CUL-H05279-15-P36136

স্নেহের ব্যথা।

15 — P 36,136

নবগঙ্গার শ্যাম কূলে মাধবপুর ক্ষুদ্র গ্রাম। নদীতীরে এক শ্রেণী তিন্তিড়ীক ও কতকগুলি বেণুকুঞ্জ। নদীপথে গমনশীল জলযানের আরোহীর চক্ষে সেই শ্যামস্তূপ-মধ্যবর্ত্তী গ্রামখানি চিত্রলিখিতবৎ প্রতীয়মান হয়। শ্যামশষ্পাস্তৃত নিম্নগ তটভূমিতে জলকূলে ঘনশ্যাম বেতসকুঞ্জ ও মধ্যে মধ্যে কেতকী। গ্রামখানিও বৃক্ষবহুল, ছায়াতিশয্যে শীতল। গ্রামে আম, কাঁটাল, খর্জ্জুর ও নারিকেল তরুই অধিক—আর মধ্যে মধ্যে বেণুকুঞ্জ। গ্রামে স্থানে স্থানে পতিত জমীতে কালকাসন্দা ও আস্‌সাটির ঝোপ; শীতাগমে শিয়ালকাঁটার হরিদ্রাবর্ণ ফুল ফুটিয়া থাকে। গৃহগুলি পরিচ্ছন্ন—প্রাঙ্গন এরণ্ডের বা চিতার বৃতিতে বেষ্টিত; বৃতিতে তেলাকুচার লতার কোথাও বা শ্বেত কুসুম—কোথাও বা পরিপক্ক রক্ত ফল। অধিকাংশ প্রাঙ্গনেই বাণে লতা।

গ্রামে লোকের সংখ্যা অধিক নহে। অধিকাংশই কৃষিব্যবসায়ী; কয় জন কৈবর্ত্ত—ভূষামালের কায করে; আর কয় ঘর কায়স্থ—কাহারও সামান্য জমাজমী আছে, কাহারও বা চাকরী সম্বল। গ্রামে ধনী নাই বলিলেই হয়। কায়স্থ-হারাধন তরফদার হরিণকুণ্ডের ব্রাহ্মণ জমীদারের অধীনে ভদ্রাসনের ও নিকটস্থ আর কয়খানি গ্রামের তহশীলদার ছিলেন। তরফদার মাসিক তিন টাকা বেতনে সন্তুষ্ট থাকিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন; তাহাতেই তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। অভাব অল্প;—খামারজমীতে কিছু ধান্য হইত,—প্রজারাও বিচালি, তরকারী প্রভৃতি দিয়া আসিত।

হারাধনের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ আশুতোষ নিকটস্থ গ্রামের পাঠশালায় কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। হারাধনের মৃত্যুর পর জমীদার তাঁহাকে তাঁহার পিতার কার্য্য দিয়া প্রতিপালন করেন। আশুতোষের পর হারাধনের পর পর দুই পুত্র ও এক কন্যার মৃত্যু হয়;—কনিষ্ঠ শ্যামাচরণ তাহার পরের সন্তান, সুতরাং জননীর বড় আদরের। তাহার বিদ্যা "শিশুবোধক" অতিক্রম করে নাই। শ্যামাচরণ বাড়ীর কায দেখিত;—খাসখামারের কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিত;—গ্রামের লোকের আপদবিপদে সাহায্য করিত—অন্নপ্রাশনের, বিবাহের, শববহনের ও

শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিত; বর্ষাকালে নবগঙ্গার স্ফটিকবারি যখন কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিত, তখন ছিপ লইয়া মৎস্য ধরিত।

হারাধনের মৃত্যুকালে আশুতোষের বয়স প্রায় ত্রিশ, শ্যামাচরণের বিশের কিছু উপর। হারাধনের মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে আশুতোষের প্রথম সন্তান—পুত্র যশোদাকুমার জন্মগ্রহণ করে। পুত্র প্রসব করিয়াই বহুকালাবধি রুগ্না প্রসূতি পীড়িতা হইয়া পড়েন। পীড়া ক্রমে সূতিকায় পরিণত হয়। প্রথম সামান্য টোট্‌কা টাট্‌কার ব্যবস্থা হয়—তাহাতে ফলোদয় হইল না। পরে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কবিরাজ মহাশয় পীড়ার অবস্থা শুনিয়া বটিকার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ফল প্রসব করিয়া ওষধি যেমন শুকাইয়া যায়, পুত্র প্রসব করিয়া প্রসূতি তেমনই জীবনত্যাগ করিলেন।

যশোদাকুমার পিতামহীর আদরে ও খুল্লতাতপত্নীর অঙ্কে বাড়িতে লাগিল। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাহার হাতে খড়ি হইল। সেই সময় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আশুতোষের মনে পুত্রকে অর্থকরী ইংরাজী বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। তিনি পুত্রকে সেই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

যশোদাকুমার বিদ্যালয়ে পড়িতে লাগিল। বুদ্ধিমান বালক শিক্ষায় উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিতে লাগিল, শিক্ষকগণ বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন,—আশুতোষের পিতৃহৃদয় আনন্দে ও আশায় উৎফুল্ল হইল।

যশোদাকুমারের বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর, সেই সময় শীতকালে গ্রামে বিষম বিসূচিকা দেখা দিল। গৃহে গৃহে ক্রন্দনধ্বনি—নদীজলে শব—শৃগাল কুক্কুর গৃধ্র শব আহার করিয়া শেষ করিতে পারিতেছে না;—সকলেই ভীত। এক দিন প্রত্যূষে আশুতোষ পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। সন্ধ্যার মধ্যে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। ভ্রাতার শবদাহ করিয়া শ্যামাচরণ যখন গৃহে ফিরিল, তখন পুত্রের পীড়া জননীতে সংক্রান্ত হইয়াছে। তিন দিন সস্ত্রীক শ্যামাচরণ প্রাণপণে জননীর শুশ্রূষা করিল। রোগিণীর অবস্থা কখন কিছু ভাল, কখন অত্যন্ত মন্দ—এই ভাবে তিন দিন আশায় নিরাশায় শ্যামাচরণের হৃদয়ে আলোক ও ছায়া আসিতে যাইতে লাগিল। চতুর্থ দিন জননীর জীবন শেষ হইয়া গেল।

শ্যামাচরণ অন্ধকার দেখিল।

২

যথাকালে ভ্রাতার ও জননীর শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইল। শোকের প্রথম বেগ প্রশমিত হইয়া গেল। ভাবনার অন্ত নাই, শ্যামাচরণ ভাবনার কূল পাইল না।

সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের উপায় কি! যশোদাকুমারের শিক্ষার উপায় কি হইবে? এখন বিপদে পড়িয়া শ্যামাচরণ বিশেষ বুঝিল,—যেমন করিয়াই হউক, যশোদাকে পড়াইতে হইবে। সে আপনি যদি কিছু লেখাপড়া জানিত, তবে আজ এত বিপদ ঘটিত না। এখন শ্যামাচরণের মনে পড়িল, পিতা তাহাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিরস্কার করিলে জননী যখন বিপন্ন পুত্রের উদ্ধার হেতু ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন, তখন বিরক্ত হইয়া পিতা বলিতেন,—"শেষে যে খানসামাগিরি করিয়া খাইতে হইবে! আমি তাহা দেখিতে আসিব না; কষ্ট উহারই হইবে।"

স্বামী স্ত্রীতে অনেক পরামর্শ হইল। বন্ধ্যা কামিনী হৃদয়ের সমস্ত আকর্ষণে যশোদাকেই ভালবাসিয়াছিল—তাহাকেই নিষ্ফল বক্ষে চাপিয়া শান্তি পাইয়াছিল। কামিনীও বলিল, যেমন করিয়া হউক যশোদাকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে হইবে। কিন্তু উপায় কি! কেহই ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিল না।

পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের এক জন দরিদ্র কায়স্থসন্তান কলিকাতায় কাজ করিত। এই সময় সে গৃহে আসিল। সে শ্যামাচরণকে আশা দিল যে, মানসম্ভ্রম ত্যাগ করিতে পারিলে কলিকাতায় কিছু উপার্জ্জন হইতে পারে। তখন মানসম্ভ্রমের কথা শ্যামাচরণের মনেই ছিল না; সে তখন যশোদাকুমারকে মানুষ করিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্যামাচরণ স্ত্রীকে সে কথা বলিল। কামিনী কেবল জিজ্ঞাসা করিল, "যাইতেই হইবে?" দুইটি ক্ষুদ্র কথায় কি বেদনা! সত্য—যাইতেই হইবে; না যাইয়া উপায় নাই; কিন্তু যাইতে শ্যামাচরণেরও যেমন কষ্ট, কামিনীরও তেমনই বেদনা। শ্যামাচরণ কখনও বিদেশে যায় নাই; এই বয়সে অজ্ঞাত বিদেশে যাইয়া, অজ্ঞাত ব্যবসায়ে কেমন করিয়া কি করিবে? কামিনী ভাবিল,—এত দিনে গৃহ ও হৃদয় শূন্য হইবে। কামিনী কাঁদিয়া ফেলিল। তখন শ্যামাচরণ আপনার উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া পত্নীকে বুঝাইল,—"ভয় কি? আমি প্রায়ই বাড়ী আসিব। যশোদা বাড়ী থাকিবে। অল্প দিনেই যশোদা মানুষ হইবে; তখন আমাদের সব দুঃখ দূর হইবে। এ কয় দিন কোনরূপে সব সহ্য করিয়া থাকিতেই হইবে।"

কামিনী স্বামীর কথা শুনিল—বুঝিল। কিন্তু তবুও পোড়া চক্ষুতে জল ঝরিতে লাগিল। সে কেমন করিয়া শূন্য হৃদয়ে শূন্য গৃহে থাকিবে? পত্নীর সেই অশ্রু দেখিয়া শ্যামাচরণও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেছিল না। তখন অশ্রুতে অশ্রু মিশিলে হৃদয় শান্ত হইত সত্য; কিন্তু তাহা হইলে কামিনী কি আর ধৈর্য্য

ধরিতে পারিত? তাই শ্যামাচরণ সেই শেষ সান্ত্বনা হইতেও স্বেচ্ছায় আপনাকে বঞ্চিত করিল।

যাহার সহিত শ্যামাচরণ কলিকাতায় যাইবে, তাহার যাইবার দিন আসন্ন হইয়া আসিল। আশুতোষের পত্নীর যে কয়খানি অলঙ্কার ছিল, তাহা ভ্রাতার ও মাতার শ্রাদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। এখন টাকার উপায় কি হইবে! সংসারখরচ রাখিয়া যাইতে হইবে; কিছু মূলধন সঙ্গেও লইয়া যাইতে হইবে। টাকার আবশ্যক শুনিয়া কামিনী আপনার সব অলঙ্কারগুলি আনিয়া শ্যামাচরণকে দিল। সে অলঙ্কার লইতে শ্যামাচরণ ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া কামিনী বলিল,—"যদি ভগবান দিন দেন, অনেক অলঙ্কার হইবে। তুমি উপার্জ্জন করিতে যাইতেছ। অদৃষ্টে থাকে, আবার অলঙ্কার হইবে। যশোদা মানুষ হইলে সব কষ্ট ঘুচিবে।"

পত্নীর মহত্বে শ্যামাচরণ মুগ্ধ হইল। তাহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। সে বলিল, "তোমার এই সামান্য সম্বল—"

কামিনী বাধা দিয়া বলিল, "কখন্ আবশ্যক হয়—সেই জন্যই ত অলঙ্কার। উহার জন্য তুমি ভাবিও না।"

অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া গেল, তাহার কতক অংশ দিয়া শ্যামাচরণ সংসারখরচের দুই তিন মাসের আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিল—সব গুছাইয়া দিল; আর যশোদার বিদ্যালয়ের বেতন ও অন্যান্য আবশ্যক ব্যয়ের জন্য কামিনীর নিকট কিছু অর্থ রাখিল। অবশিষ্ট অর্থ সে সঙ্গে লইয়া যাইবে।

তখন শ্যামাচরণ পাড়ার প্রবীণ-প্রবীণাদিগকে আপনার সংকল্পের কথা জানাইয়া, তাঁহাদিগকে তাহার অনুপস্থিতিকালে গৃহের তত্ত্বাবধান করিতে বলিল। প্রবীণগণ তাহার সংকল্পের প্রশংসা করিয়া তাহাকে উৎসাহ দিলেন—আশার কথা বলিলেন। সকলেই সাগ্রহে তাহার গৃহের তত্ত্বাবধানের ভার লইলেন। সহসা অবস্থাবিপর্য্যয়ে শ্যামাচরণের এই কষ্টে প্রকৃতস্নেহশীলা প্রবীণাদিগের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। সকলেই শ্যামাচরণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

গ্রামের প্রবীণপ্রবীণাদিগের আশীর্ব্বাদ লইয়া শুভলগ্নে শ্যামাচরণ কল্পতরু কলিকাতার উদ্দেশে যাত্রা করিল।

৩

শ্যামাচরণ যখন চলিয়া গেল, তখনও প্রভাত হয় নাই। শীতের আকাশে ক্ষীণতনু চন্দ্র ও স্থির তারকাপুঞ্জ। প্রকৃতির মুখে স্বচ্ছ কুজ্ঝটিকার আবরণ। অদূরে নদীতীরে বেণুকুঞ্জে পবনের দীর্ঘশ্বাস ও ঝিল্লীরব। বিহগ নীরব। গ্রাম সুপ্ত।

কামিনী আসিয়া দাওয়ায় দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে শ্যামাচরণ, তাহার সঙ্গী ও ভারবাহী অদৃশ্য হইয়া গেল। দীর্ঘশ্বাস-ত্যাগ করিয়া কামিনী সেই দাওয়ায় বসিয়া পড়িল। শ্যামাচরণ যাইবার সময় কামিনী বহুকষ্টে অশ্রুসংবরণ করিয়াছিল—আর পারিল না। দাওয়ায় বসিয়া কামিনী কাঁদিতে লাগিল—সেই অশ্রুধারায় তাহার মনের সঞ্চিত ভার প্রশমিত হইল।

পূর্ব্বগগনে আলোকবিকাশ সূচিত হইল। কামিনী অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া ঘরে গেল। যশোদা তখনও ঘুমাইতেছিল। কামিনী তাহাকে তুলিল। যশোদা উঠিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা কি গিয়াছেন?" উত্তর দিতে কামিনীর গলা ধরিয়া আসিল। যশোদা অভিমানের সুরে বলিল, "আমি তোমাকে কতবার বলিয়াছিলাম, আমাকে জাগাইয়া দিও! কেন দিলে না?" কামিনী যশোদাকে জাগাইতেছিল; সে জাগিলে কাঁদিবে বলিয়া শ্যামাচরণ তাহাকে জাগাইতে দেয় নাই। সে কথা বলিতে যাইয়া কামিনী কাঁদিয়া ফেলিল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া যশোদাও কাঁদিতে লাগিল।

এই সময় প্রাঙ্গন হইতে পাড়ার এক জন প্রবীণা ডাকিলেন, "ছোট বৌ!" অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কামিনী ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিল। প্রবীণা শ্যামাচরণের গমন-সংবাদ লইয়া প্রাতঃস্নানার্থ নদীতে গমন করিলেন। কামিনী ছড়াঝাঁট দিতে প্রবৃত্তা হইল।

গ্রামের প্রবীণগণ প্রায়ই যশোদাকে ডাকিয়া তাহাদের বাড়ীর সংবাদ লইতেন, প্রবীণারা সংবাদ লইতে আসিতেন, এবং কখনও বা চালের কুমড়া, কখন বা ক্ষেতের কল মূল উপহার আনিতেন। দুর্দ্দশায় পড়িয়া কামিনী যেন গ্রামের সকলের সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। গ্রামের সকলের এই সহানুভূতি কামিনীর রমণী-হৃদয় স্পর্শ করিত, কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত। কিন্তু হৃদয়ের শূন্যভাব কিছুতেই দূর হইত না।

মধ্যাহ্নে যখন যশোদা বিদ্যালয়ে চলিয়া যাইত,—গ্রাম শান্ত হইত, তখন বিজন গৃহে একাকিনী কামিনী দূরগত শ্যামাচরণের কথা ভাবিত, তাহার বুক যেন ফাটিয়া যাইত। কবে এ দুঃখের শেষ হইবে?

৪

শ্যামাচরণ কলিকাতায় আসিয়া যেন সমুদ্রে পড়িল। পল্বলবাসী মীন সাগরে পড়িলে তাহার কেমন বোধ হয়? সৌধের অরণ্য—পাষাণপথে অবিরাম জনস্রোতঃ! এখানে সে—পল্লীপুত্র—কেমন করিয়া কি করিবে? দেখিতে দেখিতে কয় দিন

কাটিয়া গেল—মূলধন কমিতে লাগিল। শেষে সঙ্গীর পরামর্শে শ্যামাচরণ তাহারই অবলম্বিত ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, স্থির করিল। ফিরি করিয়া জিনিস বিক্রয় করিতে হইবে। শ্যামাচরণ মানসম্ভ্রম ত্যাগ করিবে স্থির করিয়াই আসিয়াছিল; তবুও তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে কেমন করিয়া সে কার্য্য করিবে? কিন্তু তখনই যশোদার কথা মনে পড়িল;—মনে পড়িল, কামিনী রমণী হইয়াও তাহার শেষ সম্বল স্বেচ্ছায় দিয়াছে। শ্যামাচরণ স্থির করিল, যেমন করিয়াই হউক, এ কার্য্য করিতে হইবে। তবুও দিবাভাগে শ্যামাচরণ সে কার্য্য করিতে পারিল না;—শেষে সন্ধ্যার অন্ধকারে কলিকাতার পথে পথে বরফ ফিরি করিতে লাগিল।

প্রথম প্রথম উচ্চস্বরে ডাকিতে লজ্জা বোধ করিত,—কেহ বরফ কিনিবার জন্য ডাকিলে গৃহে প্রবেশকালে শ্যামাচরণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত; সে দর করিয়া পণ্য বিক্রয় করিতে পারিত না।

ক্রমে এ সকল কাটিয়া গেল; ব্যবসায়েও অল্প অল্প লাভ হইতে লাগিল। শ্যামাচরণ আপনি যত অল্প ব্যয়ে পারিত, চালাইত;—স্বয়ং সকল কষ্ট স্বীকার করিত। যশোদাকে মানুষ করিতে হইবে।

চার মাসে সামান্য কিছু অর্থ সঞ্চিত হইল। তখন শ্যামাচরণ প্রথমবার বাড়ী গেল। সমস্ত পথ কি আনন্দ, কি আশা! দীর্ঘ চার মাস পরে শ্যামাচরণ গৃহে গেল। কামিনীর আঁধার মুখে হাসি ফুটিল। শ্যামাচরণ শুনিয়া সুখী হইল। যশোদা দিন দিন পাঠে উন্নতিলাভ করিতেছে।

এমনই ভাবে চার বৎসর কাটিয়া গেল। অকালবার্দ্ধক্যে শ্যামাচরণের কেশজাল শ্বেত হইতে লাগিল—দেহ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু তাহার শ্রমে কাতরতা নাই। সেইবার যশোদাকুমার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিল।

যথাকালে পরীক্ষার ফল বাহির হইল—যশোদা উত্তীর্ণ হইয়াছে। শ্যামাচরণ ও কামিনী যেন হাতে স্বর্গ পাইল। শ্যামাচরণ গৃহে আসিল। স্বামী স্ত্রীতে আবার কত পরামর্শ হইল। শ্যামাচরণ বলিল, "এইবার যশোদার একটা চাকুরী জুটিলে হয়।" কামিনী বলিল, "না! বাছা এখনই চাকরী করিবে কি? উহাকে আরও পড়াইতে হইবে।" শ্যামাচরণের একবার মনে হইল, উচ্চাশার একটা সীমা থাকা ভাল; কিন্তু কামিনীর কথায় তাহার উচ্চাশার সীমা বাড়িয়া গেল। সেও মনে করিল, সেই ভাল। সেই ত পরিশ্রম করিতেছি-ই; আর অল্পদিন পরিশ্রম করিলে যদি যশোদা আর দুই একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে—তবে তাহাই হউক।

এইবার যশোদাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে হইবে। সে প্রস্তাবে কামিনী আবার কাঁদিল। এবার যে গৃহ একেবারেই শূন্য হইবে! শ্যামাচরণ যখন বিদেশে যায়, তখন অভাগিনী বন্ধ্যা নারী যে অবলম্বন লইয়া ছিল, আর যে তাহাও রহিল না! কিন্তু কাঁদিয়া ফল কি?

কামিনী পুত্রাধিক যশোদার বাক্স গুছাইয়া দিল। প্রত্যেক দ্রব্যে বন্ধ্যা নারীর অশ্রু যেন আশীর্ব্বাদের মত পতিত হইল। তাহার মনে কত আশঙ্কা!

আবার বিদায়ের দিন আসিল। শ্যামাচরণ যশোদাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল। কামিনী শূন্যগৃহে—শূন্যহৃদয়ে একাকিনী রহিল। সঙ্গে রহিল কেবল আশা।

৫

শ্যামাচরণ যশোদাকে কলিকাতায় লইয়া আসিল। তাহাকে ছাত্রাবাসে রাখিল। ব্যয় বাড়িয়া গেল—শ্যামাচরণ অধিক পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইল। তাহাতে তাহার বিরক্তিমাত্র নাই। কিন্তু সেই জন্য সে প্রত্যহ যশোদাকে দেখিতে যাইতে পারিত না। যশোদা কলেজে পড়িতে লাগিল।

যথাকালে যশোদা দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল—বৃত্তি পাইল। শ্যামাচরণের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু সে লক্ষ্য করিল, যশোদার যেন কেমন পরিবর্ত্তন হইতেছে। নূতন স্থানে—নূতন পরিচিতদিগের মধ্যে পল্লীপালিত বালক আর যেন পূর্ব্ববৎ নাই। শ্যামাচরণ মনকে প্রবোধ দিল, এমন হইতেই পারে। সে কথা সে কামিনীকেও বলিল না। কিন্তু যশোদা বৃত্তি পাইলেও তাহার ব্যয় দিন দিন বাড়িতে লাগিল। শ্যামাচরণের পরিশ্রম কমিল না। সে একদিনও যশোদার ব্যয়বাহুল্য সম্বন্ধে বাক্যব্যয় করিত না; যেমন করিয়াই হউক, তাহাকে তাহার প্রার্থিত অর্থ দিত।

আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল;—যশোদা বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। কামিনী পূর্ব্ব হইতেই যশোদার বিবাহ দিবার জন্য জিদ করিতেছিল; এবার বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। শ্যামাচরণেরও মত হইল।

শ্যামাচরণ কলিকাতায় আসিবার কয় দিন পরে এক দিন ছাত্রাবাসে গেল। যশোদার এক "বন্ধু" তাহাকে বলিল, "ছাত্রাবাসের সম্মুখে উকীল রামদাস বসু মহাশয়ের বাটী। তিনি তাঁহার কন্যার সহিত যশোদার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক।" শ্যামাচরণ ক্রমে ক্রমে শুনিল, রামদাসের এক পুত্র যশোদার সতীর্থ। পাঁচ ছয় মাস হইতে এই সম্বন্ধের কথা হইয়াছে; যশোদা এ বিবাহে সম্মতি জানাইয়াছে।

তাহার অজ্ঞাতে ব্যাপার এত দূর অগ্রসর হইয়াছে জানিয়া শ্যামাচরণ কিছু বিস্মিত হইল। কিন্তু যশোদার সম্মতির কথা শুনিয়া সে আর কিছু না বলিয়া আপনার সম্মতিজ্ঞাপন করিল।

বিবাহের সব স্থির হইল। শ্যামাচরণ উপলক্ষমাত্র। স্নেহশীল শ্যামাচরণের হৃদয়ে সেই প্রথম স্নেহের ব্যথা বাজিল।

দিন কয়েকের মধ্যেই শ্যামাচরণকে পুনরায় গৃহে যাইতে হইল। যশোদার বিবাহ হইবে—কামিনী জিদ করিল, সে কলিকাতায় যাইবে। শ্যামাচরণ কোন্ প্রাণে তাহাকে নিবারণ করিবে? রমণী স্নেহে অন্ধ হইলে অবস্থা-ব্যবস্থা সব ভুলিয়া যায়। কামিনী কলিকাতায় যাইবে—'বধূ-পরিচয়ে' বধূকে বলয় দিবে। অবস্থার কথা বলিয়া নিবারণ করিতে শ্যামাচরণের মন সরিল না।—কামিনী স্বেচ্ছায় তাহার স্ত্রীধন বাহির করিয়া দিয়াছিল।

শ্যামাচরণ পৈত্রিক খামারজমী বন্ধক দিল—অর্থসংগ্রহ করিল।

৬

যশোদার বিবাহ হইল। কামিনী দেশে যাইয়া 'বৌভাত' করিবার প্রস্তাব করিল। যশোদার মত হইল না। যে দারিদ্র্য মানবের ঔদ্ধত্য ও অবিনয়, গর্ব্ব ও স্পর্দ্ধা চূর্ণ করিয়া দেয়, যাহার অপেক্ষা সুশিক্ষক জগতে আর নাই, যশোদা সেই দারিদ্র্য লজ্জার কারণ বলিয়া মনে করিতে লাগিল, তাহা গোপন করিতে সচেষ্ট হইল। প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামই মানবজীবন—মহত্ত্বের ও মনুষ্যত্বের পথ প্রতিকূলতার কঠোর কণ্টকে আকীর্ণ, তাহা সে বুঝিল না। হায় ভ্রান্তি! হায় কুশিক্ষা!

যশোদার মত বুঝিয়া শ্যামাচরণ কামিনীকে বুঝাইল,—"বৌমা বড়মানুষের মেয়ে, ছেলেমানুষ। আমাদের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে এখনই লইয়া যাইলে ছেলেমানুষের বড় কষ্ট হইবে।" কামিনী অভিমানের সুরে বলিল, "বল কি? তবে কি বৌ ঘর করিতে যাইবে না?" শ্যামাচরণ বুঝাইল,—"কেন যাইবে না? একটু গুছাইয়া লইয়াই বৌমাকে লইয়া যাইব।" কামিনীর স্বাতন্ত্র্য ছিল না—সে আর দ্বিরুক্তি করিল না। কামিনীকে বুঝাইবার জন্য শ্যামাচরণ বধূর "ধূলি পায় লগ্ন" করাইয়া কামিনীকে দেশে ফিরাইয়া লইয়া গেল। যশোদা পাঠের ছুতা করিয়া কলিকাতায় রহিল,—সঙ্গে গেল না।

ইহার পর শ্যামাচরণ তাহার নিকট যাইলে যশোদা যেন বিব্রত হইয়া পড়িত। শ্যামাচরণ তাহা বুঝিল। বোধ হয়, যশোদা শ্যামাচরণের কলিকাতায়

অবস্থানের কথা বন্ধুবান্ধব ও কুটুম্বদিগের নিকট গোপন করিতেছিল। শ্যামাচরণ পুত্রাধিকস্নেহভাজন যশোদাকে সর্ব্বদা দেখিবার জন্য হৃদয়ের তৃষ্ণা হৃদয়েই রাখিল, তাহার নিকট গমন কমাইয়া আনিল। তাহাতে কেবল কষ্ট।

এই সময় প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যশোদা ডেপুটীর পদ পাইয়া বিদেশে চলিয়া গেল।

কর্ম্মস্থান হইতে যশোদা প্রথম প্রথম শ্যামাচরণকে পত্র লিখিত;—ক্রমেই তাহা বিরল হইয়া আসিতে লাগিল। কয় দিন পত্র না পাইলে শ্যামাচরণ ব্যস্ত হইয়া উঠিত—পত্র লিখিত। ক্রমে শ্যামাচরণ পত্র না লিখিলে আর যশোদার পত্র আসিত না। যশোদা শ্যামাচরণকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিল না,—শ্যামাচরণের দুঃখ ঘুচিল না।

গৃহে যাইয়াও শ্যামাচরণের শান্তি নাই। কামিনী বধূকে আনিবার জন্য জিদ করে—অভিমান করে। শ্যামাচরণ তাহাকে কি বলিয়া বুঝাইবে? সেই দারুণ দুঃখের কথা বলিয়া কামিনীকে ব্যথিত করিতে সে কুণ্ঠিত হইত। বিলম্বের নানা-প্রকার কারণনির্দ্দেশ করিয়া শ্যামাচরণ তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিত।

বর্ষাধিক কাল কাটিয়া গেল। শ্যামাচরণ পৈতৃক খানাবজমী বন্ধক রাখিয়াছিল। মহাজন পূজার সময় তাহাকে টাকার জন্য তাগাদা করিতে লাগিল। অনেক বলিয়া কয় মাসের সময় লইয়া শ্যামাচরণ কার্ত্তিকের প্রথমে বাড়ী হইতে কলিকাতায় আসিল।

৭

পৌষের প্রথমে কামিনীর জ্বরের সংবাদ পাইয়া শ্যামাচরণ বাড়ী গেল; যাইয়া দেখিল, কামিনী অত্যন্ত শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কার্ত্তিক মাস হইতে তাহার জ্বর; সে গ্রাহ্য করে নাই, তাহাকে সংবাদও দেয় নাই। এখন শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।—দেখিয়া শ্যামাচরণ উদ্বিগ্ন হইল, নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে ডাক্তার আনাইল। ডাক্তার সাত আট দিন ঔষধ দিলেন; কোন ফল ফলিল না। কামিনী দিন দিন অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন শ্যামাচরণ অধিক শঙ্কিত হইয়া পড়িল। সে পৈতৃক জমাজমীর নিজের অংশ বিক্রয় করিল, ঋণশোধ করিয়াও কিছু অর্থ হাতে রহিল। শ্যামাচরণ কামিনীকে লইয়া কলিকাতায় আসিল।

কলিকাতার একটি বহুজনাকীর্ণ বাড়ীর একটি ক্ষুদ্র কক্ষে শ্যামাচরণ বাস করিত। মেজে আর্দ্র, প্রাচীরগাত্র বহু দূর পর্য্যন্ত সিক্ত—বালুকা খসিতেছে।

সেই ক্ষুদ্র কক্ষে কামিনী যেন হাঁপাইয়া উঠিল। তাহার পল্লীগৃহ পরিচ্ছন্ন, শুষ্ক, আলোকোজ্জ্বল, বায়ুহিল্লোলস্নিগ্ধ। সে গৃহের সহিত এ গৃহের কি প্রভেদ!

শ্যামাচরণ ডাক্তার আনিল। তিনি দেখিয়া বলিলেন, রোগিণী ম্যালেরিয়া জ্বরে জীর্ণা। প্রথম কয় দিন শ্যামাচরণ সর্ব্বদাই পত্নীর নিকটে থাকিত। কিন্তু সামান্য অর্থ ছিদ্রকুম্ভের বারির মত শেষ হইতে লাগিল। তখন শ্যামাচরণকে আবার অর্থের জন্য বাহির হইতে হইল। দরিদ্রের অনেক জ্বালা। সে যতক্ষণ নিকটে না থাকিত, ততক্ষণ কামিনীর মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইত। শ্যামাচরণের কেবল মনে হইত, অর্থাভাবে কামিনীর যথেষ্ট চিকিৎসা করাইতে পারিতেছে না।

মাসাধিককাল চিকিৎসা চলিল—কোন সুফল ফলিল না। শেষে শ্যামাচরণ ও কামিনী উভয়েই বুঝিল, দিন ফুরাইয়াছে। শ্যামাচরণের দুর্দ্দশাদাবানলদগ্ধ জীবনে সকল আশার আলোক যেন নিবিয়া যাইতে লাগিল।

শেষে কামিনী এক দিন বলিল, "তুমি যশোদাকে আসিতে লেখ। তাহাকে আনিয়া দাও। আমি মরিবার আগে তাহাকে একবার দেখিব।"

শুনিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া শ্যামাচরণ বালকের মত কাঁদিল, তাহার পর মন স্থির করিয়া যশোদাকে পত্র লিখিয়া কামিনীর শেষ ইচ্ছা জানাইল।

ইহার দুই দিন পরে পূর্ণিমা। কামিনীর জ্বর বাড়িল। সে একবার জিজ্ঞাসা করিল, "যশোদা কবে আসিবে?" শ্যামাচরণ বলিল, "শীঘ্রই আসিবে।"

কামিনী জ্বরঘোরে সংজ্ঞাহীনা হইয়া পড়িল। অজ্ঞান অবস্থায় সে কেবল যশোদার কথা বলিতে লাগিল—যখন শ্যামাচরণ যশোদাকে তাহার নিকট রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই সময়ের কথা।

সেই দিন নিশাশেষে কামিনীর জীবনদীপ মৃত্যুর ফুৎকারে নিবিয়া গেল। শ্যামাচরণের সব শেষ হইল।

* * * * *

কামিনীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া যশোদা যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহা কামিনীর মৃত্যুর পর শ্যামাচরণের হস্তগত হইল। শ্যামাচরণ তাহার উত্তর দিল না।

তাহার পনর দিন পরে ছুটী লইয়া যশোদা কলিকাতায় আসিল—শ্বশুরালয়ে উঠিল।

শ্যামাচরণের সহিত যশোদার যখন সাক্ষাৎ হইল, তখন যশোদার চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। প্রকৃতি সময় সময় কৃত্রিমতার সকল আবরণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। যশোদা শৈশব হইতে কামিনীর ক্রোড়ে পালিত—তাহার

মৃত্যুতে যশোদা হৃদয়ে সত্য সত্যই বেদনা অনুভব করিতেছিল। কিন্তু শ্যামাচরণের আহত অভিমান গুরুভার প্রস্তরের মত তাহার অশ্রুর উৎসমুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। উভয়ের অশ্রুপ্রবাহ মিশিল না—উভয়ের মধ্যে বর্দ্ধনশীল ব্যবধান দূর হইল না। যে সুযোগ আপনি আসিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইল।

ইহার পর যশোদা প্রায় প্রত্যহ শ্যামাচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিত। কিন্তু কেহই যেন কথা খুঁজিয়া পাইত না।

শ্রাদ্ধের দিন যশোদা শ্যামাচরণের সঙ্গে গঙ্গাতীরে গেল। শ্রাদ্ধ শেষ হইল। গৃহে ফিরিবার সময় শ্যামাচরণের গৃহদ্বারে যশোদা তাহাকে কয়খানি নোট দিল।

শ্যামাচরণ কক্ষে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিল; সেই কয়খানি নোট বহুবার নাড়া চাড়া করিয়া কেবল কাঁদিল। যশোদার মাতৃবিয়োগ হইতে আজ পর্য্যন্ত কত দিনের কত কথা তাহার মনে পড়িল! যশোদার শৈশব হইতে বাল্য, বাল্য হইতে যৌবন, সে যেন সবই চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে লাগিল। আর—কামিনীর স্নেহ ও স্বার্থত্যাগের কথা বারংবার তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

বহুক্ষণ কাঁদিয়া শ্যামাচরণের হৃদয়ের ভার যেন কিছু লঘু হইল। তখন সে উঠিল—দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহের বাহির হইল।

শ্যামাচরণ যশোদার শ্বশুরের গৃহে উপনীত হইল। ভৃত্যকে দিয়া যশোদাকে ডাকাইল। যশোদা আসিলে শ্যামাচরণ সেই অশ্রুসিক্ত নোট কয়খানি তাহার হস্তে দিয়া বলিল, "বাবা, শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইয়াছে; টাকার আমার আর আবশ্যক নাই।"

যশোদা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। সে কোনও কথা কহিবার পূর্ব্বেই শ্যামাচরণ গলি ছাড়াইয়া সদর রাস্তায় গিয়া পড়িল।

কুসুম।

নলিন ও পরেশের কলিকাতার নিম্নবাহিনী ভাগীরথী ভিন্ন অন্য কোনও নদীর সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। প্রাবৃটপ্রসন্না পদ্মার অকূল জলবিস্তার দেখিয়া তাহারা সহজেই চকিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাতে আবার ঝড়!

শঙ্কিতচিত্তে বন্ধুদ্বয় 'ছই'য়ের বাহিরে আসিয়া দেখিল, পদ্মা ফেনপুঞ্জে মণ্ডিতা।—যেন নন্দনচারিণীগণের চেলাঞ্চলচ্যুত শুভ্র পুষ্পরাশি পদ্মাবক্ষে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম চক্রবালনিম্নে সূর্য্যকিরণে জলরাশি রঞ্জিত। রক্তাংশুকের ন্যায় একটি রক্ত আভা তাহাদের নৌকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুলিতেছে। পদ্মা তখন উন্মাদিনী মূর্ত্তিতে নৃত্যশীলা।

অদূরে, ইলিশ-মাছ বোঝাই একখানি 'ছাঁদি' নৌকায় দিনান্তে জালুকেরা গৃহে ফিরিতেছিল। বিপদ আসন্ন বুঝিয়া তাহারা পুনরায় 'বেড়জাল'খানা ফেলিয়া দিল। 'বেড়জাল' ফেলিতে পারিলে ছাঁদি নৌকার আর কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

নলিন ও পরেশ উভয়েই তখন কিনারায় নৌকা লাগাইবার জন্য মাঝিকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। মাঝি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিল, পদ্মার 'ভাঙ্গন' কূলে নৌকা লাগান বিপজ্জনক। উপায়ান্তরহীন বন্ধুদ্বয় তখন অগত্যা কোনও নিরাপদ স্থানের প্রতীক্ষায় রহিল।

কিছুক্ষণ পরে মাঝি একটা 'জুলি'র মধ্যে নৌকা লইয়া গেল। কিন্তু সেখানেও বিপদের আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূর হইল না। এক একবার এক একটা দম্‌কা বাতাস আসে, আর সুর-চড়ান বেহালার তাঁতের মত নৌকার কাছি টন্ টন্ করিয়া উঠে। দেখিয়া শুনিয়া বন্ধুদ্বয়ের নৌকায় থাকিতে সাহস হইল না। মাঝিকে একটা আশ্রয়ানুসন্ধানের জন্য পাঠাইয়া দিল।

মাঝি ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, নিকটবর্ত্তী হাটের এক মুদীর দোকানে তাহাদের থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া আসিয়াছে।

২

ঝম্ ঝম্ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। মাঠের মধ্য দিয়া পথ। মাঝে মাঝে এক একটা 'বন্যা' ও 'হিজল' গাছ। পথে কোথাও এক হাঁটু জল, কোথাও কাদায় পা ডুবিয়া যায়। অতি কষ্টে নলিন ও পরেশ মুদীর দোকানে গিয়া উপস্থিত হইল।

ঘরখানি বেশ পরিচ্ছন্ন। উপরে 'ছনে'র ছাউনি; চারি দিকে 'চাঁচে'র বেড়া। এক কোণে একটি প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। গৃহের সামান্য তৈজস-পত্রগুলির শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যের মধ্যে নিপুণ গৃহিণীপনার পরিচয় সুস্পষ্ট।

গৃহের এক প্রান্তে মাচার উপর একটি শয্যা। সেই শয্যায় এক জন শয়ান। শয্যাপার্শ্বে বসিয়া একটি যুবতী তাহার গায়ে হাত বুলাইতেছিল। যুবতী আগন্তুকদ্বয়কে দেখিয়া, ঘোমটা টানিয়া, ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

দাঁড়ের উপর একটি কাকাতুয়া ঘুমাইতেছিল। অপরিচিতের সাড়া পাইয়া কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল।

বন্ধুদ্বয় শয্যার নিকট গিয়া দেখিল, শয্যায় এক জন পীড়িত,—বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখ, কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু দুইটি নিমীলিত। তাহারা দুই একবার রুগ্নকে ডাকিল, কোনও উত্তর পাইল না।

এমন সময় স্ত্রীলোকটি এক ঘটি জল ও একখানি গামছা ঘরের মেঝেয় রাখিয়া গেল। বন্ধুদ্বয় হাত পা ধুইয়া আসিল। এক পাশে গোটা দুই তিন কেরোসিনের বাক্স পাতা ছিল, তাহার উপর বসিয়া পড়িল।

স্ত্রীলোকটি তখন ঝিনুকে করিয়া রুগ্নকে দুধ খাওয়াইতেছিল। দুধ খাওয়ান শেষ হইলে সযত্নে রোগীর মুখ মুছিয়া দিয়া গায়ের বাঁধাখানি ভাল করিয়া মুড়িয়া দিল। তার পর রোগীকে ব্যজন করিতে লাগিল।

যাহাদের আশ্রয়ে আসিয়াছে, তাহারা কেহ কোনও কথা কহে না দেখিয়া, পরেশ মনে মনে একটু বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া উঠিল। নলিনের কানে কানে বলিল, "কৈ, এরা কেউ ত কিছু বলে কয় না।"

নলিন বলিল, "সে জন্য এত আক্ষেপ কেন? রাত্রে থাকিবার মত একটু স্থান পাইয়াছ, তাহাই যথেষ্ট। তা ছাড়া দেখছ এক জন রুগ্ন। অপরটি স্ত্রীলোক, বিশেষ,—"

প। তুমি যে ইতিমধ্যেই বিশেষের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হ'লে দেখছি। অ—এমন যখন অবস্থা, তখন অমন কলাবউটি সেজে থাকার চেয়ে আমাদের আশ্রয় না দিলেই হ'ত।"

বিপন্নাবস্থায় আশ্রয়প্রাপ্তির জন্য যে তাহাদের কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য, নলিন তাহার বন্ধুকে এই কথাটি স্মরণ করাইয়া দিবে, মনে করিতেছিল। কিন্তু পরেশ এক কথায়, মুখবন্ধের প্রারম্ভেই, নলিনের মুখবন্ধ করিয়া দিল।

কথায় পরেশকে আঁটিয়া উঠা দায়।

উভয়ে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর পরেশ উঠিয়া একেবারে পীড়িতের শয্যার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিয়া স্ত্রীলোকটি তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিয়া শয্যা হইতে নামিয়া দাঁড়াইল।

সরলপ্রকৃতি পরেশ সর্ব্বত্র সপ্রতিভ। তাহার কথাবার্ত্তায় আলাপ আচরণে এমন একটি সরল সচ্ছন্দ ভাব ছিল যে, নিতান্ত অপরিচিত লোকের মধ্যেও সে অতি সহজে নিজের ব্যক্তিত্বটাকে বিশেষিত করিয়া তুলিতে পারিত।

পরেশ রুগ্নকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি অসুখ? কতদিন ভুগিতেছ?"

সে কোনও উত্তর দিল না। কাতরদৃষ্টিতে অতিথির মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

পরেশ ভাবিতেছিল, লোকটা কালা না কি?

স্ত্রীলোকটি তখন সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিল যে, এক বৎসর হইল, রোগে ইহার বাক্‌শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পরেশ স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এর কে হও?"

সে কোনও উত্তর দিল না। অবনতমুখী হইয়া রহিল।

"তোমার স্বামী?"

স্ত্রীলোকটি সসঙ্কোচে মস্তক অবনত করিয়া দ্বারের অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় হাটের 'পিঠালিপোড়া' গাছ হইতে 'কুরুলিয়া' পাখী 'কঃ-কঃ' শব্দে প্রহর ডাকিয়া উঠিল।

পরেশ ধীরে ধীরে নলিনের পাশে আসিয়া বসিল; কহিল, "কি হে! তুমি ধ্যানমগ্ন না কি!"

নলিন অন্যমনস্ক ছিল। পরেশের কণ্ঠে চমকিয়া উঠিয়া একটু অপ্রতিভ-ভাবে কহিল, "কাকাতুয়াটি বেশ।"

পরেশ নলিনের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "তুমি বুঝি এতক্ষণ কাকাতুয়ার ধ্যানে মগ্ন ছিলে! কাকাতুয়ার স্বামিনীকে দেখ্‌লে না!"

নলিন সত্যই এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া একদৃষ্টে কাকাতুয়াটি দেখিতেছিল। বিরহী যেমন কোনও ব্যক্তিতে প্রিয়জনের কোন সাদৃশ্য দেখিলে একাগ্রচিত্তে তাহার প্রতি দৃষ্টি-সম্বদ্ধ করিয়া থাকে, নলিন তেমনই ভাবে কাকাতুয়াটির পানে চাহিয়াছিল। তাহাদের আশ্রয়দাত্রীর সঙ্গে পরেশের যে কথা হইয়াছিল, তাহার কিছুই সে শুনিতে পায় নাই। এখন সমস্ত শুনিয়া সে বিস্মিত হইল। আজ এক বৎসর এই দুঃখিনী একাকিনী এই রুগ্ন রুদ্ধবাক্ দরিদ্র স্বামীর সেবায় নিবিষ্ট!—ভাবিতে ভাবিতে তাহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

অকস্মাৎ কড় কড় শব্দে অনতিদূরে একটা বজ্রপাত হইল। বিদ্যুৎবিভায় গৃহাভ্যন্তর মুহূর্ত্তের জন্য আলোকিত হইল। বন্ধুদ্বয় শিহরিয়া উঠিল। কাকাতুয়াটা 'ক্যাঁ, ক্যাঁ' করিতে করিতে দাঁড়ের নীচে ঝুলিয়া পড়িল। স্ত্রীলোকটি ছুটিয়া আসিয়া, জননী যে আগ্রহে শিশুসন্তানকে বুকের ভিতর টানিয়া লয়, তেমনই আগ্রহে তাহার পীড়িত অশক্ত স্বামীর শয্যাপার্শ্বে ছুটিয়া গেল। বুঝি তাহার

ইচ্ছা, বিশ্বের সমস্ত বিপত্তি হইতে এমনই করিয়া সে চিরদিন তাহার রুগ্ন স্বামীকে রক্ষা করিবে!

নলিনের বোধ হইতেছিল—মাতৃত্বের একটি স্নিগ্ধ ফল্গুধারা অনুক্ষণ এই সেবাপরায়ণা সাধ্বীর অন্তরতল অভিষিক্ত করিতেছে।

শৈশবে মাতৃহীন নলিনের হৃদয় আজ স্বর্গীয়া জননীর স্মৃতিতে উদ্বেল হইয়া উঠিল।

৩

পাশের ঘরে নলিন ও পরেশের শয়নের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহার এক ধারে একখানি ছোট মুদীখানা। অপর দিকে একখানি তক্তপোষের উপর একটি সামান্য শয্যা। বন্ধুদ্বয় শুইয়া 'সিগারেট' টানিতেছিল।

পরেশ কহিল, "এ যাত্রা কিন্তু খুব রক্ষা পাওয়া গিয়াছে। আর একটু হইলেই গৃহিণীদের সিঁথির সিন্দুর হাতের নোয়া ঘুচিয়া যাইত।"

বেড়ার আড়ালে যেন চুড়ির ঠুন্ ঠুন্ শব্দ হইল।

নলিন পরেশের কথার কোনও উত্তর না দিয়া বলিল, "শুনচ, পরেশ! মাঝির বিরহ!"

নৌকায় মাঝি তখন 'ভাটিয়াল' ধরিয়াছিল:—

"আলগা চুল কপালের উপর উড়া-কুইরা থুইয়া—
কাজলিতে খাড়াইয়াছিল কাজলা চ'খে চাহিয়া
ও সে-কি সুন্দর চ'খ—"

পরেশ শুনিয়া একটু হাসিল। বলিল, "না হ'বে কেন? কেমন চড়ুণদার তার নৌকার—"

কথায় কথায় রাত্রি বাড়িয়া উঠিল। বন্ধুদ্বয় নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিল।

৪

প্রভাতে নলিনের ঘুম ভাঙ্গিল। কিন্তু নিদ্রার জড়তা তখনও দূর হয় নাই। পরেশের তখনও নাসিকাধ্বনি হইতেছিল।

এমন সময় পাশের ঘর হইতে কাকাতুয়াটা বলিয়া উঠিল, "মা'জি! বাবু আয়া।"

সুপ্তি-সিক্ত নয়নদ্বয় উভয় হস্তে মার্জ্জন করিয়া স্পন্দিতহৃদয়ে নলিন শয্যায় উঠিয়া বসিল।

ঘরে অন্য কেহ ছিল না। একটা বিড়াল বস্তার উপর বসিয়াছিল। সে আস্তে-আস্তে নামিয়া দোকানের মাচার নীচে প্রবেশ করিল।

কাকাতুয়াটা আবার বলিয়া উঠিল—"ওগো! বেলা হয়েছে—ওঠ না।"

বিস্মিত স্তম্ভিত নলিনের তখন আর একটা কাকাতুয়ার কথা মনে হইতেছিল। সে কাকাতুয়াটাও এই সকল বুলি বলিত!

এই সময়ে পরেশের ঘুম ভাঙ্গিল। সে নলিনের মুখের দিকে চাহিয়াই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। স্নেহার্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "নলিন, তোমার কি কোনও অসুখ বোধ হচ্ছে?"

নলিন কি উত্তর দিবে? অতীতের স্মৃতিতে তাহার চিত্ত তখন উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুখে কথা সরিল না।

নলিনকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া পরেশ যখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, তখন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নলিন পরেশের নিকট কাকাতুয়ার রহস্যটি ব্যক্ত করিল। বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু ছল-ছল করিতে লাগিল।

পরেশ একটু হাসিল। বলিল, "ছি! তুমি এখনও তাহাকে ভুলিতে পার নাই?"

নলিন কাহাকে ভুলিবে? সেই উদ্ভিন্ন যৌবনের উল্লসিত রূপ, বসন্তের জলজলতিকার মত স্নিগ্ধ-অঙ্গলাবণ্য, সেই মুগ্ধবিহ্বল দৃষ্টি—হায়, সে সব কি ভুলিবার!

শিশু সূর্য্যের সোনালি কিরণ তখন, পিচকারীর ধারার মত, বেড়ার ছিদ্র দিয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। কৃষকেরা হলস্কন্ধে গরু তাড়াইতে তাড়াইতে ক্ষেত্রাভিমুখে চলিয়াছে। মেঘমুক্ত প্রকৃতির মুখ প্রফুল্ল—প্রসন্নহাস্যে সমুজ্জ্বল।

এমন সময় নৌকার মাঝি আসিয়া জানাইল, বেলা হইলে বাতাস উঠিতে পারে।

আর বিলম্ব করা অসঙ্গত মনে করিয়া বন্ধুদ্বয় উঠিয়া পড়িল। আশ্রয়দাত্রীর নিকট বিদায় লইতে গিয়া দেখিল যে, রমণী গৃহে নাই। তাহারা এ দিক ও দিক একটু অনুসন্ধান করিল; অবশেষে কোথাও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া, রুগ্নের শিয়রে কয়েকটি টাকা রাখিয়া, তাহারা চলিয়া গেল।

৫

পাঁচপীরের নাম স্মরণ করিয়া মাঝি নৌকা খুলিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় একটি কৃষকবালক হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া নলিনের রূপার সিগারেট-কেসটি ও যে টাকা কয়টি তাহারা রুগ্নের শিয়রে রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই টাকা কয়টি তাহার হাতে দিয়া, এবং সকলের বিস্ময়ের মাত্রা সমধিক বর্দ্ধিত করিয়া তখনই আবার ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সিগারেট-কেসটি যেন নলিন ভুলিয়া ফেলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু পীড়িতের সাহায্যার্থ তাহারা যে টাকা কয়েকটি দিয়া আসিয়াছিল, তাহা ফিরাইয়া দিবার তাৎপর্য্য বন্ধুদের কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

নৌকা 'জুলি'র মধ্য হইতে পদ্মায় আসিয়া পড়িল। বীচিমালিনী পদ্মা তখন শান্ত, স্থির। তীরে রাখালবালকেরা কলের জাহাজ দেখিবার আশায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নলিন 'ছই'য়ের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া একটা সিগারেট ধরাইবার অভিপ্রায়ে সিগারেট-কেসটি খুলিয়াই দেখিতে পাইল, তাহার মধ্যে একখানি কাগজ। দেশলায়ের বাক্সটি কোলের উপর রাখিয়া নলিন ধীরে ধীরে কাগজখানির ভাঁজ খুলিল। খুলিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার হৃদয়ের স্পন্দন রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল।

কাগজখানিতে লিখিত ছিল,—

"তোমার কাছে পরিচয় দিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পোড়া কাকাতুয়াটার জন্য দেখিতেছি সবই প্রকাশ হইয়া পড়িল।

"আসিবার সময় লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম, 'আমি একবস্ত্রে চলিলাম'—কিন্তু কাকাতুয়াটাকে যে আমি লইয়া আসিয়াছিলাম, তাড়াতাড়িতে সে কথা লিখিতে মনে হয় নাই। যদি কাকাতুয়াটাকে না আনিতাম! অথবা আগে থাকিতে যদি এটাকে কোথাও সরাইয়া রাখিতাম!—

"আমাকে তুমি একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিলে না। নিঃশব্দে চলিয়া গেলে। ইহাতে আমার বোধ হইতেছে, আমার প্রতি তোমার অত্যন্ত বিরক্তি ও ঘৃণা জন্মিয়াছে। এই পীড়িত ব্যক্তি যে আমার স্বামী, তাহা বোধ হয় তুমি বিশ্বাস করিতে পার নাই। এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল, আজ সে সকল কথা তোমাকে খুলিয়া বলিব; তোমাকে না বলিয়া না কহিয়া হঠাৎ চলিয়া আসিয়াছিলাম, সে জন্য তোমার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিব। কিন্তু সাহস হইল না।

"যাক্, একটা কথা আজ তোমাকে জানাইতেছি। আমার বিবাহ হইয়াছিল। তুমি তাহা জানিতে না। আমি জানিলেও, স্বামী কেমন, জীবিত কি মৃত, তাহা কিছুই জানিতাম না। পরে তাহা জানিয়াছিলাম। অর্থের লোভে মা চাতুরী করিয়া তাহা আমাকে জানিতে দিতেন না। হায়, যদি কোনও গৃহস্থের ঘরে জন্মিতাম!

"আশীর্ব্বাদ কর, যেন শীঘ্র মরি। কিন্তু স্বামীর আগে নয়। আমি আগে মরিলে এ অবস্থায় তাঁহাকে কে দেখিবে?

"হতভাগিনীর সকল অপরাধ ক্ষমা করিও।

কুসুম।"

* * * *

স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় নলিন তীরের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার বোধ হইল, দূরে—সেই মুদীর দোকানের পার্শ্বে এক নারীমূর্ত্তি তাহাদের নৌকার দিকে চাহিয়া আছে।

গরুর গাড়ী।

গ্রীষ্মের ছুটীতে দেশে আসিয়া দেখিলাম, আমাদের গ্রামের পাশ দিয়া রেলের রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে, ছোট ছোট মালগাড়ী রেলের মালমশলা সাজসরঞ্জাম আনিয়া ফেলিতেছে। দেশের ইতর ভদ্র স্ত্রীপুরুষ সকলেরই মনে উৎসাহ ও উল্লাস, বিদেশে যাতায়াতের সুবিধা হইবে, 'ছয় দণ্ডে চলে যাবে ছ' দিনের পথ।' অনেকে উৎসাহভরে আমাকে বলিয়া ফেলিলেন, 'এ বছর যা কষ্ট পেলে, আস্‌ছে বছর আর গরুর গাড়ীর কর্ম্মভোগ ভুগিতে হইবে না, একেবারে রেলগাড়ীতে আমাদের গ্রামের মাঠে আসিয়া নামিবে।' কথাটায় আমার কিন্তু আশ্বাস না হইয়া কেমন একটা আপ্‌শোষ হইল; প্রাণটা কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল। মনে হইল, হায়! ইংরাজী সভ্যতার হিড়িকে আমাদের দেশের প্রাচীন প্রথাগুলি একে একে লয় পাইতেছে; বহুবিবাহ উঠিয়াছে, অবরোধপ্রথা জাতিভেদপ্রথা একান্নবর্ত্তিপরিবারপ্রথা যায় যায় হইয়াছে, আমাদের সনাতন চক্‌মকির স্থান 'বিলাতী অগ্নি দেশলাইরূপী' দখল করিয়াছে, নবাবী আমলের অম্বুরী খাম্বিরা ছাড়িয়া আজ ভারতবাসী মার্কিনের বার্ডসাই ফুঁকিতেছে; আবার বুঝি বিধিবিড়ম্বনায় আমাদের সনাতন ঋষিগণের উদ্ভাবিত অপূর্ব্ব যান গরুর গাড়ীও বিলয়প্রাপ্ত হয়। হায়! কি কুক্ষণেই পলাশীর মরদানে বিচিত্র সমর অভিনয় হইয়াছিল।

বাস্তবিকপক্ষে, গরুর গাড়ী যেন আমাদের ভারতের নিতান্তই অন্তরঙ্গ, 'আত্মীয় হতে পরমাত্মীয়'। আমাদের শাস্ত্রে বলে, 'যাদৃশী দেবতা তস্যাস্তাদৃগ্

ভূষণবাহনম্'। কথাটা বড় পাকা। প্রকাণ্ডকায় মন্থরগতি গম্ভীরবেদী হস্তী, মাংসপিণ্ড স্থূলোদর জড়ভরত জমীদার জাতির উপযুক্ত বাহন। নরস্কন্ধবাহিত আবৃতদ্বার শিবিকা, সুভগপুরুষহৃদিবাসিনী ব্রীড়াসঙ্কুচিতা অবগুণ্ঠনবতী কুলনারীর উপযুক্ত বাহন। কঙ্কালসার-অশ্বিনীকুমারযুগল-সংযোজিত কেরাঞ্চী গাড়ী, কলিকাতার কর্ম্মক্লিষ্ট কৃশকায় কেরাণীকুলের উপযুক্ত বাহন। অবিরতঘূর্ণিতনেমি দ্বিচক্রযান আত্মনির্ভরক্ষম 'হস্তপাদাদিসংযুক্ত' উষ্ণশোণিত নব্যসম্প্রদায়ের উপযুক্ত বাহন। রেলগাড়ী, ট্রামগাড়ী, বাষ্পের জোরে, তাড়িতের বলে, প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে বায়ুবেগে ছুটে; এ সকল যান, প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের উপর প্রভুত্বপ্রয়াসী অবিশ্রান্তকর্ম্মা ধরাবিদ্রাবকারী রাজসিক য়ুরোপীয় জাতির উপযুক্ত বাহন। তেজীয়ান্ ত্বরিতগতি তুরঙ্গম, বীরবিক্রান্ত যুদ্ধব্যবসায়ী তামসিক রাজপুত জাতির উপযুক্ত বাহন; 'হঠ ধর্ম্মে হর্ষ অতি, হঠ হঠ সদা গতি, সদাগতি পরাভূত তায়'। আর দমদমাদিগুণালঙ্কৃত সাত্ত্বিক ভারতীয় ব্রাহ্মণ প্রকৃতির উপযুক্ত বাহনই গোযান। যেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা 'গোব্রাহ্মণহিতায় চ' এই অপূর্ব্বযান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হিন্দুর আরাধ্য দেবদেব মহাদেব পরমযোগী কর্ম্মমুক্ত, বৃষভাসনে সমারূঢ়। 'শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী'; ভক্ত দেবতার উপরও এক কাঠী চড়িয়াছেন। বৃষভপৃষ্ঠে বীরাসনে উপবিষ্ট হইয়া লগুড়দণ্ডে বারংবার বৃষভরাজকে তাড়না করিলে সমাধিভঙ্গের ভয় আছে, নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ হইবার পথে বিঘ্ন আছে। তাই বলীবর্দ্দযুগলের পশ্চাতে যষ্টিহস্ত সারথি ও অপূর্ব্ব বংশময় যান স্থাপিত করিয়া সাত্ত্বিক আরোহী দারুব্রহ্মের ন্যায় নিশ্চল, যেন জগৎসংস্থিতিকারণ নারায়ণ ক্ষীরোদশয্যায় অনন্ত শয়নে কোটিকল্প ধরিয়া যোগনিদ্রায় বিভোর।

যতই চিন্তা করি, ততই দেখি, গরুর গাড়ী আমাদের জাতীয় প্রকৃতির সহিত বড় পরিষ্কাররূপে খাপ খায়। রেলগাড়ীর সব দিকেই আঁটাআঁটি বাঁধাবাঁধি। রেলগাড়ী চলিবে, তাহার জন্য রেল পাতিতে হইবে, রাস্তা তৈয়ার করিতে হইবে। সেই রেল হইতে রেখামাত্র বিচ্যুত হইলেই প্রাণসংশয়, রেলের উপর কোনও কিছু থাকিলে তখনই বোঝাই ট্রেন পড়িয়া চুরমার হইয়া যাইবে, রাস্তা বেমেরামত থাকিলে তৎক্ষণাৎ ট্রেনের গমনাগমন বন্ধ। তাহার পরে, রেলের গাড়ীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে, তাহাকে হুঁসিয়ার করিতে, তাহার জল কয়লা সরবরাহ করিতে, অসংখ্য লোক ও অবিরত বন্দোবস্তের দরকার।

রেলগাড়ী নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য থামিবে, নির্দ্দিষ্ট পথে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাইবে। কঠোর ব্যবস্থা, 'পদে পদে নিয়ম অধীন'। ঠিক বিলাতী সমাজের সভ্যতার অনুরূপ, সেই পোষাক পরিচ্ছদের কড়াকড়ি, সেই কলার নেক্‌টাই রেলট গার্টারের কসাকসি, সেই ডিনারটেব্‌লের ড্রয়িংরুমের এটিকেটের আঁটাআঁটি, সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সামাজিক রীতিনীতির বাঁধাবাঁধি। এক পাও স্বাধীনভাবে ইচ্ছাসুখে এগোবার যো নাই।

গরুর গাড়ী হিন্দুসমাজের ন্যায় উদার সার্ব্বভৌমিক; জলে, জঙ্গলে, বনে বাদাড়ে, পথে অপথে, ইহার অপ্রতিহত গতি; 'হাট-বাট-ঘাট-মাঠ ফিরি ফিরিছে বহুদেশ'। ইহা নিয়মের, কড়া আইনের, নাগপাশে বাঁধা নহে। ধীরে ধীরে নীরবে নির্ব্বিকারে নির্ব্বিচারে ইহা সর্ব্বস্থানে গতায়াত করিতেছে। বিশাল বিরাট হিন্দুসমাজ যেমন 'গুঁড়ি কাষ্ঠ নুড়ি শিলা', ঘেঁটুমনসা, শীতলা, ওলাবিবি, ষষ্ঠীবুড়ী, কলাবৌ হইতে নিগুণ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত ছোট বড় সকল দেবতা নির্ব্বিবাদে নির্ব্বিশেষে অঙ্কে স্থান দিয়া ধীর স্থির গতিতে ধ্রুব লক্ষ্য অভিমুখে চলিয়াছে, শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, সেইরূপ গরুর গাড়ীও শ্যামল শস্যক্ষেত্রে, বালুকাময় নদীপুলিনে, তুঙ্গ শৈলশিখরে, বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে, গভীর খাতে, পঙ্কিল জলাভূমিতে, সমান প্রীতির সহিত ধীর সংযত গতিতে গন্তব্য পথে চলিয়াছে। সমাজ ও যান উভয়ই শান্তি ও প্রীতির লীলাস্থল। পক্ষান্তরে, য়ুরোপীয় সমাজ বাষ্পীয় এনজিনের ন্যায় রক্তনেত্রে উদ্দাম উন্মত্ত বেগে ছুটিয়াছে; আর অণুমাত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেই ধ্বংসমুখে উপনীত হইতেছে। কলুষিত প্রবৃত্তি, উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা, বিজাতীয় উৎসাহ, মর্ম্মবেদনাকর অতৃপ্তি, য়ুরোপীয় প্রকৃতির ভালে কলঙ্কের কালী লেপিয়া দিতেছে, এনজিনের কৃষ্ণাঙ্গার অবিশ্রান্ত ধূমোদ্গার করিয়া আকাশমণ্ডল কালিমাবৃত করিয়া দিতেছে। যান ও সমাজ উভয়েই অশান্তি ও অপ্রীতি স্পষ্ট প্রতীয়মান। তাই বলিতেছিলাম, গরুর গাড়ী, শুদ্ধশীল সাত্ত্বিক ভারতীয় প্রকৃতির সুসদৃশ।

যাক্, ও সব অধ্যাত্মতত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া একবার রেলগাড়ী ও গরুর গাড়ীর সুবিধা অসুবিধার কথাটা বিচার করি। রেলগাড়ীতে বারমাস ত্রিশদিন সমান লোকের ভিড়। একটু পা ছড়াইয়া বসি, বা গা মেলিয়া শুই, তাহার যো নাই। গরুড় পক্ষীর মত হাঁটু উঁচু করিয়া বসিয়া আছি, হাঁটু নামাইলেই সহযাত্রীদের পেটরার খোঁচায় কাপড় ছিঁড়িয়া বা গা ছড়িয়া যাইবে। আশে পাশে গাদা করা

বস্তা, সম্মুখে কয়েক জন 'দেশওয়ালী' দাঁড়াইয়া আছে, শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়াছে। বেঞ্চিতে পিছনে ছাতা লাঠী ছিঁচ্‌কে প্রভৃতি শাণিত অস্ত্র, একটু পিছাইলেই 'শূলে' যাইবার আশঙ্কা। ডাহিনে 'চাচাসাহেব' থাকিয়া থাকিয়া জৃম্ভন করিতেছেন, পিঁয়াজ রশুনের গন্ধে নাক জ্বলিয়া যাইতেছে। বামে মাড়োয়ারী মহাজনের কাঁইমাই চীৎকারে কাণ ঝালাপালা হইতেছে। বায়ুবেগে কয়লার গুঁড়া উড়িয়া আসিয়া চোখে পড়িতেছে। কাঠের বেঞ্চের কোমল পরশে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে, অথবা শতরঞ্চি-মোড়া গদীর কেল্লা হইতে ছারপোকাকুল অঙ্গে শেল হানিতেছে। যদি বা একটু তন্দ্রা আসিল, অমনই কাঠের দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া চৈতন্যলাভ হইতেছে, অথবা 'চাচাসাহেবে'র কোমলামঙ্গনে ম্লেচ্ছসংস্পর্শের ফল হাতে হাতে পাওয়া যাইতেছে। কোনও কোনও গাড়ীতে নিদ্রার সুবিধার জন্য ঝুলান বেঞ্চি আছে, কিন্তু উঠিতে নামিতে মাথাফাটার ভয় বিলক্ষণ আছে, অসহিষ্ণু সহযাত্রিবর্গের উত্তমাঙ্গে পাদুকাসঞ্চারের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, জীবনাষ্টিক না জানিলে উঠা নামা অসাধ্য। ইহার উপর আবার ষ্টেশনে ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে যাত্রীদের উঠানামার ভিড়, পেটরা টানাটানির হিড়িক; নবাগত যাত্রী তাড়াতাড়িতে গায়ের উপর দিয়া জুতা চালাইলেন, মাথার উপর পেটরা নামাইলেন; এ সব তো ফাউ, বোঝার উপর শাক আঁটিটা। যতক্ষণ থাকিব, নরদ্বারনিষিদ্ধবৃত্তি হইয়া থাকিতে হইবে, ষ্টেশনে নামিবার অবসর নাই, পাছে গাড়ী ছাড়িয়া দেয়, আমাকে ফেলিয়া যায়, 'সদা মনে হারাই হারাই'। গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াও স্বস্তি নাই, নামিবার সময় অসাবধানতার জন্য সহযাত্রীদের ভ্রূকুটি, তাঁহাদের নিকট সবিনয় এপলজি, মুটে ডাকাডাকি, পেটরা বাক্স নামাইবার তাড়াহুড়া, সেই উপলক্ষে সহযাত্রী মহাশয়দিগের নিকট আর একপ্রস্থ এপলজি। গাড়ী হইতে নামিয়াই অস্থাবর সম্পত্তি নামাইবার জন্য মেয়েকামরায় ছুটাছুটি, অবগুণ্ঠিতাদের ভিতর হইতে নিজের মাল সনাক্ত করা, এবং পরিশেষে রোরুদ্যমান শিশুকে চুপ করাইতে করাইতে ক্যাসবাক্সধারিণী অর্দ্ধাঙ্গিনীকে খালাস করা। চকিতের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে। নতুবা দাম্পত্যবন্ধনে চিরবিচ্ছেদ!

P 36,136

আর গরুর গাড়ী? 'হেথা সুবিমল শান্তি অনন্ত বিশ্রাম'। লোকের ভিড় নাই, কোনও হাঙ্গামা নাই, কাহারও সহিত সঙ্ঘর্ষণ হইবার আশঙ্কা নাই। I am monarch of all I survey, My right there is none to dispute. পরমুখাপেক্ষী হইয়া যাত্রিসাধারণের সুবিধার জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিসর্জ্জন

দিতে হইবে না। পুরু বিচালীর উপর তেসোক পাতিয়া ভোফা লম্বা হইয়া গা পা ছড়াইয়া দিয়া পড়িয়া আছি। উঠিলে মাথা ঘুরিবে, বসিলে বমনোদ্রেক হইবে, দাঁড়াইলে পতন অবশ্যম্ভাবী, এ স্থলে 'শয়নে পদ্মনাভ' ভিন্ন গত্যন্তর নাই। গ্রন্থকার ভবিষ্যৎ অভিধানে লিখিবেন, 'যে যানে চড়িলে শয়ন করিয়া থাকা অনিবার্য্য, তাহারই নাম গোযান'। পেটরা বাক্স সব গাড়ীর পিছনে, যানের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিতেছে। তাহার উপর পা তুলিয়া দিয়া শরীরের ভার লঘু করিতেছি। গাড়ীর মন্থরগতিতে ঈষদান্দোলিত চ্যাঙ্গারী মৃদু বায়ুহিল্লোল তুলিয়া টানাপাখার কাজ করিতেছে। বামপার্শে তেলের চোঙ্গা অবিরাম এধার ওধার দুলিয়া পেন্ডুলমের ন্যায় সময় নিরূপণ করিতেছে। ডাহিনে ছইয়ে গোঁজা কাস্তে Feudal castleএর ভিত্তিলম্বিত যুদ্ধাস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উপরে বিচিত্র রাকারীনির্ম্মিত ছই চন্দ্রালোকে অট্টালিকার কড়িবরগার ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিতেছে। নীচে ঝুলান ছাত্রাবলী থালা ঘটী বাটী দুন্দুভিনিনাদ করিতে করিতে চলিয়াছে। গাড়ীর মৃদুমন্থরগতি ও তজ্জনিত মৃদুমন্দ শব্দ, 'শ্রোণীভারাদলসগমনা' নূপুরচরণা বরাঙ্গনার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। মুহুর্মুহু আন্দোলিত কর্দ্দমগোময়লিপ্ত গোপুচ্ছ কপোলদেশে হরিচন্দনের ছিটা দিতেছে। গাড়োয়ানরূপী সচ্চিদানন্দ হুঙ্কাররবে প্রণব উচ্চারণ করিতেছেন, আর আমি 'বাঁশের দোলাতে উঠে' 'শেষের সে দিন ভয়ঙ্করে'র কথা ভাবিয়া পরমার্থতত্ত্বে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। কি ভূমা আনন্দ, কি বিমল শান্তি, কি প্রগাঢ় যোগাভ্যাস! স্থানে অস্থানে আপন এক্তিয়ার মত যেখানে সেখানে যতক্ষণের জন্য ইচ্ছা থামাইতে পারি, যেখানে সেখানে যতক্ষণের জন্য ইচ্ছা চালাইতে পারি। সাধ পুরিয়া প্রাণ ভরিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি; রেলগাড়ীর ন্যায় নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া দর্শন ও উপভোগের বিঘ্ন জন্মাইতেছে না। 'যথাবিধো মে মনসোঽভিনিষ্পতেঃ প্রবর্ত্ততে পশ্য তথা বিমানম্।' এ যেন ঠিক মনোরথগতি পুষ্পক রথ।

আর যদি এই শকটে যুগলমূর্ত্তিতে বিরাজ কর, তবে তো সে মণিকাঞ্চন যোগ। স্থানের পরিসর, শরীরের অবস্থান ও যানের গতি, এই তিনের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে এ স্থলে অনন্ত অবিচ্ছিন্ন মিলন অবশ্যম্ভাবী, মান অভিমান বিরাগ বিরহের অবসরমাত্র নাই। ভীরুস্বভাবা সীতাদেবী দণ্ডকারণ্যে মেঘগর্জ্জন শুনিয়া রামচন্দ্রকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, সেই 'নিবিড়বন্ধ পরিচয়' প্রেমিক রামচন্দ্র অনেক দিন ভুলিতে পারেন নাই। আমরা বাঙ্গালী কাপুরুষ, মেঘগর্জ্জন শুনিলে

আমরাই আগে আতঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িব, তা প্রিয়াসুখস্পর্শ অনুভব করিব কি? কিন্তু গরুর গাড়ী যখন বন্ধুর ভূমিতে উচ্চ হইতে নীচে হঠাৎ অবতরণ করে, তখন পতনভীতা ব্রীড়াশীলা কুলবধূ, কতক জড়জগতের গতিবিজ্ঞানের অমোঘ নিয়মে, আর কতক নারীহৃদয়ের সলজ্জ সশঙ্ক অনুরাগভরে পার্শ্বস্থিত পতিকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মনে রামচন্দ্রের 'দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সহচরী'র কথা উদয় করাইয়া দেন; অবসরজ্ঞ পতিও পতননিবারণের জন্য অব্যর্থ উপায় অবলম্বন করেন। ধন্য রে গরুর গাড়ী, পবিত্র প্রণয়ের এমন মধুর রস তোমার প্রসাদেই বাঙ্গালী উপভোগ করিতে পারে!

এই প্রসঙ্গে আমার এক জন অভিন্নহৃদয় বাল্যবন্ধু তাঁহার অতীত জীবনের যে একটি সুখস্মৃতির পট উদ্ঘাটন করিয়াছেন, এখানে তাহার উল্লেখ করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। বন্ধুবর লিখিয়াছেন—

"নূতন চাকরীতে প্রবৃত্ত হইয়া সস্ত্রীক শকটারোহণে' প্রবাসযাত্রা করিয়াছি। জ্যোৎস্না-রাত্রে আহারাদির পর আমরা দু'জনে দুর্গা বলিয়া চড়িয়া পড়িলাম। গ্রাম্য পথ ধরিয়া কিছু দূর গিয়া গাড়ী বাঁধা রাস্তায় উঠিল। দুই ধারে অনন্তবিস্তৃত প্রান্তর। আকাশে চাঁদ সুষুপ্ত জগতে কৌমুদীধারা ঢালিতেছে। নিশার নিস্তব্ধ প্রকৃতি মনে স্বপ্নদৃশ্যের সঞ্চার করিতেছে; আধ ঘুম আধ জাগরণে দীর্ঘ পথ বাহিয়া প্রশান্তমনে চলিয়াছি। অন্তরে বিমল শান্তি ও পরিপূর্ণ সুখের উৎস খেলিতেছে। ক্রমে পূর্ব্বদিক্ ফরসা হইল, তরুশাখায় পাখীরা প্রভাতী গাহিল, দেখিতে দেখিতে প্রাচীদিগ্‌বধূর 'ভালে বালার্ক সিন্দূরফোঁটা' শোভা পাইল, আর দিবালোকে আলজ্জবদনা প্রিয়ার ঘোমটায় তাঁহার কপালের সিন্দূরফোঁটা ঢাকা পড়িল। স্নিগ্ধ প্রভাতবাতসংস্পর্শে নিদ্রাকর্ষণ হইল। নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, একটি নদী পার হইতেছি। নদীতীর হইতে গ্রাম্যসুন্দরীরা বামকক্ষে কলসী লইয়া দক্ষিণ করপল্লব আন্দোলিত করিতে করিতে গ্রামের দিকে যাইতেছে, আর ঘরকন্নার সুখের দুঃখের কথা বলিতেছে; সরল শান্তপ্রকৃতি গ্রাম্যনারী, কোনও বিলাসচাঞ্চল্য নাই, কোনও হাব ভাব নাই। মাঠে কৃষকেরা লাঙ্গল দিতেছে ও বলদের লাঙ্গুল মোচড়াইতেছে, রাখালবালকেরা গরু চরাইতেছে ও মনের আনন্দে মেঠোসুরে গান ধরিয়াছে 'ওরে রামশশী, হ'বি বনবাসী, কে আমারে ডাকবে মা বলে'। বড় মিঠে লাগিল। ক্রমে বেলা হইল, ক্ষুধা তৃষ্ণার বেশ উদ্রেক হইয়াছে, এমন সময় এক আড্ডায় পৌঁছিলাম। পথের ধারে অশ্বত্থগাছের ছায়ায় গাড়ী রাখিয়া একখানি দোকানঘরে ঢুকিলাম। দোকানী বাড়ীর ভিতরের

একখানি ঘর নিকাইয়া চুকাইয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দিল। আমি পুঁটুলি বাঁধা ডাল চাল নুন লঙ্কা হলুদ খুলিতে লাগিলাম ও যে সব জিনিসের অভাব আছে, তাহা দোকানীকে সরবরাহ করিতে বলিলাম। এ দিকে গৃহিণী দোকানীর ছোট মেয়েটিকে সঙ্গে লইয়া স্নানে গেলেন ও আর্দ্রবস্ত্রে পূর্ণকুম্ভকক্ষে মঙ্গলময়ীবেশে আবির্ভূতা হইলেন। যথাসময়ে রন্ধন সম্পন্ন হইলে স্নানান্তে আহারে বসিলাম। কি সুন্দর রন্ধন, কি সুন্দর পরিবেশন! গৃহে কতদিন গৃহিণী রন্ধন করিয়াছেন, কিন্তু সে অন্ন ব্যঞ্জন পাঁচমিশালি, কোনটুকু তাঁহার স্পর্শে অমৃতায়মান, তাহা কেহ জানিতে দেয় নাই। আজ আর দ্বিধা সংশয় করিবার যো নাই। বুঝিলাম, নূতন সংসার পাতিয়া প্রবাসে ভালই কাটিবে। আর পরিবেশনকালে, নূতন গৃহিণীপনার আনন্দে ও গুরুজনের অসাক্ষাতেও সসঙ্কোচ লজ্জায় জড়াইয়া কি এক অপূর্ব্ব মুখশ্রী! 'ভয় নাই তবু আঁখি সতত চঞ্চল'। রৌদ্রের তেজ কমিলে আবার গাড়ী মুড়িল, দুই চারি ক্রোশ যাইতেই গোধূলি আসিল; পশ্চিম গগনে সূর্য্যদেব পাটে বসিলেন, একবার আকাশের রক্তিমরাগ আর একবার প্রিয়ার মুখের লজ্জারুণ মুখশ্রী দেখিলাম, বুঝিলাম না কোন্ শোভা অধিক মনোলোভা। রাত্রি এক প্রহর হইলে আবার এক আড্ডায় পৌঁছিয়া বিশ্রাম করিলাম, এবং শেষরাত্রে নূতন উদ্যমে যাত্রা করিলাম। সে রাত্রে আর রাঁধা বাড়া হইল না, এক চাষাবাড়ী হইতে খাঁটি দুধ লইয়া ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করিলাম। পরদিন প্রদোষকালে প্রবাসস্থিত নূতন গৃহে পৌঁছিয়া সাদরে সংসারসঙ্গিনীকে গৃহলক্ষ্মীর পদে বরণ করিলাম। সে সুখের স্মৃতি আজও গরুর গাড়ীর সঙ্গে বিজড়িত রহিয়াছে। কিন্তু রেলগাড়ীর এই বিরামবিশ্রামহীন সময়সংক্ষেপকারী বেগে সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য, সেই পথের বিচিত্র সুখ দুঃখ আনন্দ আবেগ সবই ভাসিয়া যাইবে। দেশভ্রমণের কবিত্বরস উঠিয়া যাইবে।" "The poetry of travelling is gone."

সুহৃদ্বরের ব্যক্তিগত সুখস্মৃতির কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণভাবে দেখিতে গেলেও বুঝা যায়, গরুর গাড়ীর সঙ্গে যে কবিত্বরস বিজড়িত আছে, তাহা রেলগাড়ীতে নাই। রেলগাড়ীর কথা পাড়িলেই টিকিটঘরে লোকের ভিড় ও পকেটকাটার কথা, মালপত্র লইয়া কুলীর হাঙ্গামা ও ওজনদারের কারচুপীর কথা, টেন ফেলের কথা, গলাধাক্কার কথা, গাড়ীতে গাড়ীতে ঠোকাঠুকীর কথা, চলন্তটেণে চুরী ডাকাতী ও পাশবিক অত্যাচারের কথাই মনে পড়ে। ইহাতে

কবিত্ব নাই, রস নাই, প্রেমপ্রীতির অবসর নাই; ইহার সার কবিত্ব Iron horse, আয়ন অশ্ব।

আর গরুর গাড়ী? গরুর গাড়ী প্রাচীন ভারতের সুদূর অতীতের সহিত বর্ত্তমানের কি মধুর বন্ধন, কি অখণ্ড সংযোগ স্থাপন করে। ম্লেচ্ছ যবন, শক হূণ, মোগল পাঠান, ফরাসী ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশী জাতি কর্ত্তৃক সংঘটিত রাষ্ট্রবিপ্লবের বাস্তব সত্য লুপ্ত করিয়া অতীতের সহিত বর্ত্তমানের অবিচ্ছিন্ন ঐক্য স্মরণ করাইয়া দেয়। গরুর গাড়ীর নাম শুনিলেই স্মৃতিপটে ভারতের অতীতের কত বিচিত্র দৃশ্য ফুটিয়া উঠে।

ঐ দেখিতেছি, বর্দ্ধমানক নামক বণিক্‌পুত্র দাক্ষিণাত্যে মহিলারোপ্য নামক নগর হইতে গোশকটে দ্রব্যসম্ভার সাজাইয়া, গৃহপালিত সঞ্জীবক ও নন্দক নামক দুই বলদ বুড়িয়া বাণিজ্যার্থ মথুরা যাত্রা করিয়াছেন। শকট মন্থরগতিতে স্নিগ্ধবায়ুসঞ্চালিত ষমুনাকচ্ছ বাহিয়া চলিতেছে, আর বণিক্‌পুত্র শুইয়া শুইয়া পণ্যবিক্রয়লাভের স্বপ্ন দেখিতেছেন।

আবার কি দেখিতেছি? এ যে উজ্জয়িনীর রাজপথ। মানসপটে একে একে তিনটি দৃশ্য ফুটিয়া উঠিতেছে। এক দিকে দেখিতেছি, শর্ব্বিলক নামক ব্রাহ্মণতনয় প্রেমের মহিমায় বারাঙ্গনার ক্রীতদাসী মদনিকার বিনামূলে নিষ্ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং হর্ষগদ্গদচিত্তে প্রেমপ্রতিমাকে লইয়া গোযানে চড়িয়া সুখের জীবন আরম্ভ করিতেছেন।

অন্য দিকে দেখিতেছি, অকলঙ্কচরিত্রা বসন্তসেনা চারুদত্তে সমর্পিতপ্রাণা হইয়া গোযানে চড়িয়া চারুদত্তের উদ্দেশে অভিসারে যাইতেছেন, কিন্তু 'প্রবহণবিপর্য্যয়ে' দুষ্ট শকারের হস্তে পড়িয়া অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন।

ও দিকে গোপালদারক আর্য্যক সিদ্ধপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণীতে সিংহাসনলাভ করিবেন এই আশঙ্কায়, রাজা পালক তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছেন; তিনি কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া 'বধূযানে' আরোহণ করিয়া আত্মসংগোপন করিতেছেন, এবং রাজপুরুষ চন্দনক ও দ্বিজ চারুদত্তের নিকট অভয় প্রার্থনা করিতেছেন।

এই দৃশ্যগুলি বিলীন হইতে না হইতেই মানসপটে এক পবিত্র দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। কৌণ্ডিল্য নামক মুনিসত্তম সদ্যঃপরিণীতা শীলানাম্নী সুশীলা ভার্য্যাকে লইয়া গোযানে চড়িয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছেন, মধ্যাহ্নসময়ে নদীপুলিনে ব্রতধারিণী কুলনারীগণ অনন্তের ডোর ধারণ করিয়া তাঁহার পূজা করিতেছেন; তাহা দেখিয়া

বিমাতার নির্য্যাতন হইতে সদ্যোনির্ম্মুক্তা বালিকা বধূ স্বামীর সৌভাগ্যকামনায় ঐ ব্রত গ্রহণ করিতেছেন, এবং ব্রতসিদ্ধি ও ভবিষ্য সুখের ঘরকন্নার স্বপ্ন দেখিতেছেন।

ও দিক্ হইতে নয়ন অপসারিত করিয়া দেখিতেছি, সম্মুখে বিরাট্ দৃশ্য। পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তে বৈদিক ঋষিগণ অশেষভূতিলাভার্থ সোমযাগ করিতেছেন; রাজ্ঞী 'রোম'কে গোযানে স্থাপন করিয়া ছদিঃ (ছই) দ্বারা আবৃত করিয়া 'হবির্ধান-প্রবর্ত্তন' প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন, এবং উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত ক্রমে স্নিগ্ধগম্ভীর-নির্ঘোষে ঋক্ উচ্চারণ করিতেছেন।

তাই বলিতেছিলাম, প্রাচীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতের, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের, ঐক্যসূত্রস্বরূপ এই গরুর গাড়ী। হিন্দুর বাণিজ্য, হিন্দুর রাজনীতি, রাষ্ট্রবিপ্লব, হিন্দুর প্রমোদ প্রমদাপ্রীতি, হিন্দুর ব্রতাচার ধর্ম্মাচার, সকল প্রথার মধ্যেই এই গরুর গাড়ী পরিস্ফুটভাবে বিরাজ করিতেছে। আজ দৈববিড়ম্বনায় বিলাতী সভ্যতার কুহকে অন্ধ হইয়া আমরা সেই জাতীয় জীবনের চিরসহচর গরুর গাড়ীকে হারাইতে বসিয়াছি। হায় আর্য্যসন্তান!

* * * * *

আর না! ঐ মাঠের ধারে রেলের রাস্তায় টেনের বাঁশী বাজিল। শ্যামরায়ের বাঁশীতে একদিন ব্রজবালা কুলত্যাগ করিয়াছিল। ইংরেজরাজের এই বাঁশীতে গ্রাম্যসুন্দরীদের কি দশা হইবে, কে জানে?

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যদি।

১

সর্ব্বদেশের ভাষায় 'যদি' বলিয়া একটা কথা আছে। 'যদি' অতি পুরাতন কথা। 'যদি' অতি ক্ষুদ্র হইলেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া আছে।

'যদি' অতি সামান্য কথা হইলেও ইহার গৌরব অক্ষুণ্ণভাবে চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। মানবের পক্ষে 'যদি' অস্ত্রের নড়ি।

'যদি'র আলোচনা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য। সাহিত্য-পরিষৎ ভবিষ্যতে 'যদি'র সম্বন্ধে একটা নোট করিবেন, এরূপ আশা করা যায়।

এক জন কবি গাহিয়াছিলেন :—

"'যদি'রে রমণীকুল হতে কাননের ফুল।"

হায়! হায়!

অন্য একটি কবি গাহিয়াছিলেন :—

"আগে জানতেম 'যদি' নিরবধি কাঁদাবে আমায়,
তবে কি মন প্রাণ সঁপিতাম তোমায়?"

কি সুন্দর ভাব!

প্রথম কবির ইচ্ছাটি 'যদি' অবলম্বন করিয়া সংসারের বনস্থলী কম্পিত করিতেছে। দ্বিতীয় কবি 'যদি'র কণ্ঠ জড়াইয়া হৃদয়ের অসহ্য বেদনা ও আক্ষেপ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

আমরা তাই ভাবি, 'যদি'টা কি? যদির উৎপত্তি কোথায়? 'যদি'র কি মরণ নাই? লবণের ন্যায় 'যদি' প্রত্যেক ভাবের অগ্রে পশ্চাতে ও মধ্যে মিশিয়া যায়। 'যদি' না হইলে ভাষায় রস হয় না, চিন্তায় মাধুরী হয় না, কথাবার্ত্তা জমাট বাঁধে না।

খনি ফুটিয়া যেমন খই হয়, বাক্যভাণ্ডার 'মন' হইতে কথা ফুটিলে সেইরূপ 'যদি' বাহির হয়।

২

চাদরখানি মাথায় বাঁধিয়া জীবনচন্দ্র বন্ধু হরিদাসের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন।

সম্মুখে 'ম্যাণ্টলপীসে'র উপর একখানি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ অরুণ রোদন করিতেছিল। যদি সেটা না থাকিত, তবে জীবন 'যদি'র দিক দিয়াও যাইত না; কিন্তু সে ভবিতব্য, তাহা নিশ্চয় ভবিতব্য। এই সত্য কথা ও সার কথা চিন্তাশীল পুরুষগণ বহু অধ্যবসায়ের সহিত চারি যুগ ধরিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।

ফটোগ্রাফখানি দেখিয়া জীবন ভাবিল,—"যদি বিবাহ করিতে হয়, তবে ঐরূপ।"

এটা মতপ্রকাশ।

আবার ভাবিল,—"যদি আমার হইত, তবে কত সুখের হইত!"

এটা কামনা।

জীবনের চরিত্রদৌর্ব্বল্যের পাছে হ্রাস হয়, সেজন্য বলিয়া রাখা ভাল যে, জীবনের তখনও বিবাহ হয় নাই। যে বিবাহ করে নাই, তাহার প্রথম মনে করিয়া ইহা সকলের অনুমোদিত।

অবশেষে জীবনের মনে একটা ভয় হইল, "যদি পরের হয়?"

এরূপ ভয়ও মার্জ্জনীয়।

মস্তক হইতে চাদর খুলিয়া জীবন ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিল। অধিক চিন্তা হইলে মানব হয় বসিয়া থাকে, নয় ঘুরিয়া বেড়ায়। যাহারা সস্ত্রীক, তাহারা বসিয়া পড়ে। যাহারা অবিবাহিত, তাহারা ঘুরিতে থাকে।

এটা সাধারণ প্রথা। প্রতিষেধ পাওয়া গেলেও বুঝিতে হইবে যে, তাহার কোনও গূঢ় কারণ আছে।

৩

ফটোগ্রাফখানি মাধুরীর। মাধুরী সুন্দরী। সর্ব্বাপেক্ষা মাধুরীর চক্ষু দুটি সুন্দর।

অল্পক্ষণের মধ্যেই পূর্ব্বকথিত 'যদি'র মীমাংসা হইয়া গেল। মাধুরী হরিদাসের ভাগিনেয়ী, এবং সর্ব্বপ্রকারেই জীবনের উপযুক্তা।

মাধুরী জীবনেরই হইল। অভাব পরিপূর্ণ হইল।

যদি মাধুরীর কোনও কষ্ট হয়, যদি মাধুরীর কোনও অভাব হয়, এই ভয়ে জীবন মাধুরীকে কচি লিচুর কলমের ন্যায় যত্ন করিতে লাগিল।

মাধুরী বলিল, "তুমি আমার জন্য অত কষ্ট কর কেন?"

জীবন হাসিয়া বলিল, "তুমি ভালবাসিবে বলিয়া।"

মাধুরী। 'যদি' না বাসি, তবে যত্ন করিবে না?

আবার সেই সর্ব্বনেশে 'যদি'।

জীবন বলিল, "যদি না বাস, দেখা যাইবে।"

'যদি' কল্পনার বাহন। মানব কল্পনার দাস। কল্পনা অভাবের সহচরী। ব্রহ্মা প্রথম সৃষ্টি করিয়া ভাবিয়াছিলেন, "যদি পরে অগ্নিটার সৃষ্টি করা যাইত, তাহা হইলে দেবাসুরের সংগ্রাম বাধিত না।" কিন্তু ব্রহ্মা পরে বুঝিয়াছিলেন যে, যদি একটা হয়, তবে অন্যটা হয় না। এক সঙ্গে সকলই সম্পূর্ণ হইলে 'যদি' থাকিত না। কিন্তু তাহা কি কখনও হয়? সুতরাং 'যদি'র প্রতাপ অজেয়।

জীবন ভাবিল, মাধুরীর কথাগুলা একটু কড়া। যদি আর একটু মিষ্ট হইত। যাহা হউক, যেটা হইবার কথা, সেটা হইয়া গিয়াছে। অনুশোচনা বৃথা।

৪

জীবন লেখাপড়া যথেষ্ট শিখিয়াছিল। শরীরখানি দৃঢ় ও ক্লেশসহিষ্ণু। তবে জীবন কিছু কৃষ্ণবর্ণ, এবং তাহার নিজের পছন্দমত নহে। জীবনের একটা বিশেষ স্বভাব ছিল। সে সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধচিত্ত।

সন্দিগ্ধচিত্ত পুরুষের নিকট 'যদি' কিছু অধিকমাত্রায় প্রকাশ পায়।

কুম্ভকর্ণ সন্দিগ্ধচিত্ত ছিল; কেন না, সে ছয় মাস ঘুমাইয়া থাকিত। ঘুম হইতে উঠিয়া কুম্ভকর্ণ রাবণকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, রাম কে?"

এ সন্দেহ রাবণের পূর্ব্বে হয় নাই। কিন্তু 'যদি' কুম্ভকর্ণের স্কন্ধ হইতে রাবণের স্কন্ধে আরোহণ করিল।

ঘটনাক্রমে জীবনের পক্ষে আবার 'যদি' কঠিনরূপে আবির্ভূত হইল। কথাটা অতি সামান্য।

মাধুরীর একখানি রুমালের কোণে এক ছত্র কবিতা রেশমের সুতায় গ্রথিত ছিল,—

"স্মৃতিটুকু রেখ মোর তরে"
তোমারিই জীবনে মরণে—

জীবন হঠাৎ মাধুরীর বাক্স খুলিয়া তাহা পাইয়াছিল। জীবন ভাবিল, রুমাল-খানি কোনও বাল্যসহচরীর উপহার। যদি তাই হয়, লুকাইয়া রাখে কেন? জীবন ভাবিল, মাধুরী থিয়েটার হইতে আসিলে কথাটা জিজ্ঞাসা করিবে। মন খুলিয়াই কথাটা বলা ভাল। কিন্তু আবার ভাবিল, "না, যদি মাধুরী মিথ্যা কথা কয়?"

৫

মিথ্যা কহাও সম্ভব, সত্য কহাও সম্ভব। তবে যদি মিথ্যা কথা কয়! এই ভয় জীবনের বাড়িতে লাগিল।

মনোময় জগতে প্রমাণের ভার 'যদি'র উপর। ন্যায়বাগীশ বলেন, "যদি ব্রহ্ম সত্য, তবে জগৎ মিথ্যা; কিন্তু জগৎ মিথ্যা, অতএব ব্রহ্ম সত্য।" "কোনটা সত্য নহে" এমন হইতে পারে না।

কিন্তু "যদি দুইটাই সত্য হয়?" হইবে না কেন? জগৎ মায়াময়। মায়াটা সত্য। তবে মায়ার রূপটা সত্য নয়। মায়ার খেলাটা সত্য। যাঁহার খেলা, তিনি সত্য। তবে মায়ার খেলাটা সত্য হইলেও মায়া মিথ্যা। কিন্তু এটা যে মিথ্যা, তাহা সত্য। অর্থাৎ, এ কথাটা সত্য। তবুও মিথ্যা সত্য হইতে পারে না।

আর জীবন? স্বয়ং রামচন্দ্র জানকীর সম্পর্কে বিচার ও তর্কের অধীন হইয়াছিলেন, জীবনচন্দ্র ত সামান্য লোক! জীবনচন্দ্র নূতন ওকালতী আরম্ভ করিয়াছিলেন। সওয়াল জওয়াব তাঁহার অভ্যস্ত।

কাজেই সারারাত্রিটা জীবনের অনিদ্রায় গেল। ভীষ্মের শরশয্যার ন্যায় 'যদি'

ক্রমাগত অতি তীক্ষ্ণ শরশয্যা স্থাপন করিতে লাগিল। 'যদি' শরে বিদ্ধ হইতে লাগিল। ষ্টার থিয়েটারে "সরলা" সময় যখন মাধুরী বাড়ী ফিরিল, তখন জীবন ওতপ্রোতভাবে ছিলেন। মাধুরী নিকটে আসিয়া দেখিল, জীবনের অবস্থ জীবনের মুখেও একটু নূতন রকমের গন্ধ ছিল।

মাধুরী ভাবিল, জীবন ঔষধ খাইয়াছে। মাধুরী ক করিতে দেখে নাই। কাজেই মাধুরী 'যদি'র মধ্যে গেল ন

মাধুরী বলিল, "তোমার অসুখ করেছে?"

জীবন রক্তবর্ণ চক্ষু দ্বারা অন্য দিকে একটিবারমাত্র "যদিস্যাৎ।"

৬

নবীনা বধূর ন্যায় বসন্ত-নিশীথিনী সূর্য্যকরস্পর্শে অবগুণ্ঠন হইল। দিন ও রাত্রি' বিভিন্ন নহে। সময় একটাই। সু অতএব তিনি দিনকর। চন্দ্র সেই জন্যে নিশাকর।

কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য্যেরও একটা অন্ধকার আছে। সে মানব কিছুতেই 'যদি'র কবল এড়াইতে পারে না। অভাবপূরণ হইলেও 'যদি'।

হরিদাস বলিয়াছিলেন, "'যদি' একটি পুত্রসন্তান হয়, পায়।" ক্রমে যখন পুত্র কন্যা প্রচুরপরিমাণে জন্মিল, তখন গোটা দুই কন্যা বাদ যাইত, তবে বিষয়টা এত খাটো হ হউক, যাহা হইবার, তাহা হইবেই; ইহাই 'যদি'র ব্রহ্মাস্ত্র।

হরিদাসের পুত্রকন্যার সংখ্যা মনে করিয়া জীবন ভাবিল, আমার ঐরূপ পুত্রকন্যা হয়!"

ভবিতব্যের কথা কে বলিতে পারে? জীবনের ফুলের

"যদি রে কামিনী, হ'ত, কাননের ফুল।"

জীবন ভাবিল, "যদি লাঠিগাছটা এই সময় কাছে দেখাইয়া দিতাম।"

গায়কপ্রবর হরিদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দুভূষণ। অত স্থালক। ইন্দু হরিদাসের উত্তরাধিকারী। বিষয়টা বৃহৎ। ভাবে বলিল, "তোমাদের বখামি কি সব সময় ভাল লাগে।

৭

ইন্দু একটু অপ্রতিভ হইল।

জীবন বলিল, "ইন্দু, প্রেমটা বেশ জিনিস, যদি তাহার মধ্যে কণ্টক না থাকিত।"

ইন্দু। কণ্টকটাও বেশ জিনিস, যদি তাহার সঙ্গে প্রেম না থাকে। কণ্টকটাকে চাহিলেই কণ্টক আসে। কণ্টকটা কল্পনা।

জীবন। তোমার কল্পিত কাননের ফুলও ত কল্পনা।

ইন্দু। আমি কণ্টক কল্পনা করি নাই, ফুলই কল্পনা করিয়াছি।

জীবন। জগতে কণ্টক আছে। কেবল মূর্খেরাই ফুলের কল্পনা করিয়া থাকে।

ইন্দু। যদি কল্পনা করিতে হয়, তবে ফুলের কল্পনাই ভাল। ফুলও কল্পনা, কণ্টকও কল্পনা। সুখও কল্পনা, দুঃখও কল্পনা। যদি কল্পনা করাই মনুষ্যত্ব, তবে ভালটা কল্পনা করাই ভাল। আমি কল্পনা করিয়াছি যে, বিলাতে গিয়া একটা মেম বিবাহ করিব।

জীবন। সে তোমাকে কখনও ভালবাসিবে না।

ইন্দু। জীবন দা'! তজ্জন্য আমি অল্প চিন্তা করি। কে ভালবাসিবে, তাহা কে জানে? অন্ধ দর্পণে মুখ দেখিতে পায় না।

স্ত্রীলোকগুলাই দর্পণ। যাহারা চালাক, তাহারা তাহাতে আপনার মুখ দেখিয়া লয়। আমি শুনিয়াছি, প্রকৃতি নাকি প্রচ্ছন্ন বিরাট পুরুষের দর্পণ।

জীবন। তোমার মতে স্ত্রীলোক ভালবাসিতে পারে না?

ইন্দু। সেটা প্রতিবিম্ব। তুমি ভালবাসিলেই সে বাসিবে।

জীবন। যদি না বাসে?

ইন্দু। নিশ্চয় বাসিবে। এটা একটা ধ্রুব সত্য।

জীবন। অনেকে ভালবাসিয়া প্রতিদান পায় নাই।

ইন্দু। তবে সে স্ত্রী এখনও ভালবাসিতে শিখে নাই।

জীবন। শিখিয়াছে, কিন্তু সে অন্যকে ভালবাসে।

ইন্দু। ওটা কবির কল্পনা। স্ত্রীলোক ভালবাসা চায়। রামই হউক, আর শ্যামই হউক, তাহার ভালবাসার একটা আধার চাহি। রামকে যদি সে আগে ভালবাসিয়া থাকে, তবে শ্যামের case খারাপ। কিন্তু শ্যাম যদি প্রথমে ভালবাসিয়া থাকে, তবে রামের বাবার সাধ্য নাই যে, তাহার অপসৃতাবী প্রতিবিম্ব

মুছিয়া ফেলে। মনটা একটা জড় প্রস্তরের মত। একবার গলিলেই কর্দ্দম হইয়া যায়। দুইবার গলিতে পারে না।

ইন্দু গানটা আবার উচ্চসুরে ভাঁজিয়া বাড়ীর মধ্যে গেল।

না জানি কেন মাধুরী শীর্ণা হইয়া গিয়াছে। মাধুরীর চ'খে কালিমা পড়িয়াছে।

ইন্দু বলিল, "মাধুরী, তুই অমন হয়েছিস্ কেন?"

মাধুরী বলিল "কিছু না।"

ইন্দু বুঝিল, ইহার মূলে কর্ত্তার সহিত সম্বন্ধ। বাহিরে গিয়া ইন্দু বলিল, "জীবন দা'! পূর্ব্বে জানিতাম, তুমি একটা ঘোড়া, এখন দেখিতেছি সম্পূর্ণ গাধা।"

৮

তিন চারি দিন ক্রমাগত ভাবিয়া জীবনের মাথা খারাপ হইয়াছিল। আদালতে যাইবার পূর্ব্বে জীবনের পিসী খাইতে ডাকিলেন।

জীবনের সাড়াশব্দ নাই! পিসী জীবনের বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলেন, জীবন অর্দ্ধ-অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া আছে।

পিসী ডাকিলেন, "ওরে! তোরা এ দিকে আয়, ডাক্তারকে নিয়ে আয়।"

হঠাৎ একটা গণ্ডগোল বাধিয়া গেল, এবং যাদব ডাক্তার ক্যাম্ফারের শিশি ও নস্যের ডিবা লইয়া উপস্থিত হইলেন।

জীবনের মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা হইত। ছোট খাট রকম হইলে নস্য দিলেই যাইত। একটু গম্ভীরাকারে হইলে ক্যাম্ফার লাগিত। কিন্তু এবার মূর্চ্ছা নহে। জীবন বলিল, "তাহার বাম হস্ত এবং বোধ হয় অঙ্গটা অবশ হইয়া গিয়াছে।"

যাদব ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "তোমরা সব সর।"

পিসী তখন ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে গেলেন, এবং পুরাতন শরীরে যত দূর সম্ভব, সেকালের অভ্যাস স্মরণ করিয়া পরহিতের জন্য চীৎকার করিতে করিতে লোচনের বারি ছাড়িয়া দিলেন।

মাধুরী ভয়ে ব্যাকুল হইয়া গেল। পিসী বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে, দাদার যে ব্যারাম হয়েছিল, জীবনধনেরও যদি তাই হয়—মাগো!————"

জীবনের পিতার পক্ষাঘাতে কাল হয়। মাধুরী তাহা শুনিয়াছিল। মাধুরী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

৯

অর্দ্ধরাত্রিতে যাদব ডাক্তার বলিলেন, "এখন একটু ভাল আছ ত?"

জীবন বলিল, "হাঁ।"

জীবনের চক্ষু কি অন্বেষণ করিতেছিল। পিসীমা বুঝিয়া মাধুরীকে খুঁজিতে গেলেন।

মাধুরীর মূর্চ্ছা আপনিই ভাঙ্গিয়াছিল, তাহার পর সে একমনে ঈশ্বরকে ডাকিতেছিল।

ধীরে ধীরে হৃদয়ের অসহ্য কম্পনা দৃঢ়ভাবে সংবরণ করিয়া মাধুরী জীবনের পদতলের দিকে বসিল।

জীবন বলিল, "মাধুরী, তুমি ভয় পাইয়াছ?"

মাধুরী। আমার আশা, ভয়, অবলম্বন,—সবই তুমি।

জীবন। যদি কোনও দোষ করিয়া থাকি,—কিছু মনে করিও না।

মাধুরী। স্বামীর কোনও দোষ হইতে পারে না। অমন কথা বলিও না। বল, ভাল হইবে।

জীবন। যদি না হই?

মাধুরী। তবে আমারও শেষ।

জীবন মাধুরীকে কোলে টানিয়া লইল। জীবনের কোনখানে পক্ষাঘাতের লক্ষণ ছিল না।

জীবন বলিল, "তোমার বাক্সের মধ্যে সুন্দর একখানি রুমাল দেখিয়াছি।"

মাধুরী লজ্জায় গলিয়া গেল। মাধুরী বলিল, "ওটা তোমার জন্যই বুনিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, যদি মরি, তবে ঐখানি তোমার হাতে দিয়া যাইব। কিন্তু তোমার রোগের সংবাদ পাইয়া রুমালখানি কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছি।"

জীবন সেই ছিন্ন রুমাল দেখিল।

জীবন অনেকক্ষণ স্থির হইয়া থাকিল। অলক্ষ্যে 'যদি'র শতগুলি জীবনের বুক হইতে নির্ব্বিঘ্নে বাহির হইতে লাগিল। সন্দেহের 'যদি' গেল; ঘামনার 'যদি' গেল; অহঙ্কার ও মোহের 'যদি'ও গেল। তথাপি জীবন একটা 'যদি'কে ধরিয়া রাখিল।

জীবন বলিল, "মাধুরী, যদি তুমি আজ আমার নিকট এ সময় না আসিতে, তবে আমি বাঁচিতাম না।"

মাধুরী। আমি ত তোমার দাসী। আমি যাব কোথায়?

তখন ইন্দু বাহিরে গাহিতেছিল, "যদি আসে তবে কেন যেতে চায়!"

জীবন হাসিয়া বলিল, "আমার রুমাল দেখিয়া ভয় হইয়াছিল, ও। অন্য কাহারও উপহার।"

মাধুরী। কার?

জীবন। হয় ত তুমি কাহাকেও পূর্ব্বে ভালবাসিতে।

মাধুরী। তবে তোমার নিকট আসিয়া বাঁচিয়া থাকিতাম কি করিয়া?

জীবন। ওঃ! তাই বটে। দেখ, আমার কেবল সামান্য মূর্চ্ছা হইয়াছিল মাত্র। সেটা বোধ হয় 'যদি'র মূর্চ্ছা।

মাধুরী আশ্বাস পাইয়া স্বামীর মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল।

মাধুরী। 'যদি'র মূর্চ্ছা কি প্রিয়তম?

জীবন। আমার সন্দেহ হইয়াছিল—যদি তুমি আমাকে না ভালবাস।

মাধুরী বলিল, "তোমরা আশ্চর্য্য জাতি। আমাদের কাছে 'যদি' নাই। আমরা যাহা হয়, তাহাই বিশ্বাস করি। আমরা স্বামীকেই দেখি, স্বামীকেই জানি।

জীবন। যদি স্বামী অসৎ হয়?

মাধুরী। তবুও তিনি সৎ। কল্পনা হইলেও এটা সুখের। কল্পনা-স্বপ্ন যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তবু দ্বিতীয় কল্পনা নাই। এই জন্য আমরা স্বামীকে রাখিয়া মরিতে পারিলে সুখী হই। সুখ একবারই চাওয়া যায়, একবারই আসে। আবার তুমি যদি 'যদি'র নাম কর, তবে জোর করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিব।

নায়িকা একই উপায়ে নায়কের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে পারে; মাধুরী সেই উপায়ে জীবনের মুখ বন্ধ করিয়া দিল।

জীবনের মন অভ্যাসবশতঃ পরে কখনও 'যদি' স্মরণ করিলেও, মাধুরীর স্মৃতি তাহাকে তাড়াইয়া দিত। এটা দশ বৎসর পরের কথা। তখন সোনার মাধুরী একটি পুত্র রাখিয়া স্বর্গে গিয়াছে।

মধুস্রবা।

১

গুর্জ্জর প্রদেশের অন্তর্গত কুসুম্ভপুরের রাজা বন্ধুহিত পরমসুখে রাজ্যভোগ করিতেছিলেন। কন্যা মধুস্রবার যত্ন, সেনাপতি বলাহকের শত্রুশাসন ও সভাকবি ক্ষেমশ্রীর মধুর কাব্যরস রাজাকে চিন্তামুক্ত ও সদানন্দ করিয়া রাখিয়াছিল।

মধুস্রবার তনুলতায় লাবণ্যললিত পুষ্পশ্রী ; ঈষচ্চঞ্চল আয়ত নয়নে শুভ্র দুগ্ধ-নদীর ন্যায় মুগ্ধ দৃষ্টি ;—তরঙ্গায়িত ভ্রমরকৃষ্ণ বিপুল কেশরাশি ও লীলামধুর গতি-ভঙ্গীতে তাহাকে ঘনবর্ষার বিদ্যুৎপুঞ্জের মত মনে হইত।

সাগরোপকণ্ঠে রাজসভা,—মর্ম্মরমণ্ডিত, মণিবেষ্টিত, উদ্যানশোভিত, সাগর-চুম্বিত। দক্ষিণে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল ফেনমাল্যমণ্ডিত ভীমকান্ত সমুদ্র ; পূর্ব্বে সাগর-সম্মিলিতা ক্ষুদ্রা স্রোতস্বিনী বিশাখা ; উত্তরে নগরপ্রান্তে মেঘমালার মত ধূম্রধূসর মুঞ্জকেশ পর্ব্বত ; পশ্চিমে এলালিঙ্গিত চন্দনতরুর উদ্যান। সমুদ্রের গর্জ্জন, বিশা-খার গুঞ্জন, মুঞ্জকেশের তরুরাজিনীলা শ্রী, উদ্যানলুণ্ঠিত মিশ্রগন্ধ রাজসভাটিকে অত্যন্ত মধুর করিয়া রাখিত ; রাজার পার্শ্বোপবিষ্টা মধুস্রবার রূপজ্যোতি রাজ-সভাকে পূর্ণশ্রী দান করিত।

মধুস্রবার রূপ ও কুসুমপুরীর সংস্থানসৌন্দর্য্যে বহু বীরহৃদয় প্রলুব্ধ হইত ; কিন্তু বলাহকের তরবারি সকলকে বিমুখ করিত। রাজা সানন্দচিত্তে ক্ষেমশ্রীর কাব্যরস উপভোগ করিতেন। বলাহকের তরবারি মধুস্রবাকে স্মরণ করিয়া যেমন ভয়ঙ্কর দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিল, ক্ষেমশ্রীর কাব্যও তেমনই মধুস্রবাকে আশ্রয় করিয়া সকলের হর্ষ উৎপাদন করিত।

শক্র-মথন-কালে বলাহক যে করুণ প্রেমব্যাকুল দৃষ্টিতে মধুস্রবার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিত, বলাহকের সেই চকিত দৃষ্টিতে কত প্রেম কত নীরব প্রার্থনা মধু-স্রবার চরণে নিবেদিত হইত, তাহা কাহারও অগোচর থাকিত না। শক্রবিজয়-অন্তে ক্ষেমশ্রীর কবিতায় মুদ্রিত-কমল-বেষ্টনকারী ভ্রমরের মত যে হর্ষ-শোকার্দ্র গুঞ্জন-ধ্বনি ধ্বনিত হইত, তাহাতে মধুস্রবা বুঝিত, কত প্রেম, কত অব্যক্ত ব্যাকুলতা তাহাকেই আশ্রয় করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। যখন বলা-হক গর্ব্বোন্নতমস্তকে সভাস্থলে দাঁড়াইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিত, "মহারাজ, আপনাদের স্নেহের কবচে আত্মরক্ষা করিয়া আমি আজ জয়ী!" তখন ক্ষেমশ্রী কম্পিতকণ্ঠে স্ত্রীদীপ্তনয়নে নতমস্তকে গাহিত, "ওগো! তোমার প্রেমে আমি আজ বন্দী।" বন্দী-কৃত শক্রকে রাজসম্মুখে আনিয়া বলাহক যখন বলিত, "মহারাজ, এই দুর্দ্ধর্ষ শক্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আনিয়াছি, এখন ইহাকে কি শাস্তি দিব, বলুন।" তখন ক্ষেমশ্রী অশ্রুসজলনয়নে করুণামধুরকণ্ঠে গাহিত, "বন্দীর লৌহশৃঙ্খল খুলিয়া দাও, উহাকে প্রেমের শৃঙ্খলে চিরবন্দী কর।" বলাহক যখন শুভারম্ভে দেবদর্শনের ন্যায় চকিতে মধুস্রবার লাবণ্যললিত কৌমারশ্রী একাগ্রনয়নে পান করিয়া লক্ষ্যবেধে প্রবৃত্ত হইত, ক্ষেমশ্রী তখন পুষ্পস্তবকাভিরাম দৃষ্টি দ্বারা মধুস্রবার আরতি করিয়া আসিত। বলা-

হক চাহিয়া চাহিয়া হাসিত; দেখিতে দেখিতে ক্ষেমশ্রীর চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিত।

২

মধুস্রবার বিবাহকাল উপস্থিত হইল। বলাহক মধুস্রবার পাণিপ্রার্থী হইয়া রাজাকে বলিল, "মহারাজ, হৃদয়ের শোণিত ব্যয় করিয়া চিরকাল আপনার আদেশ পালন করিয়াছি, আজ তাহার পুরস্কার দিন।" ক্ষেমশ্রী কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিতকণ্ঠে ভয়চকিতচিত্তে বলিল, "মহারাজ, ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়া আজীবন আপনাদের সেবা করিয়াছি,—তাহা স্মরণ করিয়া আজ প্রসাদ ভিক্ষা দিন।"

উভয়েই রাজার প্রিয়। ক্ষেমশ্রী শুধু প্রীতি দিয়াছে; বলাহক ধনপ্রাণ রক্ষা করিয়াছে। তিনি সংশয়ভঞ্জনের ও কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের আশায় মধুস্রবার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, মধুস্রবা উভয়কেই প্রীতিমধুরদৃষ্টিতে অভিনন্দন করিতেছে। তখন রাজা বলিলেন, "ধরণী ও রমণী বীরভোগ্যা; তোমাদের বলের পরীক্ষা হউক।"

বলাহকের মুখচ্ছবি আশায় দীপ্ত হইল; বক্ষঃ স্ফীত হইয়া উঠিল। বলাহকের দিকে চাহিয়া মধুস্রবা একটু হাসিলেন; কিন্তু ক্ষেমশ্রীর মলিন মুখের দিকে চাহিতেই সে হাসি ম্লান হইয়া গেল।

ক্ষেমশ্রী বলিল, "মহারাজ, কবি সৌন্দর্য্যের উপাসক, রমণী প্রেম-পক্ষপাতিনী; আমাদের প্রেমের গভীরতার পরীক্ষা হউক।" মধুস্রবার মধুর দৃষ্টিপাতে ক্ষেমশ্রীর সুন্দর কমনীয় মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বলাহক ব্যাকুলদৃষ্টিতে রাজার মুখের দিকে চাহিল। রাজা বলিলেন, "বলহীন কখনও আত্মরক্ষায় সক্ষম নহে; আমার রাজ্য ও কন্যার রক্ষায় কে সমর্থ?" বলাহক তরবারি কোষমুক্ত করিল, মধুস্রবার স্মিতমধুর মুখের দিকে চাহিল। ক্ষেমশ্রী গাহিয়া উঠিল, "প্রেম দিয়া শত্রুজয় করিব, প্রেমের বলে বলী হইব; স্বার্থই কি পরমার্থ? বিরোধ-বিক্ষুব্ধ রাজ্য অপেক্ষা নির্ব্বিরোধ তরুতলবাস শ্রেয়ঃকল্প।" এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে আত্মপক্ষসমর্থন করিয়া যে যখন মধুস্রবার সদয় দৃষ্টি লাভ করিতেছিল, সে তখন প্রফুল্ল ও অপর জন বিষণ্ণ হইতেছিল। রাজা বলিলেন, "বলীই আমার কন্যা লাভ করিবে।" বলাহক স্বীয় সৌভাগ্যগর্ব্বে ক্ষেমশ্রীকে বিদ্রূপ-দগ্ধ দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ করিল। ক্ষেমশ্রী বিনয়নম্রবচনে বলিল, "তবে বলেরই পরীক্ষা হউক।" তখন দম্ভভরে বলাহক অসি গ্রহণ করিয়া ক্ষেমশ্রীকে আহ্বান করিল। ক্ষেমশ্রীর ব্যাকুল দৃষ্টি মধুস্রবার নয়নে সন্নদ্ধ হইল।

এতক্ষণ পরে মধুস্রবা কহিল, "এরূপ বলপরীক্ষা ন্যায়সঙ্গত নহে। এক জন

আজন্মশিক্ষিত অস্ত্রব্যবসায়ী, অপর জন অস্ত্রপ্রয়োগে অনভিজ্ঞ, কবি। এরূপ অসম যুদ্ধে বল অপেক্ষা কৌশলেরই জয় হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। আর, অস্ত্রযুদ্ধে এক জন হত বা আহত হইতে পারে। তাহাও আমার অনভিপ্রেত।" বলাহক তাহার প্রতি ভর্ৎসনাসূচক দৃষ্টিপাত করিল; ক্ষেমশ্রীর দৃষ্টিতে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। "তবে বাহুযুদ্ধ হউক।" মধুস্রবা তাহাও নিরাপদ মনে করিল না। তখন স্থির হইল, "ভারোত্তোলনের শক্তি দেখিয়া বলের পরিমাপ হউক।"

৩

শরতের কনকাভ উজ্জ্বল রবি-কিরণ সভা-প্রাঙ্গনে ব্যাপ্ত হইতে না হইতে সভাগৃহ জনপূর্ণ হইল। বৈতালিক রাজার আগমন ঘোষণা করিল। ক্ষেমশ্রী চিরপ্রথামত রাজাকে অভ্যর্থনা করিয়া গান ধরিল; কিন্তু আজিকার গান অতি সংক্ষিপ্ত, অতি করুণ। নহবৎ বাজিয়া উঠিল। রাজাদেশে পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

বলাহক গুরু ভার সকল তুলিতে লাগিল। ক্রমশঃ অধিকতর গুরু ভার তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত হইতেছে, আর সে তাহা তুলিয়া ফেলিয়া দিতেছে। বলাহক একটি ভার বক্ষ পর্য্যন্ত তুলিয়া আর তুলিতে পারিল না।

এখন ক্ষেমশ্রীর পালা। ক্ষেমশ্রীর সদাপ্রফুল্ল মুখ আজ শারদ প্রভাতের মত গম্ভীর সৌন্দর্য্য পূর্ণ। সে অগ্রসর হইল। শত সহস্র চক্ষু সেই অঙ্গনের উপর করুণা ও মঙ্গলেচ্ছার বৃষ্টি করিতে লাগিল। ক্ষেমশ্রী একবার সাগরের স্তব্ধ গম্ভীর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিল, একবার বিশাখাকে দেখিল, একবার মুঞ্জকেশ পর্ব্বতের দিকে চাহিল, একবার এলালিঙ্গিত চন্দনতরুশ্রেণী দেখিয়া লইল,—সর্ব্বশেষে মধুস্রবাকে দেখিয়া দেখিয়া দীপ্ত হইয়া উঠিল; তাহার পর পদপ্রান্তপতিত সেই গুরু ভার দুই হস্তে ধারণ করিয়া দ্রুতহস্তে মাথার উপর তুলিয়া ধরিল।

ক্ষেমশ্রীর জয়ে সভায় হর্ষকোলাহল উত্থিত হইল; সভাজনের দৃষ্টির আঘাতে বলাহকের পরাজয় সহস্রগুণ তীব্র হইয়া উঠিল। লজ্জায় বলাহক ঘর্ম্মাক্তবদন, গাত্রবস্ত্র, মৃত্তিকাবদ্ধদৃষ্টি। রাজা বলিলেন, "সাধু ক্ষেমশ্রী! সাধু! তোমার প্রেমের জয় হইয়াছে। গুরুভার আর ধারণ করিয়া থাকিবার আবশ্যক নাই, ফেলিয়া দাও।"

জয়োল্লসিত কবির কর্ণে সে কথা প্রবেশ করিল না। কবি মধুস্রবার দিকে বদ্ধদৃষ্টি, গুরুভার প্রস্তর মাথার উপর ধরিয়া নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান। চারি দিক হইতে ধ্বনি উঠিল, "ফেল, ফেল, প্রস্তর ফেলিয়া দাও।" কবির মুখ হাস্যদীপ্ত, চক্ষু মধুস্রবার প্রতি নিবদ্ধ, হস্তে গুরু ভার। কবি অবিচল, অকম্পিত। মধুস্রবা বলিলেন, "কবির হাত হইতে প্রস্তর নামাইয়া দাও।" অমনই কয়েক জন লোক অগ্রসর হইয়া

কবির হস্তধৃত প্রস্তর আকর্ষণ করিল। সে আকর্ষণে ক্ষেমশ্রীর প্রাণহীন দেহ প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ ভূমিতলে পতিত হইল।

বিজয়দৃপ্ত কবির এই অপূর্ব্ব তিরোধান রাজসভার আনন্দকোলাহলের উপর মরণের করুণগম্ভীর একখানি যবনিকা টানিয়া দিল। মধুস্রবা তাহার পণজেতা স্বামীর এই মহিম-মণ্ডিত মৃত্যুতে হর্ষ-শোকে অভিভূত হইয়া মূর্চ্ছায় শান্তিলাভ করিল।

পরিণাম।

সকলেই জানেন, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় কাণপুরে অনেক ইংরাজকে বিদ্রোহীর হস্তে প্রাণ দিতে হয়।

এই সময়ে একদিন মনিয়ার নামে জনৈক ইংরাজ কর্ম্মচারী স্ত্রী ও এক বৎসরের একটি শিশুকন্যাকে সঙ্গে লইয়া ডাকগাড়ী করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতেছিলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে সাহেব দেখিলেন, এক দল সশস্ত্র সিপাহী বিকট চীৎকার করিতে করিতে তীরবেগে গাড়ীর দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। সাহেব স্ত্রীকে গাড়ীর পশ্চাৎদিকের দরজা দিয়া তাড়াতাড়ি নামাইয়া দিয়া কহিলেন, "তুমি শীঘ্র মেয়েকে লইয়া দৌড়াইয়া নিকটস্থ কাহারও বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লও, আমি ততক্ষণ উহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া ঠেকাইয়া রাখিতেছি।" এই বলিয়া সাহেব সশস্ত্র রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে উন্মত্ত বিদ্রোহিদল আসিয়া উপস্থিত হইল। সাহেব একা আর বেশীক্ষণ যুঝিতে পারিলেন না, অবিলম্বে ভূতলশায়ী হইলেন।

মিসেস্ মনিয়ার দৌড়াইয়া এক মুসলমান বণিকের বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন। বণিক প্রথমে কোনমতেই আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইলেন না; অবশেষে স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহাকে বিবাহ করিবে, এই শপথ করাইয়া লইয়া মেমকে বাড়ীতে স্থান দিলেন। মুসলমান অনেকদিন যাবৎ মেমকে অন্দরে লুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু স্বামিশোকেই হউক, কিংবা মুসলমানের অনুগৃহীতা হইয়া থাকিতে হইবে এই দারুণ মনস্তাপেই হউক, মিসেস্ মনিয়ার ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া শীঘ্রই ইহলোক

পরিত্যাগ করিলেন। অন্ধকার রাত্রে গোপনে খাঁসাহেব বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগের বাগানে মেমের কবর দিলেন।

ছোট মেয়েটিকে লইয়া কিন্তু খাঁসাহেব ভারি বিপদে পড়িলেন। খাঁসাহেব নিজে দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ;—মেয়েটির নীল চোখ, কটা চুল, ধবধবে শাদা রঙ্গ দেখিয়া সকলেই নিশ্চয় সন্দেহ করিবে যে, এ সাহেবের মেয়ে,—হয় ত মনিয়ারের হত্যাপরাধে শেষে তাঁহাকে অভিযুক্ত হইতে হইবে। মেয়েটির জন্য পূর্ব্বেই একটি বৃদ্ধা আয়া নিযুক্ত হইয়াছিল। খাঁসাহেব ভয়ে ভয়ে মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া আয়াকে সঙ্গে লইয়া গোপনে কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া খিদিরপুরের কাছে ছোটখাট একটি একতালা বাড়ী ভাড়া লইয়া আয়ার সঙ্গে মেয়েটিকে রাখিলেন। সমস্ত ঠিকঠাক্ করিয়া খাঁসাহেব পুনরায় কার্ণপুরে ফিরিয়া আসিলেন, এবং মেয়ের জন্য আয়ার নামে মাসে মাসে, বিশ ত্রিশ,যখন যেমন সুবিধা হইত, টাকা পাঠাইতে লাগিলেন।

মেয়েটি একটু বড় হইয়া কথা কহিতে শিখিয়া বুড়ীকে "আয়ি" বলিয়া ডাকিত। বুড়ী মেয়েকে আদর করিয়া "মণিবাবা" বলিত।

মেয়েটি বড় হইতে লাগিল, এবং দেখিতে দেখিতে অলক্ষ্যে তরুশাখার ন্যায় বুড়ীর শুষ্ক বক্ষঃপঞ্জরের মধ্যে এমন একটি ক্ষুদ্র স্নেহনীড় রচনা করিল, যাহার জন্য, এই জরাজীর্ণ দেহ লইয়া যে পূর্ব্বে প্রতিনিয়ত মৃত্যুকামনা করিত, সে এক্ষণে মনে মনে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিল, "আরও কিছুদিন আমাকে রাখো—মেয়েটিকে মানুষ করিয়া বড় করিয়া ইহার একটা সদ্গতি দেখিয়া তবে যেন মরিতে পারি।"

বুড়ী একলাই সব কাজ করিত। খুব ভোর থাকিতে উঠিয়া লাঠি-হাতে ঠুক্‌ঠুক্ করিয়া নিজে গয়লাবাড়ী গিয়া দুধ লইয়া আসিত, পাছে গয়লা দুধে জল মেশায়;—নিজে বাজার করিত, রাঁধিত, স্নান করাইত, খাওয়াইত, স্কুলে রাখিয়া আসিত, মধ্যাহ্নে পুনরায় স্কুলে গিয়া খাওয়াইয়া আসিত, অপরাহ্নে আবার স্কুল হইতে মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী আনিত। মেয়েটি যখন স্কুলে থাকিত, তখন অন্য কোন কাজকর্ম্ম না থাকিলে বুড়ী দৃষ্টিহীন চক্ষে সুতাবাঁধা একটি চস্‌মা আঁটিয়া মেয়ের জন্য কাপড় শেলাই করিতে বসিত। রাত্রে মেয়েটিকে বুকের কাছে রাখিয়া বুড়ী সেকালের কত অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলিত,—বলিতে বলিতে সেই কক্ষবিহীন নির্জ্জন গৃহে নিরাশ্রয় দুই জনে ঘুমাইয়া পড়িত। এইরূপে দিনরাত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া বুড়ী মেয়েটিকে মানুষ করিয়া তুলিতে লাগিল। কাঁচা কাঠ শীঘ্র ধরে না,

শুষ্ক কাষ্ঠেই ইন্ধন প্রস্তুত হয়। বুড়া হাড়ে একবার স্নেহের আঁচ লাগিলে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে থাকে।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, খাঁসাহেব মধ্যে একবার আসিয়া মেয়েটিকে এক অর্ফান স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া যান। সেখানে নাম ভাঁড়াইয়া "মিস টার্নার" বলিয়া মেয়েটির পরিচয় দেন, এবং নিজেও ঐ নামে তাহাকে ডাকিতে থাকেন।

স্কুলে অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্রী হইতে শিক্ষয়িত্রী পর্য্যন্ত সকলেই মেয়েটির গুণে মুগ্ধ হইল। তাহার দীনতা বিনয় সৌজন্য দেখিয়া সকলেই তাহাকে ভালবাসিল, সকলেই তাহার বন্ধু হইল।

প্রতিবাসীরা ও যে সকল সাহেব মেম বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিত, তাহারা প্রায়ই মেয়েটি সম্বন্ধে বুড়ীকে অনেক প্রশ্ন করিত,—কাহার মেয়ে, বাপ মা কোথায়, এখানে থাকে কেন, ইত্যাদি। মেয়েটি অনাথা নিরাশ্রয় জানিলে পাছে তাহার বিপদ্‌সম্ভাবনা হয়, এই ভয়ে বুড়ী মিথ্যা করিয়া বলিত, —"টার্ণার সাহেবের মেয়ে, সাহেব পশ্চিমে ব্যাজ করেন, কখন কোথায় থাকেন ঠিক নাই,—মেয়ের মা নাই, তাই আমার কাছে এইখানে রাখিয়া গেছেন।"

বুড়ী ভয়ে স্কুল ছাড়া মেয়েকে বাড়ীর বড় একটা বাহির করিত না—মেয়েটিও বাহিরে যাইতে চাহিত না। মেয়েটির আমোদের জন্য বুড়ী নিজের পয়সা খরচ করিয়া এক রাশ হাঁস, পায়রা ও গোটাকতক শাদা ইঁদুর কিনিয়া দিয়াছিল— সে বাড়ীতে তাহাদের লইয়াই খেলা করিত।

সন্ধ্যার সময় দুই জনে সিঁড়ির ধাপে আসিয়া বসিত; ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা উড়িয়া আসিয়া বালিকাকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিত—বালিকা তাহাদের জন্য মটর ছড়াইয়া দিত,—শাদা ইঁদুরগুলাকে কোলের উপর রাখিয়া রুটীর টুক্‌রা খাওয়াইত। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল। বালিকাও ক্রমে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল।

এক দিন দুই জনে সিঁড়িতে বসিয়া আছে, এ কথা সে কথার পর বালিকা বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আম্মি, আমার মা বাপের কথা তুমি কি কিছু জান?"

আম্মি কহিল, "সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, মণিবাবা,—তাঁহারা ত কেহই নাই।"—এই বলিয়া চোখের জল মুছিল।

বালিকা কহিল, "আচ্ছা, খাঁ-সাহেব আমার কে হন? উনি এখানে আসেন কেন, আমার জন্য টাকাই বা কেন পাঠান?"

বুড়ী কহিল, "উনি তোমার মা বাপের খুব বন্ধু ছিলেন, তাই তোমাকে এত স্নেহ করেন।"

বালিকা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "আমি আর কতদিন এইরূপ থাকিব!"

বুড়ী কহিল, "কেন মণিবাবা, এমন কথা বলিতেছ, তোমার দুঃখ কি?"

এই সময়ে বিচিত্রবাসপরিহিত এক দল সাহেব মেম হাস্যকলরব তুলিয়া, সুগন্ধ ছড়াইয়া গাড়ীর সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল।

তাহারা চলিয়া গেল, কিন্তু ঢেউ আসিয়া বালিকার হৃদয়ে আঘাত করিল; তাহার দৈন্য আরও ফুটিয়া উঠিল—চোখ ছলছল্ করিতে লাগিল।

বুড়ী তাহা দেখিতে পাইল না, কিন্তু মণিবাবাকে অনেকক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, সে তাহার মনের দুঃখ বুঝিল, কহিল, "চল বাবা, আজ হাঁসদের খাওয়ান হয় নাই, তাহাদের খাওয়াইয়া আসি।"

খাঁসাহেব প্রায় দুই বৎসর পরে কলিকাতায় আসিয়াছেন। অনেক মাল নৌকা-ডুবি হইয়া কারবার ফেল হওয়ায় তিনি এক্ষণে ঋণগ্রস্ত। হঠাৎ এই বিপৎপাতে খাঁসাহেবের মেজাজ একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে। যে কসাই রোজ বাড়ীতে মাংস দিয়া যায়, মাংস খারাপ হওয়াতে একদিন তাহাকে এমন গালি দিলেন যে, আর একটু হইলেই খুনাখুনি ব্যাপার হইত;—গয়লার হিসাব লইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন; সে দুধ দেওয়া বন্ধ করিল। কারণে অকারণে প্রতিবাসী সকলের সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করিলেন। বুড়ীও বড় একটা বাদ যাইত না; কিন্তু সে মেয়ের মুখ চাহিয়া সকলই সহ্য করিত।

একদিন খাঁসাহেবের কিছু টাকার আবশ্যক হইল, বুড়ীর কাছে চাহিলেন। বুড়ী কহিল, "সাহেব, আপনি যে টাকা পাঠাইতেন, তাহাতে বাড়ী ভাড়া দিয়া খুব কষ্টেই সংসার চলিয়াছে। আমার যা কিছু টাকা সঞ্চিত ছিল, তাহাও মেয়েটির জন্য খরচ করিয়াছি—আমার হাতে কিছুই নাই।

বুড়ীর কথায় খাঁসাহেব একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন, দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, "যাহা পাঠাইতাম, তাহা হইতে অন্ততঃ দু' শ' টাকা এতদিনে খুব রাখা যাইত। এত টাকা পাঠাইতাম, সবই খরচ হইয়াছে!—নিশ্চয়ই তুই চুরি করিয়াছিস্—তোকে পুলিসের হাতে দিব।"

বুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "শেষে এই কথা! আপনার যা ইচ্ছা হয়—করুন, খোদাকি কসম্, আমি আপনার টাকা লই নাই!"

খাঁসাহেব কহিলেন, "তুই আমার বাড়ী থেকে এখনি বেরো।"

বালিকা বুড়ীর হইয়া অনেক বলিল, কাঁদিতে কাঁদিতে হাতে পায়ে ধরিল, কিছুতেই কিছু হইল না। বুড়ী বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত হইল। যাইবার সময় বালিকার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "যদি বাঁচিয়া থাকি, আর আল্লা দিন দেন ত আবার দেখা হইবে। বালিকাও খুব কাঁদিল।

বুড়ী কয়েক দিন লুকাইয়া "মণিবাবা"র সহিত দেখা করিল, কিন্তু একদিন ধরা পড়িয়া খাঁসাহেবের নিকট এমন ভর্ৎসিত হইল যে, সেই অবধি আর তাহাকে দেখা গেল না।

খাঁসাহেবের এক পরমবন্ধু সীলোনে চালের ব্যবসা করিতেন। খাঁসাহেব পত্র দ্বারা তাঁহাকে আপনার অবস্থা জানাইলেন। উত্তরে বন্ধুবর তাঁহাকে সীলোনে আসিতে লিখিলেন, এবং পথখরচাও পাঠাইলেন। খাঁসাহেব মেয়েটিকে অর্ফানেজে বোর্ডার রাখিয়া সীলোন যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য, অর্ফানেজ্ অনাথ বালক-বালিকার জন্য—সেখানে কোনও খরচ দিতে হয় না।

৩

বালিকা এখন পূর্ণবয়স্কা যুবতী, সুতরাং, এখন হইতে আমরা তাহাকে মিস্ টার্নার বলিয়াই ডাকিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অর্ফানেজের সকলেই মিস্ টার্নারকে খুব ভালবাসিত। সেখানে এক মিশনরী মেম প্রতি শনিবারে আসিয়া মেয়েদের বাইবেল শিক্ষা দিতেন। মিস্ টার্নারের প্রতি তাঁহার ভালবাসার আর সীমা ছিল না। মিস্ টার্নার ক্রমে এণ্ট্রেন্স, এফ্. এ. পাস করিল। তখন ঐ মিশনরী মেম একদিন তাহাকে বলিলেন, "তুমি যদি আমাদের মিশনে কাজ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া দিতে পারি।" মিস্ টার্নার খুব আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

অল্পদিন পরেই মিস্ টার্নার মিশনে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার মাসে এক শত টাকা বেতন ধার্য্য হইল। তিনি বৌবাজারের কাছে একটি ছোটখাট বাড়ী ভাড়া লইয়া মিশনের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। বুড়ীকে কিন্তু মিস্ টার্নার ভুলিতে পারিলেন না, তাহার জন্য মনটা মাঝে মাঝে কেমন করিত। গ্রহণের সময় যেমন পৃথিবীর

উপর ম্লান আভা পড়িয়া সমস্তই মলিন দেখায়, স্বাধীন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও মিস্ টার্নারের মনে তেমনই বুড়ীর জন্য দুঃখের একটা ম্লান ছায়া চিরদিনের জন্য রহিয়া গেল।

একদিন মিস্ টার্নার ঘরে বসিয়া লিখিতেছেন, এমন সময় তিন চারি জন পুলিসের লোক সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া একটা বাক্স হইতে কতকগুলি অলঙ্কার ও একটা পুঁটলিতে বাঁধা দুই শত টাকার নোট্ দেখাইয়া কহিল, "এই অলঙ্কার, এই নোট্ আপনার কি?"

মিস্ টার্নার অলঙ্কারগুলি অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া কহিলেন, "এ অলঙ্কারও আমার নয়, এ নোটও আমার নয়।" পুলিস আর কোনও কথা না বলিয়া অলঙ্কারগুলি বাক্সয় ভরিয়া ও নোটগুলি বাঁধিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে মিস্ টার্নার রাস্তা হইতে একটি মর্ম্মভেদী আর্ত্তস্বর শুনিতে পাইলেন। ছুটিয়া রাস্তায় গিয়া দেখেন, পুলিসের প্রহারে এক বুড়ী অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে—পার্শ্বে সেই পুলিসের লোক দাঁড়াইয়া। মেম "আমি"কে চিনিতে পারিলেন—তীব্র চীৎকার করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার পর পুলিসদের নীচের ঘরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বুড়ীকে কোলে করিয়া উপরে লইয়া গেলেন।

অনেক কষ্টে বুড়ীর চৈতন্য হইল। একটু সুস্থ হইলে মেম ডাকিলেন, "আমি!"

বুড়ী ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, "মণিবাবা!"

মেম কহিলেন, "এ কি ব্যাপার আমি?"

বুড়ী থামিয়া থামিয়া কহিতে লাগিল, "আমার আর সময় নাই। আমি যাহা বলি, শোন। তোমার মা খাঁসাহেবের ভয়ে লুকাইয়া আমার কাছে কতকগুলি গহনা রাখিয়াছিলেন, বলিয়া দিয়াছিলেন, তুমি বড় হইলে সেগুলি তোমাকে দিতে। দেশে বাড়ীতে আমার নাতির কাছে গহনাগুলি রাখিয়া দিয়াছিলাম। দেশ হইতে এই গহনার বাক্স আনিয়া পথে পথে কতদিন যে তোমার সন্ধানে ফিরিয়াছি, তাহার ঠিক নাই!—উঃ!—তাহার পর আজ দুই দিন হইল পুলিসের হাতে পড়ি। তোমার নাম ভুলিয়া গিয়াছিলাম,—'মণিবাবা' বলাতে উহারা কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার পর তুমি এক সময়ে খিদিরপুরের যে স্কুলে পড়িতে, তাহার নাম করাতে পুলিস আমাকে সেখানে লইয়া গেল। সেখানে সকলেই আমাকে চিনিল,—তোমার নাম ও সন্ধান পুলিসকে বলিয়া দিল।—উঃ!—আর মণিবাবা, খাঁসাহেব দু' শ' টাকার দাবী দিয়া আমায় যে চোর অপবাদ দিয়াছিলেন—

আমি দেশের জায়গা জমী বিক্রি করিয়া সেই টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি—দুই-ই পুলিসের কাছে আছে। খাঁসাহেবকে টাকা দিও, আর গহনাগুলি তুমি পরিও।—উঃ!—"বুড়ীর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল,—তাহার পর কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া আবার কহিল, "তুমি সুখে আছ ত?"

মেম বুড়ীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "তোমাকে দেখিতে পাইলাম আমি, এই আমার সুখ, তোমাকে যে কত খুঁজিয়াছি!"

বুড়ী অস্পষ্ট উচ্চারণে কহিল, "আমার ত দিন ফুরাইয়াছে, খোদা তোমাকে সুখে রাখুন। মণিবাবা, গয়নার বাক্স আন—আমি নিজের হাতে তোমাকে পরাইয়া দিই।"

মেম পুলিসের কাছে গিয়া বলিলেন, "আমার ভুল হইয়াছিল, এই গহনার বাক্স ও নোট আমারই।" মেম বলিতেছেন, পুলিস অগত্যা রসিদ লইয়া ছাড়িয়া দিল।

বুড়ী কম্পিতহস্তে একজোড়া সোনার বালা লইয়া মেমের হাতে পরাইয়া দিতে লাগিল।—এক হাতে পরাইয়া আর পারিল না, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। বুড়ী আর একবার ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, "মণি!—" তাহার পর সব শেষ হইল।

মেমের কান্না রাস্তা হইতে শোনা গেল। প্রকৃতিস্থ হইয়া মেম সমারোহের সহিত বুড়ীকে কবর দিলেন। প্রত্যেক রবিবারে সন্ধ্যার সময় দেখা যাইত, "আম্মি"র কবরের উপর ফুল রাখিয়া মিস্ টার্নার বসিয়া আছেন।

অপেক্ষা।

১

সে দিন প্রভাতে সখীগণ সাথে
আমার প্রাসাদশিখরে উঠি'
দেখিতেছিলাম, পূর্ব্ব গগনে
তরুণ অরুণ উঠিতে ফুটি'।
কখনো নিধার ধূসর আঁচল
পশ্চিম মেঘে লুটায়ে চলে,
পূর্ব্ব মেঘের রেখায় রেখায়
শোণিমা—রক্ত-কমল-দলে।
কলরবহীন বিশাল নগর
নিদ্রিত,—মাঝানগরী যেন;
জনহীন পথ রয়েছে পড়িয়া
হিম-জড় দেহ উরগ হেন।

ছায়াহীন মোর বিরাট প্রাসাদ—
চিত্রে লিখিত প্রাসাদ সম ;
মুক্ত-কৃপাণ প্রহরী কেবল
ফিরিছে সপ্ত তোরণে মম।
পুর-সরসীর স্বচ্ছ সলিলে
তখনো মুদিত কমলরাজি ;
মর্ম্মরে বাঁধা সোপানে কাহারো
মুখর নূপুর উঠেনি বাজি'।
তখনো দিনের আলোকে জ্বলেনি
পুর-পরিখার আঁধার জল,
সদ্য-বিগত- নিদ্র বিহগ
কূজিছে কেবল হরষ-কল।

২

উঠিল বিকশি' কনক-কিরণ,
মুদিত কোরক মেলিল আঁখি ;
সুখদ-পরশ প্রভাত-পবন
বিকচ-কুসুম সুরভি মাখি'।
জাগিয়া উঠিল নিদ্রিত পুরী,
খুলিল প্রহরী রুদ্ধ দ্বার।
জাগিছে নগরী জন-কলরবে,
পবনে ভাসিছে আভাস তার।
সূর্য্য-বিমান দেখিয়া বিস্ময়ে
পশ্চিম দিকে দেখিনু চাহি'—
আসিছে একাকী পথিক যুবক
বিরল-পথিক সরণী বাহি' ;
শুভ্র ললাট পৌঁছিছে উজ্জ্বল
তরুণ রবির মরণ করে,
ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ ;
প্রতিভা রাজি নয়ন 'পরে।
বুঝিতে নারিনু নিদ্রিতা আমি—
অথবা নিশার স্বপন-ঘোরে ;
মানস-দেবতা আসিল কি মোর
মূর্ত্তি ধরিয়া, ছলিতে মোরে ?
পিপাসিত আঁখি, পড়ে না পলক ;
মুগ্ধা—হেরিতে জাগিনু তবে।
চঞ্চল হৃদি উল্লাস-ভরে—
আসিল পথিক আমারি দ্বারে !

৩

পুত্রের সম পালিলা আমাকে
মৃত পিতা মোর—রাজ্য-স্বামী।
রাজার মুকুট লুটেছে চরণে,
ফিরিয়া চাহিনি,—কুমারী আমি।
নারী-হৃদয়ের স্নেহ-প্রেম-ক্ষুধা—
ভাবিলে আপনি শিহরি লাজে ;
চরণে যাহার বিশাল রাজ্য
আপনা-বিকান তাঁরে কি সাজে !'
দুর্ব্বল নারী স্নেহপ্রেম যাচে,
আপনারে দেয় পরের করে ;
আপনারে লয়ে আছিনু অটল
আপন গর্ব্ব-শিখর 'পরে।
আজ যেন মোর রুদ্ধ প্রকৃতি
ব্যাঙ্গ-প্রকাশ করিল বলে ;
অটল গর্ব্ব টুটি' গেল মোর
দরবিগলিত অশ্রুজলে।
পূর্ণ প্রাসাদ জনহীন যেন,
সুখ-লেশহীন সফল সুখ।
নিষ্ফল মোর জীবনে কেবল
অসহ যাতন—তীব্র দুখ।
দু'খানি অধর- পরশের আশে
চাহিনু সকলি করিতে দান ;
নিষ্ফল বুকে শিশুরে ধরিতে
ব্যাকুলি' উঠিল নারীর প্রাণ।

৪

অটল-গর্ব্ব- শিখর ত্যজিয়া
দুর্ব্বল নারী আসিনু নামি,'
হৃদয়-আসন রচনা করিয়া
অজানা পথিকে বরিনু স্বামী।
কেহ নাহি তার, কহিল পথিক—
মধুর বচনে অমিয় ক্ষরে—

আমারে পাইয়া লভিল সে যেন
স্বর্গ-কুসুম মানব-করে।
পরাধীনতায় ছিল এত সুখ।
কেঁদেছি তৃষিতা বারিধি-তীরে।
কর প্রসারিলে অমৃত মিলিত
গর্ব্ব-অন্ধা চাহিনি ফিরে।
সুখ-সুধা-পান- বিহ্বলা আমি
হেরিনু জগৎ হরষময়;
নিঃশেষ-পীত সুধার পাত্র
পলক ফেলিতে পূর্ণ হয়।
আমাদেরি তরে পাখী গাহে গান,
পবন মোদিত কুসুম-বাসে;
আমাদেরি তরে ফুটি' উঠে তারা;
আমাদেরি তরে জ্যোছনা হাসে।
হরষে নিমেষে দিন বহে যায়—
ত্বরিতপক্ষ—উজল-হাসি।
বরষের পর বরষ আসিল,—
সুখের প্রবাহে চলিনু ভাসি'।

৫

বাতায়নে বসি' দেখিতেছিলাম,
উঠিছে ফুটিয়া রবির কর।
দৃঢ়বাহুপাশে বাঁধি' পতি মোর
টানি' লয়েছিলা বক্ষ'পর।
সে সুখ-শয়নে নিবেশিতা আমি,—
প্রেমের অমরা সে বাহু-পাশ,—
অলকে, কপোলে পরশিতেছিল
দেবতার মোর তপ্ত শ্বাস।
দেখিনু চাহিয়া পূর্ব্ব তোরণে,
দাঁড়ায়ে রমণী—মলিনবেশ,
আঁধার আননে বিষাদের ছায়া,
জীর্ণ বসন, রুক্ষ কেশ।
সহসা আমার কটিতট হ'তে
খসিল শিথিল বাহুর পাশ।
চকিতে চাহিয়া দেখিনু, স্বামীর
পাণ্ডু আনন,—নয়নে ত্রাস।
বাহু বাড়াইয়া গলদেশ বেড়ি'
আদরে চুমিনু অধরখানি;—
উঠিল না জাগি' চুম্বন সেথা,—
শীতল অধর, ফুরে না বাণী;
বন্ধ নয়ন পূর্ব্ব তোরণে।
অজানা শঙ্কা জাগিল প্রাণে।
দেখিনু চাহিয়া, রোদন-নিরতা
ভিখারিণী চাহি' তাঁহারি পানে।

৬

দুখিনী রমণী আমারি তোরণে
এসেছে—খুঁজিয়া পতিরে তা'র!
কপট পুরুষে যে দেয় হৃদয়
নিয়তি তাহার—নয়নধার।
কেহ নাহি তা'র বলেছিলে মোরে;
সত্য বলিয়া ভেবেছি আমি।
কি ছলে ভুলিয়া রাজার কুমারী
অজানা পথিকে বরেছি স্বামী!
ক্রোধ-কম্পিত দেহলতা মোর,
রোষের বহ্নি হৃদয় দহে;
বিপদশঙ্কা গণিয়া হৃদয়ে
ভীতি-নত-আঁখি সখীরা রহে।
দলিত দর্প লভে নব বল,—
কোথা সে ভ্রষ্ট দেবতা মম?
ক্ষমা নাহি দিব, প্রতারিতা আমি,
রচিব শাস্তি কঠোরতম।
দেখিনু খুঁজিয়া কক্ষে কক্ষে,
বিরাম-কুঞ্জে—সরসীতীরে,
কুসুম-আকুল উদ্যানমাঝে,
উচ্চ-শিখর-প্রাসাদ-শিরে।

৭

নিষ্ফল শ্রম; ফিরিল সকলে;
অজানা পথিক গিয়াছে চলি';
অজানা যেমন এসেছিল একা,
অজানা তেমনি গিয়াছে চলি'।

৮

নিষ্ফল ক্রোধে ফিরিনু যথায়
পতিপ্রেমহীনা দুঃখিনী নারী
মলিন ছিন্ন বসনে মুছিছে
দরবিগলিত নয়নবারি।
কেন সে আসিল? পরশে তাহার
লুপ্ত প্রেমের অমরা মোর!
সুখের স্বপনে ছিলাম বিভোর,
কেন সে টুটিল ঘুমের ঘোর?
আঁধারে ঢাকিল সুখের কিরণ
কেন সে দুঃখিনী?—তাহারি দোষ।
দুখিনীর 'পরে উঠিল জ্বলিয়া—
রাজবালা আমি—আমার রোষ।
চাহিনু বারেক মুখপানে তা'র—
ম্লান মুখখানি বিষাদে ঢাকা;
চরণ-লগ্ন সজল নয়ন—
প্রভাতকমল শিশিরমাখা।
আজি যে যাতনা- বিহ্বলা আমি—
কত দিন সেই যাতনা ভার
বহেছে দুখিনী হৃদয়ে তাহার!
দুখের অন্ত নাহিক তা'র।
অপগত-ক্রোধ রাজবালা আমি
বসিনু নগ্ন হর্ম্ম্যতলে;
গল বেড়ি' তা'র, নয়ন-সলিল
মিশানু তাহার নয়ন-জলে।

সে অবধি দু'টি অভাগিনী নারী
তাহারি আশায় জীবন বাহি:
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী;—
চরণশব্দে চমকি' চাহি।
বাতায়নতলে বকুল-কুঞ্জে
কাঁপিলে পত্র, গাহিলে পাখী,
দুরু দুরু কাঁপে দু'খানি হৃদয়,
চমকিয়া চাহে সজল আঁখি।
নিদাঘে রবির দীপ্ত কিরণ,
বরষায় ঘন জলদরাশি,
শরতে তপনে জলদে মিলন,
হেমন্তে শস্যে সোনায় হাসি,
কুহেলি-আঁধারে ঢাকা ধরা ছিমে,
মাধবে মাধুরীমধুর ধরা;
বরষের পর বরষ পোহায়—
মোদেরি হৃদয়ে বিষাদ-জরা।
পূর্ণ প্রাসাদ জনহীন যেন,
সুখলেশহীন সকল সুখ;
গত-অভিমান, প্রেমক্ষুধাতুর
রমণী-জীবনে কেবলি দুখ।
আশা-পথ চাহি' দিন কাটি' যায়,
জীবন-গ্রন্থি জরায় খসে।
জুড়া'বে না বুঝি দু'খানি জীবন
প্রেমের অমৃত-পরশ-রসে।

কঞ্চুকী

প্রথম অধ্যায়।

রাজনীতি।

দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে যে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা গণনা করিয়াও শেষ করা যায় না। স্বার্থপর, হীনবল ও বিলাসপরায়ণ রাজারা যে যাহার আপনার রাজ্যে নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছিলেন, এবং সুবিধা পাইয়া যুসলমানেরা ধীরে ধীরে পঞ্জাব সীমান্তে প্রবল হইয়া উঠিতেছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন চন্দেল্ল-বংশীয় রাহিল রাজার পুত্র হর্ষদেব বুন্দেলখণ্ডের রাজা। আর্য্যই হউন, অনার্য্যই হউন, হর্ষদেবের স্বদেশানুরাগ ছিল। কি করিলে ভারতবর্ষ বিদেশীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারে, সর্ব্বদাই তাহার উপায়-উদ্ভাবনে ব্যগ্র ছিলেন। সীমান্তপ্রদেশগুলি সুরক্ষিত করিতে হইলে দেশের সমগ্র রাজবল একত্রে প্রযুক্ত হওয়া উচিত। এই জন্য তিনি বিভিন্ন প্রদেশের রাজসভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না।

ভারতবর্ষ তখন ক্ষীণপুণ্য; মানবচেষ্টার তখন তাহার উদ্ধার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। যোদ্ধা ও পণ্ডিতদিগকে লইয়া হর্ষদেব অপরাহ্ণসময়ে সভা করিয়া বসিলেন; অমনই ভাটেরা তাঁহার যশের গান আরম্ভ করিল। রাজা ভাটদিগকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "আমি এই ক্ষুদ্র বুন্দেল-খণ্ডের শাসনকর্ত্তা মাত্র, আমাকে অযথা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর বলিয়া অপমান করিও না।"

রাজার আদেশে বিভিন্ন রাজ্য হইতে প্রত্যাগত দূতেরা একে একে আসিয়া রাজবর্গের অভিমতি জ্ঞাপন করিতে লাগিল। কানোজ-প্রত্যাগত দূত কহিল, "মহারাজ, কানোজ-পতি মহেন্দ্রপাল দেব তাঁহার গুরু ও সভাপণ্ডিত কবিরাজ-শেখরের বিদ্ধশালভঞ্জিকা পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং উহার শিরোভাগে স্বহস্তে আপনার প্রস্তাবের উত্তর লিখিয়া দিয়াছেন।" রাজা গ্রন্থখানি লইয়া দেখিলেন, যে, লিখিত আছে, "কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালং গচ্ছতি ধীমতাম্।" রাজা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া মাথা নাড়িলেন। দ্বিতীয় দূত রাজার চরণতলে একখানি লিপি-

স্থাপন করিলেন। রাজা স্বয়ং তাহা পড়িয়া দেখিলেন যে, চেদিকুলের কলচুরি-বংশীয় মুগ্ধতুঙ্গ-প্রসিদ্ধধবল তাঁহাকে লিখিয়াছেন যে, "তিনি নিজে পরাক্রান্ত ও বাহুবলসম্পন্ন। ম্লেচ্ছ যবনদিগকে অনায়াসে দূরীভূত করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে; তিনি অন্য রাজার সহিত দলবদ্ধ হইয়া আত্মগৌরব হীন করিতে চাহেন না।" হর্ষদেব মন্ত্রীকে বলিলেন যে, "ইহাকেই বিপত্তি কালের বিপরীত বুদ্ধি বলে।" ক্ষুদ্র কোশল-রাজকে পরাস্ত করিয়া এবং পূর্ব্ব সমুদ্রকূলের দুর্ব্বল রাজাদিগকে জয় করিয়া, কলচুরি রাজা অতি গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এই সময়ে চোলরাজ্যে বীরনারায়ণ বা পবান্তকদেব রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি কেরল-রাজদুহিতাকে বিবাহ করিয়া, অংশতঃ কেরলপতির সাহায্যে পাণ্ড্য রাজাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, এবং লঙ্কা পর্য্যন্ত জৈত্রযাত্রা করিয়া তত্রত্য রাজা পঞ্চম কস্‌সপকে (কাশ্যপ) একবার পরাভূত করিয়াছিলেন। হর্ষদেবের বিশ্বাস ছিল যে, বীরনারায়ণ সমগ্র দক্ষিণপ্রদেশের একাধীশ্বর হইতে পারিবেন। এই জন্য তাঁহার বিজয়-বার্ত্তায় আনন্দপ্রকাশ করিয়া আপনার অভিমতি জানাইয়াছিলেন। কিন্তু পরান্তকের পত্রে কেবল এই কয়েকটি কথা ছিল;—"উত্তর ভারত বহুদূরে।" হর্ষদেব সঙ্কল্প করিলেন যে, তিনি নিজেই একবার অন্যান্য নিকটবর্ত্তী রাজাদিগের মন বুঝিবেন; তাহার পর যাহা হউক, একটা কিছুর অনুষ্ঠান করিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রগল্‌ভা।

লুনীর জল বড় নির্ম্মল, বড় শীতল। অজমীর প্রদেশে এখন যেখানে তারাগড়, উহার দক্ষিণ দিক দিয়া এক সময়ে লুনী নদীর ধারা বহিয়া যাইত। সেই সময়ের কথাই বলিতেছি। অতি প্রত্যূষে নদীর শীতল জলে অঙ্গমার্জ্জনা করিয়া, কুমারী কঞ্চুকা দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। একালের রুচিতে কঞ্চুকা নামটা ভাল লাগিবে না; কিন্তু কবিত্বপ্রিয় পাঠকদিগের খাতিরে ঐতিহাসিক নামের পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব।

নামটা যেমনই হউক, কুমারী হয় ত খুব সুন্দরী। কেন না, তিনি দেবমন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্রই, এক জন সৌম্যমূর্ত্তি যুবক সন্ন্যাসী তাঁহাকে দর্শন করিয়া, দেব-পূজার মন্ত্র ভুলিয়া মনে মনে আবৃত্তি করিতেছিলেন,—

কনককমলকান্তৈঃ সদ্য এবাম্বুধৌতৈঃ
শ্রবণতটনিষক্তৈঃ পাটলোপান্তনেত্রৈঃ
উষসি বদনবিম্বৈরংসসংসক্তকেশৈঃ
শ্রিয় ইব গৃহমধ্যে সংস্থিতা যোষিতোঽস্থ। (১)

এই সময়ে অজমীরে নূতন চাহমান বা চোহান বংশের রাজত্ব চলিতেছিল। রাজা গোবকের পুত্র চন্দন তখন সিংহাসনে। কুমারী কঞ্চুকা রাজা চন্দনের সহোদরা।

সুন্দরী দেবপদে অঞ্জলি প্রদান করিয়া সন্ন্যাসীর চরণতলে মস্তক অবনত করিলেন। সন্ন্যাসী সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "আমি আপনার প্রণামগ্রহণের অযোগ্য; বিশেষতঃ, এই মন্দিরের মধ্যে দেবতা ভিন্ন অন্য কেহ নমস্য নহেন।" কথা কি কেবল কণ্ঠের গুণেই মিষ্ট হয়? সন্ন্যাসীর সহিত কথা কহিতে কাহারও বাধা নাই; কুমারী সস্মিতবদনে কহিলেন, "স্বয়ং চাহমান-পতি আপনার ভক্ত; তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী আপনাকে প্রণাম করিলে ক্ষতি হইবে কেন?" সন্ন্যাসী এই পরিচয় পাইয়া প্রসন্ন হইলেন, মনে হইল।

কুমারী হয় ত একটু প্রগল্‌ভা; কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুটি মুগ্ধার চক্ষু। সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া কথা কহিবার সময়, পাতা দু'খানি যখন ঈষৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়াই সুকোমল দৃষ্টিটুকু ঢাকিয়া অবনত হইল, তখন সন্ন্যাসীর মাথা ঘুরিয়া গেল। সন্ন্যাসী দেখিলেন যে, তাঁহার প্রাণটি প্রাচীন বক্ষোগৃহ ছাড়িয়া, যুবতীর ঈষন্মুক্ত দৃষ্টিপথ দিয়া সৌন্দর্য্যের নবমন্দিরে প্রবেশ করিল। মনোমোহিনী যদি চক্ষুর পাতা দুখানি আবার উন্মুক্ত করিয়া চাহিতেন, তথাপি পলাতক প্রাণটা ফিরিয়া আসিত কি না সন্দেহ।

ইহার পর হইতেই কুমারীর দেবভক্তি বাড়িয়া উঠিল। তিনি দু' বেলা মন্দিরে আসিতেন; এবং কখনও কখনও পরিচারিকা লইয়া আসিতেও ভুলিয়া যাইতেন। একদিন সন্ন্যাসী মন্দিরসোপানে বসিয়া বামকরে চক্ষু আবৃত করিয়া মানসপূজায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে কুমারী মৃদুপদে নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। সায়াহ্নের আরতির জন্য তখনও দেবমন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ

---

(১) সদ্যঃস্নাতা কামিনীর হেব শোভা সুরুচির;—
বিলম্বিত কেশপাশ, অংসতল শোভিল;
পাটল উপান্তনম, আঁখি দুটি মনোরম,
আকর্ণবিশ্রান্ত সরি, কিবা শোভা ধরিল।
কনককমল সম, এ যে মুখ নিরুপম;
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী যেন গৃহমাঝে বসিল।

হইল; তিনি নম্রস্বরে কুমারীর কুশলপ্রশ্ন করিলেন। কুমারী কহিলেন, "আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিব; এবং আপনার শিষ্যা হইব।" কুমারী বড় প্রগল্‌ভা। তাহার পর উভয়ে কি কথোপকথন হইল, বলা দায়। কিন্তু মন্দিরের দ্বার মুক্ত হইবার পূর্ব্বেই হৃদয় দুইটি মুক্ত হইয়াছিল।

উহার পর দিন সন্ন্যাসী রাজসভায় প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি ঘটক হইয়া কুমারী কঞ্চুকার সহিত বুন্দেলখণ্ডপতি হর্ষদেবের বিবাহসম্বন্ধ করিবেন। রাজা স্বীকৃত হইলেন; এবং সন্ন্যাসী লুনীর জলে স্নান আহ্নিক সম্পন্ন করিয়া অজমীর পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু কথাটা মনে রহিল যে, লুনীর জল বড় নির্ম্মল, বড় শীতল।

তৃতীয় অধ্যায়।

সমরক্ষেত্রে।

সন্ধি স্থাপিত না হইলে যুদ্ধ করিতে হয়, ইহা চিরকালের নীতি। চান্দেল্লপতি হর্ষদেব, বুন্দেলখণ্ডকে ভারতের কেন্দ্র করিবেন বলিয়া, ক্ষুদ্র রাজাদিগের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিবিধ স্থানে জয়লাভ করিবার পর চেদিবংশীয় কলচুরি রাজাদিগের সহিত সমর আরম্ভ হইল। গর্ব্বদীপ্ত মুগ্ধতুঙ্গ-প্রসিদ্ধধবল তখন পরলোকে; এবং তাঁহার পুত্র বালহর্ষ তখন রাজা। মধ্যপ্রদেশে এখন যেটা সগর জেলা, উহা চেদিরাজ্যের প্রধান স্থান ছিল। সগর জেলার উত্তরে ও বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণ সীমায় সাহগড়ে উভয় পক্ষের সংগ্রাম হইয়াছিল।

যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বাহ্ণে একদিন দেবীপূজা করিবার পর রাণী কঞ্চুকা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। মূর্চ্ছাপন্না হইয়া স্বপ্নে দেখিলেন যে, রাজা যেন একখানি আলোকরঞ্জিত মেঘস্তরে উপবেশন করিয়াছেন, এবং তিনি রাজার পাদস্পর্শের জন্য যতবার হস্তপ্রসারণ করিতেছেন, ততবারই সিংহাসনখানিতে বাধা লাগিতেছে। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর রাণী প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি সমরক্ষেত্রেও স্বামীর নিকটে উপস্থিত থাকিবেন। রাজা অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাণী তাহা শুনিলেন না। তিনি একটু হাসিয়া রাজাকে বলিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর! চাহমানের মেয়ে যুদ্ধ দেখিয়া ভয় পায় না।" রাণী রাজাকে সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিতেন।

সাহগড়ে সৈন্যকোলাহল ধ্বনিত হইতে লাগিল। ফাল্গুনের শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন মধ্যাহ্নসময়ে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল; সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল, তবুও কোনও পক্ষ নিরস্ত হইল না। সহসা রাণীর মনে কেমন একটা উৎকণ্ঠাজন্মিল, কোনও ক্রমে তিনি শিবিরে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ব্যগ্র হইয়া যুদ্ধবেশ ধারণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে

উঠিলেন ; এবং শিবিরস্থিত ৫০ জন পদাতিক লইয়া, 'জয় চন্দেল্লপতির জয়!' বলিয়া পার্শ্বদেশ হইতে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিতে ছুটিলেন। রাত্রিকালে নূতন সৈন্যের আগমনে পরিশ্রান্ত কলচুরি সৈন্যদল রণে ভঙ্গ দিতে লাগিল ; এবং 'মার মার!' শব্দে বুন্দেলখণ্ডের সৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল।

রণজয়ের পর রাজা ও রাণী একত্র প্রত্যাগমন করিলেন। রাণীর আদেশে অবিলম্বে জ্যোৎস্নালোকে মুক্ত আকাশতলে শয্যা প্রস্তুত হইল ; সমরসজ্জা পরিত্যাগ না করিয়াই রাজা সেখানে শয়ন করিলেন। রাণী রাজার পার্শ্বে উপবেশন করিবামাত্রই বৈদ্য আসিলেন ; কিন্তু রাজা স্থিরভাবে বলিলেন, "চিকিৎসায় কোনও ফল হইবে না।" তবুও রাণীর অনুরোধে বৈদ্য রাজার ক্ষত বক্ষঃস্থলে ঔষধলেপন করিলেন; এবং রাণী স্বহস্তে ঔষধ পান করাইয়া পতির মুখচুম্বন করিলেন।

হর্ষদেব পত্নীর করধারণ করিয়া বলিলেন, "একটি অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে; তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বল যে, আমার চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করিবে না।" দেবী অর্দ্ধরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "দেবতা, রমণীজন্মের যথার্থ সুখটুকু হইতে আমাকে কি অপরাধে বঞ্চিত করিবে?" রাজা বাহুবেষ্টনে রাণীর কোমল কণ্ঠ ধরিয়া কহিলেন, "দেবী, দেবদত্ত জীবন আত্মহত্যায় নাশ করিবার কাহারও অধিকার নাই। সুখের আশা পরিত্যাগ কর ; দুঃখ বহন কর। উহাই জীবনের যথার্থ গৌরব। যে মন্ত্রে নুনীতীরে আমরা দীক্ষিত হইয়াছিলাম, সেই মন্ত্রে বালক যশোবর্ম্মাকে দীক্ষিত কর। পুত্রের জননী হইয়া আমার কামনা পূর্ণ করিবার জন্য জীবনধারণ কর।" রাণীর আদেশে পুত্র যশোবর্ম্মাকে আনিবার জন্য অশ্বারোহী ছুটিল।

পরিশিষ্ট।

এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকায় সংগৃহীত লিপি হইতে পাঠকেরা জানিতে পারিবেন যে, রাজার কামনা ও রাণীর সাধনা বহুপরিমাণে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। যশোবর্ম্মা মাতার নিকট যুদ্ধদীক্ষা গ্রহণ করিয়া, গৌড়, খস, কোশল, কাশ্মীর, মিথিলা, মালব, চেদি, কুরু ও গুর্জ্জর জয় করিয়াছিলেন।

তিব্বত (ভোট) রাজার নিকট হইতে কানোজ-রাজ একটি দেবমূর্ত্তি পাইয়াছিলেন, উহা কৈলাস হইতে আনীত বলিয়া প্রবাদ আছে। ৯৪৮ খৃষ্টাব্দে যশোবর্ম্মা কানোজ হইতে ঐ দেবমূর্ত্তি আনিয়া বৈকুণ্ঠ নামক একটি মন্দির গড়িয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করেন। পিতামাতার বৈকুণ্ঠকামনায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সহযোগী সাহিত্য।

গুজরাটী উপন্যাস।

"ইষ্ট অ্যাণ্ড ওয়েষ্ট" পত্রে সিভিলিয়ান মিষ্টার কিংকেষার্ড একখানি গুজরাটী উপন্যাসের অনতিদীর্ঘ পরিচয় বিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন সম্প্রদায়কে বুঝিবার পক্ষে, সেই সম্প্রদায়ের সাহিত্যই সর্ব্বপ্রধান সহায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমষাভাবে ভারত-প্রবাসী ইংরাজগণ প্রকৃতপক্ষে দেশীয় সাহিত্যের উৎকৃষ্ট পুস্তক বাছিয়া লইতে ও পাঠ করিতে পারেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি নন্দশঙ্কর টুলজশঙ্কর কর্ত্তৃক প্রণীত "করণ-ঘেলো" নামক গুজরাটী উপন্যাসের উল্লেখ করিয়া কহেন, এই ঐতিহাসিক উপন্যাস স্কটের উপন্যাসের মোহালোকে সমুজ্জ্বল।

উপন্যাসের নায়ক করণ-ঘেলো গুজরাটের শেষ রাজপুত রাজা। উপন্যাসবর্ণিত কালের ঐতিহাসিক অবস্থার আলোচনা করিয়া আমরা উপন্যাসের পরিচয় দিব। উপন্যাসবর্ণিত কালে আলাউদ্দীন দিল্লীর সম্রাট্। তিনি ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে জেলালউদ্দীনকে নিহত করিয়া তদীয় সিংহাসন লাভ করেন। ইঁহার রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতে মুসলমানের আধিপত্য পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও বঙ্গের কোনও কোনও অংশ ব্যতীত অন্যত্র স্থায়ী হয় নাই। মুসলমানপ্রাধান্য পারস্যে, আসিয়া মাইনরে, আফ্রিকায় ও স্পেনে বন্যার জলের মত বিস্তৃত হইয়াছিল; কিন্তু ভারতে তাহা অতি মন্দগতিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিল মাত্র। মহম্মদের যশঃপ্রভা বিকীর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার দূত পত্র লইয়া পারস্যাধিপতির নিকট উপনীত হয়—'মহম্মদকে ভগবানের প্রেরিত সত্যধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া স্বীকার কর।' পারস্যাধিপতি সে পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলে দূত বলিয়া আইসে, পারস্যরাজ্য ছিন্ন পত্রখণ্ডেরই মত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। এই ঘটনার দশ বৎসর পরে মহম্মদ আরবের রাজা হইলেন; ইহার বিশ বৎসর পরে দুর্ব্বল পারস্যের সর্ব্বনাশ হইল। এজদিলার্ড পলাইয়া শেষে চীনে যাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার দুহিতৃত্রয়ের মধ্যে এক জন বন্দি-অবস্থায় জীবনত্যাগ করেন; এক জন আলীর পুত্র হসেনের সহিত বিবাহিতা হয়েন; আর এক জন সৌরাষ্ট্রে আসিয়া পবিত্রীতা হয়েন। উদয়পুরের বর্ত্তমান শাসকগণ তাঁহার বংশধর। আফ্রিকা-বিজয়, স্পেন-পর্য্যায়—সবই পল্লবিত—সাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু ভারতে মুসলমান-প্রাধান্য-সংস্থাপনের ইতিহাস অন্যরূপ। ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে মুসলমানের প্রথম পদার্পণ। কিন্তু ৭১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুসলমান ভারতবিজয়ের কল্পনা করেন নাই। সেই বৎসর মহম্মদ কাশিম সিন্ধুদেশ বিজয় করেন। কিন্তু সে বিজয়ও স্থায়ী হয় নাই। বিশ বৎসরের মধ্যে মুসলমান-প্রাধান্য ক্ষীণ হইয়া ক্রমে বিলীন হইয়া যায়। ইহার ফলে সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসর ভারতে আর মুসলমানের আক্রমণ হয় নাই। ইহার পর মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।—সোমনাথের মন্দির আক্রমণকালে তাঁহার যে সকল সৈনিক প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের সমাধি আজও বর্ত্তমান।—কিন্তু তবুও ভারতে মুসলমান-প্রাধান্য স্থায়ী হয় নাই।

শেষে তৈমুরের বংশধরগণ ভারতে মুসলমান-প্রাধান্য স্থাপন করেন। কিন্তু হিন্দুর অন্তর্নিহিত শক্তি তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। তাই মোগলশাসন শিথিল হইতে না হইতে—শিবাজীর

মৃত্যুকালে রাজপুতানায়, পঞ্জাবে ও দাক্ষিণাত্যে মুসলমানের প্রাধান্য অন্তর্হিত হইল, এবং অল্পকাল-মধ্যেই মোগল মহারাষ্ট্রীয়ের কৃপাপ্রার্থী হইলেন। মুসলমান-প্রাধান্যের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রাজপুতগণ ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়াছেন। বহুবার মোগলবলে নিষ্পিষ্ট হইয়াও রাজপুতের স্বাধীনতা-প্রিয়তা লুপ্ত হয় নাই। রাজপুত-সম্প্রদায়ের কোনও শাখা বা এই কালসমরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে—কোনও শাখা বা সামান্য বশ্যতাস্বীকার করিয়া রক্ষা পাইয়াছে। মেওয়ারের অন্য গর্ব্বে সামান্য কলঙ্কস্পর্শমাত্র ঘটিয়াছিল। বিকানীরপতি ও অম্বরাধিপ তুর্ককে বংশের কন্যাদান করিয়াছেন, তিনবার চিতোর জনশূন্য হইয়াছে, তবুও উদয়পুরের শিশোদীয় রাজা বনে ও মরুভূমিতে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন; বশ্যতাস্বীকার করেন নাই।

আলোচ্য পুস্তকে বর্ণিত কালের পূর্ব্বে গুজরাট মামুদ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও মহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক মুসলমানাধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তখন স্বাধীন হিন্দু রাজপুত রাজা—করণ গুজরাটের অধিপতি। প্রথম অধ্যায়ে রাজধানী অনিলবাদপত্তনে দশারা উৎসবের বর্ণনা। এই শুভদিনে রাজার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনোদ্দেশে সমবেত জনগণের মধ্যে প্রধানত্রয়ের বর্ণনা এইরূপ,—

বণিক জাতিতে কুনবী। সে জনতায় তাঁহার মত সুগঠনকায় ও প্রতিভাদীপ্তশ্রী আর কেহই ছিল না। তিনি রাজার কৃপায় জায়গীর পাইয়াছিলেন—বহু ভূসম্পত্তিও করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর—কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি অনাহত। তাঁহার দেহ সুরক্ষিত—বুদ্ধি প্রখর ও অভিজ্ঞতা অসাধারণ।

বাণের সম্মুখে জৈন বণিক জেঠাশ উপবিষ্ট। তাঁহার বিস্তৃত কারবার। গ্রামে গ্রামে তাঁহার দোকান। তাঁহার নামের গুণে মরুভূমিও মুক্তাকীর্ণ হইত। বিদেশে বহু বন্দরে তাঁহার বাণিজ্য-তরী গতায়াত করিত। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয়মাত্র পাওয়া যাইত না। তিনি অতিকায়—তিনি মরিলে কি প্রকারে তাঁহাকে বহিয়া লইয়া যাওয়া হইবে, সেই চিন্তায় তাঁহার আত্মীয়গণ অধীর হইতেছিল। উদরে মাংসরাশি স্তরবিন্যস্ত, কোনও দ্রব্য স্তরদ্বয়-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, সহজে তাহার উদ্ধারের আশা থাকিত না।

সেই জনতায় আর এক জন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাধব নাগর ব্রাহ্মণ—বুদ্ধিমান। তিনি রৌপ্যাসনে উপবিষ্ট; গাত্রে কাশ্মীরজাত শাল, বাহুতে ও মণিবন্ধে অলঙ্কার, অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়। দেহ ঈষৎস্থূল, বর্ণ শুভ্র, নাসিকা ও কর্ণ সুগঠিত—নয়নে প্রতিভাদীপ্তি। তিনি রাজমন্ত্রী। বুদ্ধি-বলে তিনি ক্ষমতাশালী। তিনিই প্রকৃতপক্ষে দেশের শাসক; রাজা পুতুলমাত্র।

রাজপ্রাসাদ দুর্গমধ্যে অবস্থিত। গ্রন্থকার নিপুণতার সহিত প্রাসাদের পাষাণপ্রাচীরের ও স্তম্ভরাজির বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীরগাত্রবহির্ভাগে রামায়ণে ও মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধের ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার চিত্র কোদিত।

প্রাতে সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিতপূর্ব্বে প্রাসাদে শঙ্খনাদে ও ঢক্কারবে রাজার শয্যাত্যাগবার্ত্তা ঘোষিত হইল। রাজা উঠিয়া অশ্ব পরিদর্শন করিলেন; পরে স্নানাদিসমাপনান্তে শিবপূজা শেষ করিয়া সমবেত ভিখারীদিগকে তণ্ডুলদানের আদেশ প্রদান করিলেন; তাহার পর অলঙ্কৃত হইয়া দরবারে চলিলেন।

দরবার-কক্ষ প্রশস্ত ও সুন্দর; স্তম্ভাবলী স্ফটিকনির্ম্মিত। হর্ম্ম্যতলে পুরু গদি, তদুপরি শ্বেত

আস্তরণ। দুই পার্শ্বে আসন, সিংহাসনের দুই পার্শ্বে পদমর্য্যাদা-অনুসারে কর্ম্মচারী প্রভৃতির আসন। পুত্রহীন রাজার সিংহাসনের পার্শ্বে যুবরাজের শূন্য সিংহাসন,—তৎপার্শ্বে মন্ত্রীর আসন। মাধব সুসজ্জিত হইয়া তাহাতে উপবিষ্ট।

আর এক পার্শ্বে রাজদূতগণের আসন। তাহার পর সামন্ত ছত্রপতি প্রভৃতির নির্দ্দিষ্ট স্থান। এক কোণে চর্ম্ম, অসি ও ছুরিকাধারী সেনাগণ দণ্ডায়মান। পণ্ডিত, জ্যোতিষী, চিকিৎসক প্রভৃতির সদ্ভাব নাই। আর এক দিকে ভাট, চারণ, চিত্রকর প্রভৃতি। আর এক স্থানে বহুবস্ত্রাভরণে সুসজ্জিত নর্ত্তকীদল লাস্যলীলায় লোকের মনোরঞ্জন করিতেছে। সহসা চোপদারগণ অগ্রসর হইয়া রাজার আগমন ঘোষিত করিল। সকলে আসনত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

রাজা করণ যুবক—বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র—ব্যায়াম হেতু দেহ সুগঠিত ও বলিষ্ঠ। রাজা সুন্দর। ওষ্ঠাধর দেখিলে বোধ হয়,তিনি একগুঁয়ে;—যাহা ধরেন,ভাল হউক মন্দ হউক, তাহা শেষ না করিয়া ছাড়েন না। নয়নদ্বয় দীপ্ত। তিনি রাজপুত, অত্যন্ত সাহসী। তিনি চিন্তা করিয়া কার্য্য করেন না। তিনি কামুক। রাজার কপাল প্রশস্ত। রাজবেশ বহুমূল্য—মাথায় জরীর কায কিবা পাগড়ী—মুক্তাময় ও হীরকখচিত অলঙ্কারে বদ্ধ। স্বর্ণ পিধানে অসি—বস্ত্রাদিখচিত।

দরবারের পর রাজাকে ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ ও রাজকবির গান শুনিতে হইবে; অপরাহ্নে নগরের বাহিরে একটি বৃক্ষকে পূজা করিতে যাইতে হইবে।

সন্ধ্যাকালে রাজা বিশ্রাম না করিয়া ছদ্মবেশে নগরের পথে ভ্রমণে বাহির হইলেন। এই সময় রাজা মাধবের পত্নীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। মাধবের পত্নী রূপসুন্দরীর বর্ণনা এইরূপ;—

রূপসুন্দরী পদ্মিনীজাতীয়া স্ত্রী। তিনি চারুচন্দ্রাননী; সে আননের সরম-শোণিমায় গোলাপের রক্তিমা পরাজিত হয়। মুখ-গহ্বর ক্ষুদ্রায়তন—ওষ্ঠাধর প্রবালবৎ। তিনি মৃদু হাসিলে মুক্তাপাঁতির মত দশনচয় দেখা যায়। তাঁহার নাসাভ্যন্তরের মুক্তা যখন সেই প্রবাল ওষ্ঠাধর স্পর্শ করে, তখন বোধ হয়, যেন রক্তপদ্মপর্ণে শিশির শোভা পাইতেছে। হায়েজ একটি বালিকার মুখে তিল-চিহ্নের জন্য সিরাজ ও বোখারা দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, রূপসুন্দরীর গণ্ডেও সেইরূপ চিহ্ন।—নয়নদ্বয় দীর্ঘ ও কৃষ্ণতার, কজ্জলসজ্জিত নয়নপল্লবে নয়নের শোভা বর্দ্ধিত হইত। নয়নে স্নিগ্ধ দৃষ্টি—তবুও সে দৃষ্টিতে নরের চিত্ত বিদ্ধ হয়। ভ্রূযুগ রামধনুর মত, মদনদেব সেই ধনুকে গুণ দিয়া সহস্র সহস্র হৃদয় বিদ্ধ করিতে পারিতেন। কপালে চন্দনবিন্দু—তুষারক্ষেত্রে রক্তবিন্দুর মত দেখায়। কবরীমুক্ত হইলে কেশরাশি কটিদেশ স্পর্শ করিত। তিনি বিধাতার অনিন্দ্য রচনা। কে এমন রূপ দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে? মানুষ মানুষমাত্র।

এ রূপরাশি দেখিয়া রাজা মুগ্ধ হইলেন। তিনি যে উপায়েই হউক, রূপসুন্দরীকে লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পর দিবস রাজকার্য্যের ছলে মাধব দূরে প্রেরিত হইলেন। রূপসুন্দরী প্রভাতে উঠিয়া কক্ষকোণে সম্মার্জ্জনী দেখিয়াছিলেন, সোপানশ্রেণী অবতরণ করিতে একটি বিড়াল তাঁহার পার্শ্ব দিয়া গেল, বাতায়নপথে চাহিতে তিনি সম্মুখে এক জন বিধবাকে দেখিলেন। এই সকল দুর্লক্ষণে চঞ্চলচিত্তা রূপসুন্দরী মনে নানা আশঙ্কা করিতেছিলেন, এমন সময় রাজসেনাদল গৃহ আক্রমণ করিল। মাধবের ভ্রাতা কেশব ভৃত্যবর্গের সাহায্যে গৃহরক্ষার চেষ্টা করিয়া নিহত হইলেন। তাঁহার

পত্নী গুণসুন্দরী পতির শব সহ চিতারোহণ করিলেন। শ্মশানের পথে রাজা ছদ্মবেশে তাঁহার আশীর্ব্বাদলাভের চেষ্টা করিলেন। গুণসুন্দরী তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন,—অভিশাপ দিলেন,—যেন রাজা গৃহহীন হইয়া মরুপথে প্রাণত্যাগ করেন; তাঁহার পত্নী পরহস্তে পতিতা হয়েন; তাঁহার দুহিতা বহু নিগ্রহ ভোগ করিয়া বর্ব্বরের করতলগতা হয়েন; যেন তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার পুরীতে আসিয়া বাস করে; প্রজাদল রাজদুর্ভাগ্যভাগী হয়; রাজধানী নষ্ট হয়।

সতীর কথা ব্যর্থ হইবার নহে। আবার রাজসংসারে রাজ্যে আর এক পাপঘটনা ঘটিল। এক জন বেণিয়া দুই হাজার টাকা ঋণ করে,—এক জন ভাট তাহার জামীন ছিল। সুদে আসলে তাহা চারি হাজারে পরিণত হয়। মহাজন বেণিয়ার নিকট টাকা না পাইয়া ভাটকে ধরিল। ভাট মহাজনের টাকা শোধ করিবার দায়গ্রস্থ হইল। সে তিন দিন অনাহারে বেণিয়ার দ্বারে পড়িয়া রহিল; তবুও বেণিয়া টাকা দিল না। তখন সে তাহার মাতাকে ও পুত্রকে আনিয়া বেণিয়ার দ্বারে হত্যা করিয়া তাহাকে সেই রক্তে সিক্ত করিল। তবুও টাকা না পাইয়া সে অবশেষে রাজদ্বারে প্রতীকারপ্রার্থী হইল; আশার নিরাশ হইয়া সে রাজসমক্ষে আত্মহত্যা করিল।

এই সময় দিল্লীর সেনাদল রাজার রাজধানী আক্রমণ করিল।

মুসলমান সেনার রাজধানী-আক্রমণের মূল কারণ—মাধব। পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে, রাজকার্য্যে মাধবকে দূরে পাঠাইয়া রাজা তাহার পত্নীকে হরণ করেন। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মাধব দেখিলেন, গৃহ শূন্য, পত্নী অপহৃতা, ভ্রাতা মৃত, ভ্রাতৃবধূ সহমৃতা, তিনি স্বয়ং কর্ম্মচ্যুত। সুসময়ের বন্ধুগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিল। প্রবল প্রতিহিংসোবহ্নি হৃদয়ে জ্বালিয়া মাধব দেবমন্দিরে গমন করিলেন। সতীপূজিতা ভবানী মুসলমানবমণীরূপে তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া দিল্লীর পথ দেখাইয়া দিলেন। মাধব বহু কষ্টে আলাউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মদিনোৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্বে দিল্লীতে উপনীত হইলেন।

কালীমন্দিরে সাধু সন্ন্যাসীর জনতা দেখাইয়া, লেখক, পাঠককে আলাউদ্দীনের রাজসভায় উপনীত করিলেন। আক্রমণকারী মোগলদলের অবশিষ্ট কয় জন করিপরপিষ্ট হইবে, এই দণ্ড প্রাপ্ত হইল। যুদ্ধে ও অন্য সময়ে তাঁহার সকল কার্য্য মুসলমানধর্ম্মবিধানের অনুমোদিত কি না—সম্রাট ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, কাজী বলিলেন, সম্রাটের কার্য্য মুসলমানবিধানবিরোধী। সকলেই ভাবিল—কাজীর সর্ব্বনাশ হইবে। কিন্তু আলাউদ্দীন কাজীর সাহসে প্রীত হইয়া তাঁহাকে উপহার দিয়া বলিলেন যে, মুসলমানবিধানে এক দিনও হিন্দুস্থান শাসিত হইতে পারে না।

শাহজাদার জন্মদিনে সন্ধ্যাকালে মিছিল বাহির হইল। নানা স্থান হইতে সংগৃহীত রত্নরাজিতে সুসজ্জিত অশ্বগজাদি পথে বাহির হইল। এই সময় একটি হাউই বাজি জ্বলিয়া বাজির গাড়ীতে আগুন লাগিল। চারি দিকে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল।

বিপুল জনতার সকলে পরস্পরকে ঠেলিয়া পলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সে জনতায় পথ পাওয়া দুঃসাধ্য। শেষে এ উহাকে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। হস্তী ও অশ্ব সকল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। কেহ বা করিপদে, কেহ বা অশ্বক্ষুরে, কেহ বা অস্ত্রাঘাতে মরিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে লোক মরিতে লাগিল। ধনী দরিদ্র, প্রভু ভৃত্য, রাজা প্রজা, একত্র ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

শাহজাদার হস্তীও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মাহুত আর করিপৃষ্ঠে থাকিতে পারিল না। হাওদায় অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছিল। শাহজাদার তখন লম্ফ দিয়া পড়িলে নরপতিপেষণে পিষ্ট হইবার সম্ভাবনা যেমন নিশ্চিত, করিপৃষ্ঠে থাকিলে অগ্নিদগ্ধ হইবার সম্ভাবনাও তেমনই ধ্রুব। এই অবস্থায় মাধব তাঁহার উদ্ধারসাধন করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। তিনি প্রীত হইয়া পুরস্কার দিতে চাহিলে মাধব সম্রাটের সাক্ষাৎভিক্ষা করেন, এবং সম্রাটসমীপে সকল কথা নিবেদন করেন। সম্রাট গুজরাট জয় করিয়া তাঁহাকেই মন্ত্রী করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন।

দিল্লীর সেনাদল উপনীত হইলে করণের সেনানায়কগণ প্রস্তাব করিলেন, যুদ্ধ না করিয়া নগর-রক্ষার ও মুসলমানদিগের রসদ বন্ধ করিবার চেষ্টাই সঙ্গত। সঙ্গে সঙ্গে আরও সেনাসংগ্রহ চলিতে থাকুক। কিন্তু করণ ধৈর্য্য ধরিতে জানিতেন না; তিনি বলিলেন, এ কার্য্য রাজপুতের যোগ্য নহে। তিনি সম্মুখসমরে অগ্রসর হইলেন। দিনব্যাপী যুদ্ধের পর রাত্রিকালে উভয় পক্ষ সম্মত হইয়া রাত্রির মত যুদ্ধ বন্ধ করিলেন। সরলহৃদয় হিন্দুরা নিদ্রিত হইল। নিশার শেষভাগে যবনগণ অতর্কিতভাবে হিন্দুশিবির আক্রমণ করিল। হিন্দুরা পরাজিত হইল। রাজা আহত হইয়া পলায়ন করিলেন। রাণীরা জহরে জীবন-বিসর্জ্জন করিবার পূর্ব্বেই পুরী মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। পাটরাণী ঝালাবাদে পিত্রালয়ে যাইবার ব্যর্থ চেষ্টার পর ধৃত হইয়া আলাউদ্দীনের নিকট প্রেরিত হইলেন। সতীর অভিশাপের একার্দ্ধ পূর্ণ হইল।

কয় বৎসর পরে করণের সহিত পাঠকের পুনরায় সাক্ষাৎ। তখন তিনি দেওঘরের মহারাষ্ট্রীয় রাজা রামদেবের বেগনান দুর্গে অবস্থিতি করিতেছেন। পাটরাণী পিত্রালয়যাত্রাকালে কন্যাদ্বয়কে—কনকদেবী ও দেবলদেবীকে ঝালাবাদে প্রেরণ জন্য ভৃত্যকে আদেশ করেন। ভৃত্য পথে অবগত হয় যে, করণ বেগনান দুর্গে। তাই সে ঝালাবাদে না যাইয়া কন্যাদ্বয়কে পিতৃসমীপে আনয়ন করে। পাঁচ বৎসর পরে জ্যেষ্ঠার মৃত্যু হয়—উপন্যাসবর্ণিত কালে কনিষ্ঠার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর।

এই সময় রামদেবের পুত্র সঙ্কলদেব ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে দেবলদেবীকে উদ্ধার করেন। উভয়ের মনে প্রেমসঞ্চার হয়। রামদেব দেবলদেবীকে পুত্রবধূ করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু করণ রাজপুত, রামদেব মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। উদ্ধত করণ এই অপমানকর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটিল। করণের পাটরাণী আলাউদ্দীনের প্রিয় মহিষী হইয়াছিলেন। তিনি কোনরূপে কন্যার কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তাঁহার পরামর্শে আলাউদ্দীন বেগনানে ও দেওঘরে সৈন্য পাঠাইলেন। করণ বেগনানে মুসলমানের গতিরোধের প্রয়াসী হইলেন। বেগনান অবরুদ্ধ হইল। শেষে দুর্ভিক্ষদুঃখে নগরবাসীরা আত্মসমর্পণ করিল। সেই অবসরে করণ কন্যাকে ও রামদেবের দ্বিতীয়পুত্র ভীমদেবকে লইয়া পলায়ন করিলেন। পথে এক দল মুসলমান তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া দেবলদেবীকে হরণ করিল, এবং দিল্লীতে পাঠাইল। সেখানে শাহজাদা তাঁহাকে বিবাহ করিলেন।

এ দিকে রামদেব মুসলমানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন, রাজ্যরক্ষা করিলেন। করণ বিরক্ত হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রামদেবের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র যুবক সঙ্কলদেব মুসলমানকে করদানে অস্বীকৃত হইলেন। করণের পরামর্শে তিনি শান্তির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে মুসলমান সেনা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সেই যুদ্ধে করণ নিহত হইলেন।

পুস্তকে উদ্ধত বীর ও কাণ্ডজ্ঞানহীন কামুকের পরিণাম চিত্রিত হইয়াছে। প্রধান চরিত্র ব্যতীত পুস্তকের নানা খণ্ডচিত্রও বিশেষ চিত্তাকর্ষক। অর্ধগৃধ্নু ব্রাহ্মণগণের চিত্র, সন্ন্যাসীর মেলা—সকলই সুন্দররূপে নিপুণ চিত্রকরের তুলিকাগ্রে অঙ্কিত। পুস্তকে গুজরাটের চিত্র ও চরিত্র, আচার ও ব্যবহার, প্রথা ও সংস্কার—বর্ণিত। পুস্তকের ঐতিহাসিক অংশও চিত্তাকর্ষক।

আলোচ্য পুস্তক হইতে বোধ হয়, গুজরাটে উপন্যাসের উন্নতি নিতান্ত গণ্য নহে।

অপূর্ব বীরাঙ্গনা।

উৎসর্গ।

কবিবর মাইকেল মধুসূদনের প্রতি।

হে মধু, আছিলে যবে এই ধরাধামে,
ছিল তব ও বদন সুহৃদ রঞ্জন,
নীলোৎপল ঢল ঢল সহাস লোচন,
মোহিনী কবিতা দেবী, (রতি যথা কামে)
গলে দিয়া বরমাল্য ও মূর্তি সুঠামে
মোহিয়া, সুজিয়া মরি নব বৃন্দাবন,
কেলিকদম্বের তলে, শ্রীমধুসূদন!
অর্চিলা ও পাদপদ্ম, রাধা যথা শ্যামে।
হে গুরো, কখন তোমা দেখিনি নয়নে,
কিন্তু দেব, দ্রোণাশিষ্য একলব্য সম,
মানসে গড়িয়া তব মূর্তি নিরুপম,
শিখিয়াছি ধনুর্বিদ্যা তোমারি সদনে।
যা রে শর। স্বর্গে গিয়া শ্রীগুরুচরণ
ক'রে আয়, ক'রে—আয়, আনন্দে বন্দন।

দশরথের প্রতি কৈকেয়ী।

হে রাজেন্দ্র। বামনেত্র করিছে স্পন্দন,
মুহুর্মুহু। হেরিয়াছি গত নিশাকালে,
ইন্দুহাসি ইন্দুভাতি অমলা কমলা।
পদ্মালয়া পদ্মগন্ধে মোহিয়া আমারে,
সুখস্বপ্ন ফুলদল ঢালিয়া পরাণে,
কহিলেন নীলাম্বরে আনন্দরূপিণী!—
"স্নান করি', শুদ্ধচিত্তে, সরযূর নীরে,
বিনাইয়া চারু বেণী, পর নীলাম্বরী,
লো কৈকেয়ী! ভাগ্যবতী, রঞ্জিয়া চরণ
অলক্তে, সর্বাঙ্গে কর চন্দনলেপন।
নিশান্তে পাইবি তুই ধনরত্নরাশি!
তরুতলে দাঁড়াইলে, শারদী শেফালী
ঢালি' দেয় যথা ফুল্ল ফুল রাশি রাশি
নিশান্তে, নিশান্তে কালি দশবর রাজা
ভরি' দিবে ও অঞ্চল রতনে রতনে।
বিশাল ললাটে তোর ওলো সুলোচনা,
জ্বল জ্বল্ জ্বলে আজি সৌভাগ্যতারকা!"
পোহাইল বিভাবরী। এই রাজপুরী
আনন্দে করিছে নৃত্য; চঞ্চলা, বিহ্বলা,
অধীরা, খসিয়া পড়ে কবরীকুসুম,
কবিয়াছে পান যেন সুতীব্র মদিরা।
বাজে বীণা, প্রাণ ঢালি' বাজিছে মুরলী,
ফুল-ছড়াছড়ি আর ফুল-কাড়াকাড়ি,

অকালবসন্ত যেন এসেছে, এসেছে।
পরি' ফুলদাম, পাতি' ফুলশয্যা নরি
সাজিয়াছে রসময়ী নবীনা নাগরী
যেন এ নগরী! কলহাস্যে নেচে উঠে
তরুণ তরণী! ধায় চৌদিকে, কৌতুকে,
সুসজ্জিত লোকসঙ্ঘ পঙ্গপাল সম!
কেন না বলিবে আজি সুখস্বপ্ন মম?
আজ্ঞা দাও, আজ্ঞা দাও, আনিতে ত্বরিত
মহারাজ! রাজহর্ম্ম্যে আছে যে উজ্জ্বল
রত্নরাজি, নেত্রসুখ, নয়নকৌমুদী,
সুন্দরীর শুভ্রহাসি, শুভদৃষ্টি সম।
অবশ্য বলিবে আজি সুখস্বপ্ন মম।
কঞ্চুকীরে পাঠাইয়া, রত্নাগার খুলি'
আজ্ঞা দাও, আজ্ঞা দাও, আনিতে ত্বরিতে
নিরবধি রত্নের ঘটা, কাঞ্চনের ছটা,
কে না জানে নারীকুল, হায় এ জগতে,
ঝাঁপাইয়া পড়ে সেই উজ্জ্বল অনলে,
বাতুলস্য বিস্তারিষা, পতঙ্গের মত?
সুশুভ সংবাদ দেব। সুশুভ সংবাদ!
এ হেন কল্যাণবাণী শোননি জীবনে।
দাতৃশ্রেষ্ঠ! তাই আজি, আশাদৃপ্তা হয়ে,
আসিয়াছি, আসিয়াছি, কল্পতরুমূলে।
রাজপ্রসাদের লোভে, ভয়লজ্জা ছাড়ি',
দুঃসাহসে বাঁধি' বুক, প্রগল্‌ভা কৈকেয়ী,
তাই আজি নিতে চায়, উৎফুল্লনোচনে,
তব শ্রীচরণে ভূপ, সাষ্টাঙ্গে প্রণমি',
সাত রাজন্যের ধন এ সংবাদমণি।
এ জ্যোৎস্না-পরশে তব পরাণ-কুমুদী
ফুল্ল হ'বে, সাধা তুমি হইবে আহ্লাদে।
মুক্তহস্তে দাও তবে, দাও তবে আজি,
শত মুক্তাবলী আর শত রত্নাবলী
এ দাসীরে! হে রাজেন্দ্র, দাও দাও আজি,
রত্ন-মালঞ্চের তব ফুল্ল যুল-সাজি!
আরক্ত অশোক জিনি' লাল পদ্মরাগ
(অলক্তের রাগ যেন কৌশল্যা-চরণে!)
ইন্দ্রনীল কাদিনীলোহাগ! ইন্দুলেখা-
উদ্গারিণী চন্দ্রকান্ত মণি। গজমুক্তা
(হে রসিক, সুমিত্রার দন্তপাঁতি সম
কি উজ্জ্বল। লাবণ্যেতে সদা ঢল ঢল)
দাও দাও স্বর্ণ-থালে আনি'। আন, ভান,
নাগিনী-কুন্তল-শোভা অপূর্ব্ব মাণিক।
উষাহাসি জিনি' আহা অনুপম হীরা
(পাতিয়াছি দুই হস্ত) দাও শীঘ্র করি!
বসন্ত-উৎসব-দিনে হে চারু নাগর,
কৌশল্যার কণ্ঠকণ্ঠে দিতে যাহা হাসি,'
আন সেই স্বর্ণহার, সাজাবে যতনে
নাগদম্পে। রত্নচেলী, কাঞ্চন কঙ্কণ,
সিঁথি, কাঞ্চী সম্মোহন, অরবিন্দ-ছটা।
হে সম্রাট, তোমার ও বিরাট ঐশ্বর্য—
কি ভয়? কভু কি ক্ষয় হয় ও ভাণ্ডার?
পারিজাত, নাগেশ্বর, শ্রীহরিচন্দন,
(মদন-উৎসব-কথা পড়ে কি হে মনে?)
দেবপুষ্প সুমন্দার—অমৃত-ফোয়ারা,
খুলি' দাও! অবগাহি আকর্ণ ডুবিয়া।
কি কহিব? হে বল্লভ, পাদপদ্ম তব
সত্যই ভেটিব আজি অপূর্ব্ব সংবাদে!
আইবুড়া-কানে যথা বিবাহের কথা,
ঢালি' দিব কর্ণে তব সঞ্জীবনী সুধা!
পাইবে নব যৌবন, ঘুচে যাবে জরা।
শুনিবে? শুনিতে চাহ অমৃত-বারতা?
গোন তবে মন দিয়া শ্রবণললাম
এ সংগীত,—ইন্দ্রালয়ে উর্ব্বশীর গীতি!
ছাড়ি' এ ধর্ম্মের পুরী হে অযোধ্যাপতি,
কক্ষ জটা, হস্তে শূল, গেরুয়া বসন,
ভালে লতাটিকা, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা,
দিবস নিশ্বাস ফেলি' তব রাজপথে,
হেসায় হইয়ে পার, সরযূ, নর্ম্মদা,
লীলায় করিয়া ভেদ ঘোর বিন্ধ্যাটবী,

দূর পঞ্চবটী বনে, নিবিড় কান্তারে,
কৈকেয়ী, ভৈরবীবেশে, যাবে চলি' আজি!
ধর্ম্মরাজ! এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠে
আকাশে; অধর্ম্ম করে পাপাচার যদি,
করে তাহা অন্ধকারে, দুর গৃহকোণে।
লজ্জায়, মুকুল পরি', দুটি চক্ষু বুজি';
তুমি আজি হে নরেন্দ্র, কেমনে অবাধে,
দিয়ে জলাঞ্জলি তব কুলশীলমানে,
দিবাভাগে, তপনের তীব্র স্ফুটালোকে,
পূর্ব্বে সত্য পাশরিলে, ধর্ম্মে বিসর্জ্জিলে?
হে সূর্য্যের বংশধর কোন্ মতিভ্রমে,
সূর্য্যের সুমুখে দিলা ছাই ভস্ম ধূলা?
কেমনে, ভরত লঙ্ঘি' রামচন্দ্রে আজি,
দিবে তুচ্ছ যৌবরাজ্য, হা ধিক্ নৃমণি!
মাথার রহিতে চাও কলঙ্ক-পশরা?
কিন্তু আমি বৃথা কেন করি এ রোদন
অরণ্যে? অমিতবল সর্ব্বশক্তিমান্
তুমি, শত অশ্বমেধ যজ্ঞে, হে রাজেন্দ্র,
বলীয়ান্ তুমি!—ভীম গঙ্গার প্রবাহে
হা লজ্জা! বোধিবে কিসে ক্ষুদ্র ইন্দ্রকরী!
আমার কি সাধ্য দিব ধর্ম্ম-উপদেশ
তোমায়? ধার্ম্মিক তুমি। কে জ্বালে প্রদীপ
দিবসে? কে বর দেয় বরদা চণ্ডীরে?
শিখাইয়া দিব আজি আমার ভরতে—
(আহা বাছা চিরদুঃখী) চাঁচর চিকুর
মুড়াইয়া, মৃগচর্ম্ম পরি', ক্ষীণহস্তে
কমণ্ডলু ধরি', ভস্ম মাখি' সর্ব্ব অঙ্গে,
সাজিবে সে আহা মরি নবীন সন্ন্যাসী।
হে রাজন্ আমার এ পাষাণ-পরাণ,
পুত্রবরে ক্রোড়ে করি, মন্ত্র দিয়া কানে
কহিব, 'যাও রে বাছা যমুনার ধারে,
বালক ভরের মত, দুটি হস্ত জুড়ি',
ডাক রে কাতরে সেই রাজরাজেশ্বরে
অন্তর অন্তরে,—বাছা রে অযোধ্যারাজ্য
কি ছার! পাইবি তুই অনন্ত সাম্রাজ্য।'
হে রাজর্ষি! জন্ম মম নহে নীচকুলে;
রাজার ঝিয়ারী আমি রাজপুত্রবধূ!
ভুবনবিখ্যাত রঘুবংশ-অবতংস
অধিনীর স্বামী! গালি দাও, কর ঘৃণা,
বক্ষে কর পদাঘাত হে স্বামিন্, তবু,
কৌস্তুভ-রতন সম বুকে লব পাতি'।
পতি ধ্যান, পতি জ্ঞান, আশৈশব আমি
শিখিয়াছি এই মন্ত্র—'পতিই দেবতা!'
নলিনীর কমকান্তি পোড়ায় অনলে
তপন, সে রবি পানে তবুও নলিনী
একদৃষ্টে চেয়ে থাকে পতিগতপ্রাণা।
হে নরেন্দ্র, ঘোর বনে, তপস্যার হেতু
পশিয়া, পূজিব যবে চণ্ডিকা দেবীরে,
হে স্বামী, করিব আগে কল্যাণ-কামনা
তোমার, মাগিব বর,—'দাও প্রাণনাথে
চির আয়ু, রসময় সুচির যৌবন।'
ইষ্টদেবতারে, দেব, সাষ্টাঙ্গে প্রণমি'
মাগিব কৌশল্যা লাগি' অনন্ত যৌবন,
আয়ত কমল-আঁখি, ফুল-শরে ভরা,
বিম্বাধরে হাসিরাশি, পীন পয়োধরে
কি লাবণ্য! সেই ললিত কঠিন স্পর্শে
হর্ষে টুটি' খসি' যাবে মুকুতার মালা!
বুকে দাগা দিলে তুমি, তবু নরমণি,
মুক্তকণ্ঠে তব যশ গাইব চৌদিকে।
গঙ্গাষ্টক, শিবস্তব, বিষ্ণুনামমালা
গায় যথা ভক্তগণ, তব গুণাবলী
বিরচি' হে গুণিশ্রেষ্ঠ, জলধিগর্জ্জনে
উচ্চারিব, গঙ্গোত্রীর প্রপাতের মত
নিনাদিয়া: শুনাইব বিশ্ব চরাচরে।
দুটি ঋষিবালিকারে কাছে ডাকি' আনি'
একেরে শিখায়ে দিব অপরে শুধাতে,
'ভূমণ্ডলে ধর্ম্মপ্রাণ কোন নরপতি?'
অপরা উত্তর দিবে আমার ইঙ্গিতে—

'অযোধ্যার পতি, আহা অযোধ্যার পতি।'
শিখাব বালকবৃন্দে এ ধর্ম্মকাহিনী।
পাঠশালে গুরু যবে শুধাবে বালকে—
'ভূমণ্ডলে ধর্ম্মপ্রাণ কোন নরপতি?'
বালক উত্তর দিবে গম্ভীরবদনে,—
'অযোধ্যার পতি, দেব, অযোধ্যার পতি!'
নিরাশ, সজলনেত্রে, পাটল অধরে,
হস্ত বাঁধি' মহাকষ্টে মরমের স্থলে
কহিবে, 'কোথায় গেলে এ জ্বালা জুড়াবে?
জগতে দীনের বন্ধু কোন মহামতি?'
আমি আশ্বাসিব তারে মধুর বচনে,
'অযোধ্যার পতি, আহা, অযোধ্যার পতি!'
হরিদ্বারে, হৃষীকেশে, কাশীতে, পুষ্করে,
নৈমিষ-অরণ্যে ধ্রুব বদরিকাশ্রমে,
ঋষিমণ্ডলীর মাঝে উঠিবে এ প্রশ্ন,—
'ভূমণ্ডলে ধর্ম্মপ্রাণ কোন মহামতি?'
আমি দিব সদুত্তর, ত্রিশূল ঘুরায়ে,
'অযোধ্যার পতি, দেব, অযোধ্যার পতি!'
বাসবে সধবাবৃন্দ, করি' হুড়াহুড়ি,
সুধাইবে কূট প্রশ্ন সুসজ্জিত বরে,—
'এই বিশ্বে অতুলন কোন নরপতি?'
বর হবে সন্দিহান তাকাবে চৌদিকে!
কঙ্কণ-আঘাতে বরে চেতায়ে কৌতুকে,
রঙ্গিনীরা হাসি কবে, 'শোন মূঢ়মতি,
অযোধ্যার পতি, আহা, অযোধ্যার পতি!'
কৈলাসশিখরে গিরা হেরিব আহ্লাদে
হরগৌরী; রক্তজবা বিল্বদল দিয়া,
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি' দোঁহে, বৃষভের গলে
কৌতুকে দোলায়ে দিব অতসীর মালা!
সুহাসিনী সুধাবেন, 'বল লো যোগিনী,
বিশ্বমাঝে অতুলন কোন্ নরপতি?'
আমি উত্তরিব, 'মাগো কি না জান তুমি?
অযোধ্যার পতি, আহা, অযোধ্যার পতি!'
শুনি' কথা, মহাহর্ষে ভূতপ্রেতদল,
এই কথা বারবার, নাচিয়া নাচিয়া,
গাহিবে, কন্দুক সম কথা-লোফালুফি
করিবে,—কহিবে, 'বিশ্বে অতুল্য ভূপতি
অযোধ্যার পতি, আহা, অযোধ্যার পতি?'
আছে ধর্ম্ম; হে রাজর্ষি, চিরকাল কিবা
রহে কি? প্রদোষে আসে ঘোরা তমস্বিনী?
কৌশলে চালায় বধ কাল মহাবধী,
রণের ঘর্ঘর-শব্দ শুনিছ না কানে?
কি আশ্চর্য্য! হে কুহকী, নিম্ববৃক্ষ রোপি,
চাহ তুমি তাহা হতে চন্দনসৌরভ
ধূপ গুগ্‌গুলের গন্ধ? দেখিব কৌতুকে,
কবে কোন্ কালে তরু ধরে নিজ ভালে,
রসাল পিয়াল, ঢালে অমৃতের ধারা?

* * *

হে রাজেন্দ্র, রাজ্যপাট ছিল নিবেদিতে
যা' যা' কথা, সব কথা নিবেদি সভয়ে,
খুলি' অঙ্গ-আভরণ, এই অবসরে
ডাকি' নর্ম্মসখীবৃন্দে করিনু গোপনে;—
'আর কেন? লো মন্থরা, রাজা তবে আজি
যোগিনী!—নয়নে তোর কেন অশ্রুবারি?
হেন অমঙ্গল কেন ফসিল ভামিনী
এ উৎসবে? কৈকেয়ীর সুপ্রভাত আজি!
টুটি' যাবে চিরতরে মাথার বন্ধন
কৈকেয়ীর! দেখ্ দেখ্ সখী সুলোচনা,
কেমন সেজেছে এই গেরুয়া বসন
অঙ্গে মোর। ছি ছি! বোন্, এই অলক্ষণ
কেন তোর? পরাইতে রুদ্রাক্ষের মালা,
দুটি তপ্ত অশ্রুবিন্দু ফেলিলি লো আসি,
বাম হস্তে। সখী, ভেদিয়া পাষাণপ্রাণ,
আমারও বহিছে, হের, নয়নের বারি!
কি বলিলি; 'থাক্ দুটি শাখার কঙ্কণ
দুটি হস্তে!'—ভিখারীরে সাজাবি সুন্দরী?
এ দুঃখেও হাসি আসে শুনি' তোর কথা!
চলিনু—চলিনু তবে বিজন বিপিনে

একাকিনী। কোথা তুই অয়ি নিস্তারিণী?
রাজকন্যা ভিখারিণী, আত্মদুঃখিনী।
আঁধার আঁধার বিশ্ব। দু নয়ন আঁধা;
প'ড়ে মরি, প'ড়ে মরি আমি। কি গর্জ্জন।
সংসার-জলধি, বিস্তারিয়া শত হস্ত,
গ্রাসিবারে চাহে এলোকেশী। রক্ষ মা গো।
এ বিপদে, তনয়ারে তার ত্রিনয়নী।
মিটেছে মিটেছে সাধ। এই রসাস্বাদে
শুধু পরমাদ মাখা, শুধু অবসাদ।
আমার বক্ষের মাঝে, প্রাণপক্ষী দুঃখী
ত্রাহি ত্রাহি কবে নিস্তারিণী! এ শৃঙ্খল
খুলি' দাও, কাটি' দাও মায়ার বন্ধন।
যাক চলি' এ বিহগী বনস্থলী মাঝে,—
মাগো? তোর ও চরণ আনন্দ-কাননে,—
যথা সদা নিত্যানন্দ, কোকিলকূজন,
চিরবসন্তের রাজ্য, নির্ঝর উছলে,
শত ফুল ইন্দ্রধনু রাজে ফুলে ফুলে।
গাব শ্যামা, ধাব অলি গুঞ্জরি' গুঞ্জরি'!

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। আশ্বিন। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "শারদ-প্রভাতে" সহজ সুন্দর ক্ষুদ্র কবিতা, ধারাধৌত মৃণ্ময়ীর ন্যায় সুরভি ও নির্ম্মল। রচনাটি স্বদেশবিরহীর বেদনায় ও করুণায় অনুপ্রাণিত, কিন্তু সে বেদনায় বিষাদ নাই, সে করুণায় অশ্রু নাই। শারদসমাগমে প্রবাসী কবির উদাসী চিত্তে মাতৃভূমির যে সোনার্দ্রস্মৃতি জাগিয়াছে, তাঁহার কবিতা মুকুরে তাহাই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। সহৃদয় কবির আন্তরিকতায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। স্বর্গীয় মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের অপ্রকাশিত রচনায় বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রের "উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" এখনও চলিতেছে। উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকে এত বর্ণাশুদ্ধি অসহ্য। ২৯৬ পৃষ্ঠায়, "স্তোতব্যং শ্বেতগিরিমিবা-পরম্" এই চরণে ছন্দঃপতন হইয়াছে। "শিবালয়ং শূলাবচিত্রচূড়ম্" প্রভৃতিরও অভাব নাই। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুর "অভিনব বিবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব" বিবিধ তথ্যে পূর্ণ ও সুখপাঠ্য। কিন্তু ভাষার প্রশংসা করিতে পারিলাম না। এক স্থলে লেখক বলিতেছেন, "আলোক-চিকিৎসা প্রণালী এখনও সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই, কিন্তু ফিন্‌সেনের হস্তে এই প্রণালীর যথেষ্ট উন্নতির আশা করা যাইতেছে।" কিন্তু হায়, লেখকের এ আশা পূর্ণ হইবার নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে অধ্যাপক ফিন্‌সেন লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি এখন যে লোকে, সেখানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বন্দোবস্ত নাই। সুতরাং "ফিন্‌সেনের হস্তে উন্নতির আশা" লুপ্ত। "নিশার স্বপন সম তব এ বারতা হে দূত!" ইত্যাদি—[মাইকেল; ঈষৎ-পরিবর্ত্তিত।] কিন্তু ডেনমার্ক বঙ্গ নয়, সেখানে অনুষ্ঠাতার সঙ্গে সঙ্গে

+ সাহিত্যে কবিবর শ্রীযুক্তদেবেন্দ্রনাথ সেনের "অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা" ধারাবাহিক ক্রমে প্রকাশিত হইবে। পূর্ব্বে কবির "অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা" সম্বন্ধে আমরা যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম, "অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা"র সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। যদিও এই অভিনব কাব্যখানি অমর মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের পদানুসরণে লিখিত, তথাপি ইহাতে অনুকরণের গন্ধ নাই। মূলকাব্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, সহৃদয় পাঠক স্বীকার করিবেন যে, অভিনব কাব্যখানি সুন্দর, সরল ও মৌলিকতাপূর্ণ। আমিত্রাক্ষর রচনাতেও কবি সিদ্ধহস্ত।—সাহিত্য-সম্পাদক।

অনুষ্ঠানের মৃত্যুশঙ্কা নাই। বৈজ্ঞানিক-সম্প্রদায় ফিন্‌সেনের আবিষ্কারের মূলসূত্র ধরিয়া ক্রমে সত্যের মন্দিরে উপনীত হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "মাতৃহীনা" নামক ক্ষুদ্র গল্পটি করুণরসে অভিষিক্ত। মাতৃহীনা তারার দুঃখে হৃদয় অভিভূত হয়, অশ্রু সংবরণ করা যায় না। আমরা বহুদিন এমন করুণ-কাহিনী পাঠ করি নাই। চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক দীনেন্দ্রবাবু আপনাকেও অতিক্রম করিয়াছেন। মাতৃস্নেহবঞ্চিতা দুর্ভাগ্যা তারার চিত্র-রচনায় দীনেন্দ্র বাবু যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন; সে ছবি দেখিলে সঞ্জীববাবুকে মনে পড়ে। সঞ্জীববাবুর শিশু-চিত্র র‍্যাফেলের 'এঞ্জেলে'র মত চিরসুন্দর, অনুকরণের অতীত। হায়! বাঙ্গলা সাহিত্যে সে তুলির আর উত্তরাধিকারী নাই। "মাজুকা" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের অঙ্কিত একটি সুন্দর গল্প। ডিমিশা রুস সৈন্য। জাপানীরা তাহাকে বন্দী করিয়াছিল। ফিরোশী জাপানী মেয়ে; সে ডিমিশার যত্নের ভার পাইয়াছিল। এই পর্য্যন্ত গল্প। তাহার পর উপকথা। বিদেশী ছুটী পাইয়া গৃহে চলিল;—ডিমিশাকেও সঙ্গে লইয়া গেল। তাহাদের গ্রামে মাজুকা নাম্নী এক বিধবা ছিল। ফিরোশী মাজুকাকে ভালবাসিত, কিন্তু মাজুকা বিবাহ চাহিত না। ডিমিশার সহিত বিধবার পরিচয় হইল। উপসংহারে সে জাপানী রমনকে উপেক্ষা করিয়া যুবা রুসকেই পতিত্বে বরণ করিল। মাজুকার কাণ্ড দেখিয়া মোপাসাঁর চিত্রিত একটি গণিকাকে মনে পড়ে। ফ্রাঙ্কো-জর্ম্মন্ যুদ্ধের সময় এক দল ফরাসী নাগরিক—তন্মধ্যে দুই তিন জন সস্ত্রীক—প্রুসীয় সৈন্যের আক্রমণ-শঙ্কায় 'ওম্‌নিবস্' যানে অন্য নগরে পলায়ন করিতেছিল। একটি গণিকাও সেই ওম্‌নিবসের যাত্রী ছিল। বেহার সাহচর্য্যে সঙ্কুচিত যাত্রীরা মনের সাধে ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছিল। তাহারা মধ্যপথে একটি গ্রামে উপনীত হইয়া দেখিল,—ইতিপূর্ব্বেই গ্রামটি প্রুসীয় সৈন্যের অধিকৃত হইয়াছে। ওম্‌নিবসের যাত্রীরা গ্রাম্য পান্থশালায় আশ্রয় লইলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রুসীয় সেনাপতি গণিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। গণিকা সাক্ষাৎ করিতে গেল, এবং ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়া আসিল। সেনাপতির সহিত তাহার কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সে কাহাকেও তাহা বলিল না। প্রভাতে আবার গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিবার কথা। কিন্তু ওম্‌নিবসের চালক জানাইল, 'সেনাপতির নিষেধ, যাইবার অনুমতি নাই।' সকলে বিস্মিত হইল। সন্ধ্যার সময় পান্থশালার অধিকারী জিজ্ঞাসা করিল, 'এলিজাবেথ রুসে কি মতপরিবর্ত্তন করিয়াছেন?' গণিকা দৃঢ়স্বরে বলিল, 'না।' সে রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন প্রভাতেও যাত্রীরা জানিল,—যাত্রা করিবার অনুমতি নাই। সে দিন সন্ধ্যার সময় পান্থশালার অধ্যক্ষ আবার জিজ্ঞাসিল,—'এলিজাবেথ রুসে কি মতপরিবর্ত্তন করিয়াছেন? রুসে আবার বলিল, 'না।' পর দিন সন্ধ্যার সময় আবার এই প্রশ্ন;—উত্তরে এলিজাবেথ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিল, 'Never, Never, Never.' যাত্রীরা জানিতে চাহিল,—ব্যাপার কি? এলিজাবেথ কিছুতেই বলিতে চাহে না,—অবশেষে নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া বলিল,"পাজী আমাকে চায়—আমি কিছুতেই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইব না।'—গণিকার দৃঢ়তায় যাত্রীদের আনন্দের সীমা রহিল না। সাধুবাদের বৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু যখন বুঝা গেল, সেনাপতির দুর্ভেদ্য পণ, গণিকা তাহার প্রস্তাবে সম্মত না হইলে আর মুক্তির উপায় নাই—তখন সকলের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। নানা ছলে কলে কৌশলে তাহাকে সেনাপতির অঙ্কশায়িনী করিয়া যাত্রীর দল মুক্তিলাভ করিল। এলিজাবেথ যখন দেশের শত্রুর স্পর্শে কলুষিত ও জীবন্মৃত হইয়া গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিল, তখন তাহার কি বোধ, কি ক্ষোভ, কি লজ্জা!—নগেন বাবুর মাজুকা এই গণিকার পদধূলির যোগ্য নহে। তবে মোপাসাঁ স্বাধীনতার পুণ্যতীর্থ ফ্রান্সের বরপুত্র, নগেন্দ্রবাবু পরশত-বর্ষব্যাপী 'পরজাবে' পীড়িত বাঙ্গালীর ঔপন্যাসিক। শাস্ত্রকার সত্যই বলিয়াছেন,—"প্রকৃতিরেষাং ভূতানাং।"

উদ্বোধন।—আশ্বিন; ১ম ও ২য় সংখ্যা। শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ কাঞ্জিলালের "সৃষ্টিতত্ত্ব" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত স্বামী অখণ্ডানন্দের "তিব্বতে তিন বৎসর" যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনই শিক্ষাপ্রদ। বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ ভ্রমণবৃত্তান্ত অত্যন্ত বিরল। শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার

"ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার" প্রবন্ধে স্বর্গীয় কর্ম্মবীরের জীবনের ও হৃদয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা উপকৃত হইয়াছি। "বৈজ্ঞানিক প্রমাণপ্রয়োগে সত্যনির্ব্বাচন করিতে যাইয়া তাঁহার (ডাক্তার সরকারের) হৃদয় শুষ্ক না হইয়া বরং তাঁহার স্বাভাবিক ভক্তিপ্রবণতা, সরলতা, ও ঈশ্বরবিশ্বাস শতগুণে বৃদ্ধিই পাইয়াছিল", আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বাঙ্গলা ভাষায় পারমার্থিক গান রচনা করিতেন, ইহা সাধারণের পক্ষে নূতন সংবাদ। আমরা সরসীবাবুর প্রবন্ধ হইতে একটি গান উদ্ধৃত করিলাম।

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

"দেখ দেখ চেয়ে দেখ গগনমণ্ডলে।
কি শোভা করেছে সেণা গ্রহতারাদলে॥
(যেন) প্রকৃতি সাজায়ে রেখেছে জ্যোতির্ম্ময় পুষ্পদলে।
দিতে পুষ্পাঞ্জলি বিধাতার চরণকমলে॥
দূরবিন সহকারে বিজ্ঞানের বলে।
(দেখ অদ্ভুত রূপ তাদের জ্ঞানচক্ষু মেলে'॥
দেখিবে তবে এই অসীম বিশ্বরাজ্য।
চালাইছেন বিশ্বনাথ কি কৌশলে॥
ছাড়ায়ে ধূলি এক মুষ্টি, তিনি করিয়াছেন সৃষ্টি,
অগণ্য নিখিল ব্রহ্মাণ্ড, ধূলাখেলার ছলে॥
সঙ্কর ও মহাপ্রলয় করিতে নিবারণ,
বন্ধন করেছেন তাদের নিয়ম-শৃঙ্খলে,
নিয়মপালনে তারা ভ্রমিতেছে অনুক্ষণ,
অপার মহিমা তাঁর গাইতেছে সবে মিলে॥"

বিবিধ।

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার পুঁটিয়ার প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী শরৎসুন্দরীর জীবনচরিত লিখিতেছেন। শ্রীশবাবু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। রচনাও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। রাণী শরৎসুন্দরী সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু জানেন, তাঁহারা শ্রীশবাবুকে সাহায্য করিলে, জীবনচরিতখানি যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হইতে পারে।

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ রবীন্দ্র বাবুর "চোখের বালি" নাটকাকারে পরিণত করিয়াছেন। ক্লাসিক থিয়েটারে শীঘ্রই "চোখের বালি" অভিনীত হইবে। রঙ্গমঞ্চে বিনোদিনীর বাহার দেখিবার জন্য অনেক উৎসুক ছিলেন; তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল। কিন্তু "চোখের বালি"র নাটকত্ব কোথায়, বলিতে পারি না। তবে নাটকের ভিরতর্পণ-ধৃত ব্যুৎপত্তি এই,—ন নাস্তি আটকো যস্মিন্,—যাহাতে কিছুই আটক নাই।

লক্ষ্ণৌ নাগরী-প্রচারিণী সভা হইতে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের ভারতীয় ইতিহাসের হিন্দী অনুবাদ প্রচারিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। দত্তমহাশয়ের ইতিহাসে ভ্রমপ্রমাদ আছে, এই অজুহাতে, সভার কতিপয় সভ্য তাহাতে আপত্তি করেন। অবশেষে স্থির হইয়াছে, ইতিহাসের অনুবাদ নাগরী প্রচারিণী সভা আর দত্ত-কৃত প্রচার করিবেন না। কিন্তু সভার সম্পাদক স্বয়ং উক্ত ইতিহাসের অনুবাদ হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত করিতেছেন। দত্ত মহাশয়ের অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ইংরেজ লেখকগণের চর্ব্বিতচর্ব্বণ। সেগুলি সংশোধনের যোগ্য ও সর্ব্বথা পরিহার্য্য।

শুনিতেছি, আচার্য্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত "উপাসনা" প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এখনও সাক্ষাৎ পাই নাই।

ফির্‌দউসি ও হোমর্‌।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন মহাত্মা ফির্‌দউসির নাম শুনি, তখন স্বপ্নেও জানিতাম না যে, জীবনের ঘটনাচক্রে ভারতবর্ষের মুসলমানসমাজের কেন্দ্রস্থল হায়দ্রাবাদ প্রবাসে আমার জীবন অতিবাহিত হইবে, এবং খাঁটি পারস্যদেশবাসী মৌলবীর সংসর্গে, পারস্যভাষার অনুশীলনে, প্রায় প্রত্যহ আমার অবকাশকাল কাটিবে। পনর বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথমে পারস্যভাষায় স্বর্গীয় কবি ফির্‌দউসির শাহ্‌নামাহ্‌ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম, তখনও মনে উদয় হয় নাই যে, একদিন উহার দুই একটি উপমা, মাতৃভাষায় সাজাইয়া, মহাত্মা ফির্‌দউসিকে স্বদেশী বন্ধুবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিব।

অতি দুঃখের বিষয় যে, ফির্‌দউসি বঙ্গদেশীয় পাঠকের সুপরিচিত নহেন। পরিচিত হইলে, আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বলকারী প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়, "মেঘনাদবধ" পাঠ করিয়া কবিবর মধুসূদন সম্বন্ধে যখন লিখিয়াছিলেন :—"Second only to the highest and greatest that ever lived, like Vyas, Valmiki or Kalidas; Homer, Dante or Shakespeare;" কেন ফির্‌দউসিকে ভুলিয়া গেলেন? প্রায় সকল যুগের সকল দেশের শ্রেষ্ঠ কবিদের নাম করিলেন; কিন্তু হায়! ব্যাস, বাল্মীকি ও হোমরের সমকক্ষ, চিরস্মরণীয়, আমাদের প্রতিবাসী পারস্য কবি, যাঁহাকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যজগৎ পূজা করে, তাঁহাকে ভুলিয়া গেলেন!

শাহনামা একখানি সুবিশাল গ্রন্থ, সুতরাং এই সামান্য প্রবন্ধে, তাহার দুই একটি পরমাণু ভিন্ন অধিক স্পর্শ করা দুঃসাধ্য। Sir William Jones বলেন যে, ইতালীয় ভাষা সকল ভাষা অপেক্ষা শ্রুতিমধুর বলিয়া তাঁহার প্রথমে ধারণা ছিল। কিন্তু পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিয়া দেখিলেন যে, উহা মধুরতায় ইতালীয় ভাষাকেও পরাজিত করে। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন :—"Persian sonnets are capable of being set to music as any air in Mestachio", এবং শাহনামা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "From the majesty of its style, and the harmony of its numbers, may be justly styled, a Divine Poem." যদি বাস্তবিকই Divine Poem, তবে সকল দেশে ইহার চর্চ্চা নাই কেন? পারস্যভাষার অধিক চর্চ্চা না হইবার, Sir William Jones বলেন, একটি

কারণ এই যে, যাঁহাদের হস্তে শিক্ষার ব্যবস্থা, তাঁহারা নিজে বাস্তবিকই সুশিক্ষিত নহেন; "Men of learning have no taste, and men of taste have no learning." তাহা না হইলে আজি ইংলণ্ড কেন উমর খ্‌ইয়ামকে (Umar Khayyam) লইয়া পাগল? পারস্য কবি হিসাবে উমর খ্‌ইয়ামের স্থান ফি্‌রদউসির অনেক নিম্নে, মায়াবাদেও হাফি্‌জ্‌ (Hafiz) ও মৌলানা রুম্‌ (Maulana Rum) অপেক্ষা নিম্নে, কিন্তু ইঁহাদের আদর নাই কেন? Fitzgeraldএর কৃপায় আজি ইংরাজ পারস্যের তৃতীয় শ্রেণীর কবিকে লইয়া মাতিয়াছেন। হায় ফি্‌রদউসি! হায় হাফি্‌জ্‌! হায় অদৃষ্টের পরিহাস!

পারস্যভাষা অনেক কাব্যরত্নে পরিপূর্ণ, এবং ইহার একটি বিশেষ গৌরবের বিষয় এই যে, পৃথিবীর চারিটি মহাকাব্যের (epic) মধ্যে একটি ইহাতে রচিত হইয়াছে। হিন্দুর রামায়ণ ও মহাভারত, গ্রীকের ইলিয়ড (Illiad) ও মুসলমানের শাহনামা ভিন্ন জগতে আর অন্য epic নাই।

যদিও রুদকি (Rudaki) হইতে পারস্য ছন্দের আরম্ভ, কিন্তু ফি্‌রদউসিকে পারস্য কাব্যের জন্মদাতা বলিতেই হইবে। সুল্‌তান্‌ মহ্‌মুদ গ্‌জ্‌নির শাসনকালে খৃঃ ৯৫০ সনে মশহদের (Meshed) নিকটবর্ত্তী তুস্‌ গ্রামে ফি্‌রদউসির জন্ম হয়। ফি্‌রদউসির আসল নাম কি, তাহা লইয়া অনেক গোলমাল। অনেকের মতে, তাঁহার পিতৃদত্ত নাম অবুল কাসিম্‌ (Abúl Qásim)। কিন্তু প্রসিদ্ধ লেখক দৌলত্‌ শাহ্‌ বলেন যে, ফি্‌রদউসির আদি নাম হসন্‌। যাহাই হউক, মহ্‌মুদ গ্‌জ্‌নি-দত্ত ফি্‌রদউসি (স্বর্গীয় কবি) নামে সাহিত্যজগতে পরিচিত।

ফি্‌রদউসিকে জীবনে অনেক ঝঞ্ঝাবাত সহিতে হইয়াছে; প্রাণভয়ে তাড়িত ও নিরন্ন হইয়া অনেক সময় কালযাপন করিতে হইয়াছে। সরস্বতীর সহিত লক্ষ্মীর কলহ সকল দেশেই আছে; সাহিত্যসেবকের দারিদ্র্যও চিরকালই প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা চিরকালই উদরান্নের জন্য পরমুখাপেক্ষী! এখন, প্রকাশক মহাশয়ের অনুগ্রহ না হইলে সাহিত্য-জীবীর সর্ব্বনাশ; সেকালে, মুরুব্বী না থাকিলে একপ্রকার উপবাস। তখন, সকল দেশেই, বড়লোকে মুরুব্বী হইয়া কবিদের প্রতিপালন করিতেন। আমাদের দেশে বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই এক একটি ক্ষুদ্র রাজা বা জমীদারের আশ্রয়ে জীবনযাপন করিয়াছিলেন। মহাকবি ফি্‌রদউসি, স্বয়ং সম্রাট মহ্‌মুদকে মুরুব্বী ধরিয়াছিলেন, কিন্তু অদৃষ্টচক্রের নিদারুণ আবর্ত্তনে তাঁহার সকল যত্ন বিফল হইল, এবং ললাট-লিপি ফলিল; রাজ-দত্ত স্বর্ণমুদ্রা ফি্‌রদউসির মৃত্যুর পরে তাঁহার বাটীতে পঁহুছিল! সুতরাং বৃথা বাহুল্য

যে, তাঁহাকে চিরদিনই দরিদ্রতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই মনীষীর পক্ষে বলা যাব না যে, দারিদ্র্যদোষ গুণরাশিনাশী। বাস্তবিকই, বিলাসের সুকোমল অঙ্ক অপেক্ষা দারিদ্র্যের ভীষণ সংঘর্ষণে মানসিক বৃত্তির অধিকতর উৎকর্ষ সাধিত হয়।

কবির শেষদশা, Wordsworthএর মতে,—

"We poets in our youth begin in gladness,
But thereof come in the end depressing madness."

সকলের পক্ষে madness না হউক, অনেকের পক্ষে, দারিদ্র্য বটে। অবশ্য Byron ও shellyর মত যাঁহারা ধনিবংশোদ্ভব, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমাদের কবিকুলচূড়ামণি মধুসূদন দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করিবার কিছু পূর্ব্বে কমলাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"ভেবেছিনু মোর ভাগ্যে, হে রমা সুন্দরী,
নিবাইবে সে রোষাগ্নি—লোকে যাহা বলে—
হ্রাসিতে বাণীর রূপ তবে মনে জলে।"

কবিবর হেমচন্দ্র মাইকেলের দুর্দ্দশায় কাতর হইয়া লিখিয়াছিলেন :—

"হায়, মা ভারতী, চিরদিন তোর,
কেন এ কুখ্যাতি ভবে।
যে জন সেবিবে, ও পদ-যুগল,
সেই সে দরিদ্র হবে?"

হায়, যখন হেমচন্দ্র ইহা লেখেন, তখন তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না, তাঁহার নিজের শেষদশা কি হইবে!

মহাকবি ফি.রদউসি মরিয়াও শনির হস্ত হইতে নিস্তার পান নাই! তাঁহাকে সমাধিস্থ করিবার সময়ে মহা গোলযোগ, শেখ্ অব্‌দুল্ কাদির কুরকনি মহাশয় তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্রপাঠে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, ফি.রদউসি শাহনামায় অনেক স্থলে পার্শীদিগের সুখ্যাতি করিয়াছেন ;—পার্শীরা অগ্নিকে পূজা করে, সুতরাং তিনি ফি.রদউসিকে প্রকৃত মুসলমান বলিতে প্রস্তুত নহেন! কিন্তু সেই রাত্রে শেখ্ সাহেব স্বপ্নে দেখিলেন যে, ফি.রদউসি স্বর্গে বসিয়া আছেন ; অনুসন্ধানে অবগত হইলেন যে, শাহনামায় একেশ্বরবাদী শ্লোক থাকায় তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে। সুতরাং শেখ্ মহাশয় পরদিন প্রফুল্লচিত্তে ফি.রদউসির কবরে যথারীতি মন্ত্রপাঠ করিয়া কবির শোকসন্তপ্ত আত্মীয়গণকে আপ্যায়িত করিলেন।

শাহনামা পারস্যদেশের প্রায় ৩৬০০ বৎসরের এক প্রকার ইতিহাস—ইহাতে ফিরদউসি খৃঃ ৬৩৬ সনের ঘটনাবলি পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে ষষ্টি সহস্র দ্বিপদী শ্লোক আছে। ইহা একখানি মহাকাব্য।

কাব্য কি? এ বিষয়ে পশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ পর্য্যন্ত সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই সত্য, কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে, কাব্যের উদ্দেশ্য মনুষ্য-সমাজের উন্নতি। Wordsworth কবির কথায় সত্যই বলিয়াছেন:—

"Type of the wise who soar, but never roam;
True to the kindred points of Heaven and Home."

যাঁহারা জগতের সৌন্দর্য্য প্রকৃতরূপে বুঝিয়া লেখনী দ্বারা প্রকাশ করিতে সমর্থ, তাঁহারাই যথার্থ কবি। অতুল্য রামায়ণ ও মহাভারত ব্যতীত সমুদয় আসিয়া খণ্ডে শাহনামার মত আর কাব্য নাই। আসিয়ার বাহিরে কেবল হোমর ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী। কি কল্পনায়, কি উপমায়, কি বর্ণনাকৌশলে, কি সঙ্গীতে, শাহনামা অতুল্য। সমগ্র মুসলমানজগতে শাহনামার আদর ভারতবর্ষে মহাভারত ও রামায়ণ অপেক্ষা কম নহে। মহাভারত ও রামায়ণের আদর অনেকটা ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া। কিন্তু শাহনামার আদর কেবল কাব্য হিসাবে। কারণ, শাহনামায় ইস্‌লামধর্ম্মের অপেক্ষা মহম্মদের জন্মের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী পৌত্তলিকদিগের কথাই অধিক। ফিরদউসির কাব্য-সাগর মন্থন করিলে সকল প্রকার রত্নই পাওয়া যায়। এক দিকে মধুরতায় কালিদাস, গভীরতায় ভবভূতি, কোমলতায় ভারতচন্দ্র,—অন্য দিকে Byron ও Popeএর দেখা পাইবেন। আমাদের ভারতচন্দ্র সুখের কবি, কবিকঙ্কণ দুঃখের কবি; কিন্তু ফিরদউসি উভয়-তারেই ঝঙ্কার দিয়া গিয়াছেন। সুখের সুরে Wordsworth অপেক্ষা কম নহেন, আবার দুঃখে Byronএর সমকক্ষ। Emerson বলেন, "All mankind love a lover."। ভালবাসা মানবের চির-সম্বল। শাহনামায় সকল প্রকার ভালবাসার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়; এক দিকে প্রিয়তমার রূপভোগলালসা, অন্য দিকে গুণে মোহিত হইয়া সংসর্গলিপ্সা, বা আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন। ফিরদউসির সসীমের বর্ণনায় যেমন চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাঁহার অসীমের আভাসেও সেইরূপ হৃদয় উদ্বেলিত হয়। তাঁহার প্রকৃতি-চিত্র কখন নগ্নমূর্ত্তি, আবার কখনও ধর্ম্মোন্মত্ত—দেবভাব বা আসুরিক ভাব যেখানে যেটি আবশ্যক, যথাযথ চিত্রাঙ্কনে জগৎকে মোহিত করিয়াছেন। মিল্‌টনের (Paradise Lost) ঈভের চিত্র অপেক্ষা উত্তম প্রেমের মোহিনী প্রতিমা যদি দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে পারস্য ভাষায় শাহনামা পাঠ করুন। প্রেমচিত্রে স্বর্গ মর্ত্ত্য

প্রভেদ দেখিতে পাইবেন। ফি.রদউসির নায়িকার—উল্লাসিনী বা উন্মাদিনী, সংসারিণী বা সর্ব্বত্যাগিনী, আদরিণী বা বিরহিণী,—সমতুল্য অন্য সাহিত্যে পাওয়া দুষ্কর। নারী যে ভগবানের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ, এবং বিশ্বকাব্যের অপূর্ব্ব ভাষ্য, তাহা ফি.রদউসি বেশ দেখাইয়াছেন। ফি.রদউসি রুস্তমের স্ত্রী তহ্মিনাকে আদর্শ নারীতরুললনার সরলতা, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, লজ্জাশীলতা, সতীত্ব ও পাতিব্রত্য প্রভৃতি নানা গুণে ভূষিত করিয়া দেবোপমা করিয়াছেন। ফি.রদউসির উদ্দীপনায় অলস উচ্ছ্বাস নাই। তাঁহার উদ্দীপনা গম্ভীর মৃদঙ্গের ধ্বনিত ধ্বনি। ভাষার কুসুম ও ভাবের সুষমা সৌরভের জন্য শাহনামার এত আদর। কখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি সামান্য কথা ও সামান্য ভাব, ফি.রদউসির শব্দবিন্যাসগুণে মধুরতা লাভ করিয়াছে।

তহ্মিনা তুরাণের রাজকুমারী; রুস্তমের বীরত্বের খ্যাতি শুনিয়া তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী। কিন্তু রুস্তমের সন্দেহ হয়। তাঁহার পবিত্র চিত্তে রুস্তমের তিরস্কার সহনাতীত হইলে, মধুরভাষিণী, বাষ্পাকুললোচনা তহ্মিনা, সবিদ্যুৎ-মেঘতুল্য চক্ষু রুস্তমের উপর স্থির করিয়া, ভুবনমোহন মুখে তাঁহার দগ্ধ হৃদয়ের তাপ সামান্য কথায় এইরূপে ব্যক্ত করিলেন;—

"কস্ অজ. পন্দাহ্ বিকণ নদীদহ্ মরা
নহ্ হবুগিজ্. কস্ অদা শনিদহ্ মরা"

ভাবার্থঃ—

কেহ ত দেখেনি মোরে, ওগো স্নেহময়!
শুনে নাই কথা কেহ, হোয়ো না নির্দ্দয়।"

তাঁহার নয়নবারি, সেই দুর্দ্দমনীয় রমণীহৃদয়ের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে সহায়তা করিল। প্রণয়-বিহ্বলা তহ্মিনা কুটিল কেশবিন্যাস করেন নাই, এবং তাঁহার বিশাল চক্ষুতে কটাক্ষের নামমাত্র ছিল না। তাঁহার সরল দৃষ্টিতে রুস্তম অলৌকিক মহিমা দেখিলেন, যেন সম্মুখে প্রকৃতির রাজ্ঞী। কথা শুনিয়া রুস্তম একেবারে মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত, তাঁহার বাঙ্নিষ্পত্তির ক্ষমতা লোপ পাইল ভালবাসা ঐন্দ্রজালিক। রুস্তম বুঝিলেন যে, তহ্মিনার প্রণয় যথার্থই পদ্মের ন্যায় বদ্ধমূল, তিনি কোন প্রকারে অবিশ্বাসিনী নহেন। রুস্তমের প্রাণ পবিত্র স্নেহরসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

সকল দেশেই তহ্মিনার মত নায়িকার আদর। Shakespeare এর Desdemona অনেকটা ঐ প্রকার:—

Othello :—

"She loved me for the dangers I had passed ;
And I loved her that she did pity them."

যা তা'কে সুন্দর করা দেখিলে Tennysonএর Mermaid মনে পড়ে :—

"Who would be
A mermaid fair,
Singing alone,
Combing her hair
Under the sea,
In a golden curl
With a comb of pearl,
On a throne ?"

আমাদের ভারতচন্দ্রও শব্দমন্ত্রের আচার্য্য। সহজ কথাকে তিনি সঙ্গীতের মত করিয়াছেন :—

"অদূরে মহাকদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অবে দক্ষ দে বে সভীরে॥"

বাস্তবিকই শাহনামা এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহাতে নাই কি ? বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির চিত্র, মায়াবাদ, (Mysticism) সকলেতেই ফি.রদউসির অতুল্য কবিত্ব দৃষ্ট হয়। যে কবিতায় কৃত্রিমতা আছে, তাহা কখনও স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে না। প্রতিবৎসর কত কবির (!) আবির্ভাব হয়, কিন্তু এক শতাব্দীর পরে কয় জন তাঁহাদিগকে মনে রাখে ? প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, যখন ইংলণ্ডের Baron ও Lord মহাশয়েরা নিজের নাম লিখিতেও জানিতেন না, এবং শান্তিপ্রিয় খৃষ্টের উপাসকগণ, নিত্যার্চ্চনা ভুলিয়া, ধর্ম্মযুদ্ধ (Crusade) সময় অতিবাহিত করিতেন, তখন অমর ফি.রদউসি শাহনামা লিখিয়াছেন; কিন্তু আজিও জগতে তাঁহার কত আদর! এখনও তাঁহাকে লক্ষ লক্ষ লোক দেবতার মত পূজা করিতেছে। শাহনামায় দুই একটি আতিশয্যের ত্রুটি যদি কোনখানে পাওয়া যায়, তাহা কবিতার সঙ্গীত-ধ্বনিতে এমন ভাবে ঢাকা যে, তজ্জন্য কবিতার কোনও অংশ লুপ্তশ্রী বলা যাইতে পারে না। শব্দমাধুরীর স্রোতে যেন সেই যৎসামান্য ত্রুটিগুলি একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে। ফি.রদউসি কল্পনাবলে কত অলৌকিক দৃশ্য কবিহৃদয় দর্পণে প্রতিবিম্বিত করিয়া জগতের সম্মুখে ধরিয়াছেন। ফি.রদউসি ভাগ্যবান। শাহনামা

শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্র।

ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইলেও ইহাতে অনেক অমানুষিক ঘটনা, অপ্সরা, কিন্নর, দেবাসুরে যুদ্ধ প্রভৃতি থাকাতে, তিনি কবিকল্পনায় যথেচ্ছাক্রমে সকল দিকে বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাকে উপাদানের অভাব ভোগ করিতে হয় নাই সত্য, কিন্তু বিচিত্র সংগ্রহ ও সৃষ্টিতে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় সহজেই পাওয়া যায়। কখন তাঁহার কবিতা মেঘগর্জ্জনের ন্যায়, কখনও তীব্র তেজস্বিনী, আবার কখনও কুসুমমরী প্রতিকা মৃত্তিকায় অবলুণ্ঠিতা! কিন্তু সকল সময়েই ফি.রদউসি হৃদয়ের কবি, তাঁহার সকল কবিতাই হৃদয়স্পর্শিনী বলিয়া প্রশংসা করিতে গিয়া ভক্তির উদ্রেক হয়। যেমন বাল্মীকি ও হোমরকে পরবর্ত্তীর পদানুসরণ করিতে হয় নাই, সেই প্রকার ফি.রদ্‌উসিও, পারস্যভাষার আদি কবি বলিয়া, কোনরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিলেন না। তাঁহার সঙ্গীত প্রতিধ্বনি নহে, উহা তাঁহার নিজের স্বাধীন ধ্বনি। শাহনামায় ফি.রদউসি তাঁহার অসাধারণ তন্ময়তা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কি সৌন্দর্য্য-গঠন, কি সৌন্দর্য্য-চিত্রন, উভয়েই ফি.রদউসি সিদ্ধহস্ত। এমন সুন্দর চিত্র-পরম্পরার সমাবেশ ইংরাজিতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং এই জন্যই বোধ হয়, ইহার অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে সকলেই মোহিত। আমাদের ভারতচন্দ্র, কাশীদাস প্রভৃতি সকলেই পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের নিকট ঋণী। সকলেরই রূপবর্ণনা প্রায় একই প্রকার বলিয়া তাঁহাদের ব্যক্তিগত কবিত্ব সহজে বুঝিতে পারা যায় না।

প্রতিভা যাঁহার আছে, তাঁহার কিছুতে ভয় নাই। প্রাণভয়ে বল, অন্নচিন্তায় বল, সকল অবস্থাতেই ফি.রদউসির প্রতিভাকুসুম শত শোভায় প্রস্ফুটিত হইয়া জগতের একখানি অমূল্য রত্ন প্রসব করিয়াছিল। তাই আজি ফি.রদউসির উদ্ভাবনী প্রতিভায় সমস্ত মুস্‌লিম জগৎ গৌরবান্বিত। বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমর ভিন্ন পৃথিবীতে আর কেহ তাঁহার সমকক্ষ নাই—এমন শতমুখীপ্রতিভাশালী লেখক আর কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। ঈশ্বরদত্ত কবিত্বের সহিত ছন্দোবৈচিত্র্য থাকাতে শাহনামার এত আদর। ফি.রদউসি কবি-কল্পনার আচার্য্য। কল্পনা ফি.রদউসির নিজের সামগ্রী—সমস্ত গ্রন্থে অতি যত্নে খুঁজিলেও একটি কষ্টকল্পনা পাওয়া দুষ্কর। Wordsworthএর কথা যদি সত্য হয়, "Poetry is spontaneous overflow of powerful feelings," তাহা হইলে, যথার্থই শাহনামা কাব্যের শীর্ষস্থানীয়। Sir william Jones শাহনামার ভাষাকে "Impassioned language" বলিয়াছেন। বড় বড় ইংরাজ কবিও প্রতিভাকে ফি.রদউসির মত আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। স্বয়ং মিল্‌টন (Milton)

বলিয়াছেন যে, ঋতুবিশেষে তাঁহার প্রতিভা দেখা দিত। Byron ও Popeএর ভাল কবিতাগুলি, তাঁহাদের ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে লিখিত। ফি্রদ্‌উসিকে কখনই প্রতিভা ত্যাগ করে নাই, সেই জন্য কাব্যজগতে ফি্রদ্‌উসি আজি অমর কবি বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমরের সঙ্গে স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়া আছেন। Sir William Jones, গ্রীক, সংস্কৃত ও পারস্য, তিনটি ভাষা যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, পদলালিত্যে ব্যাস, বাল্মীকি, অথবা হোমর, এই পারস্য কবিকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। তবে, নিখুঁত পৃথিবীতে কিছুই নাই; সমালোচকের হস্তে তিলোত্তমার রূপেও ত্রুটি বাহির হয়। স্বয়ং Shakespeareএর এই সম্প্রদায়ের হস্তে নিস্তার নাই! Hectorএর সময়ে Aristotleএর জন্ম হয় নাই; কিন্তু ইংলণ্ডের কবিশ্রেষ্ঠ Hectorএর মুখে Aristotleএর বচন বাহির করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কবিত্বশক্তি একবারে নাই বলেন, এমন লোকও জগতে বিরল নহে।

হিন্দু সাহিত্যে যেমন দুষ্মন্তের, রামচন্দ্রের ও সীতার মনস্তাপ প্রসিদ্ধ, এবং ইংরাজিতে Byronএর Prisoner of Chillon যেমন অশ্রুজলসিক্ত, সেইরূপ মুস্‌লিম্ সাহিত্যে, রুস্তমের হস্তে তাঁহার অপরিচিত পুত্র সোহ্‌রাবের মৃত্যুতে রুস্তমের খেদ করুণরসে অতুল্য। যদিও ইহা শোকসিন্ধুর তীব্র উচ্ছ্বাস, তথাপি এ অশ্রুকে এক প্রকার আনন্দধারা বলা যাইতে পারে; কারণ, বিষাদের গাথা হইলেও মর্ম্ম-স্পর্শিনী বলিয়া, হর্ষসঙ্গীতের মত আনন্দদায়িনী। কাঁদিয়া সুখ কি নাই? তাই বলি, এমন কান্নার কথায় সুখ আছে। দারুণ মর্ম্মবেদনায় মনে যে তীব্র ও গভীর ভাবের উদয় হয়, তাহার বর্ণনাতেও ফি্রদ্‌উসি সিদ্ধহস্ত।

Byronএর Vision of Judgment গালির চূড়ান্ত বলিয়া খ্যাত, কিন্তু ফি্রদ্‌উসির হস্তে মহাবলপরাক্রান্ত সম্রাট মহ্‌মুদ্ গজ্‌নির লাঞ্ছনা বোধ হয় কাব্যজগতে অতুল্য। Byronএ শিক্ষা নাই বলিলেই হয়। ফি্রদ্‌উসি শিক্ষাগুরু। তাঁহার রচনায় প্রায়ই "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ পারস্যকবি উন্‌সুরি, ফি্রদ্‌উসিকে উপদেষ্টা অপেক্ষা উচ্চ স্থান দিয়াছেন:—

"উ নহ্ উস্তাদ্ বুদ্, ওয়া মা শাগির্,
উ খুদাওন্দ্ বুদ্, ওয়া মা বন্দহ্।"

ভাবার্থ:—

হইতে ফি্রদৌসি-শিষ্য, নাহি মম আশ।
তিনি হন প্রভু মোর, আমি তাঁর দাস॥

এক কথায়, আমাদের দেশে যেমন বাল্মীকির রসনায় বাগ্দেবীর আবির্ভাবে বিশ্বাস আছে, মুসলমান সমাজেও তেমনই ফি্রদউসি সম্বন্ধে ধারণা যে, তাঁহার বীণা দৈবশক্তিসম্পন্না বলিয়া তাঁহার গীতে লোক আত্মহারা হইয়া যায়।

বহুকাল হইতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শাহনামার মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অমর গ্রীক্কবি হোমরের সহিত ফি্রদউসির তুলনা করিয়াছেন। ইয়ুরোপে হোমরের বড় আদর। Meyers তাঁহার Essays Classicalএ বলেন :—

"Besides Homer, Virgil seems elaborate, Dante crabbed, and Shakespeare barbarous."

বাস্তবিকই হোমরের সহিত ফি্রদউসির অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ইউরোপে হোমরের যেরূপ আদর, পারস্য, আরব ও অন্যান্য মুসলমানদেশে ফি্রদউসির সেইরূপ মান্য। হোমরের গ্রন্থ (Illiad) যেমন একমাত্র ইউরোপীয় epic, ফি্রদউসির শাহনামা মুসলমান সাহিত্যে সেইরূপ একমাত্র মহাকাব্য। গ্রীককবির রচনায় যেমন আদিমকালের বাহুবল ও সাহসের বিশেষ প্রশংসা, তেমনই পারস্য কবির গ্রন্থেও পুরাতন কালের শৌর্য্য বীর্য্য প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। হোমর গ্রীককাব্যে পিতৃস্থানীয়; ফি্রদউসি পারস্যকাব্যের জন্মদাতা। কেবল যে ইসলাম সাহিত্যের romance ফি্রদউসির নিকট ঋণী, তাহা নহে; ইউরোপীয় romance-লেখকগণও ফি্রদউসি হইতে অনেক সুন্দর সামগ্রী গ্রহণ করিয়াছেন। খৃঃ একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফি্রদউসি শাহনামা রচনা করেন; দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত Orlando Furioso প্রভৃতিতে শাহনামার ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়।

পারস্য যোদ্ধা রুস্তম ও গ্রীক মহাবীর হর্কিউলিজ্. (Hercules) অনেকটা এক প্রকার। হর্কিউলিজ্. ১২ বার অমানুষিক বীরত্ব দেখাইয়া যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, ফি্রদউসির প্রতিভাবলে, রুস্তম্ সাতবার অলৌকিক কার্য্য করিয়া সেইরূপ বিখ্যাত। সকল দেশেই কবিগণ নারীর সৌন্দর্য্যে তৃপ্ত না হইয়া কল্পনাবলে নির্দ্দোষসৌন্দর্য্যবিশিষ্ট জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহারাই হিন্দু কবির অপ্সরা, খৃষ্টান কবির ফেয়ারি (fairy) ও মুসলমান কবির পরী। পারস্যকবি ফি্রদউসি যেমন পরী লইয়া ব্যস্ত, গ্রীক কবি হোমরের রচনাতেও সেইরূপ অনেক সময়ে fairyর দেখা পাওয়া যায়; কিন্তু fairy পারস্যকল্পনাপ্রসূত পরী নহে—উভয়ের মধ্যে কেহ যে সংস্কৃত কাব্যের অপ্সরা বা কিন্নরীর আত্মীয়া, তাহাও বোধ হয় না। পরীকে angel বলিলেও পারস্যকবির ভাব প্রকাশ পায় না; angelএর ভাব "ফরিশ্তহ্" (farishtah) শব্দে অধিক প্রকাশ পায়।

রোম্যানদিগের genii ও পারস্য কবির পরী নহে; পাশ্চাত্য কবির seraph অথবা cherub ও পারস্য কল্পনার মত নহে। চাঁদমুখের সর্ব্বত্রই জয়, সকল পারস্য কবিই ইহা লইয়া পাগল। শেখ্ সাদি বলেন :—

"মানন্দ্ তু আদ্মি দর্ আফাক্
মুম্কিন্ নবুদ্——পরী নদিদম্।"

ভাবার্থ ;—

তব সম মানবী ত না হয় সম্ভব।
পরী রূপে প্রিয়ে যদি হও পরাভব॥

প্রসিদ্ধ কবি খুসরু, সুন্দরীর কথায় বলেন ;—

"খুবান্ গুমান্ মবর্ কে অজ্ অউলাদ্-ই-আদ্মি অন্দ্
হুবন্দ্ য়া:ফরিশ্তহ্ য়া রুহায় অজ্জি.ম্ অন্দ্।"

ভাবার্থ :—

এমন রূপসী, নহে মানবসুন্দরী।
হবে:হুরী, ফ্রিস্তা, কিংবা স্বর্গের কিন্নরী॥

ইউরোপীয় Blue-eyes বা Hazel-eyesএর পারস্য কবির নিকট আদর নাই। হুর আর্ব্বী শব্দ, ইহার অর্থ কাল চক্ষু। আরব দেশে কাল চক্ষু না হইলে সুন্দরী বলে না। স্বর্গের হুরীরও:চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ।

কালতে কি রূপ নাই? "Is a Black woman of the fair sex?" মনে পড়ে, এক জন গ্রীক কবি বলেন :—

"By Didyma's beauty I am carried away ;
I melt, when I see, like wax before fire :
She is black, it is true : So are coals ; but even they
When they 're warmed, a bright glow like the rose-
cup acquire."

আরব্য কল্পনার "হুরী" ও পারস্য কল্পনার পরীতেও প্রভেদ আছে। স্বয়ং শেখ সাদি গোলযোগে পড়িয়া বলিয়াছেন:—

"হুরী নদানম্, য়া মলক্।
যবজন্দহ্ আদম্ য়া পরী।"

ভাবার্থ :—

না জানি সে প্রিয়তমা, অপ্সরা কি হুরী।
রূপসী মানবকন্যা, বা স্বর্গের পরী॥

পরীর সৌন্দর্য্যবর্ণনায় এক জন পারস্য কবি বলিয়াছেন যে, পরী অর্থে শরীরী পুষ্পসৌরভ ও চন্দ্রকর। পারস্যকবির পরীর পাখা আছে, ভবিষৎজ্ঞান বিলক্ষণ, অনাহারে জীবনধারণে অসমর্থ, এবং অমর নহেন। অবশ্য, প্রথম গুণ নির্দ্দোষসৌন্দর্য্যবিশিষ্ট। বঙ্কিম বাবুর মতে, এমন স্থলে, পাঠকের গৃহিণীর ন্যায় সুন্দরী বলিলেই সকলেই বুঝিতে পারেন, এবং সব লেঠা চুকিয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলে সত্যের অপলাপ করা হয়; কারণ, পারস্যকাব্যে গৃহিণীর রূপ উপমায় বড় আইসে না। এক জন প্রসিদ্ধ পারস্যকবি লিখিয়াছেন যে, যদি অন্য কোনও প্রকারে পরীর সুন্দর চিত্র কল্পনায় না আনিতে পার, নিজ প্রিয়তমার (উপপত্নীর) মুখখানি ধ্যান করিবে, তাহা হইলে পরীর কতকটা আন্দাজ পাইবে!

এখন দেখা যাক, শেক্সপীয়র ও মিল্টনের ফেরারি, কতটা পারস্য কবির "পরী"। Mid-summer Night's Dreamএ ফেরারিগণ

"Killing cankers in the musk-rose buds"

এবং আর এক স্থলে :—

"To serve the Fairy Queen,
To dew her orbs upon the green" &c
"They must go, seek some dew-drops here and there
And hang a pearl in every cow-slip ear."

বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পারস্যকল্পনাপ্রসূত পরীগণ যে ভবিষদ্বাণী ভিন্ন কখনও অন্য কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাহার উল্লেখ কোন পারস্যকাব্যে দেখি নাই।

মিল্টনের Comusএ পারস্য পরীর ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়—

"Their port was more than human as they stood—
——I took it for a fairy vision,
Of some gay creatures of the element,
That in the colours of the rainbow live
And play in the plighted clouds—I was awe struck,
And as I passed I worshipped."

সুরাও উভয় কবির আদরের সামগ্রী। ফি.রদউসির বীরগণ উহারের যথেষ্ট সম্মান করিতেন, এবং মদিরাসক্ত ছিলেন। শাহনামায় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, "হমা মস্ত্ বুদন্দ্", অর্থাৎ "সকলেই নেশায় চুর"। মহাকবি হোমরও তাঁহার যোদ্ধাদিগের ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিবারণের যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যে

কালের সকল বীরগণই জঠরসমস্যা বেশ বুঝিতেন,—আমাদের কুম্ভকর্ণ মহাশয়ও এ বিষয়ে বড় নিন্দনীয় নহেন! ফিরদউসি আর এক স্থলে লিখিয়াছেন, "কসারন্দহ্ বাদহ্", অর্থাৎ "শোকতাপহারী মদ্য।"

হোমরের নেপ্থুনের (Nepthune) ও ঐ গুণ :—

"Charmed with the virtuous draught the' exalted mind
All sense of woe delivers to the wind"

Pope—Odyssey.

পারস্যের আদি কবি কি ক্ষণেই সুরার গুণগান করিয়াছিলেন—হাফিজ (Hafiz) প্রভৃতি সেই গীতে মাতিয়া কাব্যে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

অপ্সরা ও পরী বিহনে স্ত্রীসৌন্দর্য্যে সকল দেশের কবিই মোহিত। সৌন্দর্য্য চিরকালই নারীর অস্ত্র। খৃষ্টের জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক কবি Anacreon বলিয়াছেন :—

"Beauty, this
Both their arms and armour is :
She that can this weapon use,
Fire and sword with ease subdues."

Thomas Stanley.

মিলটনে আছে :—

"With store of ladies whose bright eyes
Rain influence, and judge the prize
Of wit or arms, while both contend
To win her grace whom all commend."

L' Allegro.

রুস্তমের মাতা রুদাবা অতি সুন্দরী। ফিরদউসি তিলোত্তমার সংবাদ পাইয়াছিলেন কি না, তাহা জানি না। রূপবর্ণনায়, সকল দেশের সকল কবিরই প্রথমে শশধর লইয়া টানাটানি। রুদাবার রূপবর্ণনায় ফিরদউসি লিখিয়াছেন :—

"অগর মাহ্ জুয়ী, হমা কমে উস্ত্।
ওগর মুশ্ক্ বুয়ী, হমা বুয়ে উস্ত্॥"

ভাবার্থ :—

যদি চাহ ইন্দু, দেখ চন্দ্রানন তার।
সুগন্ধ মৃগনাভি, বদনে রুদাবার॥

বিদ্যার রূপবর্ণনায় ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি' তার আছে কতগুলা॥"

ভারতচন্দ্রের উপমা ও ভাব অনেক স্থলে পারস্য কাব্য হইতে নীত, স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। পারস্য উপমার সহিত রায়গুণাকরের উক্ত উপমার কত মিল দেখুন।

"হিলালে কে বর্ আস্‌মান্ যায়ে উস্‌ত্‌।
তরাশিদহ্ নাখন্ পায়ে উস্‌ত্‌॥"

ভাবার্থ :—

চন্দ্রের স্থান সবে জানে, স্বর্গ আকাশে।
পদনখে তারি কল্পনা কেন গো বিকাশে॥"

চন্দ্রের উপমায় পাশ্চাত্যের বোধ হয় Moore মনে পড়িবে :—

"Let her eye-brows sweetly rise,
In jetty arches over her eyes,
Gently in a crescent gliding,
Just commingling, just dividing."

কেবল মুখের উপমা উভয় কবির এক প্রকার নহে, সুন্দরী নারীর অন্য অঙ্গের উপমায়ও অনেক ঐক্য আছে। সকল দেশের কবিই গোলাপ ফুলের ঔজ্জ্বল্য ও কোমলতার উপমা দিয়া স্ত্রীসৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। হোমর্‌ কেবল "Rosy-fingured" বলিয়া ক্ষান্ত; Gray বলেন, "Rosy-bosomed;" Tennyson লিখিয়াছেন :—

"Rosy is the west,
Rosy is the south,
Roses are her cheeks,
And a rose her mouth."

কিন্তু ফি.র্‌দউসির নায়িকা "গুল্ অন্দাম্"—সর্ব্বাঙ্গ গোলাপের মত। স্ত্রী-সৌন্দর্য্যের সহিত গোলাপের তুলনায় Ronsard মনে পড়ে। Pierre-de-Ronsard এক জন প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি। Andrew Lang তাঁহার "গোলাপ" হইতে ইংরাজীতে পদ্যে এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন :—

ত্রিবক্রা দাসীর নাম ; মধুরভাষিণী ;
যৌবনে ত্যজিয়া স্বামী কু-অঙ্গ হেরিয়া ;
ভাবিলাম যাহা হোক, —যৌবন ত আছে,
জীবন যাপিব এবে কুসঙ্গীর বেশে।
হা লজ্জা! সে সাজসজ্জা, অঙ্গনা-বিভ্রম,
সকলি বিফল হোল ; যেই আসে দ্বারে,
সেই মম কুব্জ হেরি' হেসে চলে যায় ;
কীটদষ্ট কু-পুষ্পের ফুটিল না অলি।
দারিদ্র্যে ও অবসাদে দিশাহারা হ'য়ে
একদিন সন্ধ্যাকালে উন্মাদিনীবেশে
ঝাঁপাইয়া পড়িলাম যমুনার গর্ভে
আত্মহত্যা তরে ; চঞ্চলা কালিন্দী, আহা,
শত বাহু প্রসারিয়া আপনার ক্রোড়ে
দিলা স্থান ; ডুবে গেনু অতল তিমিরে।
নবণের হিমকক্ষে নয়ন উন্মীলি'
তাকাইনু যবে, এ কি। হেরিনু বিস্ময়ে
সেই নারীঘাট, সেই যমুনার তীর!
আর্দ্রকেশে আর্দ্রবেশে আছি গো শয়ানা
আমি এক দিব্যকান্তি-সন্ন্যাসীর ক্রোড়ে।
কহিলা মধুর মূর্ত্তি ঈষৎ হাসিয়া,—
'ছি ছি বৎসে! জন্ম জন্ম তপস্যার ফলে
লোক পায় সুদুর্লভ মানব-জনম,
সেই নর-জন্ম প্রতি এত অবহেলা?
দৈববশে যেতেছিনু এই পথ দিয়া,
ঝাঁপাইয়া পড়ি' জলে রক্ষিনু তোমারে।
ভাগ্যবতী! এখনও অদৃষ্টে তোমার
দেবতা-নাঞ্ছিত আছে সৌভাগ্য অসীম,
কিছু দিন আসিবেন শ্রীহরি আপনি
গোলোকচন্দ্র লীলাচ্ছলে এবে
অবনীতে অবতীর্ণ যশোদার গৃহে।
অমৃত-পরশে তাঁর অয়ি ভাগ্যবতী!
হবে তুমি শাপমুক্তা ; ধর, বৎসে! ধর,
এই সুমধুর মন্ত্র—'হরে কৃষ্ণ হরে'।
ইহারই প্রভাবে তব নিশ্চয় ঘুচিবে
দুঃখ দৈন্য ; থাকিবে না ভাবনা-কালিমা
অই ভালে ; যাও বালে। নগরে ফিরিয়া।
কায়মনঃপ্রাণে কর মন্ত্রের সাধনা,
হবে' সিদ্ধি। আমি বৎসে! দেবর্ষি নারদ,
এত বলি' মহাপ্রাণ, বীণা লয়ে করে,
করিলেন হরিধ্বনি মধুর ঝঙ্কারে।—
রাগিণী বেহাগ ; তাল আড়াঠেকা।
'হরি! তুমি মদনমোহন!
হেরি নাই হেন রূপ ঘুরি' ত্রিভুবন।
সাধে কি হে মনঃ-প্রাণ
তোমারে করেছি দান,
চরণ-নিকুঞ্জে থাকি মৃগের মতন।
তব রূপ-সরোবরে রাজহংস-রূপ ধ'রে
মানস-মরাল মম করে সন্তরণ।'

* * *

নগরে ফিরিয়া গিয়া কংস নৃপতির
হইলাম দাসী। সবে মোরে করে যত্ন ;
অনুলেপনের কার্য্যে হইনু নিপুণা।
বিরলে গোপনে সুখে 'হরে কৃষ্ণ হরে!'
মন্ত্র জপি। উষাকালে শয্যাত্যাগকালে
যোড়হস্তে ডাকি,—'ওহে জগন্নাথ!
ষড় সাধ হেরিবারে শ্যামল মূরতি!
নরনারী পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গমে
হেরিতে লাগিনু ধ্যানে সে শ্যাম-মূরতি।
বৈরী মোর? হায়। যেই ডাকে প্রেমময়ে
অহোরাত্রি, তার কভু বৈরী থাকে ভবে?
এ বিশ্ব সংসার হ'ল প্রীতি-পারাবার।
একদিন সুপ্রভাতে, সাধনার সিদ্ধি
হ'ল মম ; পাইলাম ত্রিদিবদুর্লভ
ঋদ্ধি ; হেরিলাম নেত্রে মদনমোহনে।
কি মধুর। কি মধুর। যুগল-মূরতি।
হস্তে চন্দনের বাটী, যাইতেছিলাম
রাজবাটী ; তুমি হাসি' পথ আগুলিলে।
পীতাম্বর মনোহর শ্যাম জলধরে

নিবসি', ঝাপটি' পক্ষ এ প্রাণ চাতক
নিবিড় আনন্দে হ'ল উদাও অস্থির!
মধুস্বরে হে গোবিন্দ! কহিলে আমারে,
'হে বরোরু! দাও ঐ অঙ্গবিলেপন
দুই জনে।' মনে মনে কহিনু গোপনে,
'হে নাথ। ও পাদপদ্মে কি আছে অদেয়?'
অঙ্গবিলেপনরাগে হইয়ে বঞ্চিত,
কি সুন্দর শোভা, মরি, ধরিলে দু' জনে।
যুগল কার্ত্তিক যেন অবতীর্ণ ভবে!
শ্রাবণ-গগনে যেন যুগ্ম ইন্দ্রধনু!
তব পদে ভগবন্। হইয়া প্রসন্ন,
তব শুভ-দরশন-ফল দেখাইতে,
প্রকাশিলা, মরি মরি। অপরূপ লীলা।
হে অচ্যুত! সুমোহন পাদদ্বয় দিয়া
এ দাসীর পাদদ্বয়-অগ্রভাগ চাপি',
শ্রীহস্তের দুটি চারু অঙ্গুলি উত্তোলি',
চিবুক ধরিলা মম; পরম আদরে,
উত্তোলি' ধরিলা দেহ। শ্রীকরপরশে
ত্রিবক্রার দেহ হ'ল সরল সমান।
যৌবন-লাবণ্যে হ'ল ঢল ঢল বপু।
হইলাম নিতম্বিনী, পীনপয়োধরা!
হরষে, বিস্ময়ে, গর্ব্বে, নবীন বৈভবে
হ'যে মাতোয়ারা আমি, বাহু পসারিয়া
হে সুন্দর! চাহিলাম তোমা আলিঙ্গিতে।
ঈষৎ হাসিয়া তুমি কহিলে সুস্বরে,—
'হে ভদ্রে! হইছ কেন অধীরা উতলা?
কার্য্য সমাপিয়া আমি দিন কয়ি ধার্য্য,
আসিব আসিব তব প্রেমের নিকুঞ্জে।
হে সুন্দরী! জান না কি বিনা নিমন্ত্রণে
কোকিল আপনি আসে বসন্ত আসিলে;—
কহাবে নলিনীপত্রে অনাহূত অলি?'

*

কত দিন, কত দিন, কতদিন গেছে!
এ তীব্র বিরহ আর পারি না সহিতে;
পারি না পোহাতে আর এ দীর্ঘ যামিনী;
হে নির্দ্দয়! মিথ্যা ধর দয়াময়-নাম;
অরসিক! মিথ্যা ধর রসময়-নাম;
অপ্রেমিক! মিথ্যা ধর প্রেমময়-নাম!
যৌবন-মণ্ডপে যত তুলসীর পত্র
ঝরি' গেল; ধূপ ধুনা হৃদয়-মন্দিরে
জ্বালিয়াছি; তাও বুঝি পুড়ে হয় খাক!
হ'ল না, হ'ল না হায়! দেবের অর্চ্চনা।
আর কেন? এস নাথ! মুরলী-অধরে,
ত্রিভঙ্গিম ভাবাবেশে হাসিয়া সুহাসি,
এস, এস পীতাম্বর, ভুবন মোহিয়া!
আবার হাসিয়া, হরি, পথ আগুলিয়া,
দাঁড়াও দাসীর পথে; অথবা চুম্বিয়া
এ মুখ, ভরিয়া দাও সর্ব্বাঙ্গ পুলকে
চক্ষু পক্ষ্ম যাক ভিজি' প্রেমের জলে;
উজলি' উঠুক আঁখি অন্তর-হাসিতে,
আঁখি-প্রান্তে লাল রেখা রাজুক সহসা,
অভিলাষ, ভয়, গর্ব্ব, রোষ ও অসূয়া
দেখা দিক এক কালে পটল অধরে।
দুরু দুরু কম্পমান পীন পয়োধর
ভরি' যাক অকস্মাৎ কদম্ব-পুলকে।
সেই দিন ত্রিবক্রার অন্তর-বক্রতা
ঘুচে যাবে, চিত্ত হ'বে সরল, সমান!
কামগন্ধ নাহি রবে কুব্জার প্রেমে,
হবি, তব রাগ-রক্ত পাদ-পদ্ম চুমে'!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

ইংরাজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ।

২। তাল-নারিকেলের দেশে।

শ্রীরাগমের অভিমুখে।

যে পান্থনিবাসে আমি আশ্রয় লইয়াছি, উহা পূর্ব্ববর্ণিত নিঃসঙ্গ শৈলটি হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ, এবং শ্রীরাগমের বৃহৎ মন্দির হইতে তিন ক্রোশ দূরে। ইহা অবশ্যমধ্যস্থিত একটি তরুশূন্য রৌদ্রস্নাত মুক্ত পরিসরের মধ্যে অবস্থিত। এখানে একজাতীয় "লজ্জাবতী" লতা-গাছ আসিয়া তালবৃক্ষের স্থান অধিকার করিয়াছে। উহার পাতা এত অল্প ও এত সূক্ষ্ম যে, উহাতে কিছুমাত্র ছায়া হয় না। চারি দিকেই অবসাদক্লিষ্ট ঝোপঝাড়, শুষ্ক দগ্ধ তৃণরাশি। শুষ্কতা প্রযুক্ত এক্ষণে ভারতের সমস্ত উত্তর প্রদেশ, সমস্ত রাজস্থান মরুপথে অগ্রসর; সেই অসাধারণ শুষ্কতার একটু নমুনা যেন এই চিরআর্দ্র চিরশ্যামল দক্ষিণ দেশেও আনিয়া ফেলিয়াছে।

আমার আবাস হইতে শ্রীরাগমে যাত্রা করিবার সময়, যে নগরটির মাথার উপরে পূর্ব্ববর্ণিত শৈলটি ঝুঁকিয়া রহিয়াছে—সেই নগরটির মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে হইল। তাহার পর, দুই ঘণ্টা কাল গাড়ীতে তাল প্রভৃতি তরুপুঞ্জের নীচে দিয়া গিয়া কতকগুলি মন্দিরের নিকট উপনীত হইলাম। এই মন্দিরগুলি, বলিতে গেলে, আসল মন্দিরটির পূর্ব্বোদ্‌যোগমাত্র।

এই মন্দিরগুলি বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন আকারের।—ইহারা যেন বিবিধ সাদাসিধা ও ক্ষোদিত প্রস্তরের উদ্দাম বিলাসলীলা। ভক্তগণ সাগ্রহে ও উৎসাহভরে এখানে আসিয়া ফুল ও ফুলের মালা বাধিয়া যাইতেছে। এ মালাগুলি কল্যকার উৎসবের জন্য;—অতি অপূর্ব্ব। প্রত্যেক প্রবেশপথে, প্রত্যেক তোরণপ্রকোষ্ঠে, বিষ্ণুদেবের (মহাদেবের?) ভীষণ ত্রিশূলগুলি সাদা ও লাল রঙ্গে টাট্‌কা রং করা হইয়াছে। এই সকল মনুষ্যদিগেরও ললাটে ত্রিশূলচিহ্ন অঙ্কিত। এখানকার কোনও কোনও তালবন বিষ্ণুদেবের উদ্দেশে বিশেষরূপে উৎসর্গীকৃত, এবং বিষ্ণুদেবেরই নিজস্ব রঙ্গে অনুলিপ্ত। স্তম্ভের ন্যায় মসৃণ প্রত্যেক বৃক্ষকাণ্ড সাদা ও লাল রঙ্গে রঞ্জিত;—কোথায় যে

মন্দিরের শেষ ও বনের আরম্ভ, তাহা বুঝা দুষ্কর। সমস্ত প্রদেশটিই যেন একটি বিশাল ভজনালয়।

অবশেষে আসল মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলাম। মন্দিরটি প্রকাণ্ড, এবং উহার সাতটি বেড়। প্রথম বেড়টির পরিধি তিন ক্রোশ। উহার মধ্যে ২১টি মন্দির;—মন্দিরের চূড়াগুলি ৬০ ফুট পরিমাণ আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে।

মন্দিরগুলির প্রকাণ্ডতা ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে যেন আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়; উহাদের আত্যন্তিক বহির্বিকাশে অন্তরাত্মা যেন ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। উহাদের আকার এত বৃহৎ, এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য্যও এত প্রচুর যে, তৎসমস্ত মনোমধ্যে ধারণা করা দুষ্কর। ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে যাহা কিছু পাঠ করা গিয়াছিল, যাহা কিছু জানি বলিয়া বিশ্বাস ছিল, পরীস্থানের নাট্যাদৃশ্য ইতঃপূর্ব্বে যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম, সমস্তই এই চমৎকারজনক দৃশ্যের নিকট হার মানে। ভারতবর্ষীয় পুষ্পের নিকট আমাদের ছোট ছোট সুন্দর ফুলগুলি যেরূপ,—এই সকল লাল পাথরের রাশি রাশি প্রকাণ্ড স্তূপের নিকট, এই সকল বিংশতিবাহু বিংশতি-মুখ দেবতাদিগের নিকট, আমাদের সাদাটে রঙ্গের ছোট ছোট প্রস্তরে গঠিত, "সেণ্ট" ও "এঞ্জেলে" ভূষিত ক্যাথিড্রাল্ গির্জ্জাগুলিও তদ্রূপ।

প্রথম বেড়টি যার-পর-নাই বিরাট, প্রকাণ্ড; উহা মন্দিরের অন্যান্য অংশ নির্ম্মিত হইবারও বহুপূর্ব্বে বিরচিত—কোনও দুর্জ্ঞেয় পুরাকালের সামিল বলিয়া মনে হয়। কোন এক যুগের লোকেরা "ব্যাবেল" মন্দিরের মত একটা প্রকাণ্ড মন্দির এখানে নির্ম্মাণ করিবে বলিয়া কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু মন্দিরটি সমাপ্ত না হইতে হইতেই, তাহাদের কল্পনা-বহ্নি বোধ হয় নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। যে তোরণের মধ্য দিয়া এই বেড়ের ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়, উহার খিলান ৪০ ফুটের ঊর্দ্ধে বিলম্বিত; এবং উহা ১৩।১৪ গজ পরিমাণ—দীর্ঘ অখণ্ড প্রস্তর-সমূহে নির্ম্মিত। উহার শীর্ষদেশে একটি ত্রিকোণাকৃতি অসমাপ্ত চূড়ার তল-দেশের নিদর্শন এখনও দৃষ্ট হয়। ঐ চূড়া সমাপ্ত হইলে, একটা ভীষণ প্রকাণ্ড অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠিত, সন্দেহ নাই। সমস্তই তাম্রবৎ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত। এবং উহার ভাস্করকার্য্যখচিত আলিসার উপর কতকগুলি পবিত্র টিয়া পাখী সপরিবারে বাস করে,—মনে হয়, যেন উহাতে উজ্জ্বল সবুজের কতকগুলি দাগ পড়িয়াছে।

তোরণগুলির অপর দিকে, মন্দিরের উদার প্রশস্ত বীথিসমূহ প্রসারিত;

ক্রমপরম্পরাগত অন্যান্য বেরগুলির মধ্য দিয়া এই সমস্ত বীথিগুলি বরাবর চলিয়া গিয়াছে। উহাদের দুই ধারে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিবিধ ইমারৎ, মেছো-পুষ্করিণী, বাজার, কুলুঙ্গীর মধ্যে আসীন বিবিধ দেবমূর্ত্তি, উচ্ছ্রিত-স্তম্ভ প্রস্তরগঠিত দ্বারহীন সেকেলে ধরণের মণ্ডপগৃহ ;—এই মণ্ডপগৃহের থামগুলি ভারতীয় ধরণের—চতুর্মুখী ; খিলান-পার্শ্বের 'ঠেস'-স্বরূপ, থামের মাথাগুলি কতকগুলি বিকটাকার মূর্ত্তিতে গঠিত।

প্রত্যেক বেরের তোরণের মাথার উপর সেই একই রকম, বর্ণনাতীত, গুরুভার ত্রিকোণাকৃতি চূড়া—৬০ ফুট উচ্চ। ১৫ "থাক্" প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেবমূর্ত্তি সারি সারি উপর্য্যুপরি স্থাপন করিয়া এই চূড়াটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ত্রিদিববাসিগণ অযুত চক্ষু দিয়া উপর হইতে অবলোকন করিতেছেন—অযুত অঙ্গের বিবিধ ভঙ্গী করিতেছেন। কতকগুলি দেবতা স্বীয় দেহের উভয় পার্শ্ব হইতে বিংশতি বাহু হাত-পাখার মত প্রসারিত করিয়া আছেন। তাঁহাদের মাথায় মুকুট, হস্তে অসি, বিবিধ প্রকারের সাঙ্কেতিক পদার্থ, পদ্মফুল, অথবা নরমুণ্ড। তাঁহাদের ঘন পংক্তির মধ্যে নানা প্রকার কাল্পনিক পশুও পরস্পরের সহিত জড়াজড়ি ভাবে রহিয়াছে ;—অসম্ভব-বৃহৎ-পুচ্ছধারী ময়ূর অথবা পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গ। তা ছাড়া, পাথরগুলা এমন ভাবে উৎকীর্ণ—এরূপ গভীর ভাবে ক্ষোদিত যে, প্রত্যেক প্রধান ও আনুষঙ্গিক মূর্ত্তি, সমগ্র মূর্ত্তিসমষ্টি হইতে যেন স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয় ;—যেন উহাদের প্রত্যেককে পৃথক করিয়া খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সমস্ত মূর্ত্তি-সংঘাত আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, এবং ক্রমশঃ সরু হইয়া, সুতীক্ষ্ণ শূলাগ্রের ন্যায়, সারি সারি কতকগুলি বিন্দুমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সমস্ত পদার্থ, সমস্ত জীবজন্তু, সমস্ত নগ্নমূর্ত্তি, সমস্ত পরিচ্ছদ, সমস্ত ভূষণ, একই অপরিবর্ত্তনীয় রঙ্গে রঞ্জিত। কত কত শতাব্দীর সহিত যুঝাযুঝি করিয়া এই রঙ্গ স্বকীয় উজ্জ্বলতা এখনও পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছে। এখানে রক্ত-লোহিত বর্ণেরই প্রাধান্য। দূর হইতে দেখিলে, প্রত্যেক চূড়াই লাল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কাছে আসিলে, অন্য রঙ্গেরও মিশ্রণ দৃষ্ট হয় ;—উহাতে সবুজ, সাদা ও সোনালি রঙ্গের মিশ্রণ রহিয়াছে।

দেবকার্য্যে নিযুক্ত যে সকল ব্রাহ্মণ অতীব শুদ্ধাচারী, তাঁহারাই মন্দিরের শেষ বেরটির মধ্যে সপরিবারে বাস করিবার অধিকারী। এই শেষ তোরণের উভয় পার্শ্বে কতকগুলি জীবন্ত হস্তী প্রস্তর-চাতালের উপর শিকল দিয়া বাঁধা। এই বৃদ্ধ হস্তীগুলি অতীব পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। এখন ইহারা আনন্দে বৃংহিতধ্বনি করিতেছে। ভক্তগণপ্রদত্ত তরুণ বৃক্ষের ডালপালা চর্ব্বণ করিতেছে। যেমন

এক দিকে অসংখ্যমূর্ত্তি-সমন্বিত এই সমস্ত গুরুভার মন্দিরচূড়ার গম্ভীর মহিমা, তেমনই আবার চতুষ্পার্শ্বে কতকগুলা নিতান্ত গ্রাম্য জিনিস থাকায় বড়ই বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়; কতকগুলি চালা ঘর, কতকগুলা ছোট ছোট সেকেলে শকট, আদিমকালের শ্রমকার্য্যোপযোগী কতকগুলা সামগ্রী ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। এই পুরাতন প্রাকারের পাদদেশে সমস্তই ভগ্ন চূর্ণ, সমস্তই বিলুপ্তমুখশ্রী। না জানি কোন্ সুদূর অতীতের নৃশংস বর্ব্বরতা এই প্রাকারটির উপর ধ্বংসের ছাপ রাখিয়া গিয়াছে।

সূর্য্য অস্তগত। দ্বারদেশ পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিব—সে সময় আর নাই। গুরুভার প্রস্তর-খিলানের নিম্নে, মন্দিরের অকুরন্ত মণ্ডপগুলির মধ্যে সন্ধ্যা দেখা দিয়াছে। তবে যে আমি প্রবেশ করিতেছি, সে কেবল কল্যকার রথযাত্রার কথা মন্দিরপুরোহিতদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত। ক্ষুদ্র চলন্ত ছায়ামূর্ত্তিবৎ ঐ সকল পুরোহিত, স্তম্ভশ্রেণীর অসীমতার মধ্যে কোথায় যেন হারাইয়া গিয়াছে।

উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমি যে কথা জানিতে পারিলাম, তাহা অতীব অস্পষ্ট ও পরস্পরবিরোধী। যথা,—"বিষ্ণুদেবের রথযাত্রা আজ রাত্রেই, কিংবা আরও বিলম্বে আরম্ভ হইবে। দিন ক্ষণের উপর, তিথিনক্ষত্রের উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে।" * * * আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, উহাদের ইচ্ছা নয়, আমি এই উৎসবে যোগ দিই।

এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বরাবর দেয়ালের ধারে ধারে দুই সারি অদ্ভুত বিচিত্র ব্যাঘ্র, স্বাভাবিক অপেক্ষা বৃহৎ বোধদীপ্ত অশ্ববৃন্দ অঙ্কিত —এইরূপ একটি গভীরনিনাদী সরু পার্শ্ব-দালানের মধ্যে, এক জন অতীব সৌম্য-মূর্ত্তি বৃদ্ধ পুরোহিতের নিকট আমি সমস্ত অবগত হইলাম। তিনি বলিলেন, এই উৎসব, নিশ্চয়ই কাল সূর্য্যোদয়সময়ে হইবে, এবং যদি এই উৎসব দেখিতে হয়, তাহা হইলে আমাকে এইখানেই রাত্রিযাপন করিতে হইবে।

আমি তৎক্ষণাৎ গাড়ীতে উঠিয়া ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তির জন্য আমার বাসায় গেলাম, এবং রাত্রিযাপন করিবার নিমিত্ত আবার মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম।

কিছু আহার করিয়া পান্থশালা হইতে যখন বাহির হইলাম, তখন মধুর চন্দ্রমা রজতকিরণ বর্ষণ করিতেছেন। এই কিরণচ্ছটা এত শুভ্র যে মনে হয় যেন, তৃণশূন্য নগ্ন ভূমির উপর—সুধালিপ্ত প্রাচীরের উপর—অজস্র তুষারপাত হইতেছে।

আমাদের শীতদেশীয় বৃক্ষের ন্যায়, চতুর্দ্দিকস্থ লজ্জাবতী লতাগাছের মধ্যে, চন্দ্রের পাণ্ডুর কিরণ সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করিয়াছে। কেন না, উহার শাখাপল্লব

অতীব বিরল ও সূক্ষ্ম—প্রায় দৃষ্টির অগোচর। নরম পালকের থোপ্‌নার মত, উহাদের ছোট ছোট ফুলগুলিও যেন পড়ন্ত তুষারকণার অনুকরণ করিতেছে—ভূতলস্থ সংহত হিমকণার অনুকরণ করিতেছে। মনে হয় যেন, শীতপ্রধান উত্তর দেশের একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য এই অত্যুষ্ণ দেশে পথ ভুলিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এখন আর আমি কিছুতেই বিস্মিত হই না—কেন না, এ দেশে যাহাই দেখি, তাহাই অপূর্ব্ব,—সমস্তই যেন বিচিত্র ছায়াচিত্রপরম্পরা; সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল মৃগতৃষ্ণিকা।

কিন্তু এই শীতের বিভ্রমটি ক্ষণিক; কেন না, এই শুষ্ক তৃণহীন ভূমিখণ্ড হইতে বাহির হইবামাত্র, বৃহৎ তালজাতীয় বৃক্ষের, বটবৃক্ষের, Bindweed বৃক্ষের পরিস্ফুট ছায়াতলে আসিয়া উপনীত হইলাম।

এই সময়ে উৎসব-দীপাবলীর আলোকচ্ছটায় নগরটি উদ্ভাসিত। সমস্ত অবারিত মন্দিরগুলি, এমন কি, আলমারির ন্যায় সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্রতম মন্দিরগুলিও, ছোট ছোট প্রদীপে ও হল্‌দে ফুলের মালায় সুসজ্জিত। শ্রীরাগমের অভিমুখে আমার গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে; একটার পর একটা কত দৃশ্যই আসিতেছে, কিন্তু সমস্তই পরস্পরের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। * * *

আবার এই সময়েই "রামদানে"র মাস; সুতরাং মুসলমানদের মধ্যেও এখন উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। যে মস্‌জিদ্‌টির সম্মুখে তুরীভেরী বাদ্যের সহিত, নানা রঙ্গের অসংখ্য উষ্ণীষ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, সেই মস্‌জিদ্‌টি অসংখ্য প্রজ্বলিত দীপকাঠিতে আচ্ছন্ন। পরী-দৃশ্যটি আরও সম্পূর্ণ করিবার জন্যই যেন সাদা প্রাচীরগুলি, স্তম্ভশ্রেণী, লতাপাতা-অঙ্কিত আরবী-ধরণের নক্‌সাদি, প্রজ্বলিত দীপাবলী,—সমস্তই একটি লাল রঙ্গের সূক্ষ্ম মলমল্ বস্ত্রখণ্ডে আচ্ছাদিত; তাহাতে, মস্‌জিদ্ একটু ঘোর-ঘোরভাব ধারণ করিয়াছে, উহাতে গোলাপী রঙ্গের ছায়া পড়িয়াছে; বোধ হইতেছে, যেন মস্‌জিদ্‌টি আরও একটু দূরে সরিয়া গিয়াছে; সমস্ত বস্তুর আকারে ও দূরত্বে যেন এক প্রকার অস্পষ্ট অনিশ্চিতভাব আসিয়া পড়িয়াছে; কেবল মস্‌জিদ্‌টির ঈষৎনীলাভ তুষারধবল "মিনার"-চূড়াগুলি ও গম্বুজটি এই রঙ্গিন বস্ত্রের মধ্য হইতে মাথা বাহির করিয়া রহিয়াছে;—উহাদের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ধ্বজাগ্রগুলি চন্দ্রালোকে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; এবং সমস্ত মিলিয়া এক সঙ্গে তারকা-খচিত আকাশের অভিমুখে সমুত্থিত হইয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সীমাদ্রি-শিখরে।

গুরু গুরু গুরু দেবদুন্দুভি
উঠিয়াছে নভে বাজি' রে।
ধমকি' চমকি' চকিত তড়িৎ
দিকে দিকে ছোটে নাচি' রে!

লম্বিত ঐ শৈলশিখরে
নীরদ-সোপান-রাজি রে।
অমরা হইতে কে এল মরতে—
মন্দাকিনীরে সাজি' রে!

ঝর ঝর ঝর ভূধরবারি
ঢালে দিগঙ্গনা হরষে,
ফুটিছে শিহরি' কেতক নীপ
কাহার চরণ-পরশে?

দেখ দেখ দেখ, কার কেশদাম
ঢেকেছে সকল দিগন্ত;
কার এ বিমল তনু-পরিমলে
সুগন্ধ ধরণী অনন্ত!

কাহারে নিরখি' শিখিনী শিখী
হর্ষ বিথারি' নাচিছে?
গম্ভীর-স্বরে প্রাবৃট-শঙ্খ
কলাপি-কণ্ঠে বাজিছে?

স্নিগ্ধ নীলিমা চারু শ্যামলিমা
মধুর বরণ-দৃশ্য রে।
কার তনু ছায় ঘন নীলিমায়
ফুটিয়া উঠিছে বিশ্ব রে!

গুরু গুরু গুরু দুরু দুরু দুরু
হৃদয় আমার কাঁপিছে!
ঐ ঘন-ঘন-মাঝে মেঘনির্ঘোষে
কে যেন আমারে ডাকিছে।

ঝর্ঝর-ঝর-নির্ঝর-স্বর-
মুখরিত গিরি অরণ্য,
চল আনি' তুলি' গিরিমল্লিকা
চারু চম্পক বরেণ্য।

নীল লোহিত পাটল পীত
কুসুমগুচ্ছ সুরঙ্গ,
আলোক-ছায়া মিলিত কায়া,
যেন হরি-হর একাঙ্গ!

এই নির্ঝর-ধারে শৈলশিখরে
পূজিতে বর সুন্দরে!—
গাঁথ সজনী! প্রসূনদাম,
গাঁথহ চারু ছন্দ রে!

কন্দর্প ও রামচন্দ্র রায়।

চাঁদ রায়ের পর বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপের অধীশ্বর কন্দর্প ও রামচন্দ্র রায়ের বিবরণ আলোচনা করা যাইতেছে। সেনবংশীয় শেষ পরাক্রান্ত রাজা দনুজমর্দ্দন বা দনোজা মাধব চন্দ্রদ্বীপের স্থাপয়িতা। তাঁহার দৌহিত্র বসু-বংশীয়েরা চন্দ্রদ্বীপের অধিকার

লাভ করেন। সুতরাং ইহারা অনেক দিন হইতে পরাক্রান্ত ভুঁইয়া-রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছেন। মোগল-বিজয়ের সময়ে কন্দর্প রায় বাকলার অধীশ্বর ছিলেন। কন্দর্পনারায়ণ অতি পরাক্রান্ত বীর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহার অধীনে অনেক সৈন্য ছিল; তিনি যবনপতি গাজীকে যুদ্ধে নিহত ও মগদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। কন্দর্প রায় কর্ত্তৃক হোসেনপুর হইতে যবনগণ বিতাড়িত হয়। (১) মোগলেরা প্রথমে বঙ্গ জয় করিলে দায়ুদ উড়িষ্যা লইয়া ক্ষান্ত হন। পরে মোগলেরা পূর্ব্ববঙ্গ জয়ের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। মোরাদ খাঁ মুনিম খাঁর আদেশে ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে কতেয়াবাদ ও বাকলা অধিকার করেন। (২) কন্দর্প রায় মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়া আর কখনও বিদ্রোহাচরণ করেন নাই। রালফ্ ফিচ্ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে বাকলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি কন্দর্প রায়ের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, কন্দর্প রায় বন্দুক-ক্রীড়া ভালবাসিতেন। (৩) কন্দর্প রায়ের পর তাঁহার শিশু পুত্র রামচন্দ্র বাকলার অধীশ্বর হন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে জেসুইট প্রচারক ফন্‌সেকা তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত

---

(১) কন্দর্প রায় সম্বন্ধে ঘটককারিকায় এইরূপ লিখিত আছে।—

"কন্দর্পোপমকন্দর্পো জগদানন্দকাত্মজঃ।
মহাধনুর্দ্ধরো মানী মহাবপ্তা মহাশূরঃ॥
অক্ষৌহিণীপতির্বীরঃ সব্যসাচিসমো রণে।
যুদ্ধপ্রিয়ো মহাচণ্ডী যবনারির্মহাবলঃ॥
যবনাধিপতিং গাজিং রণে ব্যাপাদয়ৎ কিল।
মহাবীর্য্যং তথা খর্ব্বমকরোৎ স নৃপোত্তমঃ॥
অতাড়য়ৎ যবনান্ স হোসেনাখ্যপুরাৎ ততঃ।
রথিনাঞ্চ রথী শূরঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥"

(২) "In 982, he (Murad khan) was attached to Munim's Expedition of Bengal. He conerqued for Akbor the district of Fathabad, Sirkar Bogla and was made Governor of Jellasur in Orisa, after Daud had made peace with Munim." (Blochman's Ain-i-Akbari)

(৩) "From Chatigan in Bengala I came to Bacola; the king where of is a Jentile, a man very well disposed and delighted much to shoot in a gun. His country is very great and fruitful, and hath store of rice, much cotten cloth and cloth of

হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি অষ্টমবর্ষীয় ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৫৯৮—৯৯ খৃষ্টাব্দে ফার্ণাণ্ডেজ, সোসা, ফনসেকা ও বাউরেন নামে চারি জন জেসুইট প্রচারক বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। ইঁহারা বঙ্গদেশ ব্যতীত আরাকান প্রভৃতি স্থানেও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ফনসেকা চট্টগ্রাম হইতে বাকলায় উপস্থিত হন। পরে তথা হইতে চ্যাণ্ডিকান বা সাগরদ্বীপে গমন করেন। তৎকালে সাগরদ্বীপ প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত ছিল। ফনসেকা বাকলায় উপস্থিত হইলে, রামচন্দ্র তাঁহাকে আপনার দরবারে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান; এবং তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সম্মানপ্রদর্শন করেন। ফনসেকা বলিয়াছেন যে, তিনি অল্পবয়স্ক হইলেও, তাঁহার বিবেচনাশক্তি অধিকবয়স্কের ন্যায়ই ছিল। রামচন্দ্র ফনসেকাকে তাঁহার গন্তব্য স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করেন যে, আমি চ্যাণ্ডিকানে আপনার ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের নিকট যাইতেছি। আপনার রাজ্যের মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে হইতেছে বলিয়া, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি। এক্ষণে আপনার নিকট প্রার্থনা, আপনি আপনার রাজ্যের মধ্যে গির্জ্জানির্ম্মাণ ও লোকদিগকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিবার আদেশ প্রদান করুন। রামচন্দ্র উত্তর করিয়াছিলেন যে, আমি আপনাদিগের সদ্‌গুণের কথা শুনিয়া নিজেই তাহা ইচ্ছা করিয়াছিলাম। পরে তিনি ফনসেকাকে আজ্ঞাপত্র ও দুই জনের উপযোগী বৃত্তি প্রদান করেন। (৪) ফনসেকার বিবরণ হইতে ইহাও জানা যায় যে, সে সময়ে বাকলায় রামচন্দ্রের আশ্রমে অনেক পর্টুগীজও বাস করিত। কার্ভালোর সহিত যুদ্ধের পর আরাকান-রাজ সনদ্বীপ

---

silke. The houses be very faire and high builded, the streets large, the people naked, except a little cloth about their waste. The woman weare great store of silver hoops about their neckes and armes, and their legs are ringed with silver and copper and ringes made of elephant's teeth."—*Harton Rylay's Ralph Fitch. P. 118.*

(3) "And it appeared to be by the disposition of our lord that when I was about to go to Arracan in the place of Firnandez, who was ill with fever. I too should fall ill, and should be transferred to Ciandeca; so that in this journey the company gained a residency in the kingdom of Bacola. I

অধিকার করিলে, রামচন্দ্র রায় কিছু দিনের জন্য স্বীয় রাজ্য হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। আরাকান-রাজ সেই সুযোগে বাকলা অধিকার করিয়া লন, এবং প্রতাপাদিত্যের রাজ্য অধিকার করিবার সঙ্কল্পও করিয়াছিলেন। (৫) বাকলা মগগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিল। ভবিষ্যপুরাণেও মগগণ কর্ত্তৃক

---

had scarecely arrived there, when the king (who is not more than eight years old, but whose discretion sarpasses his age) sent for me, and wished the Portuguese to come with me. On entering the hall where he was waiting for me, all the nobles and captains rose up, and I a poor priest, was made by the king to sit down in a rich seat opposite to him. After compliments he asked me where I was going, and I replied that I was going to the king of Ciandeca, who is the future father-in-law of your Highness, but that as it had pleased the Lord that I should pass through his kingdom it had appeared right to me to come and visit him and offer him the services of the fathers of the Company trusting that his Highness would give permission to the erection of churches and the making of christians. The king said, 'I desire this myself, because I have heard so much of your good qualites,' and so he gave me a letter of authority, and also assigned a maintenance sufficient for two of us."—*Beveridge's Bakarganj. pp. 30-31.*

(৫) ভূজারিক আরাকান-রাজ কর্ত্তৃক বাকলা-অধিকারের কথা এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন,—

"The king of Arracan, was proud of having taken the island of Sundwip from the Portuguese ; and desiring now to pursue his design of conquering all the kingdoms of Bengal, he snddenly threw himself upon that of Bacola, of which he possessed himself without difficulty as the king of it was absent and still young."—*Beveridge's Bakarganj. P. 34.*

" For whiles the king of Arracan having lately achieved so great matter in Pegu, and added Sundwiva and the kingdome of Baccala intended to annex Chandecan, to the rest of his conquest."—*Purcha's Pilgrim's. Pt. iv. Bk. V. P. 514.*

চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের উল্লেখ আছে। (৬) কিন্তু তাহার পর রামচন্দ্র পুনর্ব্বার বাকলা অধিকার করিয়া লন। রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঘটককারিকায় লিখিত আছে যে, প্রতাপাদিত্য বঙ্গজ-কায়স্থ-সমাজের একাধিপত্যলাভ ও চন্দ্রদ্বীপ-অধিকারের জন্য বিবাহরাত্রিতেই আপনার জামাতাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পত্নীর নিকট হইতে তাহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহার সামন্ত রামনারায়ণ মল্ল চতুঃষষ্টি-ক্ষেপণী-যুক্ত, কামানে সজ্জিত ও সৈন্যে পরিরক্ষিত একখানি নৌকা আনিয়া দেন; রামচন্দ্র তাহাতে আরোহণ করিয়া পলায়ন করেন। তিনি কামানের ধ্বনি দ্বারা স্বীয় গমনসংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। (৭) রামরাম বসু বলেন যে, বিবাহের পর প্রতাপাদিত্য রামচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখেন, এবং তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। রামচন্দ্র পত্নীর নিকট হইতে তাহা শুনিয়া স্বীয় শ্যালক উদয়াদিত্যের সাহায্যে মশালধারীর বেশে প্রতাপাদিত্যের ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নৌকাযোগে বাকলায় প্রস্থান করেন, এবং তোপধ্বনি দ্বারা আপনার পলায়ন জ্ঞাপন করেন। বসন্ত রায় তাঁহার পলায়নের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচার হয়। বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র বলেন যে, বিবাহরাত্রিতে রমাই ভাঁড় নামে এক জন লোক রামচন্দ্রের আদেশমতে স্ত্রীবেশে প্রতাপাদিত্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করায় প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের

---

(৬) "মগধাতিশয়প্রাপ্তিঃ মর্ত্তব্যা সকলাঃ প্রজাঃ।
মগাধিকারো ভাবী চ বেদভ্রষ্টো ভবিষ্যতি।
মগান্তে যবনো ভাবী কল্কিদেবাবধির্দ্বিজাঃ।"

(৭) "যশোহরেশ্বরো মানী প্রতাপস্য দুহিতরং।
বিন্দুমতীং মহাসতীমুপায়েমে নৃপোত্তমঃ॥
ততো বিবাহযামিন্যাং ক্রূরো যশোহরেশ্বরঃ।
সশ্যালস্যাধিপত্যার্থং লাভং চন্দ্রদ্বীপস্য চ॥
মন্ত্রয়ং পাত্রভিঃ সার্দ্ধং বৃতাসৌ ভীমবিক্রমঃ।
কুচক্রং কল্পয়ামাস স্বজামাতুর্বধং প্রতি।
এতৎসর্ব্বং রামচন্দ্রঃ শ্রুত্বা পত্নীমুখাত্ততঃ।
কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াত্মা মহাচিন্তান্বিতোঽভবৎ॥
মল্লকুলোদ্ভবো মল্লো রামনারায়ণঃ শূরঃ।
সামন্তস্তস্য বিখ্যাতো মহাবলসমন্বিতঃ।
শ্রুত্বা সকলসংবাদং নৃপস্য প্রমুখাত্ততঃ।

বধের আদেশ প্রদান করেন। ফলতঃ প্রতাপ যে রামচন্দ্রকে বধ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আমরা সকল প্রবাদ অপেক্ষা প্রাচীন ঘটককারিকার প্রবাদই বিশ্বাস্য বলিয়া মনে করি। রামচন্দ্রের সহিত অনেক দিন হইতে প্রতাপাদিত্যের কন্যার বিবাহের কথা হয়। সম্ভবতঃ, এই বিবাহসময়ে রামচন্দ্র কিছু কাল স্বরাজ্য হইতে অনুপস্থিত থাকায় আরাকান-রাজ বাকলা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহা হইলে, ১৬০২ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্রের বিবাহ হয়। সেই সময়ে কার্ভালোও প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নিহত হয়। রামচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, আপনার বাহুবলের পরিচয়ও প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্যকে জয় করিয়া বন্দি-অবস্থায় স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। (৮) বাকলাতেই লক্ষ্মণমাণিক্যের মৃত্যু সংঘটিত হয়। রামচন্দ্র মোগল ও মগ

চতুঃষষ্টিরণযুক্তা নৌবানীতা মহামতিঃ॥
নালীকৈঃ সজ্জিতা স্বৈরং নৈস্যাদ্যৈঃ পরিবর্দ্ধিতা।
তস্যামারোহণং কৃত্বা প্রগৃহ্য নালীকাধনুঃ।
তূর্ণং গমনবার্ত্তাঞ্চ নালীকধ্বনিভির্দদৌ।
কম্পয়িত্বা শক্রপুরীং স্বরাজ্যে পুনরাগতঃ।"

উজীরপুরের সিংহবাবুগণ উক্ত রামমোহন মল্লের বংশোদ্ভব। তাঁহারাও কায়স্থ-বংশজ।

(৮) "রামচন্দ্রস্তস্য সুতঃ গুণে শ্রীরাঘবোপমঃ।
মহাধনুর্দ্ধরঃ শূরো ভীমসেনসমো বলী॥
জিত্বা লক্ষ্মণমাণিক্যং ভুলুয়াধিপতিং বরং।
স্বরাজ্যে হ্যানয়ামাস বদ্ধা তং নৃপশার্দ্দূলঃ।"

* * *

মহাযোধো মহারথো বিক্রমে কেশরিসমঃ।
ভাগ্যবন্তৎসমশ্চৈব ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥—ঘটককারিকা।"

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ বলেন যে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণমাণিক্যের রাজ্যে উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মণ আমোদ প্রমোদের জন্য তাঁহার নৌকায় উপস্থিত হন; কিন্তু বিশ্বাসঘাতক রামচন্দ্র তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনেন। শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় ভুলুয়া হইতে এইরূপ প্রবাদ জ্ঞাত হইয়াছেন যে, রামচন্দ্র যুদ্ধঘোষণা করিয়া ভুলুয়ায় উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মণমাণিক্য তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য তাঁহার রণতরীতে লম্ফ প্রদান করিয়া পতিত হইলে, তিনিই অবশেষে ধৃত হন। সিংহ মহাশয় উক্ত প্রবাদ কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, বলিতে পারি না। কিন্তু ঘটককারিকায় দেখা যায় যে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে পরাস্ত করিয়াই বন্দি-অবস্থায় আনয়ন

কর্ত্তৃক আক্রান্ত পর্টুগীজদিগকে স্ববাজ্যে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ গঞ্জালেস কিরিঙ্গী আপনার প্রাধান্যবিস্তারের জন্য রামচন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে সে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক রামচন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ করিয়া, তাঁহার অধিকারস্থ সাহাবাজপুর ও পাতলেভাঙ্গা অধিকার করিয়া লয়। গঞ্জালেস নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিশেষরূপ আলোচনা করা যাইবে। রামচন্দ্রের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণও অত্যন্ত বীর ছিলেন, তিনি নৌযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধ ও সুদক্ষ ছিলেন, এবং মেঘনার উপকূল হইতে ফিরিঙ্গীগণকে বিতাড়িত করিয়া দেন। ঢাকার নবাব তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। (৯) চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ বাহুবলের জন্য বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। বংশানুক্রমে তাঁহারা বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কচুয়া নামক স্থানে প্রথমে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। পরে কন্দর্প রায় মাধবপাশার রাজধানী স্থাপিত করেন। (১০) বাকল নামে কোন নগর ছিল কি না, জানা যায় না; থাকিলে, ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দের প্লাবনে তাহা বিধৌত হইয়া গিয়াছে। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দের ভীষণ মহাপ্লাবনের কথা আইন-আকবরীতেও লিখিত আছে।

করেন। প্রাচীন ঘটককারিকা অপেক্ষা বর্ত্তমান প্রবাদের অধিক মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

(৯) "কীর্ত্তিনারায়ণো বীরো মহামানী তদঙ্গজঃ।
জগদেকশূরঃ সোঽপি নৌযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধকঃ॥
মেঘনাদোপকূলে স জেবঙ্গসৈনিকৈঃ সহ।
অদ্ভুতং সমরং কৃত্বা তীব্রাৎ সর্ব্বানতাড়য়ৎ॥
জাহাঙ্গীরপুরাধীশো নবাবো যবনস্ততঃ।
স্থাপয়ামাস মিত্রত্বং সার্দ্ধং তেন প্রযত্নতঃ॥"—ঘটককারিকা।

(১০) "স্থাপয়ামাস পুরঞ্চ বাহুবিকাটিসংজ্ঞকং।
তথা মাধবপাশাঞ্চ ক্ষুদ্রকাটিং তথৈব চ॥"

মাধবপাশা সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—

"চতুর্বর্ষসহস্রানি প্রথমং কলিযুগস্য চ।
গমিষ্যন্তি যদা বিপ্রাশ্চন্দ্রদ্বীপে তদা মহৎ।
পত্তনঞ্চ নদীপার্শ্বে মাধবপাশং ভবিষ্যতি॥
মাধবপাশপত্তনস্থা লোকা ধর্ম্মকৃতা যদা।
স্থাস্যন্তি গ্রামপার্শ্বে চ তদা মাধবদেবকঃ॥"

প্রতাপাদিত্য।

প্রতাপাদিত্য হিন্দু ভুঁইয়াত্রয়ের অন্যতম ছিলেন। তিনি কিরূপ পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন, তাহা সকলেই বিশেষরূপ অবগত আছেন। যদিও কোন মুসলমানী ইতিহাসে তাঁহার বিবরণ বর্ণিত হয় নাই, তথাপি জেসুইট প্রচারকগণের বিবরণ হইতে আমরা তাঁহার পরাক্রমের পরিচয় পাইয়া থাকি। তাঁহারা বারভুঁইয়ার মধ্যে শ্রীপুর ও চণ্ডীকানের অধিপতিকে ক্ষমতাশালী নরপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য সেই চণ্ডীকানেরই অধিপতি ছিলেন। এই চণ্ডীকান বা চণ্ডীকা সাগরদ্বীপের নামান্তরমাত্র। প্রতাপাদিত্য সাগরদ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন, এই জন্য ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক তিনি চণ্ডীকানের অধিপতি বলিয়া কথিত হইতেন। প্রতাপাদিত্য কিরূপে আপনার পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সম্বন্ধে কি পরিমাণে প্রকৃত ইতিহাস জানিতে পারা যায়, আমরা প্রতাপাদিত্য নামক প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে তাহার আলোচনা করিব।

এই সমস্ত ভুঁইয়া ও জমীদারগণের ইতিহাসের আলোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, বাঙ্গালী এককালে বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইত না। তাহারা আপনাদের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিত। কেবল ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর কথা নহে, ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব-সংস্থাপনের অব্যবহিত পূর্ব্বেও, অষ্টাদশ শতাব্দীতে, বাঙ্গালী বাহুবলের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে। যাঁহারা সীতারাম রায় ও উদয়নারায়ণের বিবরণের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাঙ্গালীগণ রাজসরকারে কার্য্য প্রাপ্ত হইয়াও অস্ত্রধারণে কুণ্ঠিত হইতেন না। জানকীরাম ও দুর্লভরাম প্রভৃতি তাহার প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল। আমরা আমাদের ইতিহাসের আলোচনা করি না, তাই আমরা আমাদিগকে কাপুরুষের সন্তান বলিয়া মনে করিয়া থাকি। ইতিহাসপাঠে জানা যায়, আমাদের পিতৃপিতামহ-গণ কাপুরুষ ছিলেন না। কেবল আমরাই কাপুরুষ হইয়া উঠিয়াছি। ইতিহাস গুরুগম্ভীরস্বরে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বীরত্ব ঘোষণা করিতেছে।

ভারতচন্দ্রের যুগ।

দেশের ও সমাজের অবস্থা।

স্বদেশের শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যেও বিলাসবাহুল্য অত্যন্ত প্রবল ছিল। ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য হেতু অনেকেরই দুর্নাম রটিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, মুর্শিদকুলীর সহিত তদীয় জামাতা সুজা খাঁর মনান্তর হয়; মনান্তরের প্রধান কারণ, মুর্শিদকুলীর কন্যা জিনেতউন্নিসা স্বামীর ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যে অত্যন্ত মর্ম্মাহতা হইয়াছিলেন। এই এক দোষে সুজা খাঁর বহু সদ্‌গুণ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। (১)

দুর্ভাগ্য স্বল্পভোগী সরফরাজের দোষরাশির উপর বিস্মৃতির যবনিকাপাতই বাঞ্ছনীয়। শুনা যায়, তাঁহার শুদ্ধান্তশোভিনীদিগের সংখ্যা ১৫০০ ছিল। (২) এই-টুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহার ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যে দেশের প্রধানগণ তাঁহার প্রতি বিমুখ হইয়াছিলেন। "জগৎশেঠের পুত্র এক পদ্মাসুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন, এই সংবাদ অবগত হইয়া, তিনি একদিন ঐ কন্যাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এতাদৃশ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন যে, কেহই তাঁহার জিদ ভঙ্গ করিতে পারিল না। জগৎশেঠকে অগত্যা পুত্রবধূকে রাজভবনে লইয়া গিয়া নবাবকে দেখাইয়া আসিতে হইয়াছিল।" (৩) অপদার্থ সরফরাজ প্রজার মান সম্ভ্রমের বিষয়ে এমনই উদাসীন ছিলেন।

স্নেহান্ধ, স্ত্রৈণ আলিবর্দ্দী স্বজনগণের দোষে একান্তই অন্ধ ছিলেন। যে যুবকের কুক্রিয়া-স্রোতে তাঁহার সযত্নসংস্থাপিত সিংহাসন ভাসিয়া গিয়াছিল, সে তাঁহারই অতিরিক্ত স্নেহে নষ্ট হইয়াছিল। বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইবার কয়

---

(১) হাজি আহম্মদ তাঁহার জন্য সুন্দরী সংগ্রহ করিতে যাইয়া বহু মান বিরাগভাজন হয়েন। মুতাক্ষরীণের টীকায় সুজা খাঁর ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের বিষয় যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সহজে বিশ্বাস করাই দুঃসাধ্য।—লেখক।

(২) Stewart—History of Bengal.

(৩) স্বর্গীয় রাজগতি ন্যায়রত্নের "বাঙ্গালার ইতিহাস।" See Holwell—Interesting Historical Events.

দিন পূর্ব্বে সিরাজদ্দৌলার জন্ম হয়; সেই হইতে তাঁহার প্রতি আলিবর্দ্দীর স্নেহ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। কামুকতাই আলিবর্দ্দীর বংশের কাল হইয়াছিল। তিনি সরফরাজের জননীর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি দেখাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা হাজি আহম্মেদ সরফরাজের অন্তঃপুর হইতে বলপূর্ব্বক কয় জন রমণীকে ভোগার্থ লইয়া যাইলে, আলিবর্দ্দী তাহার প্রতীকার করা দূরে থাকুক্, সে বিষয়ে দৃষ্টিপাতও করেন নাই। তাঁহার ক্ষমতাসূর্য্য যখন মধ্যাহ্নগগনে করবিস্তার করিতেছিল, তখন তাঁহার পরিবারে যে সকল কুকাণ্ডের অভিনয় হইত, সে সকল লিপিবদ্ধ করিতে লজ্জাবোধ হয়। হোসেন কুলী সিরাজের পিতৃব্যপত্নী ঘাসিটী বেগমকে পরিত্যাগ করিয়া যখন সিরাজজননী আমিনা বেগমের মোহে মুগ্ধ হন, তখনই সিরাজ ঈর্ষ্যাজর্জ্জরিতা পিতৃব্যপত্নীর সম্মতিক্রমে তাহার প্রাণনাশ করেন। এই কুকার্য্যে যে আলিবর্দ্দীরও সম্মতি ছিল না, এমন বলা যায় না। (৪)

মুতাক্ষরীণ-প্রণেতা সিরাজের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই যে, তিনি কুক্রিয়াসক্ত অনুচরবর্গের সমভিব্যাহারে মুর্শিদাবাদের রাজপথে পরিভ্রমণ-কালে, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতেন। লোকেরা তাঁহার দর্শনমাত্রেই বলিয়া উঠিত, "ভগবান্, দুরাত্মার হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।"

অল্প দিনেই হীরাঝিলে বিলাস-বাসনাও ক্রমাগত চরিতার্থতা হেতু নূতনের চাকচিক্যহীন হইয়া পড়িতে লাগিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মোগলরাজত্বের অন্তিমকালীন মুর্শিদাবাদের নবাবের সভা দিল্লীর রাজসভার প্রতিবিম্বমাত্র।

বঙ্গদেশে ধান্য ও অন্য বহুবিধ শস্য,—রেশম, কার্পাস ও নীল প্রভৃতি উৎপন্ন হইত। (৫) সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাঙ্গালায় যে ধান্য উৎপন্ন হইত, তাহার উদ্বৃত্ত অংশ নৌকাযোগে গঙ্গাতীরে পাটনা পর্য্যন্ত ও সাগরকূলে মছলীপট্টমে রপ্তানী হইত। এমন কি, সিংহলে ও মালদ্বীপেও বঙ্গ হইতে চাউল যাইত। বাঙ্গাল হইতে কর্ণাটে, মোকা ও বসোরার পথে আরবে, মেসোপোটেমিয়ায়,

---

(৪) মুতাক্ষরীণ।

(৫) ভারতচন্দ্রের "দিল্লীতে উৎপাত" বর্ণনে দেখিতে পাই,—

"ধান চাল মাষ মুগ ছোলা অরহর।
সরষা আদি বরবটী বাটুলা মটর॥
দেধান মাড়ুয়া কোদো চিনা ভুরা যব।
জনার প্রভৃতি গম আদি আর সব॥"

এবং বন্দর আরবদের পথে পারস্যে চিনি যাইত। বঙ্গে আম্র, আনারস, লেবু, হরিতকী প্রচুর ফলিত। (৬) গোধূম যে না জন্মিত, এমন নহে। তবে দেশের লোক অন্নাহারী বলিয়া অধিক গোধূমের উৎপাদন করিত না। যে গোধূম জন্মিত, ইংরাজ, ডাচ ও পর্টুগীজ জাহাজের নাবিকগণ তাহাতে বিস্কিট প্রস্তুত করিত। কয় প্রকার উদ্ভিদ, অন্ন ও ঘৃতই দেশের সাধারণ লোকের প্রধান আহার ছিল। সে সকল দ্রব্যই সুলভ ছিল। ছাগমাংস, মেষমাংস, শূকরমাংস ও পক্ষিমাংসও সুলভ ছিল। তাই প্রবাদ ছিল, বঙ্গে প্রবেশের শত দ্বার মুক্ত, কিন্তু বঙ্গ হইতে বাহির হইবার একটি দ্বারও নাই। কারণ, খাদ্যাদি সুলভ ছিল। পক্ষান্তরে বঙ্গের জলবায়ু সহজে বিদেশীয়দিগের সহ্য হইত না। রেশম ও কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত। এই সকল দ্রব্য কাবুলে, জাপানে, য়ুরোপেও প্রেরিত হইত। ডাচ ও ইংরাজগণ বঙ্গের সোরার ব্যবসায় চালাইত। জলপথবহুল বঙ্গে জলপথের উভয় পার্শ্বে বহু জনপূর্ণ গ্রাম ছিল। গ্রামের ক্ষেত্রে বহুবিধ উদ্ভিদ ও শস্য জন্মিত। তদ্ভিন্ন, গ্রামে রেশমের গুটীপোকার আহার্য্য তুঁত-গাছও যথেষ্ট দৃষ্ট হইত। নদীগর্ভে বহু চর ছিল, চরের ভূমিও বিশেষ উর্ব্বর ছিল। দেশে কড়ীও মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। (৭) বঙ্গের পাটী তখনও প্রসিদ্ধ। (৮)

জলপথবহুল বঙ্গে নানা প্রয়োজনানুরূপ নানাবিধ নৌকা নির্ম্মিত হইত। (৯)

---

(৬) সুপারী ও দাড়িম্বও জন্মিত। India of Aurangzeb গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।—লেখক।

(৭) Bernier.

(৮) India of Aurangzeb.

(৯) India of Aurangzeb.

"রঘুবংশে" রঘুর দিগ্বিজয়-বর্ণনায় কালিদাস লিখিয়াছেন,—

বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ॥"

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে মুকারম খাঁর কথায় Stewart বলেন, তিনি ঢাকায় আসিয়া রাজধানী করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ নদীবহুল, বিশেষ বর্ষাকালে অনেক স্থান জলমগ্ন থাকে; তজ্জন্য বঙ্গে শাসন-কর্ত্তাকে বহুবিধ নৌকা রাখিতে হইত। জলদেবতার প্রতি হিন্দু ও মুসলমান প্রজার ভক্তির আধিক্য হেতু শাসন-কর্ত্তাকেও বাধ্য হইয়া জলদেবতার পূজা দিতে হইত।—History of Bengal.

মুতাক্ষরীণের টীকায় দেখা যায়, ঢাকা হইতে বর্ষে বর্ষে দিল্লীতে নৌকা প্রেরিত হইত।

দিল্লীতে সম্রাটের অনুকরণে মুর্শিদাবাদে নাজিম স্বয়ং বা কর্ম্মচারীর সাহায্যে বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। আবার তাঁহার অনুকরণে জমীদারগণ আপন আপন অধিকারমধ্যে বিচার করিতেন। "জনশ্রুতি আছে যে, যবনরাজত্বকালে নবদ্বীপের রাজারা আপন অধিকারমধ্যে সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তির স্বত্বাসত্বের ও সর্ব্বপ্রকার অপরাধের বিচার করিতেন। রাজা প্রতিদিন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিচারাসনে বসিয়া সর্ব্বসাধারণের আবেদন শুনিতেন ও তাহার বিচার করিতেন। স্বত্বাস্বত্বের বিচার প্রথমে তাঁহার দেওয়ান করিতেন, কিন্তু তাহার চূড়ান্ত আদেশ রাজা দিতেন। অপরাধের বিচারের ভার তাঁহার ফৌজদারের প্রতি অর্পিত ছিল। এই উভয় কর্ম্মচারীর কৃত বিচারের আপীল রাজসন্নিধানে হইত। রাজা অবিচার করিলে তাহার আপীল নবাবের নিকট হইতে পারিত। কিন্তু রাজার বিচারের বিরুদ্ধে অপীল করা অতি দুঃসাহসের কর্ম্ম ছিল।" (১০)

বর্দ্ধমানের "গড়বর্ণনে" ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন,—দস্যু, তস্কর ও ভ্রষ্টাগণ "বেড়াপায় মেগে খায় রাজার রাজার।" কোতয়ালি চতুরতায়,—

"যমালয় সমান লেগেছে ধুমধাম।
ঠড়ঠকি হাড়ির কোড়ার পটপটি।
চর্ম্ম উড়ে চর্ম্ম পাদুকার ছটছটি।"

ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তে দেখা যায়, বর্দ্ধমান রাজদরবারে উকীলও থাকিত।

নবদ্বীপের রাজাদের সদর কাছারীতে "ন্যূনাধিক দুই শত কর্ম্মচারী থাকিতেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণের "তিন সহস্র অশ্বারোহী ও সপ্ত সহস্র পদাতিক সৈন্য ছিল।" বর্দ্ধমান-বর্ণনায় ভারতচন্দ্র সেনাগণের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু একবারেই ভিত্তিহীন বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ নাই। সেই দস্যুতস্করের অত্যাচারবহুল কালে জমীদারদিগকে লোকবলে

"কবিকঙ্কণচণ্ডী"তে "মধুকরাদি" যে সকল ডিঙ্গীর উল্লেখ ও বর্ণনা আছে, সে সকল পাঠ করিলে সহজেই মনে হয়, বঙ্গে বহু দিন হইতে নৌনির্ম্মাণ চলিত ছিল।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে জলযানের ও জলদস্যুর কথা বঙ্গের ইতিহাসে অনেক স্থানেই দৃষ্ট হইবে। বাহুল্যবোধে অধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম না।

এখন বঙ্গদেশে নৌনির্ম্মাণব্যবস্থা বিলুপ্ত হইতেই বসিয়াছে।—লেখক।

(১০) ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত

আত্মরক্ষা ও প্রজারক্ষা করিতে হইত, এবং সেই জমীদারসম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই সীতারামের ও প্রতাপাদিত্যের অভ্যুদয়। প্রথম হইতে সেনাসংগ্রহ বিষয়ে বাধা পাইলে তাঁহারা অল্পবাস মধ্যে সেনাগর্ব্বে মুসলমান-শাসন অবহেলা করিয়া আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করিতে সাহসী হইতেন না। ভারতচন্দ্রের বর্ণনা,—

"চালী খেলে উড়া পাকে ঘন হান হান হাঁকে
রায়-বেঁশে লোকে রায়বাঁশ।
মল্লগণ মাল মাটে ফুটি হেন মাটী ফাটে
দূরে হৈতে শুনিতে তরাস।"

তখন "ফিরীঙ্গী"রা দেশীয় জমীদারদিগের সেনাদলেও কার্য্য করিত; মোগল-পাঠানগণ সৈনিকের কার্য্য করিত; "অস্ত্রশস্ত্রে বিশারদ সমরে অটল" ক্ষত্রিয় সকল ও "যুদ্ধে মজবুত" যত রাজপুত তাঁহাদিগের প্রধান বল ছিল।

সমাজে, এমন কি, পূজাদি-প্রচলনেও জমীদারদিগের—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ জমীদারদিগের—বিশিষ্ট প্রাধান্য ও অধিকার ছিল। নবদ্বীপের "রাজারা ক্যাচারীকে জাতিচ্যুত ও পতিতকে উদ্ধার করিতেন। শূদ্রজাতির মধ্যে কেহ দুষ্কর্ম্মদোষে পতিত হইলে রাজসনন্দ ব্যতীত কখনই সমাজে চলিত হইত না। * * *। উজনীরা গোপসম্প্রদায়ের জল পূর্ব্বে ব্যবহৃত ছিল না। এই রাজারা এ প্রদেশে, তাহাদিগকে চলিত করেন।" (১১) "চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি" জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণার পূজা প্রবর্ত্তিত করেন।

জমীদারগণ যথেচ্ছাচারী ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা অনেকেই প্রজারঞ্জক ছিলেন। সুগঠিত রাজবর্ত্ম, বিস্তৃত সেতু ও সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা অনেক স্থানে তাঁহাদিগের কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। পূর্ব্বকালে সুলভ শ্রমজীবীর শ্রমে তাঁহারা যে সকল সরোবর খনন করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমানে তাঁহাদিগের বংশধরগণের পক্ষে সে সকল সংস্কৃত করাই দুঃসাধ্য। (১২) তখন পথিপার্শ্বে ছায়াবহুল বৃক্ষরোপণ, সরোবর-খনন প্রভৃতি লোকে পুণ্য কার্য্য বলিয়া মনে করিত। অনেক জমীদার বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইহাদের মধ্যে নবদ্বীপের রাজবংশীয়গণ বিশেষ উল্লেখ-

(১১) ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিত।

(১২) তখন বেগারও চলিত ছিল। কিন্তু লোকের উপকারার্থ বলিয়া লোকে বেগার দেওয়া অন্যায় মনে করিত না। প্রাচ্যে এরূপ অনেক কার্য্যই বেগারশ্রমে সম্পন্ন Stein's Sand-Buried Ruins of Khotan দ্রষ্টব্য।—লেখক

যোগ্য। এই বংশীয়গণ নানা স্থান হইতে পণ্ডিতদিগকে আনিয়া অধিকারমধ্যে স্থাপিত করিতেন, এবং অধ্যাপকদিগকে পরিবারের ও শিষ্যবর্গের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ভূমি বা বৃত্তি দান করিতেন। রাজসমীপে পরীক্ষাপ্রদান পূর্ব্বক ছাত্রদিগকে উপাধি গ্রহণ করিতে হইত। কৃষ্ণচন্দ্রের সভা "নানাজাতি সুগন্ধ সুন্দর কুসুম-শোভিত উদ্যানের ন্যায় বিবিধ গুণসম্পন্ন বুধগণে শোভমান ছিল।"

দেশীয় শিল্প এই সকল জমীদারের উৎসাহেই উন্নতিলাভ করিত। রাজসভায় সঙ্গীতচর্চ্চা হইত। রাজপরিবারের জন্য বস্ত্রবয়নে তন্তুবায় শিল্পকৌশলে উন্নতি-লাভ করিত। জমীদারদিগের সহায়তাতেই স্থপতিশিল্প ও ভাস্করকার্য্য শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিত। রাজগণপ্রকাশিত নানা দেবমূর্ত্তিনির্ম্মাণেই কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারগণ মৃন্মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে নিপুণ হইয়া উঠে। এ কার্য্যে তাহারা বিশেষ উৎসাহ পাইত। তাহাদিগের বংশধরগণ নানাবিধ মৃন্ময়ী মূর্ত্তির নির্ম্মাণ করিয়া অদ্যাপি দেশ বিদেশে প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কার লাভ করিতেছে। এই সকল মূর্ত্তিতে স্বভাবানুকরণনৈপুণ্য দেখিলে শিল্পীর প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

বঙ্গে স্থপতিশিল্পেরও যে উন্নতি না হইয়াছিল, এমন নহে। বঙ্গের স্থাপত্যে বিশেষত্ব বিদ্যমান। বর্ত্তমান সময়ের মিশ্রিত স্থাপত্যে যে সকল কদাকার গৃহ লোকের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিতেছে, সে সকল ছাড়িয়া দিলে বুঝা যায়, বঙ্গের কুটীরে ও বঙ্গের মন্দিরাদি গৃহে বিশেষ সাদৃশ্য বিদ্যমান। তাহাই বঙ্গের স্থপতিশিল্পের বিশেষত্ব। (১৩) বঙ্গের স্থপতিশিল্পের অনেক উৎকৃষ্ট নিদর্শন অদ্যাপি বর্ত্তমান। দিনাজপুরে কান্তনগরের মনোহর মন্দির ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হয়। ১৪ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপিতামহ রাজা রুদ্র, ঢাকা হইতে আলাল দত্ত নামক এক জন প্রসিদ্ধ স্থপতিকে আনাইয়া কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর চক ও নওবৎ-খানা ইত্যাদি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান; এবং তাহাকে এখানে (কৃষ্ণনগরে) রাখিয়া অন্যত্য গাঁড়ালজাতীয় অনেক ব্যক্তিকে তদ্দ্বারা স্থপতিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ান। এই জাতির মধ্যে একণ সুনিপুণ স্থপতি সকল হয় যে, তাহারা কৃষ্ণনগরের রাজভবনে যে বৃহৎ শোভান্বিত পুজার দালান (১৫) ও শিবনিবাসের যে তিন দেবমন্দির নির্ম্মাণ

(১৩) Fergusson—Indian and Eastern Architecture.

(১৪) Buchanan Hamilton—Eastern India. Edited by Martin

(১৫) "রাজার প্রকাণ্ড বাড়ী সেকেলে গঠন,
কত সিঁড়ি, কত ঘর, যেন হর্ম্ম্যবন;

করে, তাহার কল কৌশল অদ্যাপি দেখিলে দর্শকগণ প্রীত ও চমৎকৃত হন। এমন সুন্দর সুপ্রশস্ত ও সুদৃঢ় পুস্তার প্রাসাদ এবং এরূপ উন্নত ও দৃঢ়তর মন্দির বঙ্গ দেশের মধ্যে অন্য কোন স্থানে নয়নগোচর হয় না। * * * * শিবনিবাসের কোন কোন অট্টালিকার প্রাচীরে চূণ ও সুরকি ইত্যাদি সামান্য উপকরণ দ্বারা এরূপ সুন্দর ও সুদৃঢ় জাকরি নির্ম্মিত হইয়াছে যে, যদিও তাহাতে দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত ঝড় ও বৃষ্টির আঘাত লাগিতেছে, তথাপি এখন পর্য্যন্ত তাহা অব্যাহত রহিয়াছে। ইহা দেখিলে প্রস্তর ব্যতীত আর কিছু অনুমিত হয় না।" (১৬) দিবাপতিরা রাজবংশের বংশপতি দয়ারাম সীতারামের কৃষ্ণজীকে যে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন, সে গৃহ এত দৃঢ় যে, গত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের দারুণ ভূমিকম্পে তাঁহার পরবর্ত্তিগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সৌধমালা ভূমিসাৎ হইলেও, সেই প্রাচীন জরাজীর্ণ গৃহ ভগ্ন হয় নাই। ৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে উড়িষ্যার মন্দিরসমূহের নির্ম্মাণ আরব্ধ হয়। ভুবনেশ্বরের মন্দির ৬৬৭ খৃষ্টাব্দে ও পুরীর মন্দির ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। বুদ্ধগয়ার বর্ত্তমান মন্দির ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে তৃতীয়বার নির্ম্মিত হয়। তখন বঙ্গে জমীদারগৃহ গড়বেষ্টিত হইয়া সুরক্ষিত ও সুন্দর হইত।

পূর্ব্বে, যে যে সম্প্রদায়ের যে যে ব্যবসায়, তাহারা তাহাই করিত। সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনশঙ্কায় ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইত না। তখন ব্রাহ্মণগণ "নাজির বা দারোগার পদ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিতেন না।" "তদানীন্তন ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ কেবল অধ্যয়ন অধ্যাপন, ধর্ম্মালোচনা ও গ্রন্থরচনা এই সকল অনুষ্ঠানেই জীবনযাপন করিতেন। সাংসারিক সুখ দুঃখের প্রতি প্রায় কিছুই মনোনিবেশ করিতেন না।" (১৭)

চমৎকার পরিপাটী পুস্তার দালান
ভবনের মধ্যে ইটি নৈপুণ্যে প্রধান,
বজ্র সম গাঁথা ইট, চিত্রিত উপরে,
কত কাল গেছে তবু চমৎকার করে,
গড়ের বাহিরে সিংহদ্বারচতুষ্টয়,
নিপুণ গাঁথনি তার শক্ত অতিশয়,
প্রস্তর বিস্তর, আছে উচ্চতা বিশেষ,
খিলানে যোজনা করা নাহি কাঠলেশ।"—সুরধুনী কাব্য

(১৬) ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।

(১৭) ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।

দস্যু তস্করের উপদ্রবে দেশবাসী যাঁহারা স্বচ্ছন্দাবস্থায় কালাতিপাত করিতে পারিতেন, তাঁহারাও দীন অবস্থায় বাস করিতেন। "তাঁহাদের অর্থ চন্দ্র সূর্য্যেরও গোচর হইত না, নিয়ত গৃহের প্রাচীরমধ্যে অথবা ভূগর্ভে নিহিত থাকিত। ঋণের আদান প্রদান কার্য্য পর্য্যন্ত অতি সঙ্গোপনে সম্পাদিত হইত। অধিক লোকের বিদিত হইবার আশঙ্কায় ঋণপত্রে অন্য সাক্ষী না করিয়া কখন কখন কেবল ধর্ম্ম সাক্ষী লিখিত হইত। দস্যুতস্করভয়ে সাধারণ লোকেরা ঘরের মেঝের মধ্যস্থলে একটী গর্ত্ত রাখিতেন, এবং রাত্রিতে আভরণ ও তৈজসাদি তন্মধ্যে রাখিয়া তদুপরি এক কাষ্ঠফলক প্রদান পূর্ব্বক তাহার উপর শয্যা করিয়া নিদ্রা যাইতেন। সন্ধ্যার পর গ্রামান্তরে যাইতে হইলে বিষম বিপদ উপস্থিত হইত। স্থলপথ অপেক্ষা জলপথ আরও বিপদজনক ছিল।" (১৮)

ভারতবাসীদিগের অলঙ্কারপ্রিয়তার বিষয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ধনবান ও সম্ভ্রান্তগণ আপনাদিগের কামিনীগণকে রত্নাভরণ ও স্বর্ণভূষণ দিতেন। "মধ্যবিত্ত মহিলাগণ নাসিকায় নথ, কর্ণদ্বয়ে নলঝুমকা বা বেঁড়িঝুমকা, গলদেশে পাঁচনর বা সাতনর বা কণ্ঠমালা, এই কয়েকখানি স্বর্ণালঙ্কার পরিতেন। আর বাহুদ্বয়ে তাড়, হস্তদ্বয়ে বাউটি, গজরা, ঝুমুর, কুসীকঙ্কণ ও পুঁইচা, কটিদেশে গোট বা চন্দ্রহার, পাদযুগলে মল, পদাঙ্গুলিতে পাওলি, এই কয়েকখানি রজত-নির্ম্মিত আভরণ পরিধান করিতেন। (১৯) অপেক্ষাকৃত হীনবিত্ত রমণীরা স্বর্ণাভরণের মধ্যে কেহ বা কেবল নথ ও কণ্ঠমালা, এবং তিন চারখানি রূপার অলঙ্কার পাইলেই চরিতার্থ হইতেন। অধমাবস্থার স্ত্রীলোকের স্বর্ণ বা রজত নির্ম্মিত কোন অলঙ্কার থাকিত না। তাঁহারা কাংস্য বা পিত্তলের আভরণ পাইলেই কৃতার্থ্যন্ম

(১৮) ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।

(১৯) "কবিকঙ্কণচণ্ডীতে" বহুবিধ অলঙ্কারের উল্লেখ আছে। তাড় বালা, কঙ্কণ, কেয়ুর, [অঙ্গদ] অঙ্গুরী, হার, [পাঁচনর ও সাতনর ও কণ্ঠমালা] নূপুর পাঁসলি, চুড়ী, ও কর্ণে হেম-মুকুলিকা এবং কর্ণপুর ও শঙ্খ উল্লেখযোগ্য।

১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে ঘনরাম "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থে অঙ্গুরী কর্ণপুর, কণ্ঠমালা ও শঙ্খ ব্যতীত আরও যে সকল অলঙ্কারের উল্লেখ আছে, "নষানী সিবাইদত্ত বাবরের বৌ"র নাউসেনকে দেখিয়া "লাস বেশ"—বর্ণনায় সে সকলের নাম পাওয়া যায়। সে তালিকাও নিতান্ত সঙ্ক্ষিপ্ত নহে।—

"আরোপে অলকাকোলে মুকুতার পাঁতি।
সীমন্তে রচিয়া দিল স্বর্ণের সিঁথি॥
অঙ্গে পরে অপূর্ব্ব অনেক অলঙ্কার।
প্রবাল পুরট পাঁতি গজমতিহার॥

হইতেন। রাজপরিবারস্থ কামিনীগণ তৎকালেও বিবিধ রত্নখচিত স্বর্ণভূষণে ভূষিত থাকিতেন।" (১৯) শাঁখা, সোনা, রঙ্গিন শাড়ী সকলের ভাগ্যে জুটিত না।

বঙ্গদেশে নানাবিধ বেশমের ও কার্পাসের বস্ত্র হইত। "কবিকঙ্কণচণ্ডী"তে "পুনঃপুনঃ পাটের শাড়ী"র ও "তসরের শাড়ী"র উল্লেখ আছে। ঢাকাই মজলিন ও মালদহের পট্টবস্ত্র দিল্লীর প্রাসাদে সাদরে ব্যবহৃত হইত। (২০) সেরূপ সুন্দর বস্ত্র

দোহুতি তেহুতি মতি হেম কণ্ঠমালা।
গোরা গায় গমনতি গর্ব্ব করে ভাল॥
নাসায় বেশর পরে করিয়া লাবণ্য।

* * * *

কাণে পরে কুণ্ডল কনক কাটা কড়ি।
সহজে সুন্দরী তায় বেশ করে বড়ি।
করেতে কঙ্কণ শঙ্খ বাজুবন্দ ছড়া।

* * * *

পরিল পুরট টাড় বিচিত্র বাউলী।
কটীতে কিঙ্কিণী পরে পাদাগ্রে পাসুলি॥
তৎপর যে পদভূষা পাতা গোটা মল।"—জ্ঞানতি পালা।

অন্যান্য প্রাচীন কাব্যগ্রন্থেও প্রায় এই সকল অলঙ্কারের উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বঙ্গদেশে যথেষ্ট অলঙ্কার চলিত ছিল। তখন লোকে অলঙ্কার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করিত। সাধারণ লোকের পক্ষে দেহই সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত তোষাখানা ছিল।—লেখক।

(১৯) সুবর্ণবণিক স্বর্ণকারদিগের চাতুরীর পরিচয় "চণ্ডী"তে প্রাপ্তব্য।—লেখক

"সুবর্ণ বণিক বৈসে, রজত কাঞ্চন কসে,
পোড়ে কোড়ে হইলে সংশয়।
কিছু বেচে কিছু কেনে, মনুষ্যের ধন আনে,
পুরমধ্যে যাহার নিলয়।
নিবসে পশ্চাতে হর, পুরমধ্যে বা'র ঘর,
নির্ম্মাণ করয়ে আভরণে।
দেখিতে দেখিতে জন, হরয়ে সভার ধন,
হাথ বদলিতে ভাল জানে।
(বণিক ও নরশায়কদিগের আগমন।)

(২০) ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।

(২১) Stewart—History of Bengal.

এখন আর প্রস্তুত হয় না। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মালদহের সেখ ভিক পারস্যউপসাগরের পথে তিন জাহাজ মালদহী বস্ত্র রুশিয়ায় প্রেরণ করেন। (২২) পাটনাতেও মজলিন প্রস্তুত হইত। (২৩) ঢাকাই মজলিনের সাধারণ নাম মলমলখাস অর্থাৎ রাজ-মজলিন)। এক প্রকার মজলিনের নাম ব্যপ্তহাওয়া (বয়নকৃত বায়ু), এক প্রকারের নাম আবরাওয়ান (প্রবাহিত সলিল), এক প্রকারের নাম শবনম (সান্ধ্য শিশির)। শেষোক্ত মজলিন সিক্ত অবস্থায় তৃণোপরি সংস্থাপিত হইলে শিশির ভিন্ন অন্য কিছু বোধ হইত না। (২৪)

তক্লু ও চরখা উভয়বিধ যন্ত্রে সূত্র প্রস্তুত করণ মহিলাদিগের আয়ের এক উপায় ছিল। সূত্র তন্তুবায়গণ কর্ত্তৃক ক্রীত হইত। "যাহারা যেরূপ সূক্ষ্ম সূত্র কর্ত্তনে সমর্থ হইতেন, তাঁহারা সেইরূপ অর্থলাভ করিতে পারিতেন, এবং স্ত্রীমণ্ডলে তদনুরূপ প্রশংসাভাজন হইতেন। এই ব্যবসায় দ্বারা নিঃস্ব লোকের সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের অনেক আনুকূল্য হইত। যদিচ মধ্যবিত্ত লোকেরা এই ব্যবসায়কে অপমানকর জ্ঞান করিতেন, তথাপি তাঁহাদের স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রসূত্র বা নিজের বস্ত্রনির্ম্মাণের ছলে অধিক সূত্র কর্ত্তন করিতেন, এবং অতি সঙ্গোপনে অন্য স্ত্রীলোক দ্বারা বিক্রয় করাইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থসঞ্চয়ে সমর্থ হইতেন।" (২৫)

অশ্ব, গজ, পাল্‌কী ও গোযান ব্যবহৃত হইত। সুখাসনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। (২৬)

দেশে তাম্রকূট ব্যতীত অন্য মাদক দ্রব্যের মধ্যে সমাজের নিম্নস্তরে গাঁজা ও অন্যান্য স্তরে সিদ্ধির ব্যবহার ছিল।

"অন্ন, ডাল, নিরামিষ ব্যঞ্জন, মৎস্য, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, এই কয়েক দ্রব্য তদানীন্তন সাধারণ লোকের সচরাচর আহার ছিল। শাক্তসম্প্রদায়ী লোকে কখন কখন ছাগমাংস ভোজন করিতেন, কিন্তু এই ছাগ কোন শক্তিপূজার উদ্দেশে ছিন্ন না

(২২) Birdwood—Indusrtial Arts of India.

(২৩) Birdwood—Industrial Arts of India.

(২৪) মুতাক্ষরীণ; টীকা।

বর্ত্তমান সময়ে যখন ভারতে আসেন, তখন তাঁহার জন্য ২০ গজ দীর্ঘ ও ১ গজ প্রস্থ যে মজলিন প্রস্তুত করান হইয়াছিল, তাহার ওজন সাড়ে তিন আউন্স মাত্র।—লেখক।

(২৫) ক্ষত্রীশ-বংশাবলি-চরিত।

(২৬) India of Aurangzeb.

নেযানা নামক এক প্রকার দ্বারহীন পাল্‌কীরও সন্ধান পাওয়া যায়—লেখক।

হইলে তাহার মাংস ভক্ষণ করিতেন না। কদাচিৎ কেহ মেষ ও মৃগমাংসও ভোজন করিতেন। গোধূম বা যবচূর্ণ পিষ্টকাদি কোন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত ব্যবহৃত হইত না। ব্রাহ্মণ ও সৎশূদ্রের বিধবারা নিরামিষ ভোজন ও একাহার করিতেন। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ী লোকমাত্রেই মাংসস্পর্শ করিতেন না, এবং অনেকে মৎস্য-আহারেও বিরত থাকিতেন।" (২৭) হিন্দুশাস্ত্রনিষিদ্ধ পানভোজন তখনও সমাজে প্রচলিত হয় নাই। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে "ভারতীর রাজধানী, ক্ষিতির প্রদীপ" নবদ্বীপ হইতে যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম কূলপ্লাবিণী বন্যার মত বাহির হইয়াছিল, ভারতচন্দ্রের সময় তাহার চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু জলরাশি তখনও অপসৃত হয় নাই। পূর্ব্বে দেশে মাংসাহার চলিত ছিল বলিয়াই বোধ হয়। "কবিকঙ্কণচণ্ডী"তে ব্যাধপত্নীর বাজারে ও গৃহে গৃহে মাংসবিক্রয়ের কথা আছে। ফুল্লরা ব্রাহ্মণগৃহেও মাংস বিক্রয় করিত। ধনপতি সদাগরের গৃহে আহারের আয়োজনকল্পে দুর্ব্বলা দাসী "জীয়ন্ত শশ", "জরঠ কমঠ" ও "খাসী" কিনিয়াছিল; সাধুও "মাংসের ব্যঞ্জন" ও "মাংসবড়ি" ভোজন করিয়াছিলেন।

"ইদানীন্তন স্ত্রীপুরুষেরা যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন, পূর্ব্বকালীন লোকের সেরূপ পরিচ্ছদ ছিল না। তৎকালে মধ্যবিত্ত ও হীনবিত্ত পুরুষেরা গ্রীষ্মকালে ধুতি ও দোবজা অথবা একপাট্টা এবং শীতকালে ধুতি ও হামাম বা আলখাল্লা ব্যবহার করিতেন। শীতকালে কদাচিৎ কেহ গায়ে বেনিয়ান বা মের্জাই ও মস্তকে টুপী দিতেন, অথবা উষ্ণীষ বাঁধিতেন। মধ্যবিত্ত কোন কোন প্রবীণ ব্যক্তি প্রাতে বনাৎ ও রাত্রিতে কার্পাসপূর্ণ রেজাই ব্যবহার করিতেন। তরুণ-বয়স্কেরা শীতনিবারণার্থ দোলাই ব্যবহার করিত। কোন কোন ধনী সময়বিশেষে পট্টবস্ত্র পরিধান করিতেন। শাল, রুমাল, জামেয়ার প্রভৃতি মূল্যবান বস্ত্র অতি অল্প লোকেরই থাকিত। কি গ্রীষ্ম, কি শীত, সকল সময়েই স্ত্রীগণের এক শাটীমাত্র পরিধেয় ছিল। তাহারা শীতানুভব করিলে আর একখানি শাটী গাত্রে দিত। রাজসংসারের উচ্চপদস্থ পুরুষেরা রাজভবনগমনকালে জামা ইজার ও পাকুড়ি ব্যবহার করিতেন। করচরণাচ্ছাদনার্থ কোন প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না। (২৮) নবদ্বীপের রাজারা দেবার্চ্চন, ভোজন ও শয়নকালে ধুতি ও দোবজা পরিতেন। কিন্তু অন্য অন্য সময়ে পশ্চিমোত্তরীয় নানাবিধ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। রাজ্ঞী, রাজবধূ ও রাজকন্যারা কার্পাস বা কৌষেয় শাটী পরিতেন;

(২৭) ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।

(২৮) "কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে" আছে, "পায়ে মোজা দিয়া তারা কড়ি বন্দী কৈল।"

কিন্তু প্রায় সমস্ত শুভকার্য্যোপলক্ষে পশ্চিমোত্তরদেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের ন্যায় কাঁচুলি, ঘাগ্‌রা ও ওড়না পরিধান করিতেন। (২৯) ইহারা শীতকালে বিবিধ বহুমূল্য কৌষেয় ও রাঙ্কব বস্ত্র অঙ্গে দিতেন, এবং চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করিতেন। পূর্ব্বকালে যে উত্তম, কি মধ্যম, কি অধম, কোন শ্রেণীর লোকই পাতলা কাপড় পরিতেন না। যেহ তাদৃশ বস্ত্র পরিলে জনসমাজে অতিশয় নিন্দাস্পদ ও উপহাসভাজন হইতেন।" (৩০) দিল্লীযাত্রাকালে ভবানন্দের বেশের ভারতচন্দ্র এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"শীরে চিরা হীরা তায় বিনাতি খেলাত গায়
নানা বন্ধে কোমর বান্ধিল।"

এই বেশ রাজদরবারে যাইবার জন্য—বহুদিন মুসলমান সংস্রবের ফল।

কেশবিন্যাস রমণীদিগের প্রসাধনের বিশেষ অংশ ছিল। উড়িষ্যার মন্দিরে ভাস্করকার্য্যে নানাপ্রকার কেশবিন্যাস ক্ষোদিত রহিয়াছে। (৩১) "কবিকঙ্কণচণ্ডী"তে চিরুণী দিয়া কেশ আঁচড়াইয়া কবরী বাঁধিবার উল্লেখ আছে। লহনা "কবরী বান্ধিল রানা নাম গুয়ামুটি।" "শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে" নয়ানী "বান্ধিল বিনোদ খোঁপা বা দিকে টায়নি।" "অন্নদামঙ্গলে" পদ্মমুখীর "চূড়া ছাঁদে বাঁধা চুল তাহাতে চাঁপার ফুল।"

—তখন রমণীদিগের নয়নে অঞ্জনলেপনের প্রথা ছিল। ভারতচন্দ্রের সময় চুয়া, কেশর, কস্তুরী ও চন্দনের সঙ্গে সঙ্গে আতর, গোলাবও ব্যবহৃত হইতেছে। তৎপূর্ব্বে "চণ্ডী"তে "সপত্নী-সোহাগে" দেখিতে পাই,—

"হরিদ্রা কুঙ্কুম তৈল আমিল দুর্ব্বলা।
খুল্লনার অঙ্গে দিয়া দুব কৈল মলা॥
আমলকী দিয়া কৈল কেশের মার্জ্জন।"

তৎপরে "অঙ্গে আরোপিল রামা ভূষণ চন্দন।" "শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে" ও দেখিতে পাই, "গায়ে দিল চার্চ্চিত চন্দন চাক চুয়া।" রঞ্জাবতী

"হরিদে হরিদ্রা তৈল আমলকী সহে।
সখীসঙ্গে স্নানে যায় হর্ষচিত্ত হয়ে॥"

---

(২৯) "চণ্ডীতে" "লহনার অভিসার"—বর্ণনায় ও ঘনরামের "শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে" নয়ানীর "লাস বেশ" বর্ণনায় কাঁচুলির উল্লেখ আছে। ধনীদিগের মধ্যে ইহার বহুল প্রচার ছিল বলিয়াই বোধ হয়।—লেখক।

(৩০) সিতীশ-বংশাবলী-চরিত।

(৩১) Rajendra Lala Mittra—Antiquities of Orissa.

হরিদ্রার ব্যবহার ভারতচন্দ্রের সময়েও ছিল। সুন্দর-দর্শনে বর্দ্ধমানকামিনী-দিগের এক জনের উক্তি,—

"হলদী জিনিয়া তনু চিকনিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি।"

দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। বিবাহের বয়সও অল্প ছিল। "কবিকঙ্কণ-চণ্ডী"তে জানাই পণ্ডিত লক্ষপতিকে বুঝাইতেছেন,—

"সপ্তম বৎসরের কন্যা, বিভা দিলে হয় ধন্যা,
তার পুত্র কুলের পাবন।"

"শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে": রঞ্জাবতীর যখন "বয়স বছর বার", তখনই তাঁহার সহোদর তাঁহাকে "বদ্ধ্যা বলি হেলে।" তিনি "মাসে মাসে ঔষধ অপত্য আশে খান", এবং "কঠোর করেন কত পুত্র অভিলাষে।" আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, সুন্দরের সহিত সাক্ষাৎকালে বিদ্যার বয়স অধিক হয় নাই—তাঁহাকে তখনও "পদার্পিতমাত্রযৌবনা" বলা যায় কি না সন্দেহ। তথাপি কন্যার কলঙ্ক-কথা শুনিয়া রাণী রাজার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া "নূপুরের রুনুঝুনু" তাঁহার বৈকালিক নিদ্রা ভাঙ্গিয়া তিরস্কার করিয়া বিদ্যার কথায় বলিলেন, তাহার "বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে।"

কাজ কর্ম্ম প্রধানতঃ পূর্ব্বাহ্নে-ও অপরাহ্নে নিষ্পন্ন হইত। লোকে মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহা স্বাস্থ্যের অনুকূল কি না, তাহা বিবেচ্য।

দেশে বহুবিধ কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। লোকে শুভাশুভচিহ্নে বিশ্বাস করিত। মন্ত্রতন্ত্রে লোকের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল—মহিলাদিগের ত কথাই নাই। "চণ্ডী"তে কন্যার বিবাহে রত্নাবতী বিবিধ বশীকরণ ঔষধের সংগ্রহ করিয়াছিলেন। লহনাও দুর্ব্বলা দাসীর পরামর্শে লীলাবতীর নিকট যে ঔষধ সংগ্রহ করিতে-ছিলেন, তাহাতে,—

"ঔষধের গুণে স্বামী বোল শুনে,
যেন পিঞ্জরের শুয়া।"

"শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে"ও আছে, "মুখে মাখে তৈল গড়া, নয়নে কজ্জল।" ভারতচন্দ্র ভবানন্দের গৃহাগমনকালে চন্দ্রমুখীর কথায় বর্ণনা করিতেছেন,—

"খোঁপা বাঁধি তাড়াতাড়ি পরিয়া চিকণ শাড়ী
পড়িয়া কাজল চক্ষে দিলা।

পড়া তৈল মুখে মাখি পড়া কুল চুলে রাখি
নানা মন্ত্রে সিন্দুর পড়িলা।"

কোন কোন স্থান সম্বন্ধেও নানারূপ কুসংস্কার ছিল।

শিশুদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য অস্তিত্বহীন জীবের অস্তিত্বও কল্পিত হইত।

মোগল রাজত্বের অন্তিম দশায় দেশের সর্ব্বত্র যে বিলাস ও ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, বঙ্গেও তাহার যথেষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান। স্বভাবতঃ একপত্নীরত হিন্দুদিগের মধ্যে বহুবিবাহ বিশেষরূপ প্রচলিত হইতেছিল। "কবিকঙ্কণচণ্ডী"তে ধনপতি ভংসনা করিয়া লহনাকে বলিতেছেন,—

"সেই নারী ভাগ্যবতী ধনবান যার পতি,
বিবাহ করয়ে দুই তিন।"

লহনা এ কথা যথার্থ বিবেচনা করেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। বহুবিবাহের বহুল প্রচলন শেষে কুলীনব্রাহ্মণ ও কতকগুলি ভঙ্গকুলীনদিগের মধ্যে "বিবাহ-ব্যবসায়ে" পরিণত হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের "দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়।" ভারতচন্দ্র তরুণ বয়সে গুরুজনদিগের অমতে এবং বংশমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াও স্বীয় মনোনীতা বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর হইয়াও ভাগ্যদোষে ঘটনাস্রোতে লঘু তৃণের মত ভাসিতে ভাসিতে শেষে চল্লিশ বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগরে আসিয়া কূল পাইয়াছিলেন। তাহার পর কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহে জীবনের শেষ কয় বৎসর যৌবনের সেই প্রণয়ভাগিনীকে লইয়া দাম্পত্য ও পারিবারিক সুখ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং অত্যন্ত শুদ্ধাচারী ছিলেন। তাই বহুবিবাহকারিগণকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন,—

"এ সুখে বঞ্চিত কবি রায়গুণাকর।
দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর।"

পুরুষসমাজে অন্যবিধ ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের কথা "হরগৌরীর কথোপকথনে" জানিতে পারা যায়। ভারতচন্দ্রের দেবচরিত্র হইতে কেন আমরা মানবসমাজের আচার ব্যবহার অভ্যাসাদির আভাষ পাই, তাহার কারণ পরে আলোচিত হইবে। সমসাময়িক ইতিহাসেও ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শোভাসিংহ বর্দ্ধমানের রাজাকে রণে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। বর্দ্ধমানের রাজপুত্র স্ত্রীবেশে নারীগণের আরোহণযোগ্য যানে কৃষ্ণনগরে রামকৃষ্ণের গৃহে আসিয়া আত্মরক্ষা করেন। (৩২) সেনাবলে বলী রামকৃষ্ণ, আত্মরক্ষায় ও শরণাগত-রক্ষায়

(৩২) কিতীশবংশাবলী চরিতম্।

সমর্থ হয়েন। রাজদুহিতার রূপলাবণ্যমুগ্ধ শোভাসিংহ রাজকন্যার তীক্ষ্ণ ছুরিকার আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

পূর্ব্বে পাতলা কাপড় পরিলে জনসমাজে উপহাসাস্পদ হইতে হইত সত্য; কিন্তু ক্রমে বিলাসিতার সঙ্গে সঙ্গে সেই রূপ বস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া উঠে। "ঢাকা নগরে বহুকালাবধি অতি সূক্ষ্ম ও পাতলা এক প্রকার বস্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে, ইহা এ দেশে শব্‌নম্ ও (৩৩) ইউরোপে ঢাকাই মজলিন নামে খ্যাত, এবং অতি আগ্রহসহকারে গৃহীত হয়।" (৩৪) তাহার অনুকরণে শান্তিপুরে পাতলা ধুতি ও শাটী প্রস্তুত হইয়া নবদ্বীপ অধিকারে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে শান্তিপুরের বস্ত্র এত পাতলা যে, দীনবন্ধু মিত্র বলিয়াছেন,—

"শান্তিপুরে ডুরেশাড়ী সবমের অরি,
'নীলাম্বরী', 'উলাঙ্গিনী', 'সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী'।" (৩৫)

নীলাম্বরী ভারতচন্দ্রের সময় প্রচলিত ছিল। তিনি বিরহতাপতপ্তা বিদ্যার বর্ণনায় "নীল কাপড়ে"র উল্লেখ করিয়াছেন। পাঠ করিলে সহজেই জয়দেবের "চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলং" মনে পড়ে। জয়দেবের পর কবিকঙ্কণও মেঘডুম্বর কাপড়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রও অন্যত্র চিকণ শাড়ীর উল্লেখ করিয়াছেন। সাধী বড়রাণীকে সদুপদেশ দিতেছে,—"শাড়ী পর চিকণ শ্রীরামখানি গো।"

কৃষ্ণনগরের রাজা রঘুরাম স্বীয় পুত্র তরুণবয়স্ক কৃষ্ণচন্দ্রকে অতিক্রম করিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামগোপালকে উত্তরাধিকারী করিবার জন্য নবাবের সম্মতি লইয়াছিলেন। তিনি রাজ্যের অধিকার-প্রার্থনার জন্য যখন নবাব-সন্নিধানে গমন করেন, তখন চতুর কৃষ্ণচন্দ্র ধূমপানাসক্ত পিতৃব্যের অভীষ্ট বার্থ করিবার জন্য, মুর্শিদাবাদের চকের রাজপথের উভয় পার্শ্বে কয়েক ব্যক্তিকে অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধ তামাক খাইতে বলেন। তাম্রকূটধূমগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া তিনি পথে বিলম্ব করেন। এ দিকে কৃষ্ণচন্দ্র নবাবসমীপে পিতৃরাজ্য প্রার্থনা করিলে, নবাব, চকে রামগোপালের ধূমপানের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে অপদার্থ বিলাসী বিবেচনা করেন, এবং তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকেই রাজ্য দান করেন। (৩৬)

---

(৩৩) সকল প্রকার ঢাকাই মজলিন যে শবনম নহে, পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে।—লেখক।

(৩৪) ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।

(৩৫) সুরধুনী কাব্য।

(৩৬) ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।

বিদ্যাসুন্দরের বিলনবর্ণনায় ভারতচন্দ্র বিলাসের যে চারুচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার উপাদান তাঁহার সময় অজ্ঞাত ছিল না,—

"গোলাব আতর চুয়া কেশর কস্তুরী।
চন্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটী পুরি॥
মল্লিকা মালতী চাঁপা আদি পুষ্পমালা।
রাখে সহচরী পুরি কনকের থালা॥
ক্ষীর চিনি মিছিরি সন্দেশ নানাজাতি।
নানাদ্রব্য রাখে নারিকেল রাঙ্গাবাতি॥
শীতল গঙ্গার জল কর্পূরবাসিত। (৩৭)
পাখা মোরছল শ্বেত চামর শোভিত॥
মিঠাপান মিঠাগুয়া চূণ পাথরিয়া
রাখে ছটা বিড়া বাঁধি খিলি সাজাইয়া॥
রাখে লঙ্গ এলাচি জয়িত্রী জায়ফল।"

সমসাময়িক সাহিত্যের আলোচনা করিলে সমাজে বিলাসিতার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

দীর্ঘকাল মুসলমানদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে তখন হিন্দুসমাজে নানারূপে মুসলমানের প্রভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রাজসভায় মুসলমানের বেশ পরিহিত হইত। বেশভূষায়, গীতবাদ্যে, সাহিত্যে সে প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে। তখন মুসলমানী গ্রন্থ বাঙ্গালায় ও হিন্দুর গ্রন্থ পারসীতে অনূদিত হইত। মুসলমান কবিরাও হিন্দুর মহাভারতাদি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া রচনা করিয়াছেন। "তৎকালে পরিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা কহিবার বা লিখিবার প্রথাই ছিল না। সকল কথোপকথন ও লিখনের মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক পারস্য ও হিন্দী শব্দ ব্যবহৃত হইত।" (৩৮) দৃষ্টান্তের জন্য আমাদিগকে অধিক সন্ধানক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না। "অন্নদামঙ্গলে" "রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার বিবরণ" হইতে নিম্নলিখিত কয়টী ছত্র উদ্ধৃত করিলাম,—

"ফারসীর মহারাজ মনসবদার।
সাহেব নওয়ৎ আর কানগোই ভার॥

---

(৩৭) বর্দ্ধমানের রাজকন্যা কাঞ্চীপুরের কথায়ও বলিয়াছিলেন, "হায় বিধি সে কি দেশে গঙ্গা নাই বধা।" বর্দ্ধমান গঙ্গার উপর অবস্থিত নহে সত্য, কিন্তু গঙ্গাজলের পাবন গুণ জ্ঞাত থাকায় তাহা সমাদরে ব্যবহৃত হইত। আইন আকবরীতে দেখা যায়, আকবর রাজধানীতেই হউক, বা ভ্রমণকালেই হউক গঙ্গার জল পান করিতেন। গঙ্গাজল সঙ্গে যাইত।—লেখক।

(৩৮) কিতীশ-বংশাবলী-চরিত।

কোঠায় কামুরাঘড়ী নিশান-নহবৎ।
গাতশাহী শিবপা সুল্‌তানী সুলতানৎ।
ছত্রদণ্ড আড়ানী চামর মোরছল।
সরপেচ মোরছা কলগী নিরমল।"

এই কয় ছত্রে যবন শব্দ।

ভারতচন্দ্রের যে সকল রচনা বর্ত্তমান, সে সকলের মধ্যে "সত্যপীরের কথা" সর্ব্বপ্রথম রচিত,—

"গণেশাদি রূপধর যন্দ প্রভু মহেশ্বর
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ দাতা।
কলিযুগে অবতরি সত্যপীর নাম ধরি
প্রণমহ বিধির বিধাতা॥
দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র কলিযুগে ক্রমে ক্ষুদ্র
যবনে করিতে বলবান।
ফকীর-শরীর ধরি হরি হৈলা অবতরি।—ইত্যাদি।

মুসলমান রাজত্বকালে রাজদরবারে পারসী প্রচলিত ছিল। ক্রমে সমাজেও পারসীতে দক্ষতা আদৃত হইতে আরম্ভ হয়। তাই পারসী শব্দ অবাধে বাঙ্গলায় চলিয়া গিয়াছে। তখন পারসীর এত আদর ছিল যে, ভারতচন্দ্র প্রথম বয়সে পারসী না শিখিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করাতে স্বজনগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। মুসলমান রাজত্বের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে পারসীভাষা অনাদৃত ও ক্রমে তাহার আলোচনা ত্যক্ত হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বহু পারসী শব্দ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইয়া গিয়াছিল। সে সকল বঙ্গভাষার অঙ্গীভূত হইয়াই রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের অনেক রচনাতেও সে সকল শব্দ সংস্কৃত শব্দের পার্শ্বেই আসন প্রাপ্ত হয়। অনেক আচার যেমন বিধানের বক্র কটাক্ষ সত্ত্বেও সিংহদ্বারপথে না হউক, পশ্চাতের দ্বারপথে সমাজে প্রবেশ করে, এবং একবার প্রবেশ করিতে পাইলে সিংহদ্বারপথেও তাহাদের গতায়াত আর গোপনে নিষ্পন্ন হয় না, তেমনই সকল বিধান সত্ত্বেও, অনেক বিজাতীয় শব্দ ভাষায় প্রবেশ করে, এবং একবার প্রবেশ করিতে পাইলে রহিয়াই যায়। তখন জমীদারদিগের শাসনপ্রণালীও মুসলমানের অনুকরণে। এখনও নানা পদের বিজাতীয় নাম তাহাদিগের উৎপত্তির পরিচয় প্রদান করে।

মুসলমান শাসনকালে হিন্দুর আচারে ও ব্যবহারে, শিল্পেও সাহিত্যে, সমাজে ও সংস্কারে, মুসলমানের যে প্রভাব পতিত হইয়াছিল, তাহা দূর হয় নাই; পরন্তু তাহা হিন্দুর আচারে ও ব্যবহারে, শিল্পে ও সাহিত্যে, সমাজে ও সংস্কারে অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই, সহজে লক্ষিত হয় না।

চপলা।

প্রথম অধ্যায়।

সরস্বতীজলে।

সহসা বন্যা আসিয়া সরস্বতী নদীতে খরস্রোত বহিতেছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগের কথা; তখনও গ্রীষ্মকালে সরস্বতীতে জল থাকিত না, কিন্তু বর্ষাকালে এত প্রবলবেগে বন্যা আসিত যে, নাবিকেরাও নৌকা লইয়া যাতায়াত করিতে ভয় পাইত। থানেশ্বরের ছেলে বুড়া সকল কাজকর্ম্ম ফেলিয়া নদীতীরে বসিয়া ক্রীড়াকৌতুক করিতেছে। সাহসী যুবকেরা সাঁতার কাটিতে জলে নামিতেছে, বৃদ্ধেরা ভয় দেখাইয়া নিষেধ করিতেছেন। বালকবালিকারা কূলে কূলে জল ছিটাইয়া, আনন্দ উপভোগ করিতেছে। সরস্বতীতে বার মাস জল থাকে না বলিয়া কোথাও একখানি বড় নৌকা নাই; কচিৎ এক একখানি ছোট ডোঙ্গা দড়ী দিয়া কূলে বাঁধা ছিল। যেখানে নগরের লোকেরা আনন্দময়, তাহা হইতে কিছু দূরে দুইটি বালিকা গাছের আড়ালে জলক্রীড়া করিতেছিল। সহসা একটি বালিকা ডোঙ্গায় উঠিয়া অপরটিকে ডাকিয়া বলিল, "আয় ভাই! মজা করি।" ডোঙ্গাখানি জলে ভাসিয়া দুলিতেছিল; দড়ি টানিয়া একবার কূলে আসা, আর একবার একটুখানি দূরে চলিয়া যাওয়া, এইটুকু সেই বালিকার "মজা।" দ্বিতীয়া ভয় পাইল; সে বলিল, "না ভাই, কি হইতে, কি হইবে; আমি ডোঙ্গায় উঠিব না।" প্রথমা যখন ডোঙ্গায় উঠিয়া দড়িটা টানাটানির একটু বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিল, তখন দ্বিতীয়া কহিল, "চপলা আয় না, ঢের হয়েছে।" চপলা শুনিল না, সে হাসিতে লাগিল, এবং ডোঙ্গায় বসিয়া মজার খেলা খেলিতে লাগিল।

দৈবাৎ দড়িগাছি খুলিয়া গেল, এবং প্রবল স্রোতে ডোঙ্গাখানি ছুটিয়া চলিল। যে মেয়েটি কূলে ছিল, সে চিৎকার করিয়া বলিল, "চপলা ভেসে গেল গো।" চপলার বয়স চতুর্দ্দশের অধিক নহে; সে কিন্তু চিৎকার করিল না। সাবধানে ডোঙ্গাখানি ধরিয়া বসিয়া রহিল। চিৎকার শুনিয়া অনেক লোক ছুটিয়া আসিল,

কিন্তু কেহই সাহস করিয়া জলে নামিল না; অনেকেই কেবল মেয়েটির দুর্ব্যবহারের সমালোচনা করিতে লাগিল। এক জন অপরিচিত ব্যক্তি দৌড়াইয়া আসিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া ডোঙ্গা লক্ষ্য করিয়া সাঁতার দিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে ডোঙ্গা ও সন্তরণকারী, দর্শকগণের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া বহু দূরে চলিয়া গেল।

যে সাঁতরাইয়া গেল, সে কে? কেহই তাহা বলিতে পারিল না। তখন নানা প্রকার সমালোচনা ও দৈব দুর্ঘটনার প্রাচীন গল্পের পর, দর্শকেরা ছেলেদিগকে শাসন করিয়া ঘরে ফিরিলেন। এই খানেখানে চপলার জন্য কাঁদিবার কেহ ছিল না। চপলা শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা। এক জন অতিদূর-সম্পর্কীয় ব্যক্তি দয়া করিয়া গৃহে রাখিয়াছিলেন, এইমাত্র। চপলার প্রতিপালকের কন্যাটিকে বিধাতা সৌন্দর্য্য দান করেন নাই, কিন্তু সেই অপরাধে সুনয়নী চপলা তাঁহার বয়স্যার জননীর প্রিয়পাত্রী হইতে পারেন নাই। নানা কারণে চপলার দুঃখে কাহারও আহার ও নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিল না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আশ্রিতা।

প্রায় এক ক্রোশ পথ ভাসিয়া যাইবার পর ডোঙ্গাখানি একটা বাঁকে ঘুরিয়া প্রায় কূলের নিকটবর্ত্তী হইল। সন্তরণকারীও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া সেই স্থানে ডোঙ্গা ধরিয়া ফেলিলেন। চপলা তখনও স্থির হইয়া ডোঙ্গা ধরিয়া বসিয়া ছিল; কোন দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই।

বলিষ্ঠ সন্তরণকারী যখন ডোঙ্গাখানি কূলে টানিয়া লইয়া চপলাকে নামিতে বলিলেন, তখন তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল, সে নামিতে পারিল না। যুবক ধীরে ধীরে এক হাতে নৌকার ছেঁড়া দড়িটুকু ধরিয়া, অন্য হাতে বালিকাকে তুলিয়া কূলে নামাইয়া দিলেন। উভয়েই আর্দ্রবস্ত্র। চপলা চলিতে পারে না। যুবক তাহাকে বহন করিয়া নিকটস্থ পল্লীতে গেলেন।

গ্রামের লোকেরা তাঁহাদিগকে কাপড় দিল, আহার দিল, তাঁহারা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। যুবক চপলাকে বলিলেন, "চল, তোমাকে গ্রামে রাখিয়া আসি।" চপলা কাঁদিয়া কহিল, তাহার কেহ নাই; যাঁহার গৃহে সে আশ্রিতা, সে তাহাকে মারিবে, এবং তিরস্কার করিবে। যুবক তখন বালিকাকে লইয়া একটি প্রান্তর পার হইয়া রাত্রিকালে একটি সৈন্য-নিবেশের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। যুবককে দেখিবামাত্র সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং জানাইল

যে, তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য থানেশ্বরে যে সকল লোক গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে; এবং চারি দিকে তাঁহার সন্ধানে লোক গিয়াছে।

অবিলম্বে দশ জন দাসী নিযুক্ত করিবার জন্য যুবক আদেশ করিবামাত্র, "যে আজ্ঞা যুবরাজ" বলিয়া লোক ছুটিল। এক প্রহর রাত্রির মধ্যেই দাসী নিযুক্ত হইল, স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, এবং চপলা রাজকুমারীর মত সেবাশুশ্রূষা পাইতে লাগিল।

যুবক সৈন্যেরা যুবরাজ চন্দ্র গুপ্তের এই অভিনব অনুষ্ঠান দেখিয়া গা টেপাটিপি করিতে লাগিল; বয়স্যেরা বিরক্ত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল যে, কাজটা ভাল হইল না। সকলেরই সন্দেহ হইল যে, এই কুড়ানী মেয়েটা বুঝি রাজরাণী হইয়া উঠিবে। রাজকুমারের এক জন ভৃত্য দর্প করিয়া বলিল যে, শ্রীমতী ধ্রুবদেবীর কাছে সংবাদ গেলেই রাজরাণীগিরি ঘুচিয়া যাইবে। যুবকটি মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত; ধ্রুবদেবী যুবরাজের পত্নীর নাম। যুবরাজ পশ্চিম প্রদেশে যুদ্ধযাত্রার জন্য বাহির হইয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ইতিহাস।

যে চতুর্থ শতাব্দীর ঘটনা লইয়া এই আখ্যায়িকা, সে সময়ের রাষ্ট্রবিপ্লবের দু চারিটি কথা বলিতেছি। প্রাচীন ইতিহাসের সহিত অধিকাংশ পাঠকের পরিচয় নাই বলিয়া, একটি ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা লিখিতে গেলেও, ইতিহাসের কথা বলিতে হয়।

মৌর্য্যকুলতিলক দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী মহারাজচক্রবর্ত্তী অশোকের সময়ে গান্ধার হইতে পূর্ব্ব উপকূল পর্য্যন্ত, নেপাল হইতে মহীশূর পর্য্যন্ত, সমগ্র দেশ একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর কথা। তাহার পর যখন খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্যবংশের অধোগতি হইল, তখন সুঙ্গবংশীয় রাজারা ভারতের সম্রাট হইয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে লিখিত আছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা ক্ষুদ্র প্রদেশবিশেষের রাজা ছিলেন। এই দেশে তখন যবন, শক, তুরুষ্ক, চীনজাতীয়েরা আসিয়া রাজত্বস্থাপন করিতেছিলেন, এবং সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত বৈদেশিক আক্রমণে প্রপীড়িত হইয়াছিল। অনার্য্যজাতীয় অন্ধ্র রাজারা কেবল দক্ষিণ প্রদেশেই প্রবল হইয়াছিলেন; আর্য্যাবর্ত্তে বিদেশীয়দিগেরই প্রভাব বিস্তৃত ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে কালরাত্রির আরম্ভ, খৃষ্টোত্তর তৃতীয় শতাব্দীতে তাহার শেষ।

এই দীর্ঘব্যাপী অন্ধকারের অবসানে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে নূতন প্রভাতের

সূচনা। সম্ভবতঃ শ্রীগুপ্ত এই গুপ্ত-বংশের প্রথম রাজা। শ্রীগুপ্তের পুত্র ঘটোৎকচের রাজত্বের পর ৩১৯ খৃষ্টাব্দে চন্দ্র গুপ্ত বিক্রমাদিত্য নেপাল হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত জয় করিয়া, কানোজ-সন্নিহিত নূতন পুষ্পপুর বা কুসুমপুরে রাজধানী স্থাপিত করেন; এবং ঐ বৎসর হইতে নূতন গুপ্তাব্দের প্রথম বৎসর গণিত হয়।

প্রাচীন পুষ্পপুর বা পাটলিপুত্রে লিচ্ছবি-বংশীয় রাজারা হীনবল হইয়া রাজত্ব করিতেছিলেন; এবং প্রধানতঃ নেপালেই লিচ্ছবিদিগের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই লিচ্ছবি রাজারা গুপ্তদিগের অধীশ্বরত্ব স্বীকার করিতেন, এবং উঁহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন।

৩৫০ খৃষ্টাব্দে সমুদ্র গুপ্তের রাজত্বের আরম্ভ। সমুদ্র গুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত বিক্রমাদিত্য যখন যুবরাজ, এই আখ্যায়িকা সেই সময়ের কথা লইয়া। আলাহাবাদের স্তম্ভলিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত, বঙ্গ, কামরূপ, কলিঙ্গ ও কোশল, সমুদ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল; এবং কেরল পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভূভাগেও তিনি রাজাধিরাজ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। মহারাজ অশোকের পর ভারতবর্ষে এমন গৌরবের দিনের ইতিহাস আর নাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

রাজমন্ত্রী।

মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের প্রিয় সচিব প্রিয় বর্ম্মা, কুসুমপুরের রাজপ্রাসাদে বসিয়া কতকগুলি লিপি পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময়ে স্বয়ং মহারাজ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজ্যের কুশল ত?" প্রিয়বর্ম্মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং রাজা তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। উভয়ে আসন গ্রহণ করিবার পর প্রিয় বর্ম্মা বলিলেন, "মহারাজ, এখন শক, যবন প্রভৃতি সকলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া আদৃত হইয়াছেন; আপনাদের প্রতিও ব্রাহ্মণদের বিদ্বেষ তিরোহিত হইয়াছে; এখন বিজিত রাজ্য সুরক্ষিত করিবার দিকে বিশেষ মনোযোগী হইবার প্রয়োজন।" মহারাজ কহিলেন, "পঞ্জাব ও গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে ক্ষত্রপ রাজগণ বিজিত হইবার পূর্ব্বে, রাজ্যটিকে অখণ্ড মনে করিতে পারিতেছি না।" প্রিয় বর্ম্মা হাসিয়া বলিলেন যে, স্বয়ং যুবরাজ চন্দ্র গুপ্ত যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী। মহারাজ কহিলেন, "তোমার পুত্র বিশ্ব বর্ম্মা যখন তাঁহার সহচর ও সহকারী, তখন জয়ের আশা করিতে পারি বটে।" প্রিয় বর্ম্মা কহিলেন, "মহারাজ আপনার অনুগ্রহের পরিসীমা নাই; আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র নব বর্ম্মাকে আপনি মালবের শাসনকর্ত্তা করিয়া দিয়া আমার বংশগৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিশ্ব

বর্ম্ম যদি যুবরাজের সহচর হইয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার মঙ্গল হইবে বটে, কিন্তু রাজ্যের কল্যাণের জন্য একটা প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।"

রাজা মনোযোগী হইলেন, এবং প্রিয় বর্ম্মা কহিতে লাগিলেন;—"সংবাদ পাইলাম যে, হূন নামে একটা জাতি বড় বলশালী হইয়া উঠিয়াছে; এবং অচিরাৎ তাহাদের গান্ধার প্রদেশ অধিকার করিবার সম্ভাবনা। ভারতের পশ্চিম প্রদেশ সুরক্ষিত না হইলে কদাচ ভারতবর্ষের কল্যাণ হইবে না। হূনদিগের সন্ধান লইবার জন্য উপযুক্ত লোক প্রেরণ না করিলে নয়। বিশ্ব বর্ম্মা রোমকাদি পশ্চিমদেশীয় অনেক ভাষা শিক্ষা করিয়াছে, তাহা জানেন। আমার ইচ্ছা যে, তাহাকে ঐ প্রদেশে প্রেরণ করি।" মহারাজ সচিবের স্বার্থশূন্যতা ও হিতৈষণায় চিরদিনই মুগ্ধ ছিলেন; তবুও এই প্রস্তাব শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। চিন্তা করিয়া বলিলেন, "প্রিয় বর্ম্মা, আমি একটু ভাবিয়া দেখি, তাহার পর তোমার কথার উত্তর দিব।"

এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, পঞ্জাব হইতে যুবরাজের দূত আসিয়াছে। দূত যে সকল পত্র আনিয়াছিল, রাজা ও প্রিয় বর্ম্মা তাহা পাঠ করিয়া অবগত হইলেন যে, যুবরাজের জৈত্রসেনা নির্ব্বিঘ্নে পশ্চিমপথবাহিনী হইয়াছে। ঐ পত্রগুলির সঙ্গে আর দুখানি পত্র ছিল; রাজা তাহা অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। যুবরাজপ্রেরিত পত্র দুখানির একখানি মাতা দত্তদেবীর নামে, এবং অন্যখানি পত্নী ধ্রুবদেবীর নামে। ধ্রুবদেবীর পত্রে অন্য কথার মধ্যে এই কথাটি ছিল;—"তুমি হয় ত ভাব, তুমি ভারি কৃপণী। থানেশ্বরে একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া ক্ষত্রিয়া কুমারী কুড়াইয়া পাইয়াছি, তাহাকে দেখিলে তোমার আত্মশ্লাঘা একটু কমিতে পারে।"

পঞ্চম অধ্যায়।

চপলার কথা।

কৃতঘ্ন রাজা স্বামী রুদ্রসেন যুদ্ধ না করিয়াই সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। কাজেই মহারাজের অনুমতির অপেক্ষায় যুবরাজের সৈন্যের ভরুকচ্ছে অবস্থান করিতেছিলেন। যে সময়ে যুবরাজ চপলার উদ্ধার করেন, তাহার পর হইতে তিন মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই তিন মাসে চপলার সঙ্গে যুবরাজের কিরূপ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দিতেছি।

চপলা একটি যবনীর শিক্ষাধীন থাকিয়া চিত্র আঁকিতে শিখিতেছিল। পূর্ব্ব হইতেই এ বিষয়ে চপলার একটু শিক্ষা ছিল; এবং সে যাহা কিছু দেখিত, তাহারই ছবি আঁকিত। সেই জন্য যুবরাজ তাহার জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

চপলা ছবি আঁকিতেছে, এমন সময়ে চন্দ্রগুপ্ত গিয়া বলিলেন, "কি আঁকিতেছ চপলা?" চপলা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া ছবি ঢাকিয়া বলিল, "তা বলিব কেন?" যবনী হাসিয়া বলিল, "আজ একটা নাক আঁকিতেছে; বলিতেছিল যে, একটা ভাল নাক মক্স করিয়া লইয়া তার পর আপনার একটা ছবি আঁকিবে।" চপলা হাসিতে লাগিল। যুবরাজ স্মিতমুখে বলিলেন, "আমার নাকের উপর তোমার এত দৌরাত্ম্য কেন?' চপলা যবনীর গা টিপিয়া বলিল, "সে কথা বোলো না কিন্তু।" যুবরাজ বলিলেন, "কি কথা?" চপলার গোটা দশেক 'না না'র মধ্যে যবনী কহিল, "চপলা বলিতেছিল যে, আপনার নাকটা খারাপ হ'লে দেবী রাগ করিবেন।" চপলার লজ্জা হইল। যুবরাজ চলিয়া গেলে, চপলা যবনীকে বলিল, "মেলিনা, তুমি বড় দুষ্ট!"

আর একদিন বিশ্ব বর্ম্মা, নন্দী ভদ্র প্রভৃতি যুবরাজের প্রিয়পাত্রদের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ লইয়া মেলিনা ও চপলার তর্ক চলিতেছে, এমন সময়ে যুবরাজ কুশলপ্রশ্ন করিতে আসিলেন। চপলা প্রথমেই বলিল, "আচ্ছা বলুন দেখি, নন্দী ভদ্র খুব ভালমানুষ নয়?" যুবরাজ বলিলেন, "ভালমানুষ বই কি; নইলে তোমাকে রোজ রোজ বাদাম এনে দেয়?" চপলা বলিল, "আচ্ছা, বাদাম যদি নাই দিতেন; তবুও ত ভালমানুষ?" মেলিনা বলিল, "তিনি ভাল নয়, তা ত আর আমি বলিনি। আমি বলিতেছিলাম যে, বিশ্ব বর্ম্মার মত লোক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।" চপলা যুবরাজকে বলিল, "দেখুন, বিশ্ব বর্ম্মা ওঁদের গ্রীক্ কথা জানেন কি না, তাই এই পক্ষপাত।"

আর এক দিনের কথা বলিতেছি। রাজধানীতে সন্ধির প্রস্তাব যাইবার পূর্ব্বে মহারাজের এক আদেশলিপি আসিয়াছিল যে, বিশ্ব বর্ম্মাকে গান্ধার অভিমুখে চর-স্বরূপ যাইতে হইবে। সেই আদেশ পাইবার পর যুবরাজ বড়ই চিন্তিত থাকিতেন। একদিন যুবরাজ নানা কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে চপলা আসিয়া বলিল যে, তাহার একটা সোনার পদক চাই। সরলা বালিকার আবেদনে তৃপ্তিলাভ করিয়া যুবরাজ কহিলেন, "কি রকম পদক, চপলা?" চপলা চিত্র আঁকিয়া বুঝাইয়া দিল। "আচ্ছা, শীঘ্রই পাইবে" বলিয়া যুবরাজ পুনরপি চিন্তামগ্ন হইলেন। চপলার তাহা সহ্য হইল না; সে রাগ করিয়া চেঁচাইতে লাগিল। যুবরাজ হাসিয়া তাহার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নূতন চিন্তা।

স্বনামখ্যাত বুদ্ধঘোষ তখনও ত্রিপিটকের টীকা লিখিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারিব না। কিন্তু তিনি প্রসিদ্ধ উপদেষ্টা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ

ঘোষ, যুবরাজ চন্দ্র গুপ্তকে সুগত-মাহাত্ম্যের অনুরাগী করিবার জন্য তাঁহার যুদ্ধ-শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। যুবরাজ সমস্ত দিন তাঁহার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে কথপোকথনের পর অপরাহ্নে চপলার সংবাদ লইতে গেলেন। "বুদ্ধঘোষ দেখবি আয়!" বলিয়া মেলিনা চপলাকে ডাকিয়াছিল, চপলাও তাড়াতাড়ি তাহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল। চন্দ্র গুপ্ত দেখিলেন, চপলার ক্ষুদ্র কক্ষটুকু শূন্য। সেখানে তাহার কয়েকখানি চিত্র পড়িয়াছিল; সেগুলি দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া রাজা কক্ষমধ্যে গেলেন। একটা পাখীর ছবির তলায় তাহার নূতন পদকখানিও ছিল। পদকখানি একটু নূতন রকমের; যদি খুব বড় না হইত, তাহা হইলে সে-খানিকে একালের লকেট্ বলা চলিত। যুবরাজ অন্যমনস্কে ছবি দেখিতে দেখিতে পদকের ডালাটি খুলিয়া ফেলিলেন, এবং দেখিলেন, উহার মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র চিত্র! ক্ষুদ্র চিত্রখানি দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন, এবং ধীরে ধীরে পদকখানি বন্ধ করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া, দ্রুতপদে সেই কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন যে, মেলিনা ও চপলা এক সঙ্গে আসিতেছে। যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথায় গিয়াছিলে?" চপলা বলিল,—"আমি ভাবিয়া-ছিলাম যে, না জানি কি একটা নূতন জন্তু কিছু হইবে। মানুষ! আমরা বুদ্ধ-ঘোষ দেখিয়া আসিলাম।" চন্দ্র গুপ্ত হাসিয়া বলিলেন, "চপলা, বুদ্ধঘোষ ভারি পণ্ডিত, সাধু পুরুষ।" চপলা তখন গম্ভীর হইয়া তাঁহার উদ্দেশে একটি প্রণাম করিল।

চপলার চঞ্চলতার অভ্যন্তরে যে স্থিরতা ও গাম্ভীর্য্য ছিল, চন্দ্র গুপ্ত আজি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। চন্দ্র গুপ্ত বালিকার দিকে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "চপলা, তুমি আর কত দিন এখানে থাকিতে পারিবে?" চপলা এবারে গম্ভীর হইয়া বলিল যে, আর ভাল লাগে না, তাহার কুসুমপুর দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে, সে ধ্রুবদেবীকে দেখিতে চায়। যুবরাজ বলিলেন, "তুমি ত কখন তাঁহাকে দেখ নাই; তিনি কি তোমাকে ভালবাসিবেন?" চপলা মুখ উঁচু করিয়া বড় বড় চোখ করিয়া বলিল, "নিশ্চয়! তিনি আমাকে খুব ভালবাসবেন।" যুবরাজ তাহা জানিতেন বটে; কিন্তু বালিকার এই প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলেন।

এই আনন্দের মধ্যে একটুখানি চিন্তারাও উদয় হইল। সন্ধির প্রস্তাব অনু-মোদিত হইল কি না, এবং বিশ্ব কর্ম্মাকে অবিলম্বে গান্ধারে না পাঠাইলে চলে কি না, এই কথা ভাবিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

হূন-সংবাদ।

"আমি মহারাজের আদেশ উপেক্ষা করিয়া এখানে বসিয়া থাকিতে পারিব না। যখন সন্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে, তখন আপনি সন্ধিস্থাপন করিয়া রাজধানীতে চলিয়া যান। আমি এক জন ভৃত্য লইয়াই ছদ্মবেশে গান্ধার যাত্রা করিব।" বিশ্ব বর্ম্মার কথার প্রতিবাদ করা অসম্ভব। কিন্তু যুবরাজ বলিলেন,—"এ বিষয়ে আমি একটি দ্বিতীয় প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার জন্য আর একটু প্রতীক্ষা করিলে ক্ষতি কি?" বিশ্ববর্ম্মা কহিলেন, "যুবরাজ, মহারাজ বিশেষ বিবেচনা করিয়া যে আদেশ দিয়াছেন, তাহা পালন না করিয়া অন্যবিধ প্রস্তাব করিলে কর্ম্মভীরুতা প্রকাশ পাইবে। বিশেষতঃ, যে জন্য এই আদেশ, তাহার গুরুত্ব আমরা অনুভব করিতেছি। সে দিন শ্রমণ কুমার জীব যাহা বলিতেছিলেন, তাহাতেও হূনদিগের প্রভাববৃদ্ধির কথায় বিশ্বাস হইতেছে। এ সময়ে কালহরণ করা রাজদ্রোহিতা।" যাহা হউক, যুবরাজ বিষণ্ণচিত্তে অনুমতি দিলেন; কিন্তু তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছিল।

বিশ্ব বর্ম্মা যুবরাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া একটি বৃক্ষমূলে গিয়া বসিলেন, এবং আকাশের তারাগুলির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বিশ্ববর্ম্মা টলেমির গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, অনেক নক্ষত্রের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। এই জন্য তিনি যখন আকাশের দিকে চাহিয়া বসিতেন, কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিত না। অনেকক্ষণ পরে, যিনি নক্ষত্রগণের পতি, যিনি নরভাগ্যের নেতা, সজলনয়নে তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। যদিও মেলিনা ভিন্ন অন্য কেহ এ কথা জানিত না, তবুও কথাটা খুলিয়া বলাই ভাল, যে বিশ্ব বর্ম্মা চপলার আনন্দময়ী প্রতিমার অনুরাগী হইয়াছিলেন। কর্ত্তব্যের অনুরোধে গান্ধারে যাইতেছেন, কিন্তু চপলার জন্য মন উদ্বিগ্ন হইতেছে। চপলা তাঁহার আয়ত্তের অতীতে, বহু ঊর্দ্ধে, তাহাই মনে করিয়া পীড়িত হইতেছিলেন। চপলার প্রণয়প্রার্থী হইলে যুবরাজের সহিত এ বন্ধুত্ব আর থাকিবে না। সেই জন্য মনে মনে সঙ্কল্প করিতেছিলেন যে, রাজ্যের সেবার জন্য, ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য, তিনি আপনার মনের ব্যথা মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিবেন।

অষ্টম অধ্যায়।

দু' চারিটি সাংসারিক কথা।

যুবরাজ যখন রাজধানীতে ফিরিলেন, তখন দক্ষিণ প্রদেশ হইতে সংবাদ আসিল যে, মালবর উপকূলে চের-রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এই বিদ্রোহ

নঘুরি ও নায়ারেরা উপস্থিত করিয়াছিল। ইতিহাসে ইহার তারিখ ৩৮৯ খৃষ্টাব্দ। যুবরাজ অনেক দিন পরে রাজ্যে ফিরিয়াছেন বলিয়া, এবারে মহারাজ সমুদ্র গুপ্ত স্বয়ং দক্ষিণাপথে গমন করিলেন। এই বিদ্রোহের সুবিধায় চেব-রাজ্য জয় করিয়া, সিংহল পর্য্যন্ত যাত্রা করিবার অভিপ্রায়ে মহারাজ বহু সৈন্য লইয়া রাজধানী হইতে চলিয়া গেলেন। দুটি বৎসর রাজ্যভার সম্পূর্ণরূপে যুবরাজের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। যুবরাজ দেখিলেন যে, প্রিয় বর্ম্মা যেখানে মন্ত্রী, সেখানে রাজ্যশাসন অতি সহজ।

বিশ্ব বর্ম্মা যখন হুনদিগের সংবাদ সবিশেষ ভাবে লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন, মহারাজ তখন সিংহল জয় করিয়া ফিরিয়াছেন, এবং তখন তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। যুবরাজই সমগ্র রাজকার্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

মহারাজের সিংহল-জয়ের প্রায় তিন বৎসর পরে মালবের শাসনকর্ত্তা নর বর্ম্মা পরলোকগমন করিলেন। প্রিয় বর্ম্মা একে বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার উপর এই শোকের আঘাত। তিনি এখন কদাচিৎ প্রয়োজন উপলক্ষে রাজগৃহে আসিতেন; নচেৎ গৃহেই থাকিতেন। মালবের শাসনকর্ত্তার নিয়োগ বিষয়ে যুবরাজ চন্দ্র গুপ্ত যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত সানন্দে তাহার অনুমোদন করিয়াছিলেন। সে কথা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলিতেছি।

নবম অধ্যায়।

নূতন-পুরাতন।

এক দিন মধ্যাহ্নভোজনের পর প্রিয়বর্ম্মা গৃহের বারান্দায় শয়ন করিয়া আছেন, এবং একটি ক্ষুদ্র শিশু তাঁহার নিদ্রার বিঘ্ন জন্মাইয়া আনন্দদান করিতেছে। শিশুটি বৃদ্ধের নাতি। তিন বৎসর বয়সের ছেলেটি বৃদ্ধের পৈতাগাছটি লইয়া এক, পাঁচ, তিন করিয়া তায় গুণিতেছে; মুখে হাত দিয়া, দাঁত নাই কেন, তাহার অনুসন্ধান করিতেছে; এবং সর্ব্বাঙ্গে নূপুর-পরা ছোট পায়ের ধূলা মাখাইয়া দিতেছে। তিনি শিশুর করস্পর্শে আনন্দে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। বালক "দাদা দাদা" বলিতেছিল; এবং তিনি মুহূর্ত্তের জন্য বৃদ্ধত্ব ভুলিয়া, অতীত যৌবনের অতীত তীরের শৈশবসুখ স্মরণ করিতেছিলেন। মনে হইতেছিল, যেন তিনি আবার শিশু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া শিশুদের সঙ্গে খেলা করিতেছেন। দীর্ঘ দিবা-নিদ্রার পর যেমন কখনও কখনও অপরাহ্ণে প্রভাতের ভ্রান্তি হয়, বৃদ্ধের যেন তেমনই ভ্রান্তি হইয়াছিল।

বৃদ্ধ যখন পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া স্বপ্নে মগ্ন, তখন শিশুর মাতা দেখিলেন যে, দুষ্ট ছেলেটা বড় উৎপাত করিতেছে। তিনি তাহাকে টানিয়া আনিতে গেলেন, সে

আসিল না। অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, শিশু তাহা গ্রাহ্য করিল না। যুবতী হয় ত জানিতেন না যে, এ সংসারে ঠাকুরদাদার মত মিষ্ট পদার্থ আর নাই! যুবতী শিশুকে একটু জোর করিয়া কোলে তুলিতে গেলেন, শিশু একটি টানে তাঁহার গলার হারগাছি ছিঁড়িয়া ফেলিল। রণজয়ী শিশু হারগাছি ফেলিয়া দিয়া যখন চুল ধরিল, তখন বৃদ্ধের স্বপ্ন ভাঙ্গিল। তিনি বলিলেন, "থাক না মা লক্ষ্মী, টানাটানি ক'রে কি হবে? আমাকে কিছু বিরক্ত কচ্চে না।"

বৃদ্ধের মুখের কথা মুখে আছে, এমন সময় যুবরাজ চন্দ্র গুপ্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে উঠিয়া বসিলেন, এবং যুবতী কোনও প্রকারে চুল ছাড়াইয়া গৃহের মধ্যে চলিয়া গেলেন। যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, "চপলা, তোমার ছেলে খুব দুষ্ট হয়েছে? তা হোক্, এস বন্ধু, আমার কোলে এস!" যুবরাজ ছেলের নাম রাখিয়াছিলেন বন্ধু। পরেও ইনি বন্ধু বর্ম্মা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, সে কথা ইতিহাসজ্ঞেরা জানেন।

বন্ধু কিন্তু ছেঁড়া হারগাছির সঙ্গে একটা পদক পাইয়াছিল; সেইটিতে সে মনোযোগ দিয়াছে। পদকটি দৈবাৎ খুলিয়া গেল, এবং একখানি কাগজ বাহির হইয়া পড়িল। যুবরাজ তাড়াতাড়ি হাতে লইয়া তাহা রক্ষা করিলেন। বহুদিন পূর্ব্ব হইতে যুবরাজের জানা ছিল যে, চপলা বিশ্ব বর্ম্মার ক্ষুদ্র ছবি আঁকিয়া পদকে পূরিয়া রাখিয়াছিল। যুবরাজ হাসিয়া হাসিয়া সে প্রতিকৃতিটি পদকে পূরিয়া পদক বন্ধ করিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইলেন; চপলার ভারি লজ্জা হইল। সে জানিত না যে, যুবরাজ তাহার পদকের কথা সব জানেন।

চপলা ভাল করিয়া কাপড় গুছাইয়া পরিয়া বাহিরে আসিয়া ছেলে কোলে নিল; এবং প্রিয় বর্ম্মা যুবরাজকে বসিতে বলিলেন। যুবরাজ তখন বিশ্ব বর্ম্মার মালব-শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইবার সংবাদ দান করিলেন। চপলা বলিল, "না; বাবা এ বয়সে অত দূর কি ক'রে যাবেন?" যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, "আমরা তাহার সুব্যবস্থা করিব।" চপলা তখন আবার বলিল, "তা হ'লে আপনি দেবীকে নিয়ে মালবে মাঝে মাঝে যাবেন বলুন?" যুবরাজ স্বীকৃত হইলেন। চপলা এখনও তাঁহার আদরের আদরিণী ছোট বোন্‌টি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সহযোগী সাহিত্য।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়।

অল্প দিন হইল, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "অত্যুক্তি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। দুর্বৃষ্ট-দাবানলবদ্ধ দিল্লীর উপকণ্ঠে ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে দরবার সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই, ইংলণ্ডে ইংলণ্ডেশ্বরের অভিষেক হইয়া গিয়াছিল। সেই অভিষেকে ভারতীয় মিত্ররাজগণের কয় জন উপস্থিত ছিলেন। সেই বিষয়ে বড় কটাক্ষ করিয়া কবিবর বলিয়াছিলেন, "আজকালকার সাম্রাজ্য-মদমত্ততার দিনে, ইংরেজ নানাপ্রকারে শুনিতে চায় আমরা রাজভক্ত; আমরা তাহার চরণতলে স্বেচ্ছায় বিক্রীত। এ কথা জগতের কাছে তাহারা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিতে চাহে। তাই ঠিক যে সময়ে ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর হৃদয়ের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নপ্রায়, * * * ঠিক সেই সময়টাতেই প্রথম ভারতবর্ষের রাজভক্তি ইংরেজ নানাপ্রকারে বিশ্বজগতের কাছে উদ্ঘোষিত করিবার আয়োজন করিতেছে,—আশানুরূপ ফলও পাইয়াছে, শূন্য ঘট যেমন শব্দ করিতেছে।" এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রবাবু তুলনায় সমালোচনা সম্বন্ধে আপনার পূর্ব্বমত বিস্মৃত হইয়া বা পদদলিত করিয়া, তুলনায় সমালোচনা করিয়া, মুসলমান রাজার মস্তকে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট তুলিয়া দিয়া,—সমবেত যুরকবৃন্দের করতালিধ্বনিত তাঁহার অভিষেক সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মুসলমানে ও ইংরাজে, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে, অতীতে ও বর্ত্তমানে সকল প্রভেদ তিনি বিস্মৃত হইয়া ভাবাবেশে একই আদর্শে উভয়ের বিচার করিয়াছিলেন। ভাল করিয়াছিলেন কি না, সে বিচার করিব না। আমাদের যত দূর স্মরণ হয়—বড় অধিক দিনের কথা নহে—লর্ড কর্জনের বিলের আন্দোলনকালে রবীন্দ্রবাবুই বলিয়াছিলেন—"স্বার্থই যদি ইংরাজ ভারতশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিতেন, তাহা হইলে আজ আমাদিগের এমন দুর্দ্দশা হইত যে, ক্রন্দন করিবার অবকাশও থাকিত না।" 'মবকত-বঙ্গমঞ্চে' এই উক্তি ও 'কর্জ্জন-রঙ্গমঞ্চে' পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি উভয়ে, প্রভেদ! এই অত্যল্পকালের মধ্যেই ইংরাজ যদি পূর্ব্বাদর্শভ্রষ্ট হইয়া এমনতর নিন্দাভাজন হইয়া থাকেন, তবে বড় আশঙ্কার কথা—সন্দেহ নাই। তাহা না হইলেও, রবীন্দ্রবাবুর শেষের উক্তি যদি কবির অত্যুক্তি না হয়, তবে তাহাও বড় আশঙ্কার বিষয়। কারণ, নিদ্রিত ভারতের সহসা জাগরিত হইয়া জাগান হইবার সম্ভাবনা যখন আপাততঃ সুদূরপরাহত, তখন ইংরাজের সহিত আমাদের হৃদয়ের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়া কেবল যে ইংরাজেরই দুর্ভাগ্য, এমন নহে। কারণ শাসকে ও শাসিতে হৃদয়ের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, বেটন-বন্দুক-বেয়নেট-বয়শেলের যে সম্বন্ধ থাকে, তাহা আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশারও আমাদের পক্ষে প্রলোভনীয় নহে। শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে ভারতহিতৈষীর সন্ধান করিতে যাইয়া রবীন্দ্রবাবু হেয়ার ও হিউম প্রভৃতি দুই এক জন স্বল্প ভিন্ন আর কাহারও সন্ধান পান নাই। সে কথা রবীন্দ্রবাবু "সাধনা"য় প্রকাশিত "ইংরাজ ও ভারতবাসী" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন। কিন্তু যে মেকলে ইংরাজী-শিক্ষার উপায় করিয়া আমাদিগকে রাজনৈতিক অধিকারের আস্বাদ বুঝাইয়াছিলেন, যে ম্যাক্সমুলার ও ম্যাকডোনেল, কাওয়েল ও কোলব্রুক, জোন্স ও প্রিন্সেপ ভারতের সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিপাদনে জীবনব্যয় করিয়াছেন, যে ব্রাড্‌ল, ফসেট, ওয়েডারবার্ণ, কেন, ডিগবী ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকারের জন্য এত চেষ্টা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রবাবু তাঁহাদের নাম করেন নাই। ইহাতে স্বতঃই মনে হয়, ইংরাজের সহিত আমাদের মনের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্নপ্রায়, এ কথাটাকেও আমরা সংবাদপত্রে ও বক্তৃতামঞ্চে অত্যুক্তি করিয়া তুলিতেছি কি না? আজ ইংরাজ ভারত ত্যাগ করিলে রুশিয়া হইতে—

"গরজি গম্ভীরে
বিপ্লব ঝটিকা করিবে প্রবেশ,
নিরস্ত্র ভারত আবক্তশরীরে
ভীম উৎপীড়নে হইবে নিঃশেষ।"

এ অবস্থায় মনের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার পক্ষে আমরা যদি সামান্য চেষ্টাও করি, তাহা হইলেও আমরা দোষী। কিন্তু ভারতীয় ও ইংরাজ,—কতকগুলি লেখক, রচনায় এই সম্বন্ধবিচ্ছেদের পক্ষে সদা সচেষ্ট!

এই সময় মনের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রাখিবার ও বিচ্ছিন্নপ্রায় সম্বন্ধ পুর্ব্বাবস্থ করিবার চেষ্টা দেখিলে আনন্দ হয়। সম্প্রতি "ইষ্ট অ্যাণ্ড ওয়েষ্ট" পত্রে মিষ্টার অ্যাণ্ডারসন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান "সম্প্রদায় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।" প্রবন্ধটি বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য।

লেখক বলেন, ভারতবাসী ইংরাজদিগকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলা হয়। য়ুরোপ-প্রত্যাগত ভারতবাসীদিগকে যদি ইণ্ডো-অ্যাংলিয়ান বলিতে যাওয়া যায়, তবে তাঁহারা রাগ করিবেন; বলিবেন, তাঁহারা কেবল যে ভারতে জন্মিয়াছেন, এমনই নহে, প্রতীচ্য শিক্ষা দীক্ষা সত্ত্বেও তাঁহারা সর্ব্ব বিষয়ে খাঁটি ভারতবাসী। কিন্তু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদিগের সম্বন্ধে ঠিক এ কথা বলা যায় না।

এ বিষয়ে এক জন ফরাসী সংস্কৃতপণ্ডিতের সহিত লেখকের কথা হয়। পণ্ডিত বলেন, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ ভাবে, ভাষায় ও চিন্তায় ইংরাজ হইতে স্বতন্ত্র। ভারত-বাসে তাঁহাদিগের সহানুভূতি যেমন প্রসার প্রাপ্ত হয়, মনেরও তেমনই পরিবর্ত্তন হয়। প্রমাণস্বরূপ তিনি সার্ আলফ্রেড লায়ালের উল্লেখ করেন। স্যার আলফ্রেড সুপণ্ডিত, সুলেখক ও সুকবি। কিন্তু তাঁহার সকল রচনাতেই ভারতীয় ভাব। তাঁহার হৃদয় ভারতে। তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াও ভারতের শিল্প-সাহিত্যাদির মায়া কাটাইতে পারেন নাই। এ কথা অতি সত্য। সর্ উইলিয়ম জোন্স হইতে সার্ এড্‌উইন্ আর্ণল্ড পর্য্যন্ত কে একবার ভারতের মোহাবর্ত্তে পতিত হইয়া উদ্ধার পাইয়াছেন? সার্ আলফ্রেড লায়ালের কথাই ধরা যাউক। তিনি ইংলণ্ডে যাইয়া English Men of Letters গ্রন্থাবলীতে কবি টেনিসন সম্বন্ধে পুস্তক লিখিবার সম্মান পাইয়াছেন। এই পুস্তকেও তিনি প্রাচ্য প্রভাবের চিহ্ন লুপ্ত করিতে পারেন নাই; টেনিসনের "আক্‌বরের স্বপ্ন" শীর্ষক কবিতার কথায় প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতার কথা বলিয়াছেন। "সাহিত্যে"র পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি 'বামদেব শাস্ত্রী ছদ্মনামে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। প্রকাশকালে অনেকে সেগুলিকে সত্য সত্যই কোন ভারতবাসীর রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। সে প্রবন্ধগুলি সার্ আলফ্রেডের Asiatic Studies গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সার্ আলফ্রেড ভারতে যে সকল কবিতা রচনা করেন, তাহার কতকগুলি Verses Written in India নামে প্রকাশিত করিয়াছেন। Land of Regrets কবিতায় তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন য়ুরোপীয় যে কারণেই কেন ভারতে আসুক না, সে ভারতের ক্রীত; ভারতেরই।

যে পণ্ডিতের সহিত লেখকের কথা হয়, তিনি পুঁথির সন্ধানে ভারতে আসিয়াছিলেন, বারাণসী, কাটামুণ্ড ও কলিকাতার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। তিনিও ভারতের মায়া কাটাইতে পারেন নাই। সুদূর ফ্রান্সে বসিয়া তিনি ভারতের দৃশ্য, ভারতের সূর্য্যকরোজ্জ্বল দিবা, ভারতের অধিবাসী ও ভারতের সাহিত্য,—এই সকলের বিষয় চিন্তা করেন। প্রতীচ্যের পরিবর্ত্তন ও সংশয়ের মধ্যে প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতার চিন্তায় তিনি সুখ ও শান্তি পাইয়া থাকেন। গোল্ডষ্টুকার, ম্যাক্সমুলার, বুর্ণেল প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের ভারতের সাহিত্য লইয়া জীবনব্যাপী শ্রমের কথা স্মরণ করিলে এ কথা বিশ্বাস করিতে আর দ্বিধা বোধ হয় না।

আবার অনেক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পুরুষানুক্রমে ভারতবাসী। সেই সকল নরনারী ভারতবর্ষকেই স্বদেশ বলিয়া মনে করেন। কবিরাই কথা। এক পুরুষেই য়ুরোপের যে কোন দেশবাসী আমেরিকান, বা কেনেডিয়ান, বা অষ্ট্রেলিয়ান হইয়া যায়। তাহার ভাব ও ভাষা, চিন্তা ও আশা, তাহার নূতন দেশের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া যায়। কিন্তু কলোনিয়ান বা আমেরিকান ভাব ও চিন্তা য়ুরোপীয় ভাব ও চিন্তা হইতে যত স্বতন্ত্র, ভারতীয় ভাব ও চিন্তা য়ুরোপীয় ভাব ও চিন্তা হইতে তাহা অপেক্ষা অনেকগুণে অধিক স্বতন্ত্র। সুতরাং এ কথা বলাই বাহুল্য যে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানে ও ইংরাজে প্রভেদ নিতান্ত সুস্পষ্ট। ভারতের প্রভাবে তাহার চিন্তাদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপ ধারণ করিয়াছে। অনেকে বলেন, ইংরাজাধিকারে ভারতে অনেক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। এ কথা যদি সত্য হয়, তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সে পরিবর্ত্তন সমাজের অন্তরে প্রবেশ করে নাই; প্রাচ্য ও প্রতীচ্য স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্রই রহিবে। পাঠক স্মরণ করিবেন, রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিং একটি কবিতায় লিখিয়াছিলেন, প্রাচ্য প্রাচ্যই—প্রতীচ্য প্রতীচ্যই—উভয়ের মিলন অসম্ভব। ইংরাজশাসনে ভারতে পরিবর্ত্তনের কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা একবার মনেও করেন না যে, ভারতবাসে ইংরাজেরও অত্যন্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অন্যান্য য়ুরোপীয়ের সহিত ইংরাজের যে প্রভেদ, তাহাও সম্ভবতঃ বহু পরিমাণে ইংরাজের ভারতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল! অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আবার খাঁটি ইংরাজ হইতে স্বতন্ত্র। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভারতেরই সন্তান। ভারতে বাস তাহার শরীরে সহে না, সে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে বন্ধন, তাহার একটি স্বদেশ আছে—কেবল তাই সে পাখীর মত একান্ত ভারতেরই হইয়া যায় নাই। নহিলে প্রকৃতপক্ষে সে ভারতেরই সন্তান ভিন্ন আর কিছু নহে।

য়ুরোপে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকেন,—"ভারতে ইংরাজ এত অপ্রিয় কেন?" ফরাসীতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কতকগুলি অতি মনোরম গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কোন কোন ফরাসী গ্রন্থকার বলেন, ভারতের লোকের নিকট ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ইংরাজই সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রিয়। জিজ্ঞাস্য এই যে, সাধারণতঃ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ সমপদস্থ ভারতবাসীদিগের অপেক্ষা অধিক অপ্রিয় কি না? তাঁহারা ভারতে অধিক অপ্রিয়, না ইংল্যাণ্ডে অধিক অপ্রিয়? অধিকাংশ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভারতে বাসকালকেই জীবনে সুখের কাল বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা ভারতে সংস্থাপিত বন্ধুত্বের স্মৃতি সাগ্রহে সংরক্ষণ করেন, ভারতবাসী বন্ধুদিগের সহিত পত্রব্যবহার করেন, ভারতীয় সংবাদপত্র পাঠ করেন, দেশের রাজনীতির অপেক্ষা ভারতের রাজনীতি ভাল বুঝেন। আমাদের মনে পড়িতেছে, সুদীর্ঘ কাল ভারতে কাটাইয়া অবসরগ্রহণকালে ছোটলাট সার চার্লস ষ্টিভেন্স বলিয়াছিলেন, ছত্রিশ বৎসর পরে বিদেশ হইতে দেশে যাইতেছি: এ যেন স্বদেশ হইতে

বিদেশে যাইতেছি। যখন দেশ হইতে আসিয়াছিলাম, তখনকার আচার ব্যবহার, আর কায়দা, বেশ ভূষা, সবই এখন পরিবর্ত্তিত। সব নূতন করিয়া শিখিতে হইবে। জীবনের সাধাহে নূতন বন্ধুত্ব সংস্থাপিত করিতে হইবে। এখন পরিবর্ত্তিত স্বদেশে আমরা ধাতুঘরে রক্ষিত সামগ্রীর মত প্রতীয়মান হইব। এই করুণ-উক্তি কি মর্ম্মস্পর্শিনী। হাইকোর্টের জজ বেভার্লি দেশে যাইয়া সার্ এড্‌উইন্ আর্ণল্ড প্রণীত কোন পুস্তকের ভারতীয় দৃশ্যাদির বর্ণনার ত্রুটি ধরিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ভারতের স্মৃতি তাঁহার চিত্তে সমুজ্জ্বল।

দেশে ফিরিয়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ স্বতন্ত্র সম্প্রদায় সংগঠিত করেন; সময় সময় হিন্দী, বা গুজরাটী, বা বাঙ্গালা বলেন। তাঁহাদের সন্তানগণ প্রাচ্য দিবালোকের ও আহার ও বেহারার স্মৃতি ভুলিতে পারে না। তাহাদেরও আকাঙ্ক্ষা, ভারতে আসিবে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভারতের এমনই নিজস্ব।

জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ ভারতে কাটাইয়া, ভারতে যৌবন, স্বাস্থ্য ও উৎসাহ শেষ করিয়া গিয়া কোন্ ব্যক্তি সহজে স্বীকার করিবে যে, সে যাহাদের মধ্যে এই সময় যাপন করিয়াছে, তাহারা তাঁহাকে ঘৃণা করিয়াছে, সন্দেহ করিয়াছে? সকলেরই শত্রু আছে। উচ্চ রাজপদে স্বপক্ষপাত হইয়া কার্য্য করিলে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শত্রু করিতে হয়—লোকে আশাভঙ্গ হইয়া ক্ষুব্ধ হয় এরূপ অবস্থায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যদি স্বদেশী অপেক্ষা বিদেশীর নিকট অধিক অপ্রিয় হন, তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। সর্ব্বদেশেই রাজকর্ম্মচারীর জনসাধারণের অপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ, প্রাচ্যে বহুবিধ পদগৌরবাদির সম্মান রাজদ্বারে ও বিচারাগারে অক্ষুণ্ণ ছিল। কাজেই নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিলে সাধারণের চিত্তরঞ্জনের সম্ভাবনা অনেক স্থলে নাও থাকিতে পারে।

বলা বাহুল্য, সর্ব্ব দেশেই এমন লোক আছে, যাহারা যে স্থানে যায়, সেই স্থানেই ব্যবহারদোষে শত্রু করে। কিন্তু সেরূপ জন কয়েকের দৃষ্টান্ত হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা নিতান্তই অন্যায় যে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় ভারতেরই সন্তান হইয়া ভারতবর্ষে ভারতবাসীর নিতান্ত অপ্রিয়। বিদেশীর শাসন ভাল না বাসা এক কথা, আর যাহারা সেই শাসনের পরিচালক, তাহাদের বিরুদ্ধে জাতক্রোধ হওয়া আর এক কথা; তাহা সমীচীনও নহে। ভারতবাসীরা যে প্রকৃত শ্রদ্ধাস্পদ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দেখেন নাই, এমন কথা নহে।

য়ুরোপ এসিয়ায় বিবিধ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। এক দিকে রুশিয়া অতৃপ্ত জঠরানলে এসিয়ার খণ্ড খণ্ড আত্মসাৎ করিয়া অনন্তর বিশাল রাজ্য সংগঠিত করিতেছে; আর এক দিকে ইংলণ্ড ফ্রান্সাদি প্রাচ্যে অধিকার শাসন করিতেছে। রুশিয়ার প্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালীতে প্রজা মূক। ইংলণ্ডের প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে প্রজার প্রবল প্রাধান্য—রাজা মন্দিরের বেদীতে অধিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তিমাত্র; তিনি প্রজার শ্রদ্ধাভক্তির কেন্দ্র, কিন্তু শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। প্রাচ্যে রাজপ্রাধান্যই নিয়ম; কাজেই রুশিয়া স্বীয় শাসন-প্রণালীর প্রবর্ত্তনে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করে নাই। ইংলণ্ডে রাজা 'জনে'র সময় হইতে বহু শতাব্দীর বহু বিপ্লবের মধ্য দিয়া প্রজার প্রাধান্য প্রবল হইয়াছে। ভারতে এক দিনে সে প্রণালীর প্রবর্ত্তন প্রতিপদে বিপদশঙ্কাসঙ্কুল। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ইংলণ্ডের সেই প্রণালীতে শিক্ষিত; তাই তাহার পক্ষে ভারতশাসন বিশেষ শ্রমসাধ্য। আবার ভারতে যত বৈচিত্র্য, তেমন আর কুত্রাপি নাই। এক দিকে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ও

ইংরাজী ভাবে দীক্ষিত সম্প্রদায় ছিল। ফলে মানুষে মানুষে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বৈষম্যের বিরোধী; বঙ্কিমচন্দ্রের যৌবনের জ্বালাময় প্রথম গ্রন্থ 'সাম্য' তাঁহাদিগের মতের তূর্য্যনিনাদ। আবার আর এক দিকে কোল ভীলাদি অসভ্য জাতিরা অতি প্রাচীন যুগের আচার ব্যবহার, অভ্যাস ও বিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে নাই। আবার ভারতবাসী ইংরাজ সম্প্রদায়কেও নগণ্য বলা যায় না। এই বহু সম্প্রদায়ের বহু বিশেষত্ব বিবেচনা ও বিচার করিয়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানকে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। এ দেশে প্রথম আসিলে এই বৈচিত্র্য অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের অঙ্গে অদ্ভুত বোধ হয়। কিন্তু ক্রমে ভাবে অভাবে চিন্তায় ও বন্ধুত্বে সে ভারতেরই হইয়া যায়। তাহার ভ্রম অনিবার্য্য, কিন্তু ভারতবাসীরাই কি এরূপ অবস্থায় ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইতে পারেন? ভারতবাসীরা স্বভাবতঃ সততা ও ন্যায়পরায়ণ হইবার চেষ্টা বুঝিতে পারে। তাহারা যে সত্য সত্যই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদিগকে অধিক ঘৃণা করে, এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

যদি সত্য সত্যই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় ভারতবাসীর অপ্রিয় হয়েন, তবে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। অসন্তোষ ও সন্দেহের আওতায় কেহ সুখী হইতে পারে না, ভালরূপ কার্য্য করিতে পারে না। ভারতের জনসংখ্যার তুলনায় ভারতের মুষ্টিমেয় ইংরাজ, সিন্ধুতে বিন্দুবৎ। ভারতবাসীদিগকে বিশ্বাস না করিলে, তাহাদের কুসংস্কার পর্য্যন্ত বিশেষভাবে না মানিলে, ইংরাজের পক্ষে কার্য্য করা সম্ভব হয় না। এ দেশে ইংরাজ প্রধানতঃ শান্তি ও শৃঙ্খলার সংরক্ষণে নিযুক্ত। কিন্তু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ ভারতের সামাজিক উন্নতিসাধনে সাধ্যমত সাহায্য করিতে সর্ব্বদা তৎপর। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ সর্ব্বতোভাবে বিদেশী হইলে তাঁহাদের পক্ষে এ কার্য্য করা অসম্ভব হইত। কিন্তু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভারতেরই বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা, ভারতে জাতীয় জীবনের কেন্দ্র। এ সব সহর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের কীর্ত্তি। কাজেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের নিকট ভারতবাসীর ঋণ অস্বীকার করা যেমন অসম্ভব, তেমনই অনাবশ্যক ও অন্যায়। ভারতবর্ষে নূতন সামাজিক জীবন সংগঠিত হইতেছে; ভারতবাসীরা নূতন আশায়, নূতন আনন্দে, নূতন উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছে। এই নূতন সামাজিক জীবনে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের অংশ আছে। এ সময় তাহাকে অপ্রিয়, ঘৃণিত বলিয়া নূতন বলাবলির সৃষ্টি কর্ত্তব্য নহে। ভারত-শাসনে অনেক বিঘ্ন বিদ্যমান। ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন আচার—এ সকলকে এখন আর বাড়াইয়া কায নাই। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অনেক সময় প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়াই অপ্রিয়। সে অবস্থায় তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া, দলে লওয়া, ভারতবাসীর কর্ত্তব্য। জাতীয় বিশেষত্ব ও পার্থক্য পদদলিত করিয়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের ও ভারতবাসীর একত্র হইয়া উভয়ের স্বদেশ ভারতের উন্নতি-বিধানে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। এক জনের দোষে এক সম্প্রদায়কে ঘৃণা করা বা ত্যাগ করা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে।

যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ে প্রবন্ধলেখকের মত লোক বিদ্যমান, সে সম্প্রদায় ভারতের হিত বিষয়ে অন্ধ নহেন। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ ভারতের জন্য অনেক করিয়াছেন ও করিতেছেন। এখন যাহাতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানে ও ভারতবাসীর হৃদয়ের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না হইয়া, ঘনিষ্ঠতর হয়, সর্ব্বতোভাবে তাহারই চেষ্টা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ভারতবাসী উভয়েরই অবশ্যকর্ত্তব্য।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

বঙ্গদর্শন। কার্ত্তিক। সম্পাদকের "নৌকাডুবি" এখনও চলিতেছে; ভক্ত পাঠকগণ নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া তরী ডুবির প্রতীক্ষা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন রামায়ণের চামর ফেলিয়া বঙ্গদর্শনের আসরে "যাত্রা ও থিয়েটার" লইয়া জাহির হইয়াছেন। মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, দীনেশ বাবুর এই রচনাটি সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে অনায়াসে প্রহসনের স্থান অধিকার করিবে। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ, অবেস্তা, এমন কি, কাবুলের পেস্তা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দীনেশচন্দ্রের বিশ্লেষিনী লেখনীর অবাধগতি দেখিয়া মনে হয়, 'সর্ব্বগ্রাসিনী' প্রতিভার একটি লক্ষণ বিশ্বব্যাপিনী অনধিকারচর্চ্চা। উপসংহারে দীনেশবাবু বলিতেছেন,—"প্রাচীন যাত্রার ভাঁড় হইতে আধুনিক প্রহসনের ভাঁড় অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।" অত্র সন্দেহো নাস্তি। আমরা কেবল এই মন্তব্যের উপর আর একটি ছত্র জুড়িয়া দিতে চাই,—"আবার প্রহসনের ভাঁড় 'হইতে' আধুনিক সাহিত্যের ভাঁড় সর্ব্বগুণে গরিষ্ঠ।" হইতে=অপেক্ষা, ইত্যমরঃ। পুনশ্চ, "আমাদের কৃষ্ণগ্রীবার উপর শুভ্র নেক্‌টাই, 'অশুদ্ধ ইংরেজী-উচ্চারণ' * * প্রভৃতি," দীনেশবাবুর মতে, "শত শত বিষয়ে বঙ্গীয় প্রহসনগুলিকে পুষ্ট করিতেছে।" এখন প্রশ্ন এই, স্বদেশীয় কণ্ঠে বিজাতীয় ভাষার অশুদ্ধ উচ্চারণে যদি প্রহসনের পুষ্টি হয়, তাহা হইলে, বাঙ্গালী লেখকচূড়ামণিগণের হস্তে মাতৃভাষার এই দৈনন্দিন আদ্যশ্রাদ্ধ কিসের বিষয় মহাশয়? শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র "রামায়ণের রচনাকাল" নির্ণয় করিতেছেন। এখন পাণিনির আখড়াই চলিতেছে। অক্ষয় বাবুর চেষ্টাও "তর্ককোলাহলে অভিভূত হইয়া ব্যর্থ" না হয়, এই আমাদের আন্তরিক কামনা। "সংযম" শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের "বিশ্বামিত্রের তপস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষাংশ; লেজা না মুড়া, বুঝিতে পারিলাম না। লেখক বলেন,—"বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য-সভ্যতার আদর্শপুরুষ আমেরিকার সেই ধনকুবের মর্গান, আর্যসভ্যতার আদর্শপুরুষ সেই কাশীধামের ত্রৈলঙ্গ স্বামী।" মর্গ্যান যে পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শপুরুষ, আমরা তাহা জানিতাম না। 'আর্য্যামী'র আর একটি নাম পাওয়া গেল,—'আর্যসভ্যতা।' প্রাচীন ভারতের গুণকীর্ত্তনেও যে অন্ততঃ একবিন্দু সংযম আনুষঙ্গিক, অনেক লেখক অতি সহজেই তাহা ভুলিয়া যান। সিংহ মহাশয় সত্বর ইয়ুরোপে আর্যসভ্যতার প্রচার করুন। আগে বাঁচি ও পীহা বাঁচাই, তাহার পর ত্রৈলঙ্গ স্বামী হইব। যে মৃত, শক্তিশূন্য, স্বয়ং অন্যের বলগায় সংযত, সংযমেও তাহার কর্ত্তৃত্ব নাই। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ত্রিবক্রুর-রাজ্যে" উল্লেখযোগ্য। পিয়ের লোটীর ভারতীয় চিত্রগুলি আবব্যোপন্যাসের ঐন্দ্রজালিক আলোকে সমুজ্জ্বল।

প্রবাসী। কার্ত্তিক। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে ফার্সী ভাষায় রচিত "মাসির-উল-উমরা" নামক মূল গ্রন্থ হইতে "আওরাঙ্গজিবের আদি লীলা" বিবৃত করিয়াছেন। সরকার মহাশয় বহুদিন যাবৎ পারস্য ভাষায় লিখিত পুরাতন ঐতিহাসিক সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতেছেন। তাঁহার রচিত "আওরাঙ্গজিব" নামক মৌলিক ইংরাজী গ্রন্থ অগাধ পরিশ্রম ও অসাধারণ গবেষণার ফল। এত দিন পরে অধ্যাপক সরকার মাতৃভাষার ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। মাতৃভাষার দাবী

তাঁহার ন্যায় সুধীজনের নিকট কখনও উপেক্ষিত হইতে পারে না। অধ্যাপক সরকার এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করুন, জাতীয় ইতিহাসের নূতন ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হউক। বাঙ্গলা ভাষায় আজকাল যাঁহারা ইতিহাসের আলোচনায় ব্যাপৃত, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প। বিশেষতঃ, আমাদের তথাকথিত ইতিহাস ইংরাজীর অনুবাদ ও চর্ব্বিতচর্ব্বণে জর্জ্জরিত,—অন্তঃসারশূন্য অনুবাদসম্বল কূপমণ্ডূক ঐতিহাসিকের হুঙ্কারে সাহিত্যের তপোবন বিলুণ্ঠিত, বিক্ষুব্ধ। এই দুঃসময়ে মৌলিক গবেষণা ও শ্রমসিদ্ধ ও অধ্যয়নের সুদৃষ্টান্ত সাহিত্য-সমাজে আদর্শস্বরূপ পরিগণিত হউক, এই আমাদের আন্তরিক কামনা। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর "চিন্তাসঞ্চয়ন" নামক প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। শাস্ত্রী মহাশয় পরিণত বয়সে নির্দ্দয়ভাবে ভাষার উপর অত্যাচার করিতেছেন কেন, বলিতে পারি না। প্রবন্ধটিও শৃঙ্খলাশূন্য। কতকগুলি 'নোটে'র সমষ্টিমাত্র। আমরা "চিন্তাসঞ্চয়নে"র সূত্র খুঁজিয়া পাইলাম না। কেবল কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তের সমাবেশেই প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিপন্ন হয় না। তাহা হইতে সত্যের উদ্ধার করিবার ভার পাঠকের উপর অর্পণ করিলে, প্রবন্ধের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। অভিজ্ঞান-শকুন্তলের "চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানম্" উদ্ধৃত করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন,—"এতদ্দ্বারা প্রমাণ হয় যে, যে সময়ে মহাকবি কালিদাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ে চীনদেশীয় ক্ষৌম বসন এ দেশে প্রজাসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল।" কেবল একটি উপমার সাহায্যেই তাহা প্রতিপন্ন হয় না। প্রতিপোষক অন্য প্রমাণ আবশ্যক। শাস্ত্রী মহাশয় সিদ্ধান্ত করিতেছেন,—"লোকে 'কেতুনির্ম্মাণ করিতে হইলেই' চীনাংশুক ব্যবহার করিত।" "কেতুনির্ম্মাণ করিতে হইলেই চীনাংশুক ব্যবহার করিত" বলিলে বুঝায় যে, কেতুনির্ম্মাণে অন্য বসন একবারেই ব্যবহৃত হইত না। কিন্তু উদ্ধৃত উপমা হইতে তাহা সপ্রমাণ হয় কি? আলোচ্য প্রবন্ধে এরূপ শিথিল ভাষা ও 'পলকা' প্রমাণের অভাব নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধে আমরা এতদপেক্ষা সুদৃঢ় সিদ্ধান্তের আশা করিয়া থাকি। "কাজলী পরব" ও "সাঁওতাল-রহস্যে" বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "কল্যাণী" নামক ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক গল্পটি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। আখ্যানবস্তুর বৈচিত্র্য প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "য়ুরোপপ্রবাসী বাঙ্গালী" উল্লেখযোগ্য। একটু নীরস, কিন্তু জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ। শ্রীযুক্ত বামনদাস বসুর "বিজয়নগরের ইতিবৃত্ত একটি" সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, পাঠযোগ্য। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন "মর্ম্মর প্রস্তরে লক্ষ্মীমূর্ত্তি" প্রবন্ধে সংবাদ দিয়াছেন,—"কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে একটি লক্ষ্মীর মূর্ত্তি গড়িয়াছেন।" প্রবন্ধের সঙ্গে লক্ষ্মীপ্রতিমার ছবিও আছে। সর্ব্বশেষে লেখক এই মর্ম্মরপ্রতিমার চারিখানি প্রশংসাপত্র নিবিষ্ট করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পত্রখানিই উল্লেখযোগ্য, উপভোগ্যও বটে।—"শীতলের এই প্রথম উদ্যম শুনিলাম, সে কখনও আর্ট স্কুলে পড়ে নাই। সে এরূপ সুন্দর মূর্ত্তি কল্পনায় আনিল কিরূপে? আপনারা পূর্ব্বজন্ম মানেন না? এ ব্যাপারের সমন্বয় করিবেন কি দিয়া?" প্রতিধ্বনি বলিতেছে, "কি দিয়া?" হয় ত মাইকেল এঞ্জিলো হইতে শীতলচন্দ্র পর্য্যন্ত একটি জন্মধারা বহিয়া আসিতেছে! শীতলচন্দ্র হইতে পূর্ব্বজন্ম,—বিরাট রোড!

ভারতসুহৃদ ডিগ্‌বী।

কিছু দিন রোগভোগের পর গত ২৪শে সেপ্টেম্বর ভারতসুহৃদ ডিগ্‌বীর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে সংবাদ আসিয়াছিল, তিনি অত্যন্ত পীড়িত; স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় সমুদ্রভ্রমণে নরওয়ে যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু তখন আমরা স্বপ্নেও মনে করিতে পারি নাই যে, তাঁহার মহাযাত্রার আর অধিক বিলম্ব নাই; চিকিৎসকগণও রোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ডিগ্‌বীর জন্ম হয়। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর মাত্র হইয়াছিল; ইংরাজের পক্ষে ইহা প্রৌঢ়দশার শেষ সীমা মাত্র।

স্বদেশে কিছু দিন সংবাদপত্রের সংস্রবে কার্য্য করিয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ডিগ্‌বী Ceylon Observer পত্রের সহকারী সম্পাদক হইয়া সিংহলে আসেন। তথায় অবস্থানকালে তিনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ Fortnightly Review পত্রে Home Rule Experiment নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় সিংহলে মাদকবিক্রয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট-সময়-নির্দ্ধারণ-বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হয়। তিনি স্বয়ং মাদকবিরোধী ছিলেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি মৃত মহাত্মা কেন্ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ টেম্পারেন্স্ অ্যাসোসিয়েশনের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন।

সিংহলে অবস্থানকালে তিনি আর একটি বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সিংহলে ভূমির রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত প্রকাশ্য নিলামে ঠিকা দেওয়া হইত। বলা বাহুল্য, ঠিকাদারগণ আপনাদের অধিকারকালমধ্যে যথাসম্ভব অধিক অর্থ আদায়ের চেষ্টা করিত, এবং তাহাতে প্রজার উপর অত্যাচার হইত। ডিগ্‌বীর আন্দোলনফলে গভর্মেণ্ট অনুসন্ধানসমিতি গঠিত করেন, এবং অনুসন্ধানের ফলে ঠিকাদারী রহিত হয়। ডিগ্‌বী খাদ্যের উপর শুল্কের বিরুদ্ধেও আন্দোলন করেন। কিন্তু সে আন্দোলন সফল হয় নাই। এই সময় তিনি বিলাতের অবাধবাণিজ্যের প্রধান সমর্থক কব্‌ডেন্ ক্লবের গোচর জন্য Food Taxes in Ceylon পুস্তিকা রচনা করেন। তাহার ফলে তিনি ঐ সভার বিশিষ্ট সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েন। এই সময় Calcutta Review পত্রে তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; এবং তিনি ঐ পত্রের সম্পাদকের

পদ গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হয়েন। যাঁহারা এই পত্রের ইতিহাস ও য়ুরোপে ইহার আদরের বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা সহজেই এই পদের সম্মানের কথা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু কলিকাতা হইতে দূরে অবস্থান নিবন্ধন তিনি ঐ পদগ্রহণে স্বীকৃত হইতে পারেন নাই।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সূত্রপাত। এই বৎসর তিনি Madras Times পত্রের সম্পাদক হইয়া মাদ্রাজে আগমন করেন। তখন "ভারতে কালের ভেরী" বাজিয়াছে,—দক্ষিণ-ভারত দুর্ভিক্ষের করাল-কবলগত। রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন্ তখন মহাসমারোহে মোগল বাদশাহদিগের অনুকরণে তাঁহাদিগের রাজধানী দুর্দ্দশা-দাবানলদগ্ধ দিল্লীর শ্মশানবক্ষে—দরবারের উদ্যোগে ব্যস্ত। ক্ষুধিত মুমূর্ষু জনগণের আর্ত্ত-চীৎকারে তিনি কর্ণপাত করিলেন না। কাজেই ভারত গভর্মেণ্টের নিকট সাহায্যপ্রাপ্তির আশা সুদূরপরাহত জানিয়া ডিগ্‌বী ইংলণ্ডে Times পত্রে দেশের অবস্থা বিবৃত করিয়া পত্র লিখিলেন। তাহাতে তিনি ইংলণ্ডের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ডিউক্ অফ্ বকিংহাম্ তখন মাদ্রাজের শাসনকর্ত্তা। তিনি ডিগ্‌বীর পৃষ্ঠপোষক হইলেন। ডিগ্‌বীর পত্র ইংলণ্ডে সকল সংবাদপত্রে উদ্ধৃত হইল। ইংলণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আন্দোলন চলিল; সর্ব্বত্র ক্ষুধার্ত্তের সাহায্যের চেষ্টা হইতে লাগিল। ডিগ্‌বীর প্রমাণ অকাট্য, যুক্তি সুসম্বদ্ধ। তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যথাকালে সাহায্য না পাইলে দেশবাসীদিগের দুর্দ্দশার একশেষ হইবে। ইংলণ্ডে আন্দোলন উপস্থিত হইলে ভারত গভর্মেণ্টের চৈতন্যোদয় হইল। রাজপ্রতিনিধি দরবারের লজ্জা সম্বন্ধে কবিজনোচিত কল্পনা পরিহার করিয়া মাদ্রাজে যাইয়া দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সাহায্যের জন্য পূর্ত্তকার্য্য আরব্ধ হইল। ইংলণ্ডে ১২০০০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইল। এ দেশে ডিগ্‌বী সেই অর্থবিতরণার্থ সংগঠিত সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। এই কার্য্যে তাঁহাকে অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইত। দীর্ঘ ছয় মাস কাল তিনি প্রতি সপ্তাহে এক শত কুড়িটি শাখা-সমিতির সহিত পত্রব্যবহার করিয়া পঞ্চাশ পৃষ্ঠা বিবরণ প্রকাশ করিতেন। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রশমিত হইলেও তাঁহাকে হিসাবপত্র শেষ করিতে কিছু কাল পর্য্যন্ত গুরুশ্রম করিতে হইয়াছিল। ডিগ্‌বীর প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও গবর্মেণ্টের প্রথম অমনোযোগে বহু নরনারীর মৃত্যু হয়। গবর্মেণ্ট স্বীকার

করেন, মৃতের সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ। লোকের বিশ্বাস, প্রকৃতপক্ষে মৃতের সংখ্যা আরও অধিক।

সাহায্য-প্রদান শেষ হইল। এত অল্প ব্যয়ে এমন সুচারু ব্যবস্থায় পূর্ব্বে কখনও সাহায্যদান সম্পন্ন হয় নাই। শতকরা বার আনা মাত্র ব্যয়ে বিপুল অর্থ বিতরিত হইয়াছিল; অর্থাৎ ১০০৲ টাকার মধ্যে ৯৯৷০ ক্ষুধার্ত্তের জঠরানল-নিবৃত্তির সাহায্য করিয়াছিল। ইহার পরও কেবল একবার এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। গত দুর্ভিক্ষের সময় ইংলণ্ডের Investor's Review পত্র যে অর্থসংগ্রহ করেন, তাহা সার্ উইলিয়ম্ ওয়েডার্‌বরণের প্রস্তাবে বোম্বাই অঞ্চলে সার্ জষ্টিস্ রাণাডে ও সার্ ফিরোজশা মেটা প্রভৃতি কয় জন প্রধান ব্যক্তির দ্বারা বিনা ব্যয়ে বিতরিত হয়।

কার্য্য শেষ হইলে ইংলণ্ডে ভাণ্ডারের সম্পাদককে ও কোষাধ্যক্ষকে পুরস্কৃত করা হইল। এ দেশের অবৈতনিক সম্পাদক ডিগ্‌বীকেও পুরস্কৃত করিবার প্রস্তাব হইল। তিনি পুরস্কার লইতে অস্বীকৃত হইলেন। তাঁহার এই মহত্বদর্শনে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশদ্বয়ের সমিতির সভ্যদল আপনাদের মধ্যে স্বতন্ত্র চাঁদা তুলিয়া তাঁহাকে ২৭৪৫৲ টাকা প্রদান করেন। এই অর্থ তাঁহার শ্রমের যোগ্য পুরস্কার নহে; সমিতির সভ্যদিগের প্রীতি ও প্রশংসার নিদর্শন মাত্র। তাঁহারা এই কথাই বলিয়াছিলেন। ভারতীয় সমিতির সভাপতি সার উইলিয়ম্ রবিন্সন তাঁহার শ্রমসামর্থ্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, গুরুতর ও কষ্টকর কার্য্যে ধৈর্য্য ও শিষ্টতার বিশেষ প্রশংসা করেন। ভারত গভর্ণমেণ্টও তাঁহাকে C. I. E. উপাধিতে ভূষিত করিয়া সম্মানিত করেন।

এই অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহার Famine Campaign in Southern India গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

গভর্মেণ্ট ডিগ্‌বীকে মাদ্রাজ মিউনিসিপালিটীর কমিশনার নিযুক্ত করেন, এবং ফ্যামিন কমিশনের সদস্য নির্ব্বাচিত করিবার প্রস্তাব করেন। মাদ্রাজবাসীরাও তাঁহাকে মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সময় অতর্কিত দুর্ঘটনায় তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন।—১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে পত্নীবিয়োগ হওয়ায় তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান।

মাদ্রাজে ডিগ্‌বীর আর এক কীর্ত্তি,—পশুক্লেশনিবারিণী সভা।

দেশে প্রত্যাগমন করিয়া ডিগ্‌বী কিছুদিন সংবাদপত্রসংশ্লিষ্ট কার্য্যে লিপ্ত

থাকেন। রাজনীতিতে ডিগ্‌বী স্বয়ং উদারনৈতিক ছিলেন। রক্ষণশীল দলের প্রধান বৈঠক Carlton Clubএর মত কোনও বৈঠকের অভাব উদারনৈতিক দল বহুদিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন। ডিগ্‌বী উদ্যোগী হইয়া সেই অভাবের নিবারণকল্পে National Liberal Club প্রতিষ্ঠিত করেন; স্থাপন-কাল ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহার সম্পাদক থাকেন। এই সময় তিনি ইংলণ্ডে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুপরিচিত ও প্রভাব-সম্পন্ন হইয়া উঠেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবাসীদিগের অভাব ও অভিযোগের কথা ইংলণ্ডে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের গোচর করিবার উদ্দেশ্যে তিনি Indian Political Agency সংস্থাপিত করেন। এই কার্য্যে 'অমৃতবাজার' পত্রের অধ্যক্ষগণ তাঁহার সহকারী ছিলেন। এই সময় তিনি কংগ্রেসের British Commitee ও কংগ্রেসের মুখ পত্র 'ইণ্ডিয়া' পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। যত দূর স্মরণ হয়, তিনি প্রথম এলাহাবাদ কংগ্রেসে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের মতান্তর উপস্থিত হয়। দেশীয় রাজন্যবর্গের অভাব অভিযোগের কথা কংগ্রেসে আলোচিত হয়, ইহা মিষ্টার হিউমের অনভিপ্রেত ছিল। তিনি কংগ্রেসের কার্য্য বৃটিশ-শাসিত ভারতের মধ্যে বদ্ধ রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন। এ অবস্থায় দেশীয় রাজন্যগণের অভাব অভিযোগ-জ্ঞাপনের প্রধান পথ Political Agencyর সম্পাদকের হস্তে কংগ্রেসের ইংলণ্ডস্থ সমিতির ভার ন্যস্ত থাকা উচিত কি না, এই বিষয় লইয়া কথা উঠে। ডিগ্‌বী কংগ্রেসের কার্য্য ত্যাগ করেন। একান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ মতের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা কলিকাতার তৃতীয় অধিবেশনে 'অমৃতবাজার' পত্রের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের অনুরোধে ও মৃত মিষ্টার কেনের চেষ্টায়, পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইয়া, ঝালোয়ারের সিংহাসনচ্যুত রাণার বিষয় আলোচনা করেন।

ডিগ্‌বীর সম্পাদকতায় 'ইণ্ডিয়া' পত্র যেরূপ সুপরিচালিত হইয়াছিল, এখন আর তেমন হয় না। ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের শেষ হইলেও, ডিগ্‌বী কখনও কংগ্রেসকে ভুলিতে পারেন নাই; পরন্তু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অবসর পাইলেই কংগ্রেসের হিতসাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। National Liberal Clubএর সম্পাদক অবস্থায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক India for the Indians and for England প্রচারিত করেন। এই পুস্তক সম্বন্ধে জন্ ব্রাইট্ বলিয়া-

ছেন; যাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছুমাত্র মনোযোগ দেন, তাঁহারা সকলেই এই পুস্তকপাঠে উপকৃত হইবেন।

প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায় মহাত্মা ব্রাড্‌ল কাশ্মীর রাজ্যের প্রতি অত্যাচারের বিষয় পার্লামেণ্টের গোচরে আনেন। এই উপলক্ষে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ডিগ্‌বী Condemned Unheard গ্রন্থের প্রচার করেন।

ভারতবাসীদিগের রাজনৈতিক অভাবের বিষয়ে তিনি আরও কতকগুলি পুস্তক ও পুস্তিকার প্রচার করেন। কিছু দিন হইতে তাঁহার মতামত প্রধানতঃ 'অমৃতবাজার' ও মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রদ্বয়ের ইংলণ্ডস্থ সংবাদ-দাতার পত্রে প্রকটিত হইত। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি উইলিয়ম্ হচিন্‌সন্ কোম্পানীর অংশী হয়েন। এই কোম্পানী এ দেশে—মাদ্রাজে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম স্থাপন করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি এক জন ইটালীয়ের আবিষ্কৃত বায়ুচাপে নল-মধ্য দিয়া দ্রুত পত্রাদিচালনপ্রণালী ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তনের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ফলাফল আমরা অবগত নহি। তিনি Natural Law in Terrestrial Phenomena নামক পুস্তকের রচনা করেন। তাহাতে আব-হাওয়া বিষয়ক অনেক নূতন তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট ছিল।

তাঁহার সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ Prosperous British India ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক লইয়া যেরূপ বাদানুবাদ ও আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে, ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় প্রায় কোন পুস্তক লইয়া সেরূপ হয় না। তাহার এক প্রধান কারণ, ডিগ্‌বী স্বয়ং ইংলণ্ডে সুপরিচিত ছিলেন। ইংরাজশাসনে ভারতবর্ষ ক্রমেই দরিদ্র হইতেছে, ইহারই প্রতিপাদন এই পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই মতের আর দুই জন প্রধান পোষক, দাদাভাই নাওরোজী ও রমেশচন্দ্র দত্ত। সেই জন্যই ভারতের ক্রমবর্দ্ধনশীল দারিদ্র্যমতাবলম্বীরা Digby-Dadabhai-Dutt School বলিয়া পরিচিত।* প্রধানতঃ, এই পুস্তক প্রচার করিয়া তিনি ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদিগের বিষদৃষ্টিতে পতিত হয়েন। তাঁহাদের মতে, তিনি "a dangerous person, whose habits of controversy were as objectionable as his charges were wild and unfair." এই গ্রন্থ প্রধানতঃ সরকারী কাগজপত্র হইতে সঙ্কলিত। সে সকল কাগজপত্র গোপনীয় বলিয়া গণ্য। তাই ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার ব্রাড্‌ল ঐ

* ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ পাঠক শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত "দেশের কথা" পুস্তকে ইঁহাদিগের মতের সারভাগ জানিতে পারিবেন।

সকল কাগজপত্র চাহিলে, প্রথমে তিনি সে সকল প্রাপ্ত হয়েন নাই। শেষে তিনি ঐ সকল পাইয়া ডিগ্‌বীকে প্রদান করেন। সে সকল যে ডিগ্‌বীর ব্যবহারার্থই লইতেছেন, এ কথা তিনি ইণ্ডিয়া আফিসের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন।

এই স্থলে এ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, প্রধানতঃ ডিগ্‌বীর সাহায্যেই ভারতবন্ধু ব্রাড্‌ল ভারতের জন্য সমধিক কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতের সকল তত্ত্বই ডিগ্‌বীর নখদর্পণে ছিল; তিনি অবশ্যক হইলেই মিষ্টার ব্রাড্‌লকে সকল বিষয় অবগত করাইতেন। এই জন্যই ব্রাড্‌ল শেষজীবনে ডিগ্‌বীকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে ভারতীয় বজেটের বিচারকালে ষ্টেট সেক্রেটারী লর্ড জর্জ্জ হ্যামিল্টন্ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার ভাবার্থ এই,—ইংলণ্ডে ও ভারতে কতকগুলি লোক ক্রমাগত বলিতেছেন যে, ইংরাজশাসনে ভারতবর্ষ নিরন্ন হইয়া উঠিতেছে। ষ্টেট সেক্রেটারী হওয়া পর্য্যন্ত আমি সর্ব্ববিধ প্রমাণ সংগ্রহ ও বিচার করিয়া এই কথার সত্যাসত্যনির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইয়াছি। এই অভিযোগ সত্য হইলে—অর্থাৎ ইংরাজ-শাসনে ভারতের যদি আর্থিক অবনতি হইয়া থাকে, তবে আমরা অপরাধী, এবং সেই সাম্রাজ্যের শাসন-ভার রাখা আর আমাদের কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তাঁহাদের কথার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাই নাই। এই অভিযোগের ক্রমাগত পুনরুক্তিতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ভারতে ও ইংলণ্ডে এক দল লোক এই অভিযোগে বিশ্বাস করেন। কিন্তু এ অভিযোগ ভিত্তিহীন।—ইত্যাদি। লর্ড জর্জ্জের এই উক্তির উত্তরদানে Prosperous British India রচিত ও প্রচারিত হয়। অধিকাংশ ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারীর মত, ইংরাজ-শাসনে ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য-সম্পদ বর্দ্ধিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে সার্ রিচার্ড টেম্পল্ অতি অদ্ভুত যুক্তি দেখাইতেও পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। তিনি বলেন, ভারতের লোক স্বভাবতঃ সঞ্চয়শীল, সুতরাং লোকে যাহাই মনে করুক, তাহাদের সঞ্চয়ের অভাব হইবে না। এ বিষয়ের যথাযথ বিচার করিতে হইলে নানা রাজনৈতিক কথার আলোচনা করিতে হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার স্থান নাই।

আমেরিকা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে যেরূপ স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইংলণ্ডের অধীনে ভারতে সেইরূপ স্বায়ত্বশাসন-প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়া

* Introduction to Keene's Great Anarahy.

London Indian Societyতে প্রবন্ধপাঠ, ভারত সম্বন্ধে ডিগ্‌বীর শেষ কার্য্য।

অর্থনীতিতে পারদর্শিতা হেতু ডিগ্‌বী Royal Statistical Societyর সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

ডিগ্‌বী স্বভাবতঃ ভাব-প্রবণ, সহানুভূতি-সিক্ত, বন্ধুবৎসল ও মুক্তহস্ত ছিলেন। রাজনৈতিক বিপক্ষদিগের প্রতি তিনি কখনও ব্যক্তিগত দোষারোপ করেন নাই। তাঁহার সমাধি-সময়ে তদীয় রাজনৈতিক স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয়-দিগের একত্র সমাবেশ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ডিগ্‌বী ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা অত্যন্ত সরস ও শিক্ষাপ্রদ ছিল। তাঁহার সরস কথায় শ্রোতার হৃদয়ে বিষাদের কুজ্ঝটিকা অপসারিত হইত। আপনার গৃহে তিনি সর্ব্বদা অতিথিসৎকার করিতেন। তাঁহার সঙ্গ বন্ধু বান্ধবদিগের প্রীতিপ্রদ হইত। সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও তিনি ভারতবর্ষের, ভারতবাসীদিগের ও বন্ধুবান্ধবগণের জন্য কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার বন্ধুবাৎসল্য অত্যন্ত অধিক ছিল।*

ডিগ্‌বী কখনও শ্রমকাতর হইতেন না। তিনি বিশ্রাম বা অবকাশ জানিতেন না। জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য দিনব্যাপী পরিশ্রমের পর লোক যখন বিশ্রাম করে, তিনি তখনও পরিশ্রম করিতেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত ছিলেন, তাঁহাদের অনেকের মতে, শ্রমাতিশয্যই তাঁহার অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ। দীর্ঘ দিবাভাগে পরিশ্রমের পর তিনি জনগণের নিকট ভারতের অভাব-অভিযোগ-জ্ঞাপনার্থ বক্তৃতা করিতেন, বা স্বীয় পাঠাগারে ভারতবর্ষসংক্রান্ত কোন রচনায় ব্যাপৃত হইতেন। তখন তিনি স্পষ্টই বলিতেন,—এখন আপনাকে সজীব মনে হইতেছে; এখন কর্ম্মবন্ধন দূরে। এখন যাহা করিতেছি, তাহা জীবনের অংশ। এই সময় তিনি ভারতে সংবাদপত্রে পত্র লিখিতেন। সে সকল পত্র তাঁহার হৃদয়ের ভাবে অনুপ্রাণিত, তাঁহার হৃদয়শোণিতে লিখিত।

তাঁহার শ্রম করিবার ক্ষমতা ও কার্য্য করিয়া তুলিবার সামর্থ্য উভয়ই অসাধারণ ছিল। তিনি যদি সন্ধ্যার পরিবর্ত্তে অনন্যকর্ম্মা হইয়া সমস্ত দিন

* বর্ত্তমান লেখক তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি চাহিয়া পাঠাইলে তিনি দুই প্রকারের দুইখানি প্রতিকৃতি পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন, একখানি আপনার ব্যবহারের জন্য, আর এক-খানি আমি দিতেছি বলিয়া রাখিবেন। ইত্যাদি।—লেখক।

ভারতের কার্য্য করিতে পাইতেন, তবে তাঁহার মত ব্যক্তি যে ভারতের অজস্র কল্যাণসাধন করিতে পারিতেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার সকল কার্য্য আন্তরিকতায় অনুপ্রাণিত ছিল। ভারতের পক্ষে তাঁহার অভাব সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সম্পাদক-লীলা।

১

কথা নাই, বার্ত্তা নাই, হঠাৎ বম্বে সহরের ধরমচাঁদ গোকুলচাঁদ শ্রেষ্ঠী নামক এক জন গুজরাতী বণিক ভারতবর্ষে একটি অ-পূর্ব্বপরীক্ষিত পণ্যদ্রব্য লইয়া বাণিজ্য করিবেন, এইরূপ ঘোষণা করায়, গুজরাতী সমাজে এক ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু এই আকস্মিক আতঙ্ক সহসা বিস্ময়ে পরিণত হইল; কারণ, তাহারা শুনিতে পাইল, ধরমচাঁদ গোকুলচাঁদ শ্রেষ্ঠী বম্বে নগরে সংবাদপত্রের ব্যবসায় খুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে! অতঃপর অনেকে সন্দেহ করিল, শেঠজীর মস্তিষ্কের কিঞ্চিৎ বিকার ঘটিয়াছে। এই সূত্রে তাঁহার গৃহে স্বস্ত্যয়নের জন্য দৈবজ্ঞের ও চিকিৎসার জন্য বৈদ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল কি না, আমরা জানি না; 'ইন্দুপ্রকাশে'র তাহা জানা থাকিতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্যে বম্বে সহরে কোন সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। দেশীয় যে দুই একখানি পত্রিকা ছিল, রাজনৈতিক ও সামাজিক অভাব অভিযোগাদির আলোচনাই তাহাদের উদ্দিষ্ট। একখানি উৎকৃষ্ট গুজরাতী কাগজ চালাইতে পারে, এরূপ শিক্ষিত গুজরাতীর সংখ্যা বম্বে নগরে তখন অতি অল্প ছিল। শিক্ষিত গুজরাতীর যে অভাব ছিল, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহারা সাধারণতঃ গুজরাতী ভাষাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন; যে ভাষা শিখিয়া সাহ লোকের দোকানে খাতা লেখা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং যে ভাষায় 'কেরণ ঘেলু' প্রভৃতি অস্বাভাবিক উপন্যাস ভিন্ন স্বাধীন প্রেমের গল্প-পাঠের উপায় নাই, সে ভাষা শিখিয়া হাস্যভাজন হইবার আগ্রহ সেকালের নব্য গুজরাতীদের মধ্যে ছিল না। যাঁহারা

পড়িতে পারিতেন, তাঁহারা লিখিতে পারিতেন না। আবার রচনা ভিন্নিসটি সেকেলে গুজরাতী পয়ার-বাগীশদিগেরই একচেটিয়া সম্পত্তি ছিল; পৃথিবীর সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না। তাহাদের এক জনকে ধরিয়া 'গুর্জ্জর-প্রতিবিম্বে'র সম্পাদক করিতে শেঠজীর মন সরিত না; শেঠজী অনেক চেষ্টায় সম্পাদক সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, আহম্মদাবাদে তাঁহার এক উকীল বন্ধুকে একখানি পত্র লিখিলেন। সেই গুজরাতী পত্রখানির বঙ্গানুবাদ এই,—

"ভাই হীরাচাঁদ! আমার এই পত্র পাইয়া বোধ করি তুমি কিছু বিস্ময় প্রকাশ করিবে।

"আমি সংবাদপত্রের ব্যবসায় করিব,—যদি যায় ত কিছু টাকা জলে যাক্। কোম্পানীর কাগজের শতকরা সাড়ে চারি টাকা ছাড়িয়া কিছু টাকা পরীক্ষা-চ্ছলে জলে নিক্ষেপ করা ঠিক প্রকৃতিস্থের লক্ষণ বলিয়া তোমার মনে না হইতে পারে। কিন্তু তুমি জান, আমি ইউরোপীয় বণিক ভ্রাতাদিগের বাণিজ্য-নীতি অনুকরণযোগ্য মনে করি। 'টাইমস্'-এর আয় ও মান কত, তা ত জান। এমন অনেকেরই নাম করিতে পারি। বিলাতে যে ব্যবসায়ে লাভ হয়, এখানে তাহাতে না হইবে কেন? দেশ অশিক্ষিত, কিন্তু লোককে শিক্ষিত করিয়া লইতে কত ক্ষণ? আমরা তাহাদিগকে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, কর্ত্তব্যনীতি দান করিব, আর তাহারা তাহার পরিবর্ত্তে সপ্তাহে একটা পয়সা দিবে না? দশ লক্ষ গুজরাতী সংবাদপত্র পড়িতেও বুঝিতে পারিবে; দশ লক্ষ গুজরাতী সপ্তাহে এক পয়সা করিয়া দিয়া আমার কাগজ পড়িবে না? পড়াইব, তবে ছাড়িব। এখন চাই এক জন ভাল সম্পাদক। উপযুক্ত লোক তোমার সন্ধানে আছে? দিতে পার? আমি তাহাকে প্রত্যহ বেতন হিসাবে দু টাকা ও জলখাবার হিসাবে চারি আনা (মাসে পড়ে সাড়ে সাতষট্টি টাকা) দিব, এবং কার্য্যদক্ষতা দেখাইতে পারিলে এক বৎসর পরে বেতন আড়াই টাকা বৃদ্ধি করিয়া সত্তর টাকা করিয়া দিব। অধিক বেতন না দিলে সম্পাদকের পদের দায়িত্ব হাল্‌কা হইয়া পড়ে—এ জ্ঞান আমার আছে। আশা করি, শীঘ্র উত্তর লিখিবে।"

শ্রীযুক্ত হীরাচাঁদ মাণিকচাঁদ বি এ., এল্. এল্. বি. মহোদয়ের উত্তরের অনুবাদ।—

"ঝণ্টু, তোমার পত্র পাইলাম। তোমার উৎসাহের সঙ্গে আমার সহানুভূতি আছে; তুমি চিরকালই pushing, সেই গুণেই তুমি তোমার পৈতৃক যাহা

কিছু লাভ করিয়াছিলে, তাহা অত্যল্পকালের মধ্যে আশাতিরিক্ত হাল্‌কা করিয়া তুলিয়াছ। যদি তোমার মত আমার আত্মপ্রত্যয় থাকিত! যাহা হউক, তুমি কি রকম লোক চাও, লিখিবে;—আমি দিলেও দিতে পারি। এমন কল্পতরু তোমার বন্ধুগণের মধ্যে আর কে আছে?—তোমার হীরাচাঁদ।"

ধরমচাঁদ গোকুলচাঁদ লিখিলেন, "আমি ব্যবসায় করিব, ইহা বুঝিয়া লোক পাঠাইবে। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মত লোক চাই না। কুকুরের মত কামড়াইবার শক্তি থাকিলে বরং মন্দ হয় না। বেশ 'বলিয়ে কইয়ে' হইবে; খুব সামাজিক হইবে। ধর্ম্মে শ্রদ্ধা না থাক, ধর্ম্মধ্বজীদিগকে লইয়া দল পাকাইবার শক্তি থাকা চাই। আবশ্যক হইলে কোনও বড়লোকের মোসাহেব করিবার জন্য প্রস্তুত থাকাও চাই। বেশী পাশ ফাস চাই না, তবে পাশ টাসের চেয়ে বেশী জানে, এটুকু দেখান চাই। লর্ড মেয়োকে নিজের সমকক্ষ জ্ঞান করিবার ভাব-প্রকাশের শক্তি থাকা চাই; সংবাদপত্র রাজ্যের একটা শক্তি, তা ভুলিলে চলিবে না। গৃহে পিতা মাতার প্রতি ভক্তি না থাক, বাহিরে আমাদের বিষ্ণুলোকের ন্যায় পবিত্র গুর্জ্জরভূমির দুঃখে প্রাণ কাঁদা চাই। সর্ব্বোপরি, গবর্মেণ্টকে প্রাণপণে গালি দেওয়া চাই,—স্বার্থের খাতিরে যে লোক নীতিবিসর্জ্জন দিতে রাজী নয়, এমন নিষ্কর্ম্মা লোক পাঠাইও না।"

২

এই পত্র ডাকে দিবার সাত দিন পরে ধরমচাঁদের আফিসে একটি গুজরাতী যুবকের আবির্ভাব হইল। তাহার পায়ে বিলাতী জুতা, পরিধেয় বস্ত্রখানিও বিলাতী। এই উমেদার যুবকের নাম নটবর নরোত্তম। নটবর আহম্মদাবাদ কলেজে বি. এ. পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলেন; কিছুদিন 'সৌরাষ্ট্র-বার্ত্তার' সহকারী সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদকের সঙ্গে বিবাদ করিয়া তিনি একটা টোল-স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময় হীরাচাঁদ মাণিকচাঁদ তাঁহাকে বন্ধুর নিকট পাঠাইলেন।

ধরমচাঁদ গোকুলচাঁদ বন্ধুর পত্রখানি পাঠ করিয়া একবার একটু বক্র-দৃষ্টিতে নটবরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি পূর্ব্বে সম্পাদকতা করিয়াছেন, কাজ ছাড়িলেন কেন?" "আমি সহকারী ছিলাম, বড় সম্পাদকের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি।" "উত্তম, দেখা যাইতেছে আপনি নির্ভীক; জেলে যাইতে প্রস্তুত আছেন?

"অনাবশ্যক, জেলে যাইবার উদ্যমের পূর্ব্বেই সাবধান হইব।"

"দেখা যাইতেছে, আপনি বিবেচক।—সম্পাদকের সঙ্গে ঝগড়া করিলেন কেন?"

"আমাকে দিয়া গাধার খাটুনি খাটাইয়া নিজে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেন, এবং তিনি নিজে কোন মানহানির মামলার আসামী হইলে আমাকে দায়ী করিতেন; অথচ তিনি জেল খাটিতে রাজী বলিয়া আমায় মাহিনার চারিগুণ টাকা আদায় করিতেন।"

"দেখা যাইতেছে, আপনি ন্যায়পরায়ণ। কিন্তু আপনাতে স্বদেশ-হিতব্রতের কোন চিহ্ন দেখিতেছি না কেন?"

"স্বদেশের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে, আর সেই জন্যই আমি স্ত্রীর পরামর্শে মাকে পৃথক করিয়া দিয়াছি।"

"আপনার উত্তরে আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে।—কিন্তু পায়ে বিলাতী জুতা, পরিধানে বিলাতী কাপড়, এ সকল বিলাতী অনুরাগ কেন?"

"অনুরাগ নহে, বিলাতের অনুকরণ ও আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন আমাদের আর কি উপায় আছে? পদের মানবৃদ্ধি করিতে বিলাতী জুতাই এখন অগ্রগণ্য, বিলাতী কাপড় ভিন্ন দেশীতে লজ্জানিবারণ করিয়া নিমকহারাম হওয়া উচিত নহে। লিভারপুলের লবণ ত ছাড়িতে পারিব না।"

শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "দেখা যাইতেছে, রাজভক্তির তুমি সুন্দর যুক্তি দেখাইতে পারিবে; তোমাকে সম্পাদক নিযুক্ত করিলাম।"

৩

নটবর নবোত্তমের সম্পাদনে 'গুর্জ্জর-প্রতিবিম্বে'র কেমন শোভাবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তাহা সে সময়ের মধ্যশ্রেণীর গুজরাতীদিগের মুখে এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। 'গুর্জ্জর-প্রতিবিম্ব' প্রথমে জনাদর লাভ করে নাই, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই প্রতিভাবান সম্পাদক নিজের পথ চিনিয়া লইয়া সরোষে ইংরাজ গবর্মেণ্টের কার্য্যের সমালোচনা করিতে লাগিলেন; পরের নিন্দা কুৎসাও কীর্ত্তন করিতে লগিলেন। কিন্তু যখনই কেহ চোখ রাঙ্গাইয়া পত্র লিখিত, তখনই তাহার প্রশংসা করিয়া তাহার শক্তির নিন্দা আরম্ভ করিতেন। দেশের লোককে জাতীয়তা বজায় রাখিবার জন্য আহ্বান করিতেন, নিজে কিন্তু বিলাতীর মায়ায় মুগ্ধ। গুজরাতী সমাজে ইউরোপ-যাত্রার স্রোত বহিতে আরম্ভ হইয়াছিল, অশিক্ষিত দরিদ্র গুজরাতীরা এ ভাবটি বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখিত; এই স্রোতের প্রতিকূলে তিনি লেখনীধারণ করিলেন

মফঃস্বলের অশিক্ষিত সংবাদদাতাদিগের প্রগল্‌ভতাপূর্ণ সংবাদগুলি তাহাদের নামধামাদি সহ মফঃস্বল স্তম্ভে ছাপিতে লাগিলেন। কোন্ স্থানের কোন্ বণিক শুভ মার্গশীর্ষে (অগ্রহায়ণ মাসে) কুকুরকে কত সের জিলিপি ও পিপীলিকা-পর্ব্বে কত সের চিনি চালিয়া দিয়াছেন, তাহার সংবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সম্পাদকের প্রশংসায় শুর্জ্জরভূমির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; প্রত্যহ শত শত নূতন গ্রাহক বাড়িতে লাগিল। শেঠজী খুসী হইয়া নটবরের বেতন এক শত টাকা করিয়া দিলেন।

এইবার নটবরের প্রতাপসূর্য্য দিগন্তে রশ্মিজাল বিকীরণ করিতে লাগিল। মনিবকে ফাঁকি দিয়া তিনি নিজের জন্য কাগজ লিখিতে লাগিলেন। কোথাও কোনও অত্যাচার হইতেছে, জমীদার অত্যাচার করিতেছে, নটবর সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ করিলেন। জমীদারের কারকুণ আসিয়া নটবরের সহিত সাক্ষাৎ করিল, গোপনে কি কি কথার এবং কথার সঙ্গে অন্য কোন্ সামগ্রীর আদান প্রদান হইল, তাহা বাহিরের কেহই জানিতে পারিল না, তবে পরের সপ্তাহের কাগজে জমীদারের সুখ্যাতির প্যারা বাহির হইল; সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মন্তব্য প্রকাশ করা হইল যে, "কোন একটি নব্য উকীল জমীদারের 'ঘর' না পাওয়াতে প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া লড়িতেছে, এবং জমীদারের অন্যায় গ্লানি করিতেছে। এই মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করিয়া সম্পাদক অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছেন। জমীদার মহাশয়ের দুর্নাম-প্রচারে তাঁহার রাজভক্ত প্রজাকুলও অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইয়াছে! মিথ্যাবাদী উকীলের নামে জমীদার মহাশয় মানহানির নালিশ করিতে পারিতেন, কিন্তু আমাদের অনুরোধে তিনি সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই; বিশেষতঃ তেজস্বী ব্যক্তি মানরক্ষার জন্য কখনও আদালতের আশ্রয় লন না।"

এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে শেঠজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "নটবর! একেবারেই যে সুর বদলাইলে! এতে কাগজের প্রেষ্টীজ থাকিবে কি?"

"আর ম'শায় প্রেষ্টীজ!—প্রাণ থাকিলে ত প্রেষ্টীজ! জমীদার বেটা বয়কন্দাজ পাঠাইয়াছিল—এই তালগাছের মত মদ্দা! তার হাতে একগাছি বংশলোচন, লাঠী ত নয় যেন ভীমের গদা! আমি প্রতিবাদ করিতে সম্মত হই, তখন সে যায়। আর দেখুন যদি নালিশই করিত, তবে আপনিই বলিতেন, কেন ও ফেসাদে গেলে?—আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খুব তেজস্বীর মত লিখিব, কিন্তু শক্ত দেখিলেই সেলাম করিব।"

শেঠজী প্রীতমনে বলিলেন, "আমিও বলিয়াছিলাম, তুমি খুব ভাল সম্পাদক হইবে। তোমার কথায় বড় পরিতুষ্ট হওয়া গেল। আজ সন্ধ্যার পর আমার 'ঘরে' গোটাকতক লাড্ডু ভক্ষণ করিও।"

নটবর দেখিলেন, এ ভাবে বেশী দিন চালান কঠিন। ধূর্ত্ত শেঠ হয় ত এক দিন তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে; তখন তিনি আর এক ফন্দী করিলেন। শেঠজীর জীবনের ঘটনা অবলম্বন করিয়া 'গুর্জ্জর-প্রতিবিম্বে' প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। শেঠজী বাল্যকালে কবে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া ভাবাবেশে একটি কৃষ্ণবর্ণ বলীবর্দ্দকে গিরিগোবর্দ্ধন বলিয়া আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন, কবে তিনি কোন্ কদম্ববৃক্ষমূলে আসিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর লীলার স্মরণমাত্রে প্রেমগদগদভাবে অশ্রুত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী বর্ণিত হইতে লাগিল। নটবর কখনও বলেন, বম্বে-লাট কতকগুলি পরামর্শের জন্য আমাকে ডাকিয়াছিলেন, সে সকল গুহ্য কথা সংবাদপত্রে বাহির করিবার হুকুম নাই, তাই তাহা লইয়া আন্দোলন করিতে পারিতেছি না; কোনদিন বলেন, হাইকোর্টের জজ তেলাং বাহাদুর হিন্দুধর্ম্মের 'প্রমাণ' সম্বন্ধে কতকগুলি আলোচনার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও প্রকাশযোগ্য নহে, তেলাং-এর প্রকৃত ধর্ম্মমত কি, তাহা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিবার অধিকার তিনি আমাকে দান করেন নাই। নটবরের বেতন আরও পঞ্চবিংশতি মুদ্রা বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু নটবরের সহকারীর তিন গুণ কাজ বাড়িয়া গেল; অথচ তাহার তেইশ টাকা বেতনের এক বিন্দু পরিবর্ত্তন হইল না! শেঠজী একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "দামোদর কাজ কর্ম্ম করে কেমন?" নটবর বলিল, "যাচ্ছে তাই, যা ব'লে না দেও—তা কোনও মতে পারিবে না। সংবাদগুলো পর্য্যন্ত সংগ্রহ কর্ত্তে পারে না।" শেঠজী বলিলেন, "তবে ওটাকে সরাইয়া দেওয়া যাক্ না।" নটবর বলিলেন, "কাজ কি! কৃষ্ণের জীব আছে, থাক্; যত দিন আমি আছি, ততদিন চালিয়ে নেব।" শেঠজী বলিলেন, "নটবর! তুমিই মানুষ। এ যুগে তুমিই আদর্শ সম্পাদক।"

এইবার এক মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল,—এ যুদ্ধ লইয়া বম্বে অঞ্চলে মহা-হুলস্থুল বাধিয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গে সম্মতি-আইনের হুজুক এখনও সকলের মনে আছে। বল্লভাচার্য্যের শিষ্যগণের মানহানির মকদ্দমা লইয়াও বম্বে প্রদেশে সেই রূপ মহা বাক্‌যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল।

বম্বে হাইকোর্টের কোন গুজরাতী উকীলের একখানি গুজরাতী সাপ্তা-

হিক পত্রিকা ছিল। পত্রিকাখানির নাম, 'সংস্কারক'। এই পত্রিকায় অনেক শিক্ষিত গুজরাতী প্রবন্ধ লিখিতেন; এমন কি, ইহা গুজরাতী শিক্ষিত সমাজের মুখপত্ররূপে সর্ব্বত্র সম্মানিত হইত। 'প্রতিবিম্ব' 'সংস্কারক'কে চিরদিনই প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করিত। 'সংস্কারক' যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই লিখিতেন; সম্পাদক দেশের কল্যাণের জন্য লেখনীধারণ করিতেন; নটবর নিজের জন্য লেখনীতে শান দিতেন। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নির্লজ্জের ন্যায় মন্দকে ভাল বলিতেন। কেহ প্রতিবাদ করিলে বলিতেন, "আমি লোকশিক্ষার ভার লইয়াছি,—আমার ব্রত মহৎ, আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই ন্যায়সঙ্গত, সাধারণে তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে।" এ অবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত না। 'সংস্কারক' নীরবে উপেক্ষা প্রকাশ করিতেন। এই সময় বল্লভাচার্য্যের শিষ্যগণের বিরুদ্ধে একটি উৎকট ও অশ্লীল অভিযোগ 'সংস্কারকে' প্রকাশিত হইল। আমরা জানি, এই সংখ্যা 'সংস্কারকে'র পঞ্চাশ হাজার কাপি একদিনে বম্বের রাজপথে বিক্রীত হইয়াছিল। শীঘ্রই হাইকোর্টের সেশনে মানহানির মামলা আরম্ভ হইল।

শেঠজীর মুখে লাল পড়িতে লাগিল, কি করিলে 'সংস্কারকে'র প্রতিপত্তিটুকু আত্মসাৎ করা যায়?—নটবর বলিলেন, "গালি দিয়া।" শেঠজী বলিলেন, "গালাগালিতে উহারা অটল; উহাদের মধ্যে আবার প্রার্থনা-সমাজের দুই একটি লোকও আছে, হঠাৎ রাগিলে তাহারা নালিশ না করিয়া লাঠি তুলিয়া মারিতে আসে। তুমি রোগা মানুষ, উহাদের লাঠী বরদাস্ত করিতে পারিবে না। আমি বলি এক কাজ কর, বল, ধর্ম্ম নষ্ট হইল, যদি বল্লভাচার্য্যের প্রেমলীলা সংহার করিবার জন্য আইন হয়,তবে দেশে ভদ্রলোকে আর বাস করিতে পারিবে না।"

একটা খেই ধরাইয়া দিতে পারিলে নটবর 'গুলি'র শেষ মুড়া পর্য্যন্ত টানিয়া বাহির করিতে পারিতেন। প্রতি সপ্তাহে, "ধর্ম্ম নষ্ট হইল", "স্বর্গের পথ রুদ্ধ হইল", "প্রলয়কাল উপস্থিত!" ইত্যাদি শীর্ষক লোমহর্ষণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে লাগিল। গুর্জ্জরভূমি নটবরের লেখনীপ্রতাপে প্রকম্পিত হইতে লাগিল। নটবর দেশের মধ্যে এক জন প্রধান লোক হইয়া উঠিলেন। তিনি উত্তম বক্তৃতা করিতে পারিতেন, বল্লভাচার্য্যের মতের সমর্থন করিয়া বহুস্থানে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। বল্লভাচার্য্যের শিষ্যগণ তাঁহার পূজা যোগাইতে লাগিল। নটবরের সাংসারিক অস্বচ্ছলতা একেবারে ঘুচিয়া গেল; গৃহিণীর অলঙ্কার হইতে লাগিল।

এ সংবাদে শেঠজীর চোখ ফুটিল; একদিন শেঠজীর মুখও ফুটিল।—শেঠজী বলিলেন, "টাকাগুলা একা খাইও না, অধর্ম্ম হইবে।" নটবর বলিলেন, "আমি ধর্ম্মপক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতেছি; আহার নিদ্রার সময় নাই; প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে হাতে কড়া পড়িয়া গেল;—আর আপনি বলেন, আমি টাকা খাইতেছি। আর কেহ এ কথা বলিলে আমি সহ্য করিতাম না।"

শেঠজী দেখিলেন, সম্পাদকের ক্রোধ হইয়াছে, এমন গুণের সম্পাদক চলিয়া গেলে আর মিলিবে না। তিনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "আমাদের লেখা খুব বলিহারি রকমের হচ্চে।"

ইহার অল্পদিন পরেই, কি জন্য বলিতে পারি না, গোস্বামি-শিরোমণি হঠাৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। হাইকোর্টে তাঁহাদের পরাজয় হইল। "সংস্কারক"র প্রতিপত্তি তিনগুণ বাড়িয়া গেল। নটবরের ধর্ম্মরক্ষার বক্তৃতা শিকায় উঠিল। তখন সে নিজের স্বার্থসাধনের জন্য ভিন্ন দিকে হাত বাড়াইল। কুলমহিলাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কাগজে ছড়া লিখিতে লাগিল। তাহাতে একটি ফৌজদারীর সম্ভাবনা ঘটিল। শেঠজী এবার আন্তরিক চটিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, এ ব্যয়ভার বহন করা সহজ নহে। তিনি নটবরকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন। নটবর ক্ষমা প্রার্থনা করিল; কিন্তু অপমানিত ব্যক্তিগণ ক্ষমা করিলেন না। শেঠজী শেষে কয়েক সহস্র মুদ্রা দিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিলেন, কিন্তু নটবরকে সম্পাদকত্ব ত্যাগ করিতে হইল।

৪

নটবর হঠাৎ মধ্যাকাশ হইতে যেন একেবারে নিবিয়া গেলেন। শেঠজীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার বন্ধুগণকে ধরিতে লাগিলেন। কিন্তু শেঠজী আর সন্তুষ্ট হইলেন না। কেহ বেশী পীড়াপীড়ি করিলে তিনি বলিতেন, "যেতে দাও ভাই! ও কথা, আমি খবরের কাগজ উঠাইয়া দিব। উহা ছাড়িয়া বরং "* * *" তৈলের ব্যবসায় করিলে অধিক লাভ আছে।"

নটবর ধীরে ধীরে খাটে আসিয়া শুইলেন। মেয়ে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! অসুখ কচ্চে কি?" নটবর বলিলেন, "হুঁ।"

মেয়ে মাকে বলিল, "বাবার অসুখ।"

সম্পাদক-গৃহিণী কক্ষে আসিয়া সাগ্রহে স্বামীর ললাট স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অসুখ?"

"অসুখ নয়। একটা স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম। স্বপ্নটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।—চাকরীটি খোয়াইয়াছি; কি খাই এখন, তোমাকেই বা কি খাওয়াই?"

সম্পাদক-গৃহিণী বহুমুক্তাবিভূষিত স্থূল নথটি নাড়িয়া বলিলেন, "চাকরী গিয়াছে! যাক্, আপদ গিয়াছে। আমি ভাবছিলাম, কবে আমার প্রাণনাথকে সরকারের লোকেরা হ্যমিলাটন সাহেব করে নিয়ে যাবে। যাক্, ভালই হয়েছে, চল, তল্পি তাল্‌পা বেঁধে দেশে যাই। তাড়াতাড়ি কোলাবা ষ্টেশনে পঁহুছিলেই বাঁচি! দেশে গিয়া আবার টোল খুলিও। অধ্যাপকের ছেলের কি সম্পাদক হওয়া সাজে? গরুর পিঠে জিন কোন কালেই শোভা পায় না।"

নটবর নরোত্তম অতঃপর আহম্মদাবাদে ফিরিয়া গিয়া এক টোল খুলিয়াছেন। কিন্তু এতদিনের অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেন নাই, টোলে এখন শাস্ত্রচর্চ্চার পরিবর্ত্তে রাজনীতির আলোচনা চলে, এবং কি করিয়া গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের বিরাগ দূর করিয়া তাঁহাদিগকে নিজের সুখ ও সুবিধায় নিয়োগ করিতে পারা যায়, তাহা লইয়া তর্ক হয়। দুই পক্ষের এক পক্ষ বলে, "যোগবলেই আমরা বিশ্বজয় করিব।" আর এক পক্ষ বলে, "আমরা অশ্রুজলে বিশ্বপ্লাবন করিব,—তাহার পরই প্রলয়।" নটবর মধ্যস্থ, তিনি বলেন, "তৈলই বিশ্বজয়ের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও অমোঘ উপায়।"

নবীন গল্পলেখক।

বেদান্তদর্শন।

বেদের দুই ভাগ, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ লইয়া কর্ম্মকাণ্ড, এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্ লইয়া জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডের পর জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ডই বেদের অন্ত, বা চরম ভাগ। সেই জন্য ইহার সাধারণ নাম বেদান্ত।

পূর্ব্বমীমাংসা যেমন কর্ম্মকাণ্ড বেদের বিরোধভঞ্জন ও সামঞ্জস্যবিধানে নিয়োজিত, সেইরূপ বেদান্তদর্শন জ্ঞানকাণ্ড বেদের (বেদান্তের) সমন্বয়-সাধনে ও অবিরোধ-স্থাপনে ব্যাপৃত। সেই জন্য, এ দর্শনের অপর নাম উত্তরমীমাংসা। ব্রহ্মই বেদান্তদর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য। সেই জন্য, ইহাকে ব্রহ্মসূত্রও বলা হয়।

বেদান্তদর্শনের প্রণেতা মহর্ষি বাদরায়ণ। এ দেশের প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, ইনিই পরাশরতনয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, বাদরায়ণ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। পাণিনির ৪।৩।১১০ সূত্রে পারাশর্য্য-রচিত এক ভিক্ষু-সূত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পারাশর্য্য যে পরাশরতনয় বেদব্যাসেরই সংজ্ঞা, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কারণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে স্পষ্টতঃ ব্যাস পারাশর্য্যের উল্লেখ আছে। বাচস্পতি মিশ্রের মতে, 'ভিক্ষু-সূত্র' বেদান্তদর্শনেরই নামান্তর। কারণ, প্রাচীনকালে বেদান্তদর্শন সংসারত্যাগী চতুর্থাশ্রমীরই আলোচ্য ছিল। চতুর্থাশ্রমীর পারিভাষিক নাম ভিক্ষু। অতএব, বেদান্তদর্শনকে ভিক্ষু-সূত্র বলা অসঙ্গত নহে। এখনও দেখা যায়, দণ্ডী বৈদান্তিকেরা সংসারীকে বেদান্ত-দর্শন অধ্যাপনা করিতে অনিচ্ছুক। অতএব, বেদান্তদর্শনের প্রণেতা মহর্ষি বাদরায়ণকে বেদব্যাস মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

বেদান্তদর্শনে সর্ব্বসমেত ৫৫৬টি সূত্র আছে। এই দর্শন চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায় আবার চতুষ্পাদ। প্রথম অধ্যায়ের সাধারণ বিষয়,—সমন্বয়; দ্বিতীয় অধ্যায়ের,—অবিরোধ; তৃতীয় অধ্যায়ের,—সাধন; ও চতুর্থ অধ্যায়ের—ফল। প্রথম অধ্যায়ে স্পষ্ট, অস্পষ্ট ও সন্দিগ্ধ শ্রুতিবাক্যসমূহের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অন্যান্য দার্শনিক মতের দোষপ্রদর্শন-পূর্ব্বক যুক্তি ও শাস্ত্রের সহিত বেদান্ত-মতের অবিরোধ স্থাপিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জীব ও ব্রহ্মের (সগুণ ও নির্গুণের) লক্ষণনির্দ্দেশপূর্ব্বক মুক্তির বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে। এবং চতুর্থ অধ্যায়ে জীবন্মুক্তি, জীবের উৎক্রান্তি, এবং সগুণ ও নির্গুণের উপাসনার ফলের তারতম্য বিবেচিত হইয়াছে।

বেদান্তদর্শনের বহুবিধ ভাষ্য প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের শারীরকভাষ্য, রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য, এবং মধ্বাচার্য্যের পূর্ণপ্রজ্ঞভাষ্যই যথাক্রমে অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদীর নিকট আদরণীয়। শারীরকভাষ্যের উপর আনন্দগিরি ও বাচস্পতি মিশ্র টীকা রচনা করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রের টীকা 'ভামতী' দার্শনিকসমাজে সমাদৃত। সুদর্শনের 'শ্রুতপ্রকাশিকা' শ্রীভাষ্যের সুপ্রচলিত টীকা। বেদান্তদর্শনের অন্যান্য ভাষ্যকারদিগের মধ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু, ভাস্কর, যাদব মিশ্র, নিম্বার্ক, বল্লভ ও শ্রীকণ্ঠের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার উপর বেদান্তদর্শনের সাম্প্রদায়িক ভাষ্যেরও

অভাব নাই। নীলকণ্ঠের 'শৈবভাষ্য', 'বেদান্তপারিজাত' নামক সৌরভাষ্য ও বলদেবের 'গোবিন্দ' (বৈষ্ণব) ভাষ্যের এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বেদান্তদর্শনের যত প্রকার ব্যাখ্যা আছে, তন্মধ্যে অদ্বৈত মত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মতই প্রধান। অদ্বৈত মতের প্রধান আচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য, এবং বিশিষ্টাদ্বৈতমতের প্রধান আচার্য্য শ্রীরামানুজাচার্য্য। কিন্তু প্রধান হইলেও তাঁহারা ঐ ঐ মতের প্রবর্ত্তক নহেন। শঙ্করাচার্য্য সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর লোক; কিন্তু শঙ্করের পূর্ব্বেও অদ্বৈত মত সুপ্রচলিত ছিল। তাঁহার গুরুর গুরু গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য উপনিষদের যে কারিকা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে অদ্বৈত মতের পরিণত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য ঐ কারিকার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার শারীরকভাষ্যে তিনি আত্মমতসমর্থনের জন্য ভগবান্ উপবর্ষকে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপবর্ষেরও পূর্ব্ববর্ত্তী যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে ও সুতসংহিতায় অদ্বৈত মতের সুস্পষ্ট উপদেশ রহিয়াছে।*

এইরূপ রামানুজকেও বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রবর্ত্তক মনে করা সঙ্গত নয়।† কারণ, তিনি স্বয়ংই তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাঁহার 'শ্রীভাষ্য' যে বোধায়নের প্রাচীন ভাষ্যের অনুসরণ, তাহাও জ্ঞাপন করিয়াছেন। রামানুজের পূর্ব্বাচার্য্যগণের মধ্যে বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, ভারুচি, কপর্দ্দী ও যমুনাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈত মতের বিবরণ করিয়া গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন। সে সকল গ্রন্থ এখন প্রায়ই লুপ্ত হইয়াছে। তবে

* Shankara's is one only of the many traditional interpretations of the Sutras which prevailed at different times in different parts of India and in different schools.—Max Muller's Indian Philosophy page 284.

† In former times there existed the following works bearing on the doctrines of Visishtadwaita:—a vritti by the great Rishi Bodhayana, a Vasya of the Brahma Sutras by Dramiracharjya and a vartika by Tankacharjya. There were besides other works by Bhaiuchi, Guhadeva and other Acharjyas but these too having perished through the destroying agency of time, the siddhitraya &c. were composed by the venerable Yamunacharyya in order to explain the purport of the lost treatises. In these viz siddhitraya &c. were controverted the vashya and other writings of Bhartri × × Subsequently the illustrious commentator and holy sage Sri Ramanujachajya × × advanced the knowledge of the Visisti dwaita in the world by the composition of his great work called the sri vashya—M. M. Ram Misra Shastre's preface to his edition of Vedartha Sangraha.

যমুনাচার্য্য-কৃত 'সিদ্ধিত্রয়' সম্প্রতি মুদ্রিত হওয়াতে আশা হয় যে, কালে হয় ত অন্যান্য গ্রন্থেরও উদ্ধারসাধন হইতে পারে। এইরূপ আচার্য্যপরম্পরাক্রমে বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রবাহিত ছিল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রামানুজ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক হইলেও, বিশিষ্টাদ্বৈত মত অতি সুপ্রাচীন। *

বিশিষ্টাদ্বৈত মত সুগম করিবার জন্য রামানুজ বেদার্থসংগ্রহ, বেদান্তদীপ, বেদান্তসার, গদ্যত্রয় প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ এখনও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর উপজীব্য রহিয়াছে। এ সম্পর্কে রামানুজের নামে প্রচলিত বেদান্ততত্ত্বসার গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য।

অদ্বৈত মত বিশদ করিবার জন্য অদ্বৈতমতাবলম্বিগণ শঙ্করাচার্য্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বহুবিধ প্রকরণ গ্রন্থের প্রচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে পঞ্চদশী, অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি, চিৎসুখী বা তত্ত্বপ্রদীপিকা, পঞ্চপাদিকা, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, বেদান্তপরিভাষা, বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলি ও বেদান্তসার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত বাদে কয়েক বিষয়ে মারাত্মক প্রভেদ আছে; অথচ উভয় মতই একই বেদান্তসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয়েই প্রমাণস্থলে উপনিষৎসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্যদিগের এই মতদ্বৈধে মূলসূত্র অদ্বৈত অথবা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুকূল, তাহা স্থির করা দুরূহ। সেই জন্য বেদান্তদর্শনের বিবরণস্থলে উভয় মতেরই পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

অদ্বৈত মত।

অন্যান্য দর্শনের ন্যায় বেদান্তদর্শনেরও ভিত্তি দুঃখবাদ। বেদান্তদর্শনের

---

* There is evidence to shew that it (the Vishistadwaita school) must have come down in the form of an unbroken tradition from very ancient times—Preface to Rungacharya's Translation of Sree bhasya.

যথোদিত-ক্রম-পরিণতঃ ভক্তকলত্র এব ভগবদ্-বোধায়ন-টঙ্ক-দ্রমিড়-গুহদেব-কপর্দ্দি-ভারুচি-প্রভৃতিভিরবগীতঃ * * * শ্রুতিনিকরনিদর্শিতোঽয়ং পন্থাঃ।

[রামানুজ-কৃত বেদার্থসংগ্রহ; ১৪৮ পৃষ্ঠা।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদিগের প্রণিধানযোগ্য।

The individual philosopher is the month piece of tradition and that tradition goes back farther and farther the more we try to fix it chronologically.—Indian Philosophy. page 245.

মতেও সংসার দুঃখময়। শঙ্করাচার্য্য সংসারকে উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল আবর্ত্ত-বহুল নক্র-কুম্ভীর-ভীষণ সমুদ্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া জীব হাবুডুবু খাইতেছে।* ইহা হইতে তাহার উদ্ধারের কি উপায় নাই?

অদ্বৈত মতে জীবই ব্রহ্ম;—

জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।

জীব শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য স্বভাব।

নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-স্বভাবং প্রত্যগ্‌চৈতন্যমেব যাথাত্ম্যম্।—বেদান্তসার।

শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে বলিয়াছেন যে, বাক্য ও মনের অতীত, বিষয়ের বিরোধী, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ব্রহ্মই জীবরূপে অবস্থিত।†

এই মতের সমর্থনের জন্য শঙ্করাচার্য্য নানা শ্রুতিবাক্যের উদ্ধার করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত দুইটি শ্রুতি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

একস্ত্বেব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।—ব্রহ্মবিন্দু ১২।

যথা সর্ব্বং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্ অপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো, দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবম্ অজোঽয়ম্ আত্মা॥

'একই ভূতাত্মা ভূতে ভূতে বিরাজিত; তিনি জলে চন্দ্রবৎ একধা ও বহুরূপে দৃষ্ট হন।'

'যেমন জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়ে বহুরূপে প্রকাশিত হন, উপাধিকৃত তাঁহার এই ভেদ; সেইরূপ দ্যুতিমান্ অনাদি পরমাত্মা ক্ষেত্রভেদে বহু বলিয়া প্রতীয়মান হন।'

সেই জন্যই বেদের মহাবাক্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন করিতেছে। 'তত্ত্বমসি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'সোঽহম্', 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—'তুমি হও তিনি', 'এই আত্মা ব্রহ্ম', 'আমিই তিনি', 'আমি হই ব্রহ্ম'—ইত্যাদি। অর্থাৎ, জীব কেবল যে ব্রহ্মের সমজাতীয় পদার্থ, তাহা নহে;—

* 'অয়মধিকারী জননমরণাদিসংসারানলসন্তপ্তোদ্বাহনিমগ্ন জলরাশিমিব উপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি।—বেদান্তসার;—১১।

† বাঙ্মনসাতীতম্ অবিষয়ত্বাদ্যপাধি প্রত্যস্তমিতত্বাৎ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবং ব্রহ্ম।

The true Self, according to the Vedanta is all the time free from all conditions, free from names and forms.—Max Muller's Indian Philosophy, p 207.

জীবই ব্রহ্ম। * জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। গৌড়পাদ মাণ্ডুক্যকারিকায় লিখিয়াছেন ;—

জীবাত্মনোরনন্যত্বম্ অভেদেন প্রশস্যতে।
নানাত্বং নিন্দ্যতে যচ্চ তদেব হি সমঞ্জসম্ ॥—মাণ্ডুক্যকারিকা, ৩।১৩।
মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতৎ ন তথাঽঽত্মং কথঞ্চন।
তত্ত্বতো ভিদ্যমানাহি মর্ত্যতাম্ অমৃতো ব্রজেৎ ॥—ঐ ৩।১৯।
অজম্ অবাযম্ আত্মতত্ত্বং মায়য়ৈব ভিদ্যতে,
ন পরমার্থতঃ ; তস্মান্ন পরমার্থসৎ দ্বৈতং।—শঙ্কর।

অর্থাৎ, 'জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন; উভয়ের ভেদবুদ্ধি নিন্দার্হ। তবে যে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন বোধ হয়, তাহা বাস্তবিক নহে, মায়িক মাত্র। ভেদ যদি বাস্তব হইত, তবে যিনি অমৃত, তিনি মর্ত্য হইতেন।' তবে যে ভেদের প্রতীতি হয়, তাহা উপাধি-কৃত। † কোনরূপ উপাধিকে অপেক্ষা করিয়া তাঁহাকেই জীব বলা হয়।

---

* অদ্বৈতবাদীরা স্থানে স্থানে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে জীব নিঃসৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠের উপদেশ এইরূপ :—

স্বমরীচিবলোদ্ভূতাজ্জ্বলিতাগ্নেঃ কণা ইব।
সর্ব্বা এবোল্লিতা রাম। ব্রহ্মণো জীবরাশয়ঃ ॥—
যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি, ১৪।২২।
মেরুমন্দরসঙ্কাশা বহবো জীবরাশয়ঃ।
উৎপদ্যোৎপদ্য সংক্ষীণাস্তস্মিন্নেব পরে পদে ॥—ঐ, ঐ, ৯৫।৮।

গৌড়পাদ কিন্তু এ মতের অনুমোদন করেন না। তিনি বলেন যে, যেমন ঘটাকাশ মহাকাশের বিকার অথবা অংশ নহে (যেহেতু আকাশ অখণ্ড বস্তু), সেইরূপ জীবও ব্রহ্মের বিকার বা অবয়ব নহে।

নাকাশস্য ঘটাকাশো বিকারাবয়বৌ যথা।
নৈবাত্মনঃ সদা জীবো বিকারাবয়বৌ তথা ॥—
মাণ্ডুক্যকারিকা, ৩।৭।

† Sankara, as we said, was uncompromising on that point. With him and, as he thinks, with Badarayana also, no reality is allowed to the soul (Atman) as an individual (Jiva). * * With him the soul's reality is Brahman, and Brahman is one only.

[Max Muller's Indian Philosophy, page 244]

কোশোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্।—পঞ্চদশী—৩।৪১। *

কিন্তু ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিরুপাধি; অর্থাৎ সর্ব্ববিধ উপাধিমুক্ত।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ; জীব যখন ব্রহ্ম, তখন জীবও সচ্চিদানন্দ।

অবেদ্যোঽপ্যপরোক্ষোঽতঃ স্বপ্রকাশো ভবত্যয়ং।
সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চেত্যাদ্যৈর্ব্রহ্মলক্ষণং॥—পঞ্চদশী; ৩।২৮।

'জীব স্বপ্রকাশ; অজ্ঞেয় অথচ অপরোক্ষ; 'সত্য, জ্ঞান, অনন্ত' এই ব্রহ্মলক্ষণ জীবেও বিদ্যমান'। কারণ জীব ও ব্রহ্মে নামমাত্র প্রভেদ, যেমন অভিন্ন ঘটাকাশ ও মহাকাশের প্রভেদ।

কূটস্থব্রহ্মণোর্ভেদো নামমাত্রাদৃতেন হি।
ঘটাকাশমহাকাশৌ বিযুজ্যেতে নহি ক্বচিৎ॥—পঞ্চদশী, ৩।২৩৬—৭।

জীব যদি ব্রহ্ম, তবে তাহার সংসারদুঃখ কেন? কিসের জন্য সে সংসার-সাগরের তরঙ্গ-আঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়? কেন সে সংসার-অনলের দাব-দহনে সন্তপ্ত হয়? অদ্বৈতবাদীরা ইহার উত্তরে বলেন যে, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হইলেও অবিদ্যাবশে জীবে দেহাদি উপাধির ধর্ম্ম সংক্রামিত হয়।

এবং পরমার্থতোঽবিকৃতম্ একরূপমপি সদ্ব্রহ্ম দেহাদ্যুপাধ্যন্তর্ভাবাদ্ ভজতে ইব উপাধি-ধর্ম্মান্ বৃদ্ধিহ্রাসাদীন্।—৩।২।২০ সূত্রের শঙ্করভাষ্য।

সুখ দুঃখ, কাম ক্রোধ, রোগ শোক, এ সকল দেহ মনঃ প্রভৃতির ধর্ম্ম—জীব (আত্মার) ধর্ম্ম নহে। কিন্তু জীব দেহসংযোগ হেতু নিজেকে সুখী দুঃখী রোগী শোকী মনে করে।

গৌড়পাদ বলিয়াছেন;—

যথা ভবতি বালানাং গগনং মলিনং মলৈঃ।
তথা ভবত্যবুদ্ধানাম্ আত্মাঽপি মলিনং মলৈঃ॥

'যেমন বালকেরা আকাশকে মলা-মলিন ভাবে, সেইরূপ জ্ঞানাভাবেরা আত্মাকে মলা-মলিন ভাবে।'

সেই জন্য পঞ্চদশী-কার বলিয়াছেন, যে মহেশ্বরের যে মায়া, তাহার মোহ-শক্তিবলে জীব মোহিত হয়; এবং সেই মোহের বশে ঈশ্বর-ভাব হারাইয়া দেহ-সংলগ্ন জীব শোকের অধীন হয়।

---

* এই মর্ম্মে গৌড়পাদ মাণ্ডুক্যকারিকায় লিখিয়াছেন;—

ঘটাদিষু প্রলীনেষু ঘটাকাশাদয়ো যথা।
আকাশে সংপ্রলীয়ন্তে তদ্বজ্জীব ইহাত্মনি॥—মাণ্ডুক্যকারিকা; ৩।৪।
দেহাদিসংঘাতোৎপত্ত্যা জীবোৎপত্তিস্তৎপ্রলয়ে চ
জীবানাম্ ইহাত্মনি প্রলয়ঃ।—শঙ্কর।

মাহেশ্বরী তু যা মায়া তস্যা নির্ম্মাণশক্তিবৎ।
স্থিতে মোহশক্তিশ্চ তং জীবং মোহয়ত্যনৌ।
মোহানীশতাং প্রাপ্য মগ্নো বপুষি শোচতি। পঞ্চদশী ৪। ১১—২।

'এই অবিদ্যার আবরণে আবৃত হইলে জীব আপনাকে কর্ত্তা ভোক্তা, সুখী দুঃখী ইত্যাদি সংসারজড়িত মনে করে; বাস্তবিক কিন্তু ইহা ভ্রম। রজ্জুতে যেরূপ সর্পভ্রম, সেইরূপ মর্ম্মান্তিক ভ্রম।

অনয়াবৃতস্বাত্মনঃ কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-সুখিত্ব-দুঃখিত্বাদি-সংসারসম্ভাবনাপি ভবতি যথা স্বজ্ঞানেনাবৃতায়াং রজ্জ্বাং সর্পত্বসম্ভাবনা।—বেদান্তসার।

এই ভ্রমাপনোদনের উপায় কি? অবিদ্যাই যখন ভ্রমের জননী, তখন অবিদ্যার বারণ করিতে পারিলেই এই ভ্রম অপনীত হইবে। * জীব যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা হইলেই অবিদ্যা নিবৃত্ত হইবে। অতএব, অদ্বৈত মতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানই মুক্তির উপায়।

গৌড়পাদ বলিতেছেন;—

অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নম্ অদ্বৈতং বুধ্যতে তদা।—মাণ্ডুক্যকারিকা; ১।১৬।

'অনাদি মায়াবশে সুপ্ত জীব যখন জাগরিত হয়, তখন সে বুঝিতে পারে যে, সেই স্বয়ং জন্মহীন, নিদ্রাহীন, স্বপ্নহীন, অদ্বৈত ব্রহ্ম বস্তু'।

জীব মুক্ত-স্বভাব—পূর্ব্বাপর মুক্ত। তাহার যে বন্ধ মনে হয়, তাহা কল্পনা-মাত্র, বাস্তব নহে। সেই জন্য গৌড়পাদাচার্য্য লিখিয়াছেন;—

ন নিরোধো নচোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্নবৈমুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা।

---

* জীব আত্মবিস্মৃত। সে নিজেকে নিজে জানে না। যোগবাশিষ্ঠ বলিতেছেন,—

হেতুর্বিহরণে তেষামাত্মবিস্মরণাদৃতে।
ন কশ্চিল্লক্ষ্যতে সাধো জন্মান্তরফলপ্রদঃ।—উৎপত্তিপ্রকরণ; ৯২।৮।

জীবগণ যে জন্মান্তরপরিগ্রহ করিয়া বিচরণ করিতেছে, ইহার একমাত্র কারণ তাহাদের আত্মবিস্মৃতি।

This is indeed the real object of the Vedanta philosophy to overcome all Nescience, to become once more what the Atman always has been namely Brahman— Max Muller's Indian philosophy page 236.

This primeval Avidya is left un explained it is not to be accounted for. as little as Brahman can be accounted for. Like Brahman it has to be accepted as existent but it differs from Brahman in sofar as it can be destroyed by Vidya.—Max Muller's Indian Philosophy p. 225.

'বস্তুতঃপক্ষে আত্মার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, বন্ধ নাই, মোক্ষ নাই, সাধন নাই ও মুমুক্ষা নাই।'

এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পঞ্চদশীকার লিখিয়াছেন,—

বাস্তবো বন্ধমোক্ষৌ তু শ্রুতির্নাহতেতরাং।—পঞ্চদশী, ৬।২৩৪।

'জীবের যে বন্ধ ও মোক্ষ, বাস্তবিক এ কথা শ্রুতিসিদ্ধ নহে।' সেই জন্য অদ্বৈত মতে মুক্তি সাধ্য নহে, সিদ্ধ বস্তু। জীব স্বতই মুক্ত। তাহার পক্ষে মুক্তির অন্বেষণ বিড়ম্বনামাত্র। কারণ, জীব সর্ব্বদাই মুক্ত। এ কথা বুঝাইবার জন্য অদ্বৈতবাদীরা একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া থাকেন। "—কণ্ঠচামীকরবৎ"। তাঁহারা বলেন, এক শিশুর কণ্ঠে একটি স্বর্ণহার ছিল। শিশুর একদা ভ্রম উপস্থিত হইল যে, তাহার হার কে চুরি করিয়াছে। সে ব্যাকুল হইয়া সর্ব্বস্থানে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইল। কিন্তু কোথাও হারের সন্ধান পাইল না। তখন তাহার এক আত্মীয় বলিয়া দিলেন যে, যে হারের অন্বেষণে তুমি পণ্ডশ্রম করিয়াছ, তাহা তোমার কণ্ঠেই লম্বিত রহিয়াছে। তখন সেই অতি নিকটস্থ বস্তু, যাহাকে সে অতি দূরস্থ মনে করিয়াছিল, তাহাকে লাভ করিয়া সেই শিশু কৃতার্থ হইল। মুক্তিও এইরূপ। মুক্তি জীবের স্বভাব-সিদ্ধ। অথচ জীব নিজেকে সংসার-জালে আবদ্ধ ভাবিয়া হাহাকার করে। তখন সদ্‌গুরু কৃপা করিয়া তাহাকে প্রকৃত তত্ত্বের উপদেশ দেন। তাহার ফলে তাহার অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, এবং সে নিজের শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব উপলব্ধি করে।

অদ্বৈতবাদীরা এই তত্ত্ব একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, এক সিংহশিশু ঘটনাক্রমে এক মেষের দলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সে মেষ-সাহচর্য্যে ভ্রান্তিবশে নিজেকেও মেষ কল্পনা করিল, এবং মেষের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া হস্তী ব্যাঘ্রের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। একদা কেহ করুণা করিয়া তাহাকে জলাশয়ের ধারে লইয়া গেল, এবং জলে তাহার প্রতিবিম্ব দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল যে, সে মেষ নহে, সিংহ। তখন সে নিজের স্বরূপ বুঝিয়া সিংহবিক্রমে হস্তী ব্যাঘ্রের সহিত সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হইল।

জীবের ঘটনাও ঠিক এইরূপ। জীব উপাধিসংযোগে মোহগ্রস্ত হইয়া নিজের শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ বিস্মৃত হয়, এবং "অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ" —ঈশ্বরভাব হারাইয়া শোক মোহের অধীন হয়। যদি সদ্‌গুরু তাহাকে

বলিয়া দেন যে, 'তত্ত্বমসি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', এবং সে যদি বুঝিতে পারে, 'সোঽহম্', 'অহং ব্রহ্মাস্মি,' তবেই তাহার অবিদ্যার আবরণ অপসৃত হয়, এবং সে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি করিয়া স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,—

তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।—মুণ্ডক উপনিষদ; ১।২।১২।

'সেই জ্ঞানলাভের জন্য শিষ্য সমিৎ হস্তে লইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপস্থ হইবে।'

এই ব্রহ্ম, যাঁহার সহিত জীব ঐক্য উপলব্ধি করিবে, তাঁহার স্বরূপ কি?

উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শ্রুতি ব্রহ্মের দুইটি বিভাবের (aspect) উপদেশ দিয়াছেন। একটি—নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ভাব, অপরটি—সবিশেষ সগুণ ভাব। ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ ভাবের স্বরূপ এই যে, সে ভাবের কোন বিশেষণ বা লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যায় না। কোন চিহ্নেরই পরিচয় দেওয়া যায় না, যদ্দ্বারা তাঁহাকে চিনিতে পারা যায়; কোন গুণেরই উল্লেখ করা যায় না, যদ্দ্বারা তাঁহাকে ধারণা করা যায়। সেই জন্য এই ভাবকে নির্ব্বিকল্প নিরুপাধি বলা হয়। এই ভাবের পরিচয়স্থলে শ্রুতি 'নেতি নেতি'—তিনি ইহা নহেন, তিনি ইহা নহেন,—এইমাত্র বলিতে পারিয়াছেন, এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশস্থলে নঞের অত্যন্ত হড়াহুড়ি করিয়াছেন।

অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্।—বৃহদারণ্যক; ৩।৮।৮।
অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্।—কঠ, ৩।১৫।
তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্।—
বৃহদারণ্যক; ২।৫।১৯।

'তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন; হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন। তাঁহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, ক্ষয় নাই। ব্রহ্মের পূর্ব্বে বা পরে, অন্তরে বা বাহিরে অন্য কিছুই নাই।

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ
শ্রোত্রং তদপাণি পাদম্।—মুণ্ডক; ১।১।৬।

'যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ; যাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, হস্ত নাই, পদ নাই।'

নাস্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং
ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং না প্রজ্ঞম্।

অদৃষ্টমব্যবহার্য্য মগ্রাহ্য মলক্ষণ মচিন্ত্য
মব্যপদেশ্যমেকাত্ম প্রত্যয়সারঃ
প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্
চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।—মাণ্ডুক্য ; ৭।

যাঁহার প্রজ্ঞা বহির্ম্মুখও নহে, অন্তর্ম্মুখও নহে, উভয়মুখও নহে ; যিনি প্রজ্ঞাঘন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন। যিনি দর্শনের অতীত, ব্যবহারের অতীত, গ্রহণের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিন্তার অতীত, নির্দ্দেশের অতীত ; আত্মপ্রত্যয়মাত্রসিদ্ধ, প্রপঞ্চাতীত (নিরুপাধি), শান্ত, শিব, অদ্বৈত ;—তাঁহাকে তুরীয় বলে।'

সেই জন্য তাঁহাকে অনির্দ্দেশ্য, অনিরুক্ত, অবাচ্য ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়।

এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তে।—তৈত্তিরীয় ; ২। ৭।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তং শক্যো ন চক্ষুষা।—কঠ ; ৬।১২।

তিনি বাক্যের, মনের ইন্দ্রিয়ের অতীত। তিনি বিদিত ও অবিদিত সমস্ত পদার্থ হইতে বিভিন্ন ;—

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।—কেন ; ১।৩।

তাঁহার উদ্দেশে ইহাও বলা হইয়াছে,—

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ
কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ।—কঠ ; ২।১৪।

'তিনি ধর্ম্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন ; কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র, কারণ হইতে ব্যতিরিক্ত ; অতীত হইতে বিভিন্ন, এবং ভবিষ্যৎ হইতে অন্য।'

সেই জন্য গৌড়পাদাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

আদিমন্তমন্তবন্তমনামকমরূপকম্।
সকৃদ্ বিভাতং সর্ব্বজ্ঞং নোপচারঃ কথঞ্চন।—মাণ্ডুক্যকারিকা ; ৩। ৩৬।

উপচার—ভাষান্তর দ্বারা ইদৃশত্বনিরূপণ।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত মতের বিবরণস্থলে এই সকল ও অন্যান্য শ্রুতির উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মের নির্বিশেষ ভাব বিশদ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, উপনিষদে যেমন ব্রহ্মের নির্বিশেষভাবপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সবিশেষভাবপ্রতিপাদক শ্রুতিরও অভাব নাই। সন্তি উভয়লিঙ্গা শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ। 'সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ' ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষ লিঙ্গাঃ। 'অস্থূলম্ অনণু, অহ্রস্বমদীর্ঘম্' ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ।

'ব্রহ্ম বিষয়ে দুই প্রকারের শ্রুতি দৃষ্ট হয় ; এক, সবিশেষলিঙ্গ শ্রুতি ;

যেমন তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস। অন্য, নির্ব্বিশেষলিঙ্গ শ্রুতি, যেমন তিনি স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন।

কিন্তু তথাপি শঙ্করাচার্য্য নির্ব্বিশেষ (নির্গুণ) ব্রহ্মই শ্রুতির প্রতিপাদ্য, এই মত স্থাপন করিয়া, সবিশেষ (সগুণ) ব্রহ্মের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

অতশ্চান্তরলিঙ্গপরিগ্রহেঽপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্ব্বিকল্পকমেব ব্রহ্মাবগন্তব্যং, ন তদ্বিপরীতম্। সর্ব্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ ইত্যেবমাদিষু অপাস্তসমস্তবিশেষ মেব ব্রহ্ম উপদিশ্যতে।—ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য; ৩।২।১১।

অতএব, উভয়-লিঙ্গ-নির্দ্দেশ থাকিলেও, সমস্ত-বিশেষ-রহিত, নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য, তদ্বিপরীত (সবিশেষ সগুণ ব্রহ্ম) নহেন। কারণ, উপনিষদ্-বাক্যে যেখানেই ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করা হইয়াছে (যেমন অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় ইত্যাদি) সেখানেই ব্রহ্ম যে সমুদয়-বিশেষ-রহিত, এইরূপ উপদেশই দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্মের যে নির্ব্বিশেষ ভাব, তাহা বচনের লক্ষণের নির্দ্দেশের অতীত। কিন্তু শ্রুতিবাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার যে সবিশেষ ভাব, তাহা ইহার বিপরীত। সবিশেষ ব্রহ্মই লক্ষণে লক্ষিত, বিশেষণে বিশেষিত, চিহ্নে চিহ্নিত করা যায়। তিনি নির্বিশেষের মত মন বুদ্ধির অগোচর, অজ্ঞেয়, অমেয়, অচিন্ত্য নহেন।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।—কঠ উপনিষদ্; ৩.১২।

'এই আত্মা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা ইঁহাকে সূক্ষ্ম সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন'।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।—কঠ; ২.১২।

'অধ্যাত্ম যোগ অধিগত হইলে দেবকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি সুখ দুঃখ অতিক্রম করেন'।

হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।—কঠ, ৬।৯।

'তিনি হৃদয়ে সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হয়েন; তাঁহাকে জানিলে অমরত্ব লাভ হয়'।

এই সগুণ ব্রহ্মের পরিচয়স্থলে উপনিষদ্ নানা সুন্দর গম্ভীর মন্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং ৰু—৬।১৩।

তিনি, নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন।'

'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।'

'তিনি, অণু অপেক্ষাও অণু, মহতের অপেক্ষাও মহান্।'

সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এবাসাধুনা কর্ম্মণা কনীয়ান্ এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানাম-সম্ভেদায়।—বৃহদারণ্যক; ৪।৪।২২।

'ইনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি; সাধুকর্ম্মের দ্বারা ইঁহার উপচয় হয় না, অসাধু কর্ম্মের দ্বারা অপচয় হয় না; ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি ভূতাধিপতি, ইনি ভূত পাল; ইনি লোকসমূহের বিভাজক, ধারক-সেতু।'

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।
—মাণ্ডুক্য; ৬।

'ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্য্যামী, ইনি বিশ্বের কারণ; ইনিই ভূত সকলের উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান।'

অপাণিপাদোজবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।—শ্বেতাশ্বতর; ৩।১৯।

'তাঁর হস্ত নাই, অথচ গ্রহণ করেন; পদ নাই, অথচ গমন করেন; চক্ষু নাই, অথচ দর্শন করেন; কর্ণ নাই, অথচ শ্রবণ করেন; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, অথচ তাঁহাকে কেহ জানে না; তাঁহাকেই মহান্ পরম পুরুষ বলে।'

এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্য-সঙ্কল্পঃ।—ছান্দোগ্য; ৮।১।৫।

'এই আত্মা অপাপ-বিদ্ধ, জরা-হীন, মৃত্যু-হীন, শোক-হীন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-হীন; ইনি সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প।'

এই সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মকে উপনিষদে মহেশ্বর বলা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী দিগের মতে এই সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর মায়ার বিজৃম্ভণমাত্র—ইঁহার পারমার্থিক সত্তা নাই। ইনি, উপাধির কাল্পনিক বিলাস ভিন্ন আর কিছু নহেন।* সেই জন্য পঞ্চদশী-কার বলিয়াছেন,—

* The Lord as creator, as Lord or Isvara, depends upon the limiting conditions or the Upadhis of name and form and these, even in the Lord, are represented as products of Nescience
— Maxmuller's Indian Philosophy, p. 207.

মায়াখ্যায়া কামধেনো র্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ।
যথেচ্ছং পিবতাং দ্বৈতং তত্ত্বং ত্বদ্বৈত মেব হি।—পঞ্চদশী; ৬ ২৩৬।

'মায়া-রূপা কামধেনুর বৎস জীব ও ঈশ্বর; অর্থাৎ, উভয়ই মায়িক অবস্তু। তদ্দ্বারা দ্বৈত সিদ্ধ হয় হউক, অদ্বৈতই কিন্তু তত্ত্ব।'

যেমন ব্রহ্ম মায়া-উপাধিতে ঈশ্বর বলিয়া প্রতীয়মান হন, সেইরূপ তিনি অবিদ্যা উপাধিতে জীব বলিয়া প্রতীয়মান হন। এ প্রতীতিও অলীক।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ ব্রহ্ম তদ্বস্তু তস্য তৎ।
ঈশ্বরত্বঞ্চ জীবত্বম্ উপাধি দ্বয় কল্পিতং।—পঞ্চদশী; ৩।৩৭।

'সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই বস্তু, ঈশ্বর ও জীব উপাধি-কল্পিত (অবস্তু)'।

উপাধির পরিহার করিলে আর অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই থাকেন না।

মায়া বিদ্যে বিহায়ৈবং উপাধী পর জীবয়োঃ।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে।—পঞ্চদশী; ১।৪৮।

ব্রহ্ম, বস্তুতঃ, নিরুপাধিক। যখন তাঁহাতে মায়া শক্তির উপাধি সংযুক্ত হয়, তখন তিনি ঈশ্বর, এবং যখন কোষ উপাধির যোগ হয়, তখন তিনি জীব-পদ-বাচ্য হয়েন।

শক্তিরস্ত্যেষনী কাচিৎ সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা।
তৎশক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ॥
কোষোপাধি বিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্।—পঞ্চদশী; ৩,৩৮।৪০।৪১।

এই যে মায়া—ইহা ব্রহ্মের শক্তি। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি, সেইরূপ ব্রহ্মের মায়া শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন—'শক্তি-শক্তি'-মতোরভেদাৎ

It sometimes seems as if Shankara * * admitted two Brahmans also; Shaguna and Nirguna;—with or without quality; but this would again apply to a state of Nescience or Abidya only * * The true Brahman, however, remains always Nirguna or unqualified, * * In full reality Brahman is as little affected by qualities, as our true self is by Upadhis (conditions). * * Having no qualities, this highest Brahman cannot be known by predicates. It is subjective and not liable to any objective attribute. This Isvara exists just as everything else exists, as phenominally only, not as absolutely real. * * When personified by the power of Abidya or Nescience he rules the world, though it is a phenominal world and determines though he does not cause rewards and punishments. Ibid, p. p. 220 to 223).

শঙ্কর। অতএব, মায়া ও ব্রহ্ম অভিন্ন; কারণ, মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। অদ্বৈতবাদীরা মায়ার পরিচয়স্থলে বলেন,—

সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বাচ্যা মিথ্যা ভূতা সনাতনী।

'মায়া সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে;—সৎও নহে, অসৎও নহে। ইহার স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়।' ইহার স্বরূপ নিরাকরণ করা যায় না। সেই জন্য বেদান্তসার বলিতেছেন,—

সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ।

'মায়া ভাবরূপী কোন কিছু—ইহা ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানের বিরোধী। ইহা সৎও নহে, অসৎও নহে'।

অদ্বৈতবাদীরা আরও বলেন যে, শ্রুতিতে ব্রহ্মের ত্রিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয়,—স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ।

'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'।—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্; ২।১।১।

'বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম'।—বৃহদারণ্যক; ৩।৯।২৮।

ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্মের-স্বরূপ লক্ষণের নির্দ্দেশ করিতেছে। আর তাঁহাকে যে 'তজ্জলান্ (সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি ছান্দোগ্য ৩।১৪।১) বলা হয়, ইহা তাঁহার তটস্থ লক্ষণ। "তজ্জলান্" অর্থে—তজ্জ, তল্ল, তদন;—তাঁহা হইতে জগৎ জাত, তাঁহাতে জগৎ অবস্থিত, তাঁহাতেই জগৎ লীন।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্; ৩।১।

'যাঁহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, অন্তঃকালে যাঁহাতে বিলীন হইবে, তিনিই ব্রহ্ম।'

যথোর্ণনাভিস্তন্নোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।—বৃহদারণ্যক; ২।১।২০।

'যেমন ঊর্ণনাভ তন্তু উদ্গিরণ করে, যেমন অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গ উদ্গিরণ করে, সেইরূপ এই আত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত নিঃসৃত হইয়াছে।'

জন্মাদ্যস্য যতঃ'—ব্রহ্মসূত্র; ১।১।২।

এই সূত্র দ্বারা বেদান্তদর্শন তটস্থ লক্ষণেরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি কারণ হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় সিদ্ধ হয়, তিনিই ব্রহ্ম।' বলা বাহুল্য, ইহা সগুণ ব্রহ্মের লক্ষণ। কারণ, পরব্রহ্ম যখন শক্তিযুক্ত হয়েন, তখনই তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ইত্যাদি লক্ষণের লক্ষণীয় হন।

তবে কি অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ বলিয়া কোন কিছু বস্তু আছে, যাহার সৃষ্টি স্থিতি লয় কথিত হইতেছে? অদ্বৈতবাদীরা জগতের সত্যতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মই একমাত্র সৎবস্তু;—আর সমস্তই অসৎ-অবস্তু। ব্রহ্মই আছেন, আর কোন কিছু নাই।

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।

অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন,—'কোটি কোটি গ্রন্থে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমি অর্দ্ধ শ্লোক দ্বারা বলিতেছি—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই—অন্য কিছু নহে।' কারণ, অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্;" অর্থাৎ, ব্রহ্মই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই।

ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, ব্রহ্ম ব্যতীত আর যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমস্তই অসৎ। বাস্তবপক্ষে তাহাদের সত্তা নাই। যাহা আজ আছে, তাহা কাল ছিল না, পরশ্বও থাকিবে না। যাহা গত কল্য ছিল, তাহা আজ নাই। এইরূপ, যাহা জাগ্রত অবস্থায় আছে, তাহা স্বপ্নাবস্থায় থাকে না। স্বপ্নে যাহা দেখি, জাগ্রতে তাহা ছিল না, সুষুপ্তিতেও থাকিবে না। অতএব, তাহা অসৎ বই আর কি? কিন্তু ব্রহ্ম সকল কালে সকল অবস্থায় বিদ্যমান আছেন, ছিলেন, এবং থাকিবেন। অতএব, ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,—

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ।
একমেবাদ্বিতীয়ম্।—ছান্দোগ্য; ৬।২।১।

'আদিতে এক অদ্বিতীয় সৎই বিদ্যমান ছিলেন।'

আত্ম বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।—ঐতরেয়; ১।১।

'আদিতে এক আত্মাই ছিলেন।'

ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্।—নৃসিংহতাপনি; ৭।

'ব্রহ্মই এই সকল।'

আত্মৈবেদং সর্ব্বম্।—ছান্দোগ্য; ৭।২৫।২।

'আত্মাই এই সমস্ত।'

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।—বৃহদারণ্যক; ৪।৪।১৯।

'এখানে ভেদ নাই, সবই এক।'

যস্মাৎ পরং নাপরং অস্তি কিঞ্চিৎ।—শ্বেতাশ্বতর; ৩।৯।

'যাঁহার পর অপর কিছুই নাই।'

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। স এবেদম্ সর্ব্বম্ ৷ ৷ আত্মৈব অধস্তাৎ আত্মা উপরিষ্টাৎ আত্মা পশ্চাৎ আত্মা পুরস্তাৎ আত্মা দক্ষিণতঃ আত্মা উত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বম্।—ছান্দোগ্য; ৭-২৫।১-২।

তিনিই অধে, তিনিই উর্দ্ধে; তিনিই সম্মুখে, তিনিই পশ্চাতে; তিনিই উত্তরে, তিনিই দক্ষিণে; এ সমস্তই তিনি। আত্মাই অধে, আত্মাই উর্দ্ধে; আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই পশ্চাতে; আত্মাই দক্ষিণে আত্মাই উত্তরে; যাহা, কিছু সমস্তই আত্মা।'

"একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলাতে ইহাই বুঝায় যে, তিনি সমস্ত-ভেদ-রহিত। বিজাতীয়, সজাতীয় ও স্বগত,—এই ত্রিবিধ ভেদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি নিরুপাধি,—অর্থাৎ দেশ, কাল ও নিমিত্ত,—এই ত্রিবিধ উপাধির সম্পর্কশূন্য। *

সেই জন্য যোগবাসিষ্ঠ (উৎপত্তি প্রকরণে) বলিয়াছেন,—"দেশ, কাল, নিমিত্ত, যখন তাঁহারই মধ্যে রহিয়াছে, তখন আর দ্বৈতই বা কি, আর অদ্বৈতই বা কি? ব্রহ্ম দ্বৈতও নহেন, অদ্বৈতও নহেন; জ্ঞাতও নহেন, অজ্ঞাতও নহেন; সৎও নহেন, অসৎও নহেন, ক্ষুব্ধও নহেন, প্রশান্ত নহেন।" তাঁহাতে সমস্ত দ্বন্দ্বের চিরসমন্বয়, সকল দ্বৈতের একান্ত অবসান। †

বিপত্নীক।

১

নলিন বাবু তাকিয়া ঠেস্ দিয়া আরাম করিতেছিলেন। নলিনের পুত্র বিজয় বাতায়নপথে পিতার তৎকালীন অবস্থা একবার দেখিল।

নলিন বাবু পদশব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রা?"

সাত বৎসরের বালক সভয়ে উত্তর করিল, "আমি বিজয়।"

নলিন বাবু। কি দরকার?

বিজয়। মা'র জ্বর হয়েছে।

দুই দিন রাত্রিজাগরণের পর নলিন বাবুর ঘুম আসিতেছিল।

---

* The three ultimate categories of time, space and causality. Time = কাল, Space = দেশ এবং causality = নিমিত্ত, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ।

† সাহিত্য-পরিষদে পঠিত।

নলিনবাবু বলিলেন, "কখন ?"

বিজয়। আজ তিন দিন।

নলিন বাবু। ও জ্বর কিছু নয়। তুই থার্ম্মোমিটার দিয়া কত ডিগ্রী দেখিয়া আয়।

বালক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। নলিন বাবু বিরক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ পড়িয়া রহিলেন।

নলিন বাবু তিন দিন বাড়ী আসেন নাই। কোথায় ছিলেন, তাহা সকলে জানিত না। আজ প্রত্যূষে রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া নলিন বাবু বৈঠকখানার এক পার্শ্বে নির্জ্জনতার সুখভোগ করিতেছিলেন।

নলিন বাবুর একমাত্র সন্তান বিজয়। হঠাৎ পিতার একখানি জমিদারী পাইয়া নলিন বাবু বি. এ. পাশ্ করাটা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের নলিন বাবু কলিকাতায় স্থায়িরূপে তিন বৎসর আমোদে আহ্লাদে যাপন করিলেন।

পয়সা কড়ি প্রচুরপরিমাণে থাকিলে ভাল মন্দ উভয় প্রকারেরই বন্ধু জুটিয়া থাকে। নলিন বাবুর বন্ধু উমেশ একদিন বলিল, "নলিন, স্ত্রীকে ছাড়িয়া তোমার কলিকাতায় থাকাটা বাঞ্ছনীয় নহে। তোমার স্বভাবটা পশুর মত দাঁড়াইতেছে।"

একটু বিদ্যাবুদ্ধি থাকিলে সত্যকথাটা মনে আঘাত করিবার স্থান পায়, কাজেই কথার খাতিরে স্ত্রী সরলা ও পুত্র বিজয়কে স্বদেশ হইতে লইয়া আসিয়া নলিন বাবু কলিকাতায় একটা বড় বাড়ী ভাড়া করিলেন।

ইহাতে নলিন বাবুর আত্মত্যাগটা কত দূর অসাধারণ রকমের হইয়াছিল, তাহা তাঁহার তৎসাময়িক বন্ধুগণ সকলে বুঝিতে পারে নাই। সাহিত্যবীর ও কর্ম্মবীরের গৌরব সচরাচর বহুকাল পরে ইতিহাসেই স্থান পাইয়া থাকে।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিজয় থার্ম্মোমিটার লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিল। বিজয় পিতাকে যমের মত ভয় করিত।

চক্ষু দুটি কিঞ্চিৎ খুলিয়া নলিন বাবু দেখিলেন, থার্ম্মোমিটারের নলে পারা ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

নলিন বাবু বলিলেন, "ম্যালেরিয়া জ্বর ঐরূপ হইয়া থাকে। তোর মাসী-মাকে ও বাড়ী হইতে ডাকিয়া আন্। আর ভুবন ডাক্তারকে খবর দে।"

সরলা নলিনের স্ত্রী। সরলা শিক্ষিতা, সুশীলা ও সুন্দরী। তবুও সরলা নলিনচন্দ্রের মন পায় নাই।

মনের মধ্যে মনুষ্যত্ব একটু না ফুটিয়া উঠিলে তাহা পাওয়া যায় না। নলিনের যৌবনকালে সেটা ফুটে নাই।

প্রতি বৎসর পূজার ছুটীর সময় নলিন বাবু বাড়ী আসিয়া আমোদপ্রমোদে, গান বাজনায় ও শিকারে কাটাইতেন। কখনও সময় পাইলে স্ত্রীলোকদিগের স্নান করিবার ঘাটের নিকট বজরা লাগাইয়া বহু অঙ্গভঙ্গী সহকারে হার্মোনিয়ম বাজাইতেন। নলিন বাবুর ঈদৃশ অসামান্য প্রতিভার পরিচয় অনেক স্ত্রীলোকই পাইয়াছিল, কেবল সরলার ভাগ্যে ঘটে নাই।

অন্দরমহলে গেলে নলিন বাবু নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িতেন। দুঃখিনী সরলা স্বামীর ঘুমন্ত সুন্দর মুখখানি দেখিয়াই কৃতার্থ হইত। নলিন বাবু কলিকাতায় থাকিলে সরলা নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহার দুই একখানি জীর্ণ পুরাতন পত্র অতি সাবধানে খুলিয়া একবার, দুইবার, তিনবার পাঠ করিত। সেগুলি যৌবনের প্রথম উচ্ছ্বাসে নলিনচন্দ্র মধ্যে মধ্যে লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন।

এইরূপে শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত কাটিয়া যাইত, এবং তাহার সঙ্গে সরলার দুঃখময় জীবনও কাটিত। সরলার সুখের মধ্যে সে বিজয়কে পাইয়াছিল। পুত্রের মুখ দেখিয়া মাতা অনেক দুঃখ ভুলিয়া যায়। সরলা সকালে বৈকালে বিজয়কে পড়াইত, এবং বিজয় ঘুমাইলে, স্বামীর কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িত।

সরলার শ্বশুর প্রাণধন মুখোপাধ্যায় পুত্রবধূকে বড় স্নেহ করিতেন। তাঁহার ভয় ছিল যে, তাঁহার ঘরে লক্ষ্মী থাকিবেন না। মরিবার সময় তিনি পুত্র নলিনচন্দ্রকে দেখিতে পান নাই। সেদিন নলিনের কলিকাতায় প্রবেশিকা পরীক্ষার দিন।

বৃদ্ধ মৃত্যুকালে সরলাকে ডাকিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন, "মা, তুমি দুঃখ করিও না। ঈশ্বর বুঝি স্ত্রীলোককে দুঃখ সহিতেই গড়িয়াছেন। স্ত্রী ঈশ্বরের দৈবী প্রকৃতি। যাতে নলিন একটু ভাল হয়, তাহাই করিও।"

তার পর সরলার জ্বর হইল। সে জ্বর সারিল, আবার হইল। সরলা কলিকাতায় আসিয়া নলিনকে দেখিয়া কিছুদিন ভাল ছিল। কিন্তু নলিনচন্দ্র পুনরায় পূর্ব্ব অভ্যাস অবলম্বন করিলে, সরলা আবার জীবনকুটীর অন্ধকারময় দেখিল। আবার সরলার বিষম জ্বর হইল।

০

ভুবন ডাক্তার আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

নলিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম?"

ডাক্তার। আপনি একটু কাছে থাকুন।

নলিন। যদি প্লেগ হয়?

ডাক্তার। তথাপি আপনার কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকা উচিত।

নলিন। আচ্ছা দেখা যাবে এখন।

ডাক্তার চলিয়া গেল।

নলিনচন্দ্র সরলার কাছে গেলেন না।

সরলার ছোট বোন বিমলা মামার বাড়ী হইতে দিদির কাছে আসিল। উভয়ের পিতামাতা ছিল না। পিতার অর্থাভাববশতঃ বিমলার বয়স বেশী হইলেও বিবাহ হয় নাই। পিতার মৃত্যুর পর বিমলার ভার তাহার মাতুল লইয়াছিলেন। বিমলার মাতুলালয় কলিকাতায়।

বিমলা অতি সুশ্রী। লেখাপড়া শিখিলে বড় ঘরে পড়িতে পারে, এই আশায়, বিমলার মাতুল বিমলাকে বেথুন স্কুলে পড়াইতেন। বিমলা ষোল বৎসর বয়সে ফার্ষ্টআর্টস্ পাশ করিয়াছিলেন।

বিমলার স্বভাব স্থির, শান্ত, দৃঢ়। বিমলাকে কখনও কেহ কাঁদিতেও দেখে নাই, হাসিতেও দেখে নাই। হৃদয় স্নেহে ও করুণায় পূর্ণ থাকিলেও বিমলা তাহা কাহাকেও কখনও জানিতে দেয় নাই। বিমলার যেমন অলৌকিক সৌন্দর্য্য ছিল, তেমনই একটা স্বভাবগত অমানুষিক তেজ ছিল; সুতরাং সকলেই বিমলাকে একটু ভয় করিত।

বিমলা গাড়ী হইতে নামিয়াই সরলার ঘরে গেল।

বিমলা বলিল, "দিদি, তোমার কি হয়েছে?"

বিমলা জ্বরতাপ দগ্ধ কোমল ওষ্ঠে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "বিমল, এই আমার শেষ।"

বিমল। মুখুর্য্যে মহাশয় কোথায়?

সরলা চখের জল মুছিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তিনি বাহিরে বোধ হয়।"

বিমলা। তিনি দেখিতে আসেন নাই?

সরলা। বিমল! তিনি আমাকে কখনও বাঁচিয়া থাকিতে ভালবাসিবেন না। মরিলে যদি বাসেন। বিমল! ঈশ্বর করুন, সেই দিন যেন আজ হয়। আমার কপালে তোমার বিবাহটাও দেখা হইল না, ইহাই কেবল দুঃখ রহিয়া গেল।

সরলা আবার কাঁদিল। উভয় ভগ্নী আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত স্বর্গস্থ জনক-জননীর কথা কহিল।

রাত্রি দুইটার সময় সরলা বিজয়কে ডাকিয়া বলিল, "বিজয়! তোকে তোর মাসীমার হাতে দিয়া যাইতেছি।" বিমলা বিজয়কে কোলে লইয়া অধীরভাবে চুম্বন করিল।

বিজয় কাঁদিল। বিমলা বুদ্ধিমতী। বিমলা দৃঢ় পাষাণের বাঁধ বাঁধিয়া শোকের স্রোত হৃদয়দ্বারে রুদ্ধ করিল।

তাহার পর দুই দিন ধরিয়া অনেক ডাক্তার আসিল, অনেক ঔষধ ব্যর্থ হইয়া গেল। বিমলা ঘুমাইল না, আহার করিল না, কেবল অনিমেষনয়নে সরলার পার্শ্বে বসিয়া ভগ্নীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিল।

সন্ধ্যার সময় কোথা হইতে নলিনবাবু আসিলেন। বিমলাকে নলিনবাবু অনেক দিন দেখেন নাই। বিমলার অসীম সৌন্দর্য্য ও অঙ্গমাধুরী লক্ষ্য করিয়া নলিন বাবু বারংবার মুগ্ধনয়নে তাহার দিকে চাহিতে লাগিলেন।

নলিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিমলা, তুমি নাকি এল্. এ. পাশ করেছ?"

বিমলা কেবল চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় ভগিনীর দিকে চাহিয়া রহিল।

যতক্ষণ সৌন্দর্য্যমুগ্ধ নলিন বাবু বিমলাকে দেখিতেছিলেন, ততক্ষণ সরলা দুইটি নির্ব্বাণোন্মুখ চক্ষুর জ্যোতি স্বামীর মুখে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাঁহার নিকট সংসারে শেষ বিদায় লইতেছিল। বিমলা সেই চক্ষু দুইটির ভাব দেখিয়া ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধ বুঝিতেছিল।

সরলা অজ্ঞান হইয়া গেল। মুখে কি কথা বলিতে চাহিতেছিল, তাহা আর বলিতে পারিল না। তাহার পর সংসারের একটি সুবাস বহিয়া কোথায় গেল, কেহ জানিল না। একটি স্বর্গের মন্দির জগৎ হইতে স্থানভ্রষ্ট হইল। ঈশ্বরের একটি মধুর জ্যোতি চিরদিনের জন্য নিভিয়া গেল।

সন্ধ্যার তারকাগুলি মলিন হইয়া গেল। সরলা যে আর নাই, তাহা বিমলা বুঝিয়াছিল। বিমলা আর থাকিতে পারিল না। তীব্র কঠিন স্বরে নলিনচন্দ্রকে বলিল, "আপনি একবার ডাক্তারকে শীঘ্র ডাকুন!"

নলিন বাবু হুকুম তামিল করিতে দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। তখন বিমলা ভগ্নীর মৃতদেহ কোলে জড়াইয়া ধরিল, এবং অতি ভগ্ন ও শোকার্ত্ত স্বরে অন্তরীক্ষে চাহিয়া বলিল, "নাথ! তোমার জগতে কি ধর্ম্ম নাই? তবে তুমি কে?"

০

আহত ফণিনীর ন্যায় বিমলা একবার উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার ভূমিতে লুটাইল। তখন সরলার চিরসাধের বিজয় ঘরে আসিয়া ডাকিল, "মা, বিজয়া-দশমীর প্রণাম করিতে আসিয়াছি!" সে দিন দশমী। তখন মহাশক্তির প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া বঙ্গসন্তান ঘরে ফিরিতেছিল।

বিমলার তাহা মনে পড়িল। বিমলা বলিল, "বাবা! আমার কোলে আয়!"

বিমলা বিজয়কে কোলে করিয়া মৃতদেহের শীতল চরণ দুইটিতে মস্তক স্পর্শ করিল। তার পর বিমলা অধীর হইয়া কাঁদিল। জীবনে সেই এক দিন বিমলা কাঁদিয়াছিল। বিজয় বুঝিতে পারিল।

অনেকক্ষণ পরে বিজয় বলিল, "মা বুঝি আর নাই?"

বিমলা স্থিরভাবে বলিল, "না।"

বিজয়। তবে কোথায় যাব?

বিমলা। তোমার বাবার কোলে কখনও যাও নাই?

বিজয়। না।

বিমলা। এইবার যাবে।

বিজয়। বাবা, লইবেন না।

বিমলা। আমি লইয়া যাইব।

বিজয় আর একবার ভগ্নহৃদয়ের ব্যথা সংবরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিল। গৃহের আলোক ক্ষীণতর হইয়া আসিল। রাত্রি ক্রমে গাঢ়ীর হইল। অনেক ক্ষণ পরে বিমলা বলিল, "বাবা! কাঁদিতে নাই। কাঁদিও না। কাঁদিলে মাকে আর দেখিতে পাইবে না।"

বিজয়। মাকে আবার দেখ্‌ব?

বিমলা। নিশ্চয়। আমার কথা শুনিও; তাহা হইলে আমরা দুই জনেই তাঁকে দেখিতে পাইব।

সরলার যথারীতি সৎকার হইয়া গেল। বিমলা বিজয়কে লইয়া মাতুলালয়ে চলিয়া গেল। বিমলার স্নেহে বিজয় অনেকটা আশ্বস্ত হইল। বিজয়ের বিশ্বাস, মাসীমার কথা শুনিলে তাহার মা ফিরিয়া আসিবে। বিজয় শ্লেট ও বহি একত্র বাঁধিয়া স্কুলে যাইত; মাতার নিকট যাহা পড়িয়াছিল, সেই পুরাণো পড়া বিমলাকে শুনাইত। বিমলা বিজয়কে নূতন পড়া দিত, এবং নূতন কথা শিখাইত।

বিজয় অনেক শিথিল। বিজয় বিমলার সর্ব্বস্বধন। বিজয়কে মানুষ করিতেই বিমলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। হৃদয়ের যত স্নেহ, যত ভালবাসা, যত যত্ন, যত স্বার্থত্যাগ, বিমলা বিজয়ের উপরেই ন্যস্ত করিল।

বিমলার উন্নত চরিত্র, অসাধারণ স্নেহ, বাৎসল্য ও সুশিক্ষায় স্কুলের শিক্ষয়িত্রীগণের মুখ উজ্জ্বল হইতে লাগিল।

অনেক ধনী জমীদার ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বিমলার পাণিগ্রহণের জন্য বিমলার মাতুলের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। কিন্তু বিমলার একই কথা, "না।"

এক বৎসর কাটিয়া গেল। বোধ হয়, নলিন বাবুর মনে অলক্ষ্যে একটা আঘাত লাগিতেছিল; কিন্তু তাহা যে কি, তিনি বুঝিতে পারে নাই। নলিন বাবু বৈদ্যনাথে হাওয়া বদলাইতে গেলেন, এবং সেখানে পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ সুরার মাত্রা কিছু বাড়াইয়া ফেলিলেন।

বন্ধু উমেশ কলিকাতা হইতে আসিয়া একদিন নলিন বাবুকে বলিলেন, "নলিন, তুমি কি এই ভাবে জীবন কাটাইবে?"

নলিন। তবে কি করিব?

উমেশ। বরং বিবাহ কর।

নলিন। আমার বিবাহের বড় সাধ নাই, তবে এক জনকে পাইলে করি।

উমেশ। কে?

নলিন। বিমলা। আমার শ্যালী।

উমেশ। তুমি তাহার পদরেণুরও যোগ্য নও। তাহার ভগ্নীরও হিলে না।

নলিন। তবে আর কোন কথা নাই।

উমেশ কলিকাতায় গিয় সেই কথা বিমলার মাতুলকে বলিল। সন্ধ্যা-কালে বিমলার মাতুলানী বিমলাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, একটা কথা বলিতে ভয় হয়।"

বিমলা। ভয় কি মা?

মামী। নলিন তোমাকে বিবাহ করিতে চায়। তার জীবনটা অপদার্থ হইয়া যাইতেছে, একবার ভাবিয়া দেখ।

বিমলা। আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি।

মামী। কি স্থির করিয়াছ?

বিমলা। আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত।

তাহাই স্থির হইল।

নলিনচন্দ্র আহ্লাদে আটখানা হইলেন। কলিকাতায় অ[illegible] মলিন হইয়া গেল। যাহা হউক, বিস্ময়ের কথা মনে করিয়া কেহ বি[illegible] নিন্দা করিল না।

সকলেই নলিনচন্দ্রকে ভাগ্যবান বিবেচনা করিল। বিমলার মত অসামান্য রূপ, যৌবনপ্রভা, বিদ্যা ও বুদ্ধি তৎকালে কোনও বালিকার ছিল কি না সন্দেহ। বিমলা পাশকরা মেয়ে। বিমলা সুন্দর গাহিতে পারিত, হার্মোনিয়ম বাজাইতে পারিত, ইংরাজী ভাষায় সুন্দর বাক্যালাপ করিত। বিমলা বিবাহ করিয়া পর্দানশীন থাকিল না। স্বামীর সহিত জুড়িগাড়ী হাঁকাইয়া বাহির হইতে লাগিল।

নলিনচন্দ্র বিমলার অত্যন্ত অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। তিনি যাহা চাহিতেন, বিমলার মধ্যে সকলই পাইলেন।

বিমলা নলিনচন্দ্রের নাসিকায় রজ্জু বাঁধিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতে লাগিল। বিমলার সহিত অনেক মেমের আলাপ হইয়াছিল, অনেক সাহেবেরও আলাপ হইল। বিমলার সুপারিশে নলিনচন্দ্র অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন।

একদিন বিমলা গাহিতেছিল,—

"তুমি চিরদিন মধুপবনে, চিরবিকশিত বনভবনে
যেও মনোমত পথ ধরিয়া তুমি নিজসুখস্রোতে ভাসিও।
আমি সারা নিশি তোমা লাগিয়া
রব বিরহশয়নে জাগিয়া—"

শয়নগৃহে সেই সঙ্গীতস্বর তীব্রবিষাক্ত সুধার ন্যায় নলিনের কর্ণ দিয়া মর্ম্মে লাগিতেছিল। নলিনের ঘুম হইল না।

প্রত্যূষে উঠিয়া নলিন বাবু বলিলেন, "আজ একবার বাগানবাড়ীতে যাব।"

বিমলা বলিল, "যাও।"

নলিন বাবু বাগানবাড়ীতে গিয়া পুরাতন কৌচে লুটাইয়া পড়িলেন। রাত্রিকালে তাঁর খুব জ্বর আসিল।

প্রভুভক্ত খানসামা হরি এক জন ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার বলিলেন, "এটা decided plague case."

হরি বিমলাকে খবর দিল। বিমলা ডাক্তার ব্যানার্জীকে সঙ্গে করিয়া নলিন বাবুর কামরায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

চাহিয়া দেখিলেন, বিমলা ডাক্তার ব্যানারজীর সোনার চশমা-স্বীয় রুমালে মুছিয়া আবার তাঁহাকে ফিরাইয়া দিল।

বিমলা ব্যানারজীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার এ সময় শয্যার নিকট যাওয়া উচিত কি? প্লেগটা ছোঁয়াচে রোগ। তুমি একবার চশ্‌মা দিয়া ভাল করিয়া দেখ।"

ব্যানারজী গদ্‌গদস্বরে বলিলেন, "তোমার রোগীর নিকটে যাওয়া নিরাপদ নয়।"

নলিন বাবু অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। শতবৃশ্চিকদংশন অপেক্ষাও এ যাতনা, এ প্রায়শ্চিত্ত কঠিন।

নলিন বাবু অজ্ঞান হইলে বিমলা তাঁহার চক্ষু বাঁধিয়া ফেলিল। তিন রাত্রি স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া রহিল।

চতুর্থ দিনে একবার অন্তরীক্ষে চাহিয়া বিমলা বলিল, "দিদি, তোমার স্বামীকে বাঁচাও, যেন বাঁচিয়া থাকিয়া তোমার ব্যথা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া যাইতে পারেন।"

বিমলার প্রার্থনা পূর্ণ হইল। বিমলার অসাধারণ সেবায় নলিন বাবু বাঁচিলেন।

দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। চুণারের পুরাতন দুর্গে নলিন বাবু, বিজয় ও বিমলাকে লইয়া হাওয়া বদলাইতে গিয়াছেন।

পূর্ব্বগগনপটে বসন্তনিশীথিনী সূর্য্যকরস্পর্শে প্রভাত হইতেছিল। সময়টা একই, কিন্তু চন্দ্র-সূর্য্যের সংস্পর্শে রাত্রি দিন হয়। নলিনের অন্ধকারময় জীবনে চন্দ্র সূর্য্যের সংস্পর্শ ছিল না, কিন্তু বিমলা তাহা দেখাইয়া দিয়াছিল।

নলিন বাবু বিজয়কে ডাকিলেন। বিমলা তাহাকে লইয়া আসিল।

বিজয় পিতার কোলে গেল।

বিমলা বলিল, "নলিন! বিজয়কে প্রণাম করিতে দাও; কাল বিজয়া-দশমী গিয়াছে। তুমি তখন ঘুমাইয়াছিলে।

নলিন বিজয়কে কোলে করিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। বিমলা বাতায়নের দিকে গিয়া মুখ উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া রহিল। বিমলা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ঈশ্বরের বাণী মানবহৃদয়ে প্রতিধ্বনিত করিয়াছে, আজ বিমলার তাহাই গৌরব!

০

নলিন বিজয়ের পড়া লইল, বিজয়ের মাতার দর্পণস্বরূপ সুন্দর মুখখানি বার-বার চুম্বন করিল, এবং বিজয়ের অসাধারণ শিক্ষা ও নম্রতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল।

বিমলা বলিল, "বিজয় তাহারই প্রতিচ্ছবি। যত দিন বাঁচিয়া থাক, এই দর্পণে মুখ দেখিও। তাহার কত আত্মত্যাগ ছিল, কত সহিষ্ণুতা ও স্বামিভক্তি ছিল; তাহা আমি শত জীবনে দেখাইতে পারিব না। আমি দাসীমাত্র। সে মরিয়া গিয়াছে, আমি তাহারই হৃদয়বেদনা লইয়া চিরদিন কাঁদিব।"

নলিন। আমি এই দেশেই থাকিব। জনসমাজে আর মুখ দেখাইব না।

বিমলা। তাহাই থাক। এবং তাহার জ্যোতি ও স্নেহ স্মরণ করিয়া তুমি ঈশ্বরকে মাঝে মাঝে দেখিও। আমার জীবনে এইমাত্র সাধ। আমার সহিত ইহজীবনে তোমার অন্য কোনও সম্বন্ধ নাই। বিজয় যদি তাহার মাতাকে ভুলিতে পারে, তবেই আমার প্রতিজ্ঞা-রক্ষা হইবে, নচেৎ এ জীবন বিসর্জ্জন দিব।"

য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্‌।

য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্‌ নামক একপ্রকার পদার্থের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। জিনিসটা কি, জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। ইহার সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা গিয়াছে, নিম্নে বিবৃত হইল।

য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্‌ শব্দের অর্থ, যাহার অগ্নিতে ধ্বংস হয় না। ইহার উৎপত্তি ও উপাদান সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তবে আম্ফিবিওল বা হর্ণব্লেণ্ড (amphibiole Hornblende) নামক ধাতুর অন্তর্ভূত, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্‌ প্রধানতঃ সিলিকা ম্যাগ্‌নিসিয়া য়্যালিউমিনা ও ফেরস্‌ (Ferrous oxide) এই সকল ধাতুর রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হয়। কিন্তু স্থলবিশেষে এই সকল উপাদানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। যে য়্যাস্‌বেস্‌-টোজে লৌহের আধিক্য থাকে, তাহা সহজেই অগ্নির উত্তাপে দ্রব হয়।

য়্যাস্‌বেস্‌টোজ কতকগুলি শুভ্র স্ফটিকবৎ ও স্থিতিস্থাপক আঁশের সমষ্টিমাত্র।

ইহাতে রেশমের ন্যায় আভা থাকে। সাধারণতঃ শুভ্র, ধূসর ও হরিত বর্ণের য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার একটিমাত্র আঁশ অগ্নির উত্তাপে শুভ্র এনামেলের আকার ধারণ করে, কিন্তু কতকগুলি একত্র করিলে সাধারণ অগ্নিশিখায় কিছুতেই দ্রব হয় না।

য়্যাস্‌বেস্‌টোজ দ্বারা অতি উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত করা যায়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সে বস্ত্র কখনও অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে বস্ত্র পরিষ্কৃত করিতে হইলে রজকের সাহায্য লইতে হয় না। মলিন বস্ত্র কিয়ৎকাল অগ্নিতে ফেলিয়া রাখিলেই, তাহা অচিরাৎ পূর্ব্বশ্রী ধারণ করে। ইহা দ্বারা দস্তানা, টেবিলের চাদর, তোয়ালে, রুমাল প্রভৃতি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এমন কি, কেহ কেহ ইহা দ্বারা পরিধেয় পরিচ্ছদও প্রস্তুত করিয়াছেন। কথিত আছে, পুরাকালে মৃতব্যক্তির দেহাবশেষ চিতার আবর্জ্জনা হইতে পৃথক রাখিবার জন্য, য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্-নির্ম্মিত বস্ত্রে মৃতদেহ আবৃত হইত।

য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্ অনেক প্রকার। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়প্রকার সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়;—

(১) য়্যামিয়েন্থস্ (Amianthus)—এই শ্রেণীর য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্ দেখিতে অতি সুন্দর ও দুষ্প্রাপ্য। ইহার আঁশগুলি অতি শুভ্র, অধিকতর দীর্ঘ, নমনীয় ও সুন্দররূপে সজ্জিত। এই জাতীয় য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্ ইউরোপের মধ্যে পিরিনিস্, আল্পস্ ও ইউবাল পর্ব্বতে, আমেরিকার সেণ্টগথার্ড পর্ব্বতে, সুইডেনের সাব্‌পেণ্টাইন পর্ব্বতে ও সিলিসিয়া, নিউসাউথ্‌ওয়েল্‌স্ প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইটালীর স্যাভয় ও কর্সিকা দ্বীপ হইতে এই শ্রেণীর য়্যাস্‌বেস্‌টোজ প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়, এবং ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। লম্বার্ডি ও টিউরিনে একপ্রকার য়্যামিয়েন্থস্ পাওয়া যায়, তাহা এক গজেরও অধিক দীর্ঘ হইয়া থাকে। কথিত আছে, মিশর দেশের পূর্ব্বতন অধিবাসীরা য়্যামিয়েন্থস্ দ্বারা শবদেহের আচ্ছাদনবস্ত্র প্রস্তুত করিত। প্রাচীন গ্রীসেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

(২) সাধারণ য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্ (Common asbestos)—ইহার বর্ণ প্রথম শ্রেণীর য়্যাস্‌বেস্‌টোজের ন্যায় উজ্জ্বল নয়, এবং ইহা ওজনেও অপেক্ষাকৃত লঘু। ইহার আঁশগুলি বড়ই বিষমভাবে সজ্জিত, এবং বড়ই অনমনীয়। বস্তুতঃ, প্রথম শ্রেণীর য়্যাস্‌বেস্‌টোজের সহিত ইহার কোনও সাদৃশ্য নাই। এই শ্রেণীর য়্যাস্‌বেস্‌টোজ স্বর্ণকারদিগের বক্রনলের সাহায্যে বিশেষ আয়াসে দ্রবীভূত

করা যাইতে পারে। এই জাতীয় য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্‌ ওয়েল্‌স্‌, কর্ণওয়াল ও স্কটল্যাণ্ডে পাওয়া যায়।

(৩) Mountain Leather and Mountain Cork—ইহার আঁশগুলি পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্‌ অপেক্ষা কম নমনীয়। ইহা পিঙ্গল ও শ্বেতাভবর্ণ বিশিষ্ট। প্রথমোক্তটি (Mountain Leather) দেখিতে পাতলা চাদরের ন্যায় বলিয়া উহার 'মাউণ্টেন লেদার' আখ্যা হইয়াছে। ছিপির সহিত শেষোক্তটির সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া উহা 'মাউণ্টেন কর্ক' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সকল য়্যাস্‌বেস্‌টোজ এতই লঘু যে, জলে ভাসে। ইহা লেনর্কশায়ারে পাওয়া যায়।

(৪) Mountain Wood :—ইহা কোমল, অস্বচ্ছ ও পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট। শেষোক্ত য়্যাস্‌বেস্‌টোজ অপেক্ষা অনেক ভারি, এবং বক্রনলের সাহায্যে দ্রবীভূত হয়। এই জাতীয় য়্যাস্‌বেস্‌টোজ অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, স্কটল্যাণ্ড, পোর্ট-সয় ও কিলড্রমিতে পাওয়া যায়।

বহুদিন ধরিয়া য়্যাস্‌বেস্‌টোজের সাহায্যে আহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব হইতেছে। পূর্ব্বকালে য়্যামিয়েন্থস্‌ য়্যাস্‌বেস্‌টোজের দ্বারা কেবল বস্ত্রই নির্ম্মিত হইত। প্রথমে য়্যাস্‌বেস্‌টোজের আঁশের সহিত পাটের আঁশ মিশাইয়া লইয়া বস্ত্র বয়ন করা হইত। তৎপরে উক্ত বস্ত্র হাপরে ফেলিয়া রাখিলে পাটগুলি পুড়িয়া যাইত। এই অদ্ভুত পদার্থ সম্বন্ধে একটি বিস্ময়জনক গল্প আছে। কথিত আছে, ফ্রান্সের বিখ্যাত বিজয়ী সম্রাট সার্লেমেনের (Charlemagne) য়্যামিয়েন্থস্‌-নির্ম্মিত একখানি টেবিলের চাদর ছিল। তিনি নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবকে যখন ভোজ দিতেন, তখন সেই চাদরখানি ব্যবহার করিতেন। ভোজ শেষ হইলে তিনি সেই চাদরখানি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া অভ্যাগতগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন।

ইটালীর মিলান দেশের আলডিনি নামক প্রসিদ্ধ নাইটের টুপি, দস্তানা, জামা, মোজা প্রভৃতি সমস্ত পরিচ্ছদই য়্যাসবেস্‌টোজ-নির্ম্মিত ছিল।

য়্যাস্‌বেস্‌টোজে অতি উত্তম কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। এই কাগজে সনন্দ ও অপর দলীলাদি প্রস্তুত হইলে আগুন হইতে পারিত, কিন্তু কিয়ৎকাল প্রচণ্ড অগ্নির উত্তাপে রাখিলে লেখা অদৃশ্য হইয়া যায়। গৃহের ছাদ ও মেজে এই বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে অগ্নিভয় একেবারে তিরোহিত হয়।

০

অনেকেই জানেন, শীতপ্রধান দেশে শীতনিবারণের জন্য গৃহে অগ্নিকুণ্ড থাকে। ধূমনির্গমের জন্য প্রত্যেক অগ্নিকুণ্ডের চিম্‌নী থাকে। ঐ চিম্‌নীর আবরণ যাহাতে তাপসঞ্চালন না করে, এই জন্য চিম্‌নী ও আবরণের মধ্য-ভাগে য়্যাস্‌বেস্‌টোজ-নির্ম্মিত বস্ত্রের একটা আবরণ থাকে। তাহাতে চিম্‌নীর বহিরাবরণ তাপসঞ্চালন করিতে না পারাতে, অভ্যন্তরস্থ বাষ্পের উত্তাপ বাহিরে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। ঠিক এই কৌশল প্রয়োগ করিলে লৌহনির্ম্মিত সিন্ধুকের ভিতর অগ্নির উত্তাপ প্রবেশ করিতে পারে না। কিছু দিন হইতে বাষ্পীয় যন্ত্রের পিষ্টন (piston) এই য়্যাস্‌বেস্‌টোজ দ্বারা আবৃত করিয়া দিবার কল্পনা হইতেছে।

ডাক্তার ব্যালফোর বলেন, মান্দ্রাজের সালেম জেলায় ও মহীশূর রাজ্যে অপর্য্যাপ্তপরিমাণে য়্যাস্‌বেস্‌টোজ পাওয়া যায়।

ছোটনাগপুরে একপ্রকার পরিবর্ত্তনশীল (metamorphic) পর্ব্বত আছে; সেই সকল পর্ব্বতে, বিশেষতঃ মানভূম জেলার ঐ শ্রেণীর পর্ব্বতে, পূর্ব্বে প্রকৃত য়্যাস্‌বেস্‌টোজ পাওয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অনুসন্ধান করিয়া যত দূর জানা গিয়াছে, এখন আর তথায় অপর্য্যাপ্তপরিমাণে এই পদার্থ পাওয়া যায় না।

প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্ বেডেন পাউয়েল (Badden Powell) বলেন, পঞ্জাবের পানাম জেলায় যে রেশমের ন্যায় আভাবিশিষ্ট আঁশাল একপ্রকার খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা এই য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লাহোর শিল্পপ্রদর্শনীতে কোনও অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে অপেক্ষাকৃত কর্কশ রকমের একপ্রকার য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্ প্রদর্শিত হইয়াছিল।

গাড়ওয়াল প্রদেশে উক্ষিমনাথের সন্নিকটে একপ্রকার য়্যাস্‌বেস্‌টোজ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা পর্ব্বতের এত অভ্যন্তর প্রদেশে জন্মিয়া থাকে যে, সহজে সংগ্রহ করা যায় না। পার্ব্বত্য-ভূমির অধিবাসীরা ইহা দ্বারা ক্ষতস্থান আবৃত করে, এবং আলোকের পলিতা প্রস্তুত করিয়া থাকে।

ডাক্তার ব্যালফোর বলেন, আফগানিস্থানের অন্তর্গত জেলালাবাদে য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্ পাওয়া যায়। মিউজিয়মের ভূতত্ত্ববিভাগে য়্যাস্‌বেস্‌টোজের যে একপ্রকার নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সম্প্রতি জিউবারমঞ্জল দেশ হইতে আনীত হইয়াছে। ঐ দেশে য়্যাস্‌বেস্‌টোজের দ্বারা সম্মার্জ্জনী প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুহ।

ভারত-ইতিহাসের এক অংশ।

[আইন-আকবরী হইতে সঙ্কলিত।]

৪২৯ বিক্রম সংবতে তোমর-বংশীয় অনঙ্গপাল দিল্লী নগরের পত্তন করিয়া ন্যায়পরতার সহিত রাজত্ব করেন। ৮৪৮ সংবতে দিল্লীর নিকটে পৃথ্বীরাজ তোমর ও বীলদেব চৌহানের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে চৌহান-বংশের হাতে দিল্লী রাজ্য যায়। রায় পিথোরার (পৃথ্বীরাজের) রাজত্বকালে মইজ-উদ্দিন শ্যাম, হিন্দুস্থান বারংবার আক্রমণ করেন; কিন্তু শেষ যুদ্ধ ব্যতীত একটি যুদ্ধেও জয়লাভ করিতে পারেন নাই। ৫৮৮ হিজরা সনে থানেশ্বরের নিকট অষ্টম যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ বন্দী হন। পৃথ্বীরাজের সঙ্গে যুদ্ধকালে এক শত সামন্তরাজ উপস্থিত থাকিতেন। এই যুদ্ধে তাঁহারা কেহই উপস্থিত ছিলেন না।

কনোজরাজ রাঠৌর জয়চন্দ্র, সেই সময় ভারতভূমির সর্ব্বপ্রধান রাজা বলিয়া আপনাকে প্রচারিত করেন। ধর্ম্ম বিষয়ে জয়চন্দ্রের এত দূর উদারতা ছিল যে, পারস্য ও তুর্কীস্থানের অনেক লোক তাঁহার কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হইত না। জয়চন্দ্র এই সময়ে রাজসূয়যজ্ঞসম্পাদনের মানস করিয়া তাহার উদ্যোগ করেন। যজ্ঞান্তে রাজকন্যার স্বয়ংবরেরও উদ্যোগ হয়। পৃথ্বীরাজ ব্যতীত সমুদয় রাজা জয়চন্দ্রের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত ছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞে রাজগণকে সমস্ত কার্য্য করিতে হইত। রাজসূয় করিবার অধিকার চৌহান-দের আছে কি রাঠৌরদের আছে, ইহা লইয়া সে সময়ে একটা তর্ক উপস্থিত হয়। অস্ত্রবলে এই তর্কের মীমাংসা করিতে হইলে দীর্ঘকাল লাগিবে, এবং যজ্ঞের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইবে মনে করিয়া, জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের হিরণ্ময়ীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দ্বারদেশে দ্বারপালকের স্থানে স্থাপিত করিলেন। পৃথ্বীরাজ এই সংবাদশ্রবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পাঁচ শত অসমসাহসিক বীরপুরুষের সঙ্গে ছদ্মবেশে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া সেই স্বর্ণমূর্ত্তি হরণ করিলেন। এই কার্য্যে বহুসংখ্যক নরহত্যা হয়। রাজকন্যা পৃথ্বীরাজের অসামান্য বীরত্বের

বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন। তিনি অন্য রাজাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। জয়চন্দ্র কন্যার আচরণে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে অন্তঃপুর হইতে নিষ্কাশিত করিয়া স্থানান্তরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এই ব্যাপার পৃথ্বীরাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি রাজকন্যার উদ্ধারের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পৃথ্বীরাজের সভাসদ চাঁদ কবি গায়কবেশে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। পৃথ্বীরাজ কতিপয় নির্ব্বাচিত অনুচর সহ তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। তাঁহারা রাজকন্যার অবরোধস্থলে উপস্থিত হইয়া কৌশলপূর্ব্বক তাঁহার উদ্ধার করিলেন। পৃথ্বীরাজের এক শত সামন্ত সকলেই ছদ্মবেশে নিকটে উপস্থিত ছিলেন। জয়চন্দ্রের সেনাগণ পলায়িত দলপতির অনুসরণ করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। গিহ্লোট গোবিন্দ রাও, সাত হাজার শত্রু বধ করিয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। নরসিংহদেব, চন্দনদেব, সোলাঙ্কিরাজ, পলগানদেব, তদীয় ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্যান্য সামন্তগণ অসামান্য বীরত্ব প্রকাশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজকন্যাও পৃথ্বীরাজ ও চাঁদ কবির সহ নির্বিঘ্নে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। রাজকন্যা পূর্ব্বেই স্বর্ণময়ী পৃথ্বীরাজ-মূর্ত্তির গলে বরমাল্য দান করিয়াছিলেন। এই বিবাহ পৃথ্বীরাজের কাল হইল

পৃথ্বীরাজের সাহসী সঙ্গিগণ নিহত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে রাজকন্যার প্রণয়ে এত দূর বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত আলস্যপরায়ণ হইয়া পড়িলেন। মৈজউদ্দিন এই সংবাদে নিতান্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি জয়চন্দ্রের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বহুসংখ্যক সেনা সংগ্রহ পূর্ব্বক পৃথ্বীরাজের রাজ্যের কতিপয় অংশ অধিকৃত করিলেন। কেহ পৃথ্বীরাজের নিকট এই সংবাদ দিতে সাহসী হয় নাই। ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিলে, সম্রান্তগণ রাজধানীতে সমবেত হইলেন। তাঁহারা চাঁদ কবিকে রাজার নিকট পাঠাইলেন। পৃথ্বীরাজ এখন প্রবুদ্ধ হইলেন; কিন্তু তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের জয়লাভে এত অহঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, অল্পমাত্র সেনা লইয়া শত্রুসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। চাঁদ কবিও রাজার সঙ্গে গজনীতে নীত হইলেন। চাঁদ শীঘ্রই মৈজউদ্দিনের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। একদিন চাঁদ, পৃথ্বীরাজের ধনুর্বিদ্যার সুখ্যাতি করিলে, মৈজউদ্দিন তাহা প্রত্যক্ষ করিবার অভিলাষী হইলেন। পৃথ্বীরাজ সুলতানের সমীপে আনীত হইলেন। তাঁহার হস্তে শরাসন অর্পিত হইল। তিনি

সুলতানকে লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সুলতান নিহত হইলেন। হিন্দু ঐতিহাসিকেরা এরূপ বলেন; কিন্তু পারসীক ঐতিহাসিকেরা ইহা স্বীকার করেন না; তাঁহারা বলেন যে, পৃথ্বীরাজ যুদ্ধস্থলেই বীরের ন্যায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

পৃথ্বীরাজ হইতে চৌহান-বংশের শেষ হইল। মৈজউদ্দিন হিন্দুস্থানের প্রধান অংশ অধিকার করিলেন, এবং মল্লিক কুতুবউদ্দিনকে নিজের প্রতিনিধি রাখিয়া উত্তর দিকের পার্ব্বত্য প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে দেশে ফিরিয়া গেলেন। কুতুবউদ্দিন এই বৎসরেই দিল্লী ও তদধীন কতিপয় সামন্তরাজ্য অধিকার করিলেন। মৈজউদ্দিনের মৃত্যুর পর গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ ফেরোজ শাহ্ হইতে কুতুবের নিকট রাজছত্র ও অন্যান্য রাজচিহ্ন প্রেরণ করিলেন। কুতুবউদ্দিন, লাহোরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সাহস, সদ্বিচার ও দানশীলতার জন্য কুতুবউদ্দিন যশস্বী হইয়াছিলেন। চৌগাঁতে ক্রীড়ার সময় তিনি নিহত হন। কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কুতুবউদ্দিনের পুত্র আরাম শাহকে রাজা করিলেন। অন্য দল মল্লিক আলতামাসের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। আলতামাস কুতুবউদ্দিন কর্ত্তৃক দাসরূপে ক্রীত হইয়াছিলেন; পরে কুতুবউদ্দিন তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। আরাম পলায়ন করেন, আলতামাস সামসুদ্দিন উপাধিধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। কথিত আছে, আলতামাস এক তুর্ক সর্দ্দারের পুত্র ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া জোসেফের ন্যায় তাঁহাকে বিক্রয় করিয়াছিল। নানা মনিবের হাতে পড়িয়া আলতামাস এক বণিকের নিকট বিক্রীত হইলেন। বণিক আলতামাসকে গজনীতে লইয়া যান। সুলতান মৈজউদ্দিন শ্যাম, এই দাসকে ক্রয় করিতে চাহেন, কিন্তু বণিক এত মূল্য চাহিয়া বসেন যে, সুলতান বিরক্ত হইয়া আদেশ করেন যে, কেহ এই দাসকে ক্রয় করিতে পারিবে না। কুতুবউদ্দিন গুজরাট জয় করিয়া গজনীতে উপস্থিত হইলে, সন্তুষ্ট সুলতানের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক উচ্চমূল্যে আলতামাসকে ক্রয় করেন, এবং তাঁহাকে আপনার পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। আলতামাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু তিনি নিতান্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত ও রাজকার্য্যে অমনোযোগী হওয়ায় সম্ভ্রান্তগণ সামসুদ্দিনের কন্যা রিজিয়াকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। পুত্রগণকে পানাসক্ত দেখিয়া সামসুদ্দিন জীবদ্দশায় রিজিয়াকেই তাঁহার উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন।

মৈজউদ্দিন বেহামের রাজত্বকালে কঙ্গিল খাঁর সৈন্যগণ লাহোর প্রদেশ উজাড় করিয়া ফেলে। অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণ সুযোগের সময় বেহামকে কারাগারে নিক্ষেপ করে, এবং পরে সেখানে তাঁহাকে বধ করে।

সুলতান আলাউদ্দিন মসায়ুদের রাজত্বকালে এক দল মোগল তিব্বতের পথ দিয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করে; কিন্তু তাহারা মসায়ুদের সেনাদের কর্ত্তৃক পরাজিত হয়। অন্য সময়ে তুর্কীস্থানের শাসনকর্ত্তা ভারত আক্রমণ করেন, সুলতান তদ্বিরুদ্ধে সসৈন্য বিপাশা নদীর তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া শুনিতে পান যে, আক্রমণকারী চলিয়া গিয়াছেন। সুলতান দিল্লীতে ফিরিয়া আইসেন। মসায়ুদ, পরে কুমন্ত্রিপরিচালিত হওয়ায়, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, এবং সেখানে তাঁহার অস্তিত্ব শেষ হয়।

অনন্তর নাসিরউদ্দিন মহম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। নাসিরউদ্দিন বিজ্ঞ ও প্রজাপ্রিয় ছিলেন। আবুওমার মনহাজ-উস জোরজানি-স্বকৃত তবকত-ই-নসিরি গ্রন্থ ইঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। ইঁহার সময়ে মোগলেরা পঞ্জাব আক্রমণ করে, কিন্তু সুলতানের আগমন-বার্ত্তা পাইয়া চলিয়া যায়। নাসিরউদ্দিন, গিয়াসউদ্দিন বালিনকে উজীর করেন। বালিন প্রথমে দাসত্ববদ্ধ ছিলেন, পরে উন্নতিলাভ করিয়া উজীর হন। নাসিরউদ্দিন, বালিনকে উলুখ খাঁ উপাধি দেন। নাসিরউদ্দিনের পুত্রসন্তান না থাকায়, তাঁহার মৃত্যুর পর, উজীর বালিনই সিংহাসনে আরোহণ করেন। বালিন নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদকে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা করেন। মহম্মদের সুশাসনগুণে পঞ্জাবে শান্তি স্থাপিত হয়। মীর খসরু মহম্মদের সঙ্গী ছিলেন। মহম্মদ পিতার সহ সাক্ষাতের পর পঞ্জাবে গমনকালে পথিমধ্যে আক্রান্ত ও হত হন। মীর খসরু বন্দী হন, কিন্তু পরে পলায়ন করেন।

বালিনের মৃত্যুর সময়, তৎপুত্র বগরা খাঁ বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি সসৈন্যে দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অমাত্যেরা তৎপুত্র কৈকোবাদকে সিংহাসন প্রদান করিলেন।

মহম্মদের পুত্র কৈখসরুকে, বালিন নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান; কিন্তু অমাত্যেরা গৃহবিবাদের ভয়ে, তাঁহাকে মুলতানের শাসন-কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিল। কৈকোবাদ পিতাকে বাধা দিবার জন্য সসৈন্যে পূর্ব্বমুখে যাত্রা করিলেন। উভয়ের সৈন্য সরযূতীরে উপস্থিত হইল। বগরা, কুমন্ত্রীদের পরামর্শে, পুত্রকে সাম্রাজ্য উপভোগ করিতে দিয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া গেলেন।

মীর খসরু নিজের কিরাণ-আস্‌সেকেইন্ গ্রন্থে পিতা ও তদীয় পুত্রের এই সাক্ষাৎবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মদ্যপানে কৈকোবাদের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রকে সামসুদ্দিন উপাধি দিয়া রাজা করিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। কৈকোবাদের শবদেহ যমুনায় নিক্ষিপ্ত হয়। সাম্রাজ্য খিলিজি বংশ আশ্রয় করে, সেনাদের বেতনদাতা জিলালউদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করেন।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

বিশ্ব-কাব্য।

রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধামোদে ভরা,
কি বিরাট বিশ্ব-কাব্য অনন্ত সুন্দর!
সুধাসিক্ত কি সুষমা নিত্য চিত্তহরা,
বিকাশিছে কি বৈচিত্র্য যুগ যুগান্তর!
প্রভঞ্জনে, মেঘমন্দ্রে, কূজনে, কল্লোলে
কি গভীর কি মধুর ছন্দের ঝঙ্কার!
তারকা তপন চন্দ্র দামিনীহিল্লোলে
এ কি রুদ্র, স্নিগ্ধ, মুগ্ধ মাধুরীসম্ভার!
কি গাম্ভীর্য্য অন্ধকারে নিশীথসাগরে,
প্রেমে মোহে শোকে হর্ষে এ কি উদ্দীপনা!
স্তম্ভিত নিখিল-চিত্ত ভীতি-ভক্তি-ভরে—
লোকাতীত কল্পাতীত কি মহাকল্পনা!
ভূমানন্দে পূর্ণ হৃদি—নয়ন আমার,
নিরখিছে কবি-কাব্য দোঁহে একাকার!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চন্দ্রাবলী।

সে দিনের কথা নাথ! পড়ে কি হে মনে?
রাধার সৌভাগ্যসুখ নিরখি' নয়নে,
অসূয়া জাগিল চিতে, হইল বাসনা,
সেবিতে প্রেমের কুঞ্জে রাঙ্গা পা দুখানি,
হৃদয়-শিল্পীরে তব হতে পোষা পাখী,
পোড়াইতে কামধূপ প্রেম-হোমানলে!
কি আনন্দ! প্রাণ মন হইল অধীর,
ভাবি' সেই দেবভোগ্য সম্পদের কথা!
চন্দ্রাবলী-হৃদয়ের শুভ্র পূজাগৃহ,
ভরি যাবে পরাভক্তি শুভ্র সৌরভে!
ফেলি' দিনু সাজ সজ্জা অঙ্গনা-বিভ্রম;
ললাটে বৈষ্ণবী টীকা, করে জপ-মালা,

পাত্রে হরিনামাবলি, দীপ্ত অনুরাগে
যৌবনে সাধিনু নাথ! নব সন্ন্যাসিনী!
মনে আছে? তপঃকুঞ্জ যমুনার ধারে,
নিভৃত, কপোত তথা ডাকে মুহুর্মুহু!
পরভৃত ধরে সদা কুহু কুহু তান,
আলাভোলা পতঙ্গেরা করে কভু গান,
উদাসী কাঠঠোক্রা দেয় কভু সাড়া।
মধুর নিকুঞ্জ সেই। কদমে কদমে
সমাচ্ছন্ন, পরিবৃত তমালে, পিয়ালে।
আম্রমুকুলের গন্ধে, বনতুলসীর
মৃদুগন্ধে, হয় নাথ! প্রাণ মাতোয়ারা!
হেন সাধনার স্থল নাই বৃন্দাবনে!
সেই মনোহর কুঞ্জে, বিরচি' কুটীর,
যমুনা-মৃত্তিকা আনি, হে মনোমোহন,
গড়িলাম তব মূর্ত্তি! হাতে দিনু বাঁশী;
রঙ্গ ফলাইয়া আহা দিলাম ঢালিয়া
শ্যামল জলদ কান্তি; শ্রীঅঙ্গে আঁকিয়া।
দিলাম পরায়ে নাথ! পীতাম্বর খটী!
চরণে নূপুর দিনু আনন্দে উতলা,
হে গোবিন্দ! কণ্ঠে দিনু বরহস্তমালা।
হে হরি! আনন্দ-অশ্রু বহিল অজস্র
দু' কপোলে, হেরি' সেই মোহন বিগ্রহে!
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি' দেব, 'জয় কৃষ্ণ!' বলি'
নাচিলাম, করিলাম হরিগুণগান!
এইরূপ, এক মাস, পূজিনু সাদরে
মম ইষ্টদেবে নাথ! বিরলে বসিয়া।
স্নান করি' নিত্য পূত কালিন্দীর নীরে,
পত্রপুষ্পে দেবতার করিয়া অর্চ্চনা,
করিতে লাগিনু নাথ! যোগ-আরাধনা!
কি তাহে নিবিড় সুখ, শান্তি ও আরাম,
কেমনে বুঝাব? কভু ভোগে কি অপরে,
যোগানন্দসুখ যাহা ভুঞ্জে যোগী জন!
পতিসম্মিলনসুখ বোঝে কি কুমারী?
কোকিলের যেই সুখ কুহু কুহু করি'
প্রাণপণে,—প্রাণ আনি' ওষ্ঠের আগায়,
অভাগা বায়স তাহা বুঝে কি গো কভু?
মর্ত্ত্য-মন্দাকিনী গঙ্গা শত বাহু মেলি',
করে যবে আলিঙ্গন বক্ষোপসাগরে,
দুর্জ্জয় আনন্দে তার ডুবি' যায় বুক!
হায়! সে কল্লোলানন্দ বুঝিতে কি পারে,
ক্ষীণপ্রাণা জঘুকন্যা নদী কর্ম্মনাশা!
একদিন, মধ্যরাত্রে, তপঃকুঞ্জে বসি'
কহিলাম, "আর কেন? হৃদয়-সরসী-
মাঝে, প্রবেশি' সূর্য্যের বেশে, দয়াময়,
করহ ভাস্বর এবে সহস্র কিরণে,
ফুটুক মৃণাল-বৃন্তে ভকতি-নলিনী।"
অভিমানে, অবসাদে, উন্মাদিনী পারা,
করিনু অপূর্ব্ব গান নাচিয়া নাচিয়া!—

গান—কীর্ত্তনের সুর।

ঘৃণার অঙ্গুলি, সকলেই তুলি,
বলে, "এ যে আশী বিষ!
শঠের আকার, দুর্যশ ব্যাভার,
পাপ করে অহর্নিশ"!
হে দয়াল হরি, তব নাম করি',
এই কি ঘটিল শেষে?
গোময় কপালে, চূণকালী গালে,
কলঙ্ক রটিল দেশে!
সকলেই বলে, তোমারে ডাকিলে,
নাহি থাকে পাপলেশ।
আমার কপালে, এ কি এ ঘটালে,
নাহি দুর্দ্দশার শেষ!
আর না ডাকিব, আর না করিব
তোমার মধুর নাম;
যাকে যদি ভয়, হরি দয়াময়,
হরি' পাপ, ভাঙ্গ মান।

পরদিন, উষাকালে, যমুনার জলে
স্নান তরে অবগাহি', ভাসিতে লাগিনু,
যেন গো অপরাজিতা সমীরহিল্লোলে!
হেন কালে, সাশ্রুনেত্রে সদয় অন্তরে,
নিরখিনু, আহা পড়ি' ভবঙ্গের চক্রে,
ভাসিয়া যাইছে এক দীন দুঃখী বিহঙ্গ!
মিছা ভয় পরিহরি', দুই হস্তে তারে
সাপটিয়া, মহাহর্ষে তুলিলাম তীরে!
কত সন্তর্পনে নাথ! জিয়াইনু তারে!
কিন্তু হল অকস্মাৎ পাই' নব বল
দংশিল আঙ্গুলে মোর! চীৎকারি' সহসা
ছাড়িনু বৃশ্চিকে! তীরে এক গোপকন্যা,
'উন্মাদিনী! বলি' মোরে পাড়িতে
লাগিল
শত গালি!—কিন্তু নাথ, আকাশ হইতে
হইল কুসুমবৃষ্টি সর্ব্বাঙ্গে আমার!
শুনিনু আকাশবাণী—"ওলো চন্দ্রাবলী!
অচিরে ফলিবে তোর তপস্যার ফল;
পাইবি করুণাময়ে লো করুণাময়ী!"
সন্ধ্যাকালে যথাবিধি শঙ্খ-ঘণ্টা-রোলে,
আরতি করিয়া মম ইষ্টদেবতার,
বসিলাম ধ্যানে! হেন কালে এ কি শব্দ
বিকট গর্জ্জন করি', আইল রাক্ষস!
লাল চক্ষু, রুক্ষ কেশ, ভীষণমূরতি!
চাহিল গ্রাসিতে মোরে বদন বিকাশি'!
"জয় হরি!" বলি' আমি দানার চরণে
পড়িলাম, কহিলাম, "এ কি লীলা তব
ভয়হারী রামচন্দ্র, রাক্ষস রাবণ,
একাধারে তুমি! তুমি শত্রু, তুমি মিত্র
তুমি ভয়, তুমিই অভয়! হে নৃসিংহ,
কেন আজি সাজিয়াছ হিরণ্যকশিপু?"
কথা শুনি' দৈত্যরাজ খিলখিল করি'
উচ্চ হাসি', মহাশূন্যে গেল মিলাইয়া;
যেন কোন দুঃস্বপন নিদ্রা-অবসানে!
সহসা হইল বৃদ্ধ কৃষ্ণদেহ-গন্ধে
ভরপুর! শিহরিল সর্ব্বাঙ্গ পুলকে!
মধ্যরাত্রে, "এস হরি! এস হরি!" বলি'
ডাকিলাম নেত্র বুজি'; আকুল আহ্বানে।
যোগিনী ডাকিনী সহ, অট্ট অট্ট হাসি',
দেখা দিলা দিগম্বরী ভৈরবী কালিকা!
অসি তুলি' মহারোষে, নৃমুণ্ডমালিনী;
দুই খণ্ড করি' মোরে চাহিলা কাটিতে।
"হে শ্রীহরি, এ কি রঙ্গ? কোথা গেল বাঁশী
কোথা তব পীতাম্বর? ছি ছি! মরি লাজে,
হে ত্রিভঙ্গ, এই সাজে, দিগম্বরী হয়ে
হাসিছ নাচিছ রঙ্গে! ছাড়হ কৌতুক!"
এত বলি' ভৈরবীর চরণকমল
ছুঁইনু! অমনি দেবী অদৃশ্য হইলা
দলে বলে! শ্যামকণ্ঠে বরঙ্গমালা
দোলে যাহা, তাহারই সৌরভে অতুল,
বিপুল নিকুঞ্জ আহা হইল আকুল!
শেষ রাত্রি! জ্যোৎস্নার মধুর প্লাবন
পড়িয়াছে নিকুঞ্জের অযুত বিতানে!
হেসে সারা হইতেছে চম্পক, করবী,
নিশিগন্ধা! হেনকালে আইল তথায়
জটাজূটবিমণ্ডিত নবীন সন্ন্যাসী!
অগাধের ঝুরী সম দীর্ঘ বিলম্বিনী
পড়েছে বিশাল কাঁধে জটার সে ঘটা!
হাসি' বিদ্রূপের কহে যোগিরাজ,
"নাহি লাজ চন্দ্রাবলী? ছি ছি! এ কি
সাজ?
সাজিয়াছ কার লাগি' যৌবনে যোগিনী?
চঞ্চল, প্রগল্‌ভ সেই রাখালের রাজা,
শঠশিরোমণি আর চোরচূড়ামণি!
অঙ্গের বরণ তার কোকিলের মত,
দেহের গঠন তার কুব্জার মত!
তার তরে এ তপস্যা? হায় উন্মাদিনী!
নবীন বয়স মম, তরুণ অরুণ

সম নিরুপম, হের আনন্দরূপিণী
দেবকান্তি মম! সে অধমে পরিহরি',
বর লব হে বরোরু, পুরুষ-উত্তমে।"
এত বলি, যোগিবর হাসিয়া মৃদুহাসি,
বাঁধিয়া ফেলিল মোরে বাহুর বাঁধনে!
আমি কহিলাম, "ছি ছি! এত দিন পরে,
চিন্তিয়াছ চিন্তামণি! এ অধিনী জনে?"
শিরে কৃষ্ণচূড়া, আর গুঞ্জমালা গলে,
অমনি হইলা যোগী দেব বংশীধারী!
সে আশ্লেষে, সে সোহাগে, গেলাম গলিয়া,
মধুময় বীরখণ্ডি গলে গো যেমতি!
জাহ্নবীর জলে ভবা কনক-কলসে!
গলে যথা, গলে যথা, চন্দ্রকান্তমণি,
সুধাংশুর ঢল ঢল তরল পরশে!
যুগলমিলন হ'ল প্রেমতপোবনে,
বসিল শ্যামের বামে চন্দ্রাবলী দাসী।

হে যোগেন্দ্র? সব কথা গিয়াছ
কি ভুলে!
আমার যৌবন-রাজ্যে দুরন্ত দুর্ভিক্ষ
পশিয়াছে, বসিয়াছে শত পঙ্গপাল,
মুড়'ইয়া বসন্তের শ্যাম লতা পাতা!
কত কাল, কত কাল, থাকিব পড়িয়া,
উপবাসে; শীর্ণকায়া অনাথার মত!
এ তীব্র বিরহজ্বালা পারি না সহিতে!
এস নাথ, এস নাথ, বসন্তের মত;
কুহু কুহু কুহু শব্দে এ প্রেম-কোকিলে
আবার জাগায়ে নাথ! আবার মাতায়ে,
এস শ্যাম, আষাঢের সলধর-রূপে;
সিঞ্চিয়া অমিয়া ঢালি' এ মরা চাতকে!
ভগ্নাগত প্রাণ মম, শফরীর মত,
করিতেছি হা-হুতাশ, এ শুষ্ক ডাঙ্গাগে!
কোথা তুমি? কোথা তুমি? জলধির বারি!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

সহযোগী সাহিত্য।

কোরিয়ার রাজধানী।

মিষ্টার জর্জ্জ কেনান্ "আউট্-লুক্" পত্রে কোরিয়ার রাজধানী সম্বন্ধে একটি মনোহর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা তাহার অনুবাদ পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

চেমুলফো বন্দরে উপনীত হইবার অত্যল্পকাল পরেই তত্রত্য জাপানী দূত কোরিয়ার সম্রাটের পক্ষ হইতে আমাদিগকে রাজধানী-দর্শনের আমন্ত্রণ করিলেন। সম্রাটের "ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্মের লীলা-নিকেতন" প্রাসাদে পর দিবস আমাদিগকে আহার করিতে হইবে, দূত মহাশয় আমাদিগকে এই অনুরোধ করিলেন। চেমুলফো-স্থিত বৈদেশিকদিগের নিকেতনের বহির্ভাগে ধর্ম্মভাবের সামান্য নিদর্শন আমাদের নয়নপথে পতিত হইল, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের কোনও চিহ্নই লক্ষিত হইল না। এ অবস্থায় রাজধানীর ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাইবার সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া, আমরা উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। কতিপয় এংলো-স্যাক্সন ভ্রমণকারী সম্প্রতি কোরিয়ার রাজধানী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "রাজপথসমূহ

পরিচ্ছন্ন, সুদৃশ্য, সুকৌশলে নির্ম্মিত। পথিপার্শ্বে উৎকৃষ্ট পয়ঃপ্রণালী বিদ্যমান। রাজধানীর পর্ণ্যগমূহের কোনও স্থানে ধূলি বা কর্দ্দমের চিহ্নমাত্র নাই। বায়ু নির্ম্মল ও স্নিগ্ধকর। রাজপথ বৈদ্যুতিক আলোকে দীপ্ত, এবং বহু অশ্বযানের চক্রনির্ঘোষে মুখরিত। তাড়িতশক্তির সর্ব্বত্র প্রসারিত। রাজপথের দুই পার্শ্বে ইষ্টকনির্ম্মিত বৃহদাকার হর্ম্ম্যরাজি বিরাজিত। রাজধানীর জনসাধারণ শিল্প-কার্য্যে নিযুক্ত।" সুতরাং, এরূপ আলোকোদ্ভাসিত, পরিচ্ছন্ন নগরের রাজপ্রাসাদ যে "ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্যের লীলানিকেতন" হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

নিমন্ত্রিত জাপানী ভদ্রলোকগণ সান্ধ্য-পরিচ্ছদ (Evening suit) ও নেশনালিস্ট টুপি পরিধান করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাজধানীর সুদৃশ্য রাজপথ, সুরম্য হর্ম্মমালা, কাচ-নির্ম্মিত বাতায়ন ও উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকের সহিত আমাদিগের পরিচ্ছদাদির সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য আমরা সাধ্যানুরূপ যত্ন করিয়াছিলাম। ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্ম যে কেবল কোরিয়ার রাজ-প্রাসাদের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ নহে, এ কথাটা কোরিয়ার সম্রাটকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার বাসনাও আমাদের হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল।

শনিবার প্রাতঃকালে সাড়ে সাতটার সময় আমরা জাহাজ হইতে অবতরণপূর্ব্বক জেলে-ডিঙ্গিতে আরোহণ করিলাম। অত্যল্পকালমধ্যে নৌকা সিকতাময় নদীতটে উপনীত হইল। আমরা ধূলিসমাকীর্ণ নদীতীরপথ অতিক্রম করিয়া পরিচ্ছন্ন "শল চেমুলপো" রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, আমরা গাড়ীতে উঠিয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

চেমুলপোর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রাকৃতিক দৃশ্য তেমন রমণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া বোধ হইল না। রেলপথের পার্শ্বে অনুচ্চ পিণ্ডাকার শৈল, শৈল-শরীর লোহিতাভ বালুকারাশিতে সমাকীর্ণ। এই প্রদেশে ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বড় অল্প বলিয়া মনে হইল। কোথাও গুচ্ছ গুচ্ছ তৃণ, কোথাও বা ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রাকার শালবৃক্ষ উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান। শৈল-শ্রেণীর কোনও স্থানেই অন্য কোনও প্রকার উচ্চ-বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল না। স্থানে স্থানে উপত্যকাভূমি কিঞ্চিৎ উর্ব্বরা বলিয়া বোধ হইল। এই সকল স্থানে জলসেচনের ব্যবস্থা থাকাতে, মটর, ধান্য, ভুট্টা, যব প্রভৃতি শস্য-সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের ট্রেণ এই সকল শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে-ছিল। শস্যক্ষেত্রের প্রান্তে গ্রামসমূহ শোভা পাইতেছিল। মৃৎপ্রাচীরবিশিষ্ট পর্ণকুটীরগুলি দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন কেহ বৃহদাকার পাংশুবর্ণ দ্বারশোভিত চতুষ্কোণ ও পরস্পরা-বিন্যস্ত মধুচক্রসমূহ নির্ম্মিত করিয়াছে।

জাপানের কৃষককুলের কুটীরসমূহ উচ্চ ও দুরারোহ; কিন্তু কোরিয়ার কুটীরগুলি তৃণ-নির্ম্মিত, অনতিউচ্চ ও ক্রমনিম্ন। জাপান ও কোরিয়ার কুটীরগুলি তৃণাচ্ছাদিত। বাতায়ন কাগজে নির্ম্মিত; কিন্তু জাপানী কুটীরের বহির্দ্বার রাজপথের দিকে স্থাপিত, সর্ব্বদা উন্মুক্ত; পথিক ইচ্ছা করিলে এই দ্বারপথে গৃহমধ্যস্থ যাবতীয় দ্রব্য দেখিতে পান। কিন্তু কোরিয় কুটীরের দ্বার সর্ব্বদা রুদ্ধ থাকে। অথবা, কৃষকেরা বাঁশের একটা বেড়া দ্বারের সম্মুখে রাখিয়া দেয়। কোরিয়ার গ্রাম্য রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী পয়ঃপ্রণালী তেমন ঢালু নহে। অপরিচ্ছন্ন-জল-নির্গমের পক্ষে পয়ঃপ্রণালী তেমন উপযোগী নহে। এ জন্য উহাতে প্রায়ই দূষিত জল ও আবর্জ্জনা জমিয়া থাকে। আবর্জ্জনার পূতিগন্ধ পথিকের

রেশম উৎপাদন করিয়া থাকে। কোরিয় কৃষকদিগের ক্ষেত্রে প্রচুরপরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়। কোনও কোনও গৃহস্থের বাটীর সম্মুখস্থিত ক্ষেত্রে কলা প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে, দেখিতে পাইলাম।

কোনও স্থলে উলঙ্গনস্তক তাম্রাভ কোরিয়ানেরা, মলিন শ্বেতবস্ত্র পরিধা ধান্য বা যব বুনিতেছিল। অন্য স্থলে বালকবৃন্দ পুষ্করিণী হইতে বাঁশের ত্রিপদের মধ্যে বিলম্বিত ডোঙ্গার সাহায্যে জল তুলিয়া নালার মধ্যে ঢালিতেছিল।

প্রত্যেক কোরিয় পল্লীর মধ্যে একটি করিয়া সাধারণ কূপ আছে। সেই কূপ এমনই ভাবে অবস্থিত যে, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহসমূহের আবর্জ্জনারাশি তাহাতে গিয়া পতিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত কূপ হইতে স্ত্রীলোক ও বালিকাগণ কাষ্ঠনির্ম্মিত বাল্‌তির সাহায্যে জল উত্তোলন করিয়া চতুষ্কোণ কেরোসিন-টিনের মধ্যে ঢালিতেছিল। তাহার পরে সেই জলপূর্ণ পাত্রগুলি বাঁকে ঝুলাইয়া গৃহে লইয়া গিয়া সেই জল প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ জালার মধ্যে সঞ্চিত করিতেছিল। কোনও গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে বিস্তৃত মাদুরের উপর ভুট্টা শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে। কর্দ্দমাক্তদেহ শূকরশাবক সেই সকল বিস্তৃত মাদুরের উপর যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে ইচ্ছামত শস্যভক্ষণ অথবা শস্য নষ্ট করিতেছে। চেমুলপোর পরে কোরিয় পল্লীর এইরূপ গার্হস্থ্যসংযমশীলতা (economey) দেখিয়া আমি বিস্মিত হই নাই। কিন্তু আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, জাপানী গৃহ ব্যতীত আমি কোরিয় পল্লীর কোনও গৃহে পাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় স্পর্শ করিব না।

যতই আমরা সিউওল নগরীর সন্নিহিত হইতে লাগিলাম, শৈলমালা ততই দূরে অপসৃত হইতে লাগিল।

সহসা বামপার্শ্বে নবধান্যাঙ্কুরশ্যামল বিশাল শস্যক্ষেত্র নেত্রপথে পতিত হইল। এই সীমান্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের সুদূর প্রান্তদেশে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত শৈলরাজি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই শস্যশ্যামল ক্ষেত্রটি হান নদীর তীরে অবস্থিত। আধ ঘণ্টা পরে আমরা লৌহসেতুর উপর দিয়া হরিদ্বর্ণ হান নদী উত্তীর্ণ হইলাম। দেখিতে দেখিতে ট্রেণ ধূলিবহুল রাজধানীর উপকণ্ঠে উপনীত হইল। এক দল পণ্যসম্ভারবাহী অশ্ব নদীতীরপথে তাহাদের ক্ষুরক্ষুণ্ণ ধূলিজালে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া নগর হইতে বহির্গত হইল। রাখালেরা মন্থরগামী বলীবর্দ্দদিগের পৃষ্ঠে শুষ্ক তৃণরাশি স্থাপিত করিয়া নগরাভিমুখে গমন করিতেছিল। তৃণরাশির প্রাচুর্য্যে বলীবর্দ্দসমূহ প্রায়ই দৃষ্টিপথের অতীত। কোথাও কোরিয় কুলীগণ, কোথাও বা অবগুণ্ঠনহীনা কুলীরমণীগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। কোথাও আত্মীয়বিয়োগবিধুর ব্যক্তিবৃন্দ শোকজ্ঞাপক টুপী মস্তকে ধারণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। কোথাও বা নিষ্কর্ম্মা কোরিয় ভদ্রলোকেরা সুদীর্ঘ নলের সাহায্যে ধূমপান করিতে করিতে হস্তস্থিত তালবৃন্তসঞ্চালনে ভ্রমণজনিত শ্রান্তির অপনোদন করিতেছিল। সকলেরই পরিচ্ছদ শ্বেতবর্ণ। তখন প্রভাত না হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর হইলে এই উপনগর প্রেতলোক বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

আমাদের জাপানী সহযাত্রিবর্গের অধিকাংশই প্রথমে সিউওল ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া জাপানী দূতনিবাসে গমন করিবার জন্য জিন্‌রিকস বা নরযান ভাড়া করিলেন। ডাল্‌নি-স্থিত দূত মিঃ মরগ্যানের পরামর্শ-অনুসারে রাজপথের প্রান্তে উপনীত হইয়া, নগরপ্রাচীরপার্শ্বস্থ, পরিচ্ছন্ন নিভৃত হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এনবারনি নামক জনৈক মার্কিণ এই হোটেলের স্বত্বাধি-

কারী। সেখানে আমার দ্রব্যাদি রক্ষা করিয়া আমি মিষ্টার হ্যামিল্টন-বর্ণিত সুপরিচ্ছন্ন, সুদৃশ্য, পয়ঃ-প্রণালীসম্পন্ন রাজপথ, বৈদ্যুতিক ট্রাম ও কাচনির্ম্মিত সুরম্য বাতায়ন প্রভৃতির সন্ধানে বহির্গত হইলাম।

সিউওল নগরীর লোকসংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। নগরটি হান নদীর তীরবর্ত্তী একটি প্রশস্ত উপত্যকার উপর স্থাপিত। রাজধানীর এক পার্শ্বে সমুন্নত শৈলশ্রেণী, অন্য পার্শ্ব বৃক্ষহীন; সূচ্যগ্র শৈলরাজি দেখিবামাত্র যুরোপের মরু প্রদেশের চিত্র স্মৃতিপথে উদিত হয়। আন্দাজ ২০।৩০ ফিট্ উচ্চ একটি পাষাণপ্রাচীর দ্বারা সেই নগরীর চারি দিক ও অদূরবর্ত্তী শৈলশ্রেণীর কিয়দংশ পরিবেষ্টিত। প্রাচীরের স্থানে স্থানে এক একটি অর্দ্ধবৃত্তাকৃতি তোরণ আছে। এই তোরণবৃত্তের উভয় পার্শ্ব চীন-দেশীয় প্যাগোডার অনুকরণে নির্ম্মিত। নগরীর মধ্যে স্থানে স্থানে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদেশিকগণ ঐ সকল অট্টালিকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক উহাতে বাস করিতেছেন। একটি বিস্তৃত রাজপথের মধ্য দিয়া একটি বৈদ্যুতিক ট্রামের লাইন চলিয়া গিয়াছে। শুনিলাম, ইঁহাও নাকি বৈদেশিকদিগের উদ্যোগে ও যত্নে নির্ম্মিত হইয়াছে। বৈদেশিক দূতনিবাস ও রাজপ্রাসাদসংলগ্ন উদ্যান ব্যতীত, দেশীয়দিগের আবাসস্থান চেমুলফোর ন্যায় আবর্জ্জনাপূর্ণ ও অপরিচ্ছন্ন রাজধানীটিকে মিঃ হ্যামিল্টনের বর্ণিত "সুদৃশ্য সুরম্য রাজধানী" হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া মনে হইল।

আমার মতে, সিউওল-বাসীদিগের পরিচ্ছদবৈচিত্র্য ব্যতীত অন্য কিছু নবাগত বৈদেশিকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিতে পারে না। পরিচ্ছদের শিল্পচাতুর্য্য কৌতূহলোদ্দীপক নহে। পরিচ্ছদের পারিপাট্য ত নাই; অধিকন্তু অধিবাসীদিগের মলিনবেশদর্শনে দর্শকের হৃদয়ে স্বতঃই বিতৃষ্ণার সঞ্চার হয়। কিন্তু কোরিয় রাজপথের দৃশ্য, বিশেষতঃ পুরাতন নগরের অসংস্কৃত অংশের রাজপথের দৃশ্য সত্যই বিচিত্র। এরূপ বৈচিত্র্যবহুল দৃশ্য প্রাচ্য দেশের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ইতিপূর্ব্বে আমি শ্বেতপরিচ্ছদধারী নাগরিক, শোকপরিজ্ঞাপক-শিরস্ত্রাণধারী আত্মীয়বিয়োগবিধুর ব্যক্তিবৃন্দ, ঈষদনাবৃতদেহ রমণীকুল ও বালিকাসুলভকোমলমুখশ্রী বালকবৃন্দের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু সিউওলের রাজপথে আর এক প্রকার লোক দেখিলাম। তাহাদিগের পরিচ্ছদ পূর্ব্বোক্ত পরিচ্ছদধারীদিগের বেশভূষার অপেক্ষা অল্প কৌতূহলোদ্দীপক নহে। ইহাদের একটি চক্ষু বসনে আবৃত। এই একনয়না রমণীসমূহের পরিধানে তৃণশ্যামল আংরাখা। শুভ্রবসনা কোরিয় ললনার কুঞ্চিত পরিচ্ছদ, অর্দ্ধনগ্ন বাহু ও ঈষৎ-অনাবৃত বক্ষঃস্থল দর্শনে আগন্তুক যেমন বিস্মিত হইয়া উঠেন, তৃণশ্যামলপরিচ্ছদধারিণীদিগকে দেখিয়াও নবাগতকে তেমনই অপূর্ব্ব বিস্ময়ে ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়।

তৃণশ্যামলবসনা রমণীর পরিচ্ছদের বহির্ভাগমাত্র দর্শকের নয়নপথে পতিত হয়। এই আংরাখাটিকে একটি বেশমী water-proof আবরণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রমণীগণের গলদেশের শুভ্র "নেকইয়োক" ও হাতের কফ চারিটি ফিতার বন্ধনীর দ্বারা আবদ্ধ। এই বন্ধনচতুষ্টয়ের মধ্যে দুইটি ঘোর রক্তবর্ণ ও অবশিষ্ট দুইটি লোহিতাভ। ফিতাগুলি এত দীর্ঘ যে, তাহা প্রায় ভূমিস্পর্শ করিয়া থাকে। সুন্দরীগণ এই তৃণশ্যামল আংরাখা ও বৈচিত্র্যবহুল লোহিত ফিতার বন্ধনী মার্কিণ প্রণালীমতে পরিধান করিলে তাহাদিগের পরিচ্ছদের সৌন্দর্য্য নয়নাভিরাম হইত; কিন্তু কোরিয় ললনারা মার্কিণ প্রণালীমতে উহা পরিধান করেন না। তাঁহারা

তৎপরিবর্ত্তে উক্ত কলার (neck-yoke) মস্তকের উপরিভাগে স্থাপিত করেন, এবং আংরাখাটির দ্বারা মুখমণ্ডলের চতুষ্পার্শ্ব এমন ভাবে আবৃত করেন যে, নেত্রযুগলের মধ্যে একটিমাত্র দর্শকের নয়নপথে পতিত হয়। আংরাখার উভয় পার্শ্বের ঝালর কানের কাছে ঝুলিতে থাকে। এরূপ অপূর্ব্ব তৃণশ্যামলপরিচ্ছদধারিণী রমণীমণ্ডলীর অপেক্ষা বিচিত্রবেশধারিণীর কথা কল্পনারও অতীত। কোনও জনাকীর্ণ রাজপথে বা বাজারে বেশবৈচিত্র্যবহুল অনংখ্য রমণী দর্শকের নেত্রপথে পতিত হইয়া থাকে। অনুরূপসংখ্যক শোকচিহ্নপরিজ্ঞাপক-শিরস্ত্রাণধারী ব্যক্তিবৃন্দ শুভ্রবসনা রমণীকুলের পার্শ্ব দিয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে চলিয়া যাইতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। শুভ্রবসনা প্রেতমূর্ত্তিরূপিণী ললনাকুল যখন তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতে করিতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকেন, বা দীর্ঘনলের সাহায্যে ধূমপানে রত হন, তখন স্বতঃই দর্শক চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া দেখেন, তিনি সত্যই স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছেন, না জাগরিত? এই তৃণশ্যামলবসনধারিণী রমণীকুল কোরিয়ার মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের গৃহলক্ষ্মী।

প্রবাদ আছে, বহুপূর্ব্বে একবার নিশীথকালে সিউওল নগর শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়। সেই সময়ে নগরে একটিও যোদ্ধপুরুষ উপস্থিত ছিল না। বিপদ দেখিয়া নগরের ললনাকুল পতিদিগের ব্যবহৃত জ্যাকেট দ্বারা মস্তক ও শরীর আবৃত করিয়া অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক নগরপ্রাচীরের সমীপে উপনীত হন। শত্রুরা তখন পুরপ্রাচীর আক্রমণ করিয়াছিল। বীর্য্যবতী নারীগণ তাহাদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে থাকেন। অরাতিবৃন্দ তাঁহাদিগের লোকাতীত বীরত্ব ও সাহস দর্শনে এবং ছদ্মবেশবশতঃ নারীগণকে পুরুষ ভাবিয়া দুর্গজয় অসম্ভব মনে করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিবার পর, সিউওলের যোদ্ধৃগণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ললনাদিগের সাহস ও বীরত্ব দর্শনে মুগ্ধ হয়। তদবধি কোরিয়ার রমণীসমাজ শিরোদেশে কলার ও গ্রীবাদেশে বিচিত্রভঙ্গিতে জ্যাকেট পরিধান করিয়া থাকে। তৃণশ্যামল আংরাখা পরিধান প্রণালীর সহিত সামন্তস্য রক্ষা করিবার জন্যই উপকথাটি রচিত হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়।

বেলা ১টার সময় রাজপ্রাসাদে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। ১২টা বাজিবার অত্যল্পকাল পরে আমরা জাপানী দূতনিবাসে সমবেত হইলাম। কেহ নরযানে, কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ বা শকটে আরোহণ পূর্ব্বক "ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্যের লীলানিকেতন" রাজপ্রাসাদের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সিউওলের জনসাধারণ এরূপ বৈচিত্র্যবহুল মিছিল বা জনযাত্রা পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। পুরাতন নগরের অপরিসর ও অপরিচ্ছন্ন রাজপথের মধ্য দিয়া আমরা দ্রুতপদে পূর্ব্বতোরণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। বৈদেশিক নৌবিভাগীয় দূতনিচয়, জাপানী সিভিলিয়ান, পার্লামেণ্টের সদস্যগণ শকটারোহণে গমন করিতেছিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে অশ্বারোহী সামরিক কর্ম্মচারীরা সুদৃশ্য পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া অনুগমন করিতেছিলেন। আমাদের সহিত জাপানী ও অন্যান্য বৈদেশিক সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণও রাজসভায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সঙ্কীর্ণ আবর্জ্জনাপূর্ণ অসংস্কৃত রাজমার্গের দুই মাইল পথ অতিবাহন করিতে আমাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। সে যাহা হউক, অবশেষে আমরা কোরিয় শাস্ত্রী কর্ত্তৃক রক্ষিত ও প্রাচীরে বেষ্টিত একটি উদ্যানে উপনীত হইলাম। তথা হইতে পদব্রজে আমরা নয়নরঞ্জিত স্বাভাবিক অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

আমাদের সম্মুখে একটি বিস্তৃত শকট পরিচালনোপযোগী পথ দেখিলাম। পথের উভয় পার্শ্বে

পর্ণতরু। যদূরে শত শত বৎসরের বিশালকায় তরুশ্রেণী বহুল শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। এই সুরম্য বীথিটি একটি স্বাভাবিক শৈলের শিখরদেশ অতিক্রম করিয়া নিম্ন উপত্যকাভূমির মধ্য দিয়া প্রসারিত রহিয়াছে। বৃক্ষবহুল এই অচল দর্শনে আমার মনে হইল, আমি যেন স্বদেশের কোনও চিরপ্রিয় অরণ্যমধ্যে উপস্থিত হইয়াছি। এই অরণ্যের বৃক্ষ, ভরু, পুষ্প, সকলই যেন আমেরিকার অরণ্যের মত। শালতরুশাখায় উপবিষ্ট বায়সকুলের কা কা ধ্বনি আমার চিরপরিচিত বলিয়া মনে হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত আমি বিস্ময়ে আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিলাম। আমি যে আজ কোরিয়া রাজ্যের অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতেছি, এ কথা ভুলিয়া গেলাম। স্বদেশের সমস্ত চিত্র আমার নয়নসমক্ষে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হইল। কিন্তু এ স্বপ্ন অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। কয়েক পদ অগ্রসর হইবার পর বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল দিয়া একটি চতুষ্কোণাকৃতি কমলদলসমাচ্ছন্ন জলাশয় আমাদের নয়নপথে পতিত হইল। স্বচ্ছ বারিনীরে বৃহদাকার পদ্মপত্র-সমূহ শোভা পাইতেছে। অদূরে জলাশয়তটে দুইটি সুরম্য হর্ম্ম্য বিরাজিত। প্রাচীন ও রহস্যময় প্রাচ্যদেশের এই বিচিত্র দৃশ্য দর্শনমাত্র আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

দ্বিতল অট্টালিকা দুইটি চীনের আদর্শে নির্ম্মিত। কক্ষপ্রাচীরে কৃষ্ণ, পীত, গোলাপী, রক্তনি প্রভৃতি বর্ণে চিত্রিত। চিত্রকরের বর্ণবিন্যাসকৌশল প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু মনের উপর তেমন একটা প্রভাব বিস্তার করে না। বৃহৎ অট্টালিকার সর্ব্বত্র এইরূপ বর্ণচিত্র, কিন্তু চিত্রকরের তূলিকাস্পর্শে কোনও বর্ণই তেমন উজ্জ্বলভাব ধারণ করে নাই।

দ্বিতলে উঠিবার সোপানশ্রেণীর নিকটে কতিপয় রাজভৃত্য শ্বেত পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া দণ্ডায়মান ছিল। আমরা জনৈক পরিচারকের হস্তে আমাদের কার্ড দিলাম। গৃহের তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারী আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া সাগ্রহে আমাদের করমর্দ্দন করিলেন। এই কর্ম্মচারীর পরিচ্ছদও শ্বেতবর্ণ, তাঁহার মস্তকেও অনুরূপ শিরস্ত্রাণ দেখিলাম। তিনি সম্রাটের প্রতিনিধিস্বরূপ আমাদিগের অভ্যর্থনাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আলাপ পরিচয়ের পর আমরা কমলদলশোভিত জলাশয়ের চারি দিকে স্বেচ্ছামত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। জাপানী গার্লামেণ্টের সদস্যবর্গ তরুতলে স্থিত বেঞ্চে উপবেশন পূর্ব্বক বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন; কেহ বা ধূমপানার্থ কক্ষান্তরে গমন করিলেন। রাজধানীর যাবতীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও নগরস্থ বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত বৈদেশিক ভদ্রলোকও রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভোজসভায় সামরিক ও নৌ-বিভাগীয় বহুসংখ্যক কর্ম্মচারীকে দেখিলাম। পরিচ্ছদের বর্ণ-বৈচিত্র্যে ভোজসভাটি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি ইংরাজীভাষায় কথোপকথন করিতে পারেন, দেখিলাম। কেহ কেহ বিশুদ্ধ ইংরাজীতে অনর্গল আমাদিগের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। যে সকল জাপানী ভোজে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই মুখশ্রী প্রতিভাদীপ্ত; দেখিবামাত্র মনে হয়, তাঁহারা দৃঢ়চেতা, কর্ম্মকুশল ও বুদ্ধিমান; কিন্তু কোরিয়দিগের মুখমণ্ডলে সে সকল চিহ্ন লক্ষিত হইল না। তাঁহাদিগের মুখাকৃতি আদৌ কৌতূহলোদ্দীপক বা চিত্তাকর্ষক নহে।

বেলা এক ঘটিকার পর আমাদিগের জলযোগের আয়োজন হইল। ভোজগৃহে উপনীত হইয়া দেখিলাম, তিন চারিটি সুবৃহৎ মার্কিন টেবিলের উপর ইউরোপীয় খানা সজ্জিত রহিয়াছে। কোরিয় সম্রাট ইউরোপীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিলে, মিস্ সল্টান্ নাম্নী একটি ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ মহিলার উপর ভোজের ভার অর্পিত হইয়া থাকে। এই মহিলাটি ঘটনাক্রমে রুসরাজ্য হইতে সুদূর প্রাচ্যভূমিতে আসিয়া কোরিয় সম্রাটের নিকট চাকরী স্বীকার করিয়াছিলেন। আমাদিগের ভোজের সমুদয় কার্য্যভার তাঁহার উপরেই অর্পিত হইয়াছিল। সুতরাং কোরিয় খাদ্যের পরিবর্ত্তে আমাদের জন্য ইউরোপীয় প্রথামত খাদ্যাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। রন্ধনাদি অতি পরিপাটীরূপেই সম্পাদিত হইয়াছিল। কোন দ্রব্যেরই অভাব আমরা বোধ করিতে পারি নাই। চর্ব্ব্য, চোষ্য ও লেহ্য, কিছুরই ত্রুটী ছিল না; পেষ সম্বন্ধে ব্যবস্থাও নিতান্ত মন্দ হয় নাই। তবে শ্যাম্পেন ও ক্লারেট ব্যতীত অন্য কোনরূপ পানীয়ের আয়োজন করা হয় নাই। কোরিয় সম্রাটের রাজাশনন সম্বন্ধে যতই ত্রুটী থাকুক না কেন, অতিথিসেবায় কিন্তু কোন ত্রুটী লক্ষিত হইল না। তাঁহার রন্ধনশালার কার্য্য যেরূপ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়, কোষাগারের কার্য্য বোধ হয় তেমন শৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হয় না।

এখনও 'ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্যের লীলানিকেতনস্বরূপ' রাজপ্রাসাদটি আমাদের দেখা হয় নাই। আহারাদির পর আমরা উহার সন্ধানে বহির্গত হইলাম। প্রায় অর্দ্ধ মাইল অতিক্রম করিবার পর আমরা 'ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্যের নিকেতনটি দেখিতে পাইলাম। অট্টালিকাটি অরণ্যের একটি নিভৃত প্রদেশে অবস্থিত। ভূতপূর্ব্ব রাণীর পরিত্যক্ত শূন্য প্রাসাদ দর্শনে আমরা হতাশ হইলাম। অনতি-উচ্চ একতল অট্টালিকা; উল্লেখযোগ্য শিল্পচাতুর্য্যের সম্পূর্ণ অভাব। প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ কক্ষসমূহের কারুকার্য্য বাগানটস্থ প্রাসাদের তুলনায় অতি সামান্য। অট্টালিকার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি মরুবৎ। আমি ত প্রশংসা করিবার মত অট্টালিকাতে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু পরিত্যক্ত প্রাসাদটি যে স্থানে অবস্থিত, তাহার প্রাকৃতিক দৃশ্যটি পরম রমণীয়।

প্রাসাদটি যেখানে অবস্থিত, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অরণ্যের শোভা বিচিত্র। অরণ্যের চতুর্দ্দিকে বিশাল, বিরাট তরুশ্রেণী দণ্ডায়মান। স্নিগ্ধপবনে নানাজাতীয় পুষ্পপরিমলের কোমলগন্ধ, শ্যামল পুষ্পভারাবনত কুঞ্জের বিচিত্র শোভা ও কমলদলচিত্রিত বাপীসলিল প্রকৃতই দর্শকের চিত্তহরণ করিবার উপযোগী। কিন্তু লোকবিশ্রুত 'রাজপ্রাসাদটি' একেবারেই উল্লেখযোগ্য নহে। অট্টালিকা হয় ত 'ধর্ম্মের' রঙ্গভূমি ছিল, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের কোনও চিহ্ন আমি ত আদৌ এখানে দেখিতে পাইলাম না। মিষ্টার মর্গানকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সম্রাট কেন এই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন আবাসে গমন করিয়াছেন?' তিনি বলিলেন, 'সাপের ভয়ে। বিশাল বৃক্ষগুলি সর্পসমাকুল। সেই ভয়ে তিনি এই অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।' আমি ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিলাম, কোরিয়া রাজ্যের ঐন্দ্রজালিকেরা এই স্থানটি দুষ্টপ্রেতাত্মাযোনিতে পরিবৃত বলায় সম্রাট ভয়ে স্থানত্যাগ করিয়াছেন। সিউওলের অধিবাসীদিগের তুলনায় ভূতযোনির সংখ্যাই অধিক, এইরূপ একটা জনশ্রুতি আছে। প্রায়

তিন হাজার ঐন্দ্রজালিক বহুসংখ্যক সমাধিস্থলে মৃত ব্যক্তিদিগের রক্ষাকার্য্যে না কি যুক্ত আছে। জাপানীরা যখন এই সকল ঐন্দ্রজালিককে নগর হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে, তখন বৃক্ষস্থ সর্পভূত ও অন্যান্য প্রেতযোনিদিগের কি অবস্থা হইবে, বলা যায় না। জাপানীদিগের প্রভাব যাহাতে বর্দ্ধিত না হয়, তাহার প্রতিকারকল্পে সম্প্রতি ঐন্দ্রজালিকেরা একখানি জাপানী মানচিত্র মন্ত্রপূত আগুণে পুড়াইয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু হায়! তাহাদের আশা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে! জাপানীদিগের শক্তির হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা রুষদিগকে পরাজিত করিয়া আরও প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

'ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্যের নিকেতন' দর্শন করিবার পর আমরা নরযানে আরোহণপূর্ব্বক যাত্রা করিলাম। অপরিসর আবর্জ্জনাপূর্ণ পথের মধ্য দিয়া প্রায় আধ মাইল অতিক্রম করিবার পর আমরা আর একটি পরিত্যক্ত জনশূন্য রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলাম। এই অট্টালিকাটিকে 'হত্যা ও অপঘাতমৃত্যুর নিকেতন' বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। গত ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই প্রাসাদের কোনও কক্ষে কোরিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাণীকে নিতান্ত পৈশাচিক ভাবে হত্যা করা হয়। জাপানী সচিব ভাইকাউণ্ট মিউরা এই হত্যাকাণ্ডের অনুমোদন বা সাহায্য করেন নাই বটে, কিন্তু রাণীকে যে হত্যা করা হইবে, এ সংবাদ তিনি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন। জাপানী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এরূপ কলঙ্কপূর্ণ নারকীয় অভিনয়ের কাহিনী ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত হয় নাই। উক্ত লোমহর্ষণ ঘটনার পর কোরিয়ার রাজাও (তখন তিনি সম্রাট উপাধি লাভ করেন নাই) পলায়নপূর্ব্বক রুসীয় দূতনিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

হত্যা ও অপঘাত মৃত্যুর প্রাসাদটিকে সিউওল-প্রবাসী বৈদেশিকেরা 'পুরাতন রাজপ্রাসাদ' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই প্রাসাদটি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত। তন্মধ্যে 'দরবার গৃহ' ও 'গুপ্তমন্দির' উল্লেখযোগ্য। রাজপ্রাসাদের সর্ব্বত্রই চীনের শিল্পাদর্শ প্রকটিত। কিন্তু এগুলির শিল্পসৌন্দর্য্য জাপানের প্রাচীন মন্দিরনিচয়ের ভাস্কর-শিল্পের সহিত তুলনীয় নহে। জাপানের প্রত্যেক প্রাচীন মন্দিরে চীনের লোকপ্রসিদ্ধ শিল্পচাতুর্য্য বিদ্যমান।

প্রাদোষকালে আমি একাকী নগরের মধ্যে পর্য্যটন করিতে বাহির হইলাম। নগরের বাজারে ও রাজপথের পার্শ্বস্থ দোকানে কোরিয়া-জাত দ্রব্যাদি দেখিয়া আমার কৌতূহল-নিবৃত্তি ও অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের চেষ্টা করিলাম। অন্যান্য দেশের ন্যায় এখানেও দুই প্রকার রাজপথ দেখিলাম। কোন কোন রাজপথের উভয়পার্শ্বস্থ অট্টালিকায় নাগরিকেরা বাস করেন; এগুলিকে আবাসপল্লী বলা চলে। আবার কতিপয় রাজপথের দুইধারে কেবল দোকান ও কার্য্যালয়। জনতাবহুল রাজপথের মধ্যে কতিপয় পথ প্রশস্ত বটে, কিন্তু পথিপার্শ্বস্থ অট্টালিকানিচয় মুরম্য বা সুবৃহৎ নহে। একতলা গৃহের সংখ্যাই অধিক। প্রায় সকল গৃহেই খোলা বা পাতার চাল। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানে বিদেশজাত দ্রব্যের সংখ্যাই অধিক। নানারূপ শিরস্ত্রাণ, দীর্ঘাকার ধূমপানোপযোগী নল, ছোট ছোট ছুরি, কাঠের চিরুণী, মসৃণ কাগজের tarpulins, সামুদ্রিকশঙ্খনির্ম্মিত ঢাকনি, বহুবিধ ধান্য ও মাদুর ব্যতীত অন্য কোন কোরিয়া-দেশজাত দ্রব্য কোনও দোকানে দেখিলাম না। এক সময়ে জাপান

কোরিয়ার নিকট হইতে শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু যে কোরিয়া-দ্বীপবাসী জাপানীদিগকে ভাস্করশিল্প, সূক্ষ্মশিল্প, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, বস্ত্রবয়ন প্রণালী, রেশমের চাষ ও নানাবিধ ধাতু দ্রব্যের উপর সূক্ষ্ম খোদকারীর কার্য্য শিখাইয়াছিল, এখন তাহার এমনই অধঃপতন হইয়াছে যে, কোরিয়াজাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যও ভ্রমণকারীর বাক্সে স্থানলাভ করিবার উপযুক্ত নহে। আমি যে সকল দ্রব্য দেখিলাম, তদ্ব্যতীত আরও উৎকৃষ্ট স্থানীয় দ্রব্য থাকিতে পারে, কিন্তু আমার চক্ষে একটিও তখন পড়ে নাই। অন্যান্য দ্রব্যাদি জাপানের আমদানী।

পরদিবস কোরিয় সম্রাট তাঁহার অধিকৃত প্রাসাদের মধ্যে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। প্রাসাদটির চতুর্দ্দিক প্রাচীরবেষ্টিত। বৈদেশিক দূতনিবাস ইহার অনতিদূরে অবস্থিত। রাজপ্রাসাদটি দেখিতে আমেরিকার কোন সাধারণ বৃহদাকার দ্বিতল অট্টালিকার মত। অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকার সময় আমরা একটি কক্ষে প্রবেশ করিলাম। এই কক্ষটি অভ্যাগতদিগের বিশ্রামার্থ নির্দ্দিষ্ট। পাশ্চাত্য রুচি অনুসারে কক্ষটি সজ্জিত। কক্ষপ্রাচীর সুচিত্রিত, গৃহতল একখানি সুবৃহৎ মার্কিন গালিচায় আবৃত। কক্ষটি সুসজ্জিত হইলেও আমাদিগকে হতাশ হইতে হইয়াছিল। কারণ সর্ব্বত্রই একটা অসামঞ্জস্যের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সম্রাট একটি প্রশস্ত কক্ষে অমাত্যবর্গসমাবৃত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা একে একে তথায় নীত হইলাম। কক্ষটি গালিচাবৃত। বাতায়নগুলি পীত ও রক্তাভ রেশমী যবনিকায় শোভিত। গৃহের এক প্রান্তে একটি ভত্যচ্চ মঞ্চ। রক্তবস্ত্রে মঞ্চটি সম্পূর্ণরূপে আবৃত। উহার দুই পার্শ্বে দুইটি পীত ড্রাগনমূর্ত্তি। মঞ্চের পশ্চাতে একখানি রেশমী যবনিকা শোভা পাইতেছে। যবনিকা উপরে একটি বৃক্ষরাজিশোভিত নদীর চিত্র অঙ্কিত। নদীনীরে নানাবিধ জলচর পক্ষী বিচরণ করিতেছে। এই মঞ্চোপরি সম্রাট, যুবরাজ ও আর একটি ব্যক্তি দণ্ডায়মান। শেষোক্ত ব্যক্তিটির মুখাকৃতি মনুষ্যসুলভ। কিন্তু তাহার মুখমণ্ডলে পীড়া, অশান্তি ও দুঃখের বিষাদ-কালিমা যেন পরিস্ফুট। এই কর্ম্মচারীকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে তুর্কীস্থানের খোজা বলিয়াই আমার অনুমান হইতেছিল। সমবেত পারিষদবর্গ সকলেই শ্বেতবস্ত্রপরিহিত। সকলেরই চরণে শ্বেতবর্ণের পাদুকা, এবং মস্তকে প্রায় দেড়হাত উচ্চ শ্বেতপক্ষাবৃত শিরস্ত্রাণ শোভা পাইতেছে। কোরিয় রাজসভায় সকলকেই উক্তরূপ শিরোভূষণ মস্তকে ধারণ করিতে হয়। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবার সময় আমরা সকলেই একে একে সম্রাটকে অভিবাদন করিলাম। বার পার হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পুনর্ব্বার আমরা সম্রাটকে অভিবাদন করিলাম। আসনে উপবেশন করিবার সময়ও আর একবার অভিবাদন করিতে হইয়াছিল।

প্রথম দর্শনেই সম্রাটকে বিনয়ী, সদালাপী বলিয়া মনে হয়। সম্রাটের বর্ণরাগহীন প্রৌঢ় মুখমণ্ডল দেখিলে মনে হয় না যে, তাঁহার মানসিক শক্তি বা প্রবল নৈতিক বল আছে। কিন্তু যখন তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন, তখন বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সম্রাটের চিত্ত তাদৃশ দুর্ব্বল নহে। আত্মসংযম, রহস্যপ্রিয়তা প্রভৃতি সদ্গুণ তাঁহার সহিত বাক্যালাপকালে আপনি পরিস্ফুট হয়। সম্রাট সদালাপী, তাঁহার কথোপকথনভঙ্গিতে একটি আকর্ষণ আছে

আমাদের সহিত তাঁহার অত্যল্পকালই কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহাকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার আমার অবকাশ হয় নাই। তথাপি আমার মনে হয়, সম্রাট আরামপ্রিয়, আত্মসুখতৎপর, কিন্তু সুবুদ্ধিশালী। যুবরাজের বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিংশবর্ষ হইবে। তাঁহারও মানসিক শক্তির দৃঢ়তা সম্বন্ধে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। জনপ্রবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, তিনি যে কোরিয়ার ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন, এমন বোধ হয় না। যুবরাজের পার্শ্বে যে রাজঅনুচরটি দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান বলিয়া আমার মনে হইল। তাঁহার শীর্ণ বিবর্ণ অশান্তিছায়াচ্ছন্ন নারীজনসুলভ মুখমণ্ডলের উপর দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার আভাস দেখিতে পাইলাম। কোরিয় সম্রাটের হৃদয় ভাগ অপেক্ষা আমি এই কর্ম্মচারীর হৃদয়নিহিত ভাবের কিয়দংশ জানিতে পারিলে আপনাকে পরম সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিতাম। তাঁহার মুখচ্ছবি এখন আমার ভাল স্মরণ হইতেছে না, কিন্তু যদি আমি উৎকৃষ্ট চিত্রকর হইতাম, তাহা হইলে এই অনুচর বা কর্ম্মচারীর মুখমণ্ডল বর্ণরাগে এরূপ চিত্রিত করিতাম যে, সহস্রচিত্রপরিপূর্ণ চিত্রশালিকার মধ্যে স্থাপিত হইলেও সেই মুখ প্রত্যেক দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করিত।

রাজপ্রাসাদে কিছু জলযোগ করিয়া আমরা বাসস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। তার পর পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা পরস্পরের নোটবুক মিলাইয়া দেখিলাম।

সিউওলে অবস্থানের শেষ দিবসে জাপানী দূতনিবাসে আমাদের উদ্যানবিহারের নিমন্ত্রণ হইল। দুই শত ফিট উচ্চ একটি শৈল-শিখরে ভোজের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমরা বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া, বেড়াইয়া, গল্প করিয়া দেড় ঘণ্টা কাল কাটাইয়া দিলাম। আমাদিগের মনোরঞ্জনের জন্য কোরিয়ার ব্যাণ্ড বাজিতেছিল। পবনে সঙ্গীতের সুমধুর ঝঙ্কারে একটা মোহজাল রচনা করিতেছিল। সন্ধ্যার তরল অন্ধকার পর্ব্বতশিখর হইতে নামিয়া ক্রমে সমুদ্রের নীল জলবিস্তারের উপর প্রসারিত হইতেছিল। ধীরে ধীরে চারি দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। শৈলশিখর হইতে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ কনকরশ্মিতে সিউওল নগরটি পরিচ্ছন্ন ও পরম রমণীয় বলিয়াই মনে হইতে লাগিল;—তখন নগরপথে আবর্জ্জনা দেখা যাইতেছিল না। সেই সান্ধ্যমুহূর্ত্তে সিউওলকে পরম পবিত্র ও চিত্তাকর্ষক বলিয়া মনে হইল।

বলরাম-চূড়া।

উচ্চ তরুশাখে তার আবীরের কি বাহার!
চমৎকার বলরাম-চূড়া!
রেবতীরমণ-আঁখি হ'ত যথা ঘোর লাল,
উপহাসি' লালে লাল ভুরা!
কি সুন্দর তরুবর! মনোহর! মনোহর!
গুচ্ছে গুচ্ছে শোভে রাঙ্গা ফুল,
শিরে চূড়া, নীল ধড়া, যেন দেব হলধর,
কানে দোলে বীরবৌলি দুল!
হে চিরসুন্দর হরি! চারি ধারে, মরি মরি!
কি সৌন্দর্য্য ছড়ায়ে রেখেছ!
হে চিন্ময়, হে অরূপ, এ কি হেরি অপরূপ,
বিশ্বরূপ হইয়া বসেছ!
ইচ্ছাময়! ইচ্ছা করি' প্রকাশিলে আপনারে,
আকাশ হইল ঘট পট;
মায়ার মুখস পরি' সাজিলে গো, মরি মরি!
বহুরূপী ছদ্মবেশী নট!
কোথাও বা অতি ভীমা লোলজিহ্বা শ্যামা বামা,
উলঙ্গিনী উন্মাদিনীবেশা,
মায়াবিনী কাচি' কাচ, নাচিছ তাণ্ডব নাচ,
আলু থালু অতিমুক্তকেশা!
রাধিকার রূপ ধরি' কভু রাসরাসেশ্বরী,
লীলাময়ী শ্রীকৃষ্ণমোহিনী;
ব্রীড়ারক্ত দু' অধরে হাসিছ মোহন হাসি,
চরণে নূপুর রিণি ঝিনি!
কভু মা গো! গৌরকান্তি নিরুপমা উমা সাজি'
দশভুজা অম্বুজ-চরণা;
রূপে দিক আলো করি' চুরি কর ভক্ত-চিত্ত,
ভাবে ভোর উল্লাস-মগনা!
কভু ম্যাডোনার বেশে শিশু খৃষ্টে ক্রোড়ে করি'
করিতেছ বদন-চুম্বন;
কভু মা যশোদা সাজি' শিশু কৃষ্ণে বুকে ধরি'
সোহাগে কহিছ যাদু ধন!

তা থেই তা থেই নৃত্য! পরি' শুধু দিগম্বর,
কভু তুমি পাগল মহেশ!
কভু গলে বনমালা, শিরে চারু ময়ূরচূড়া,
ধরিছ রাখাল-রাজ-বেশ!

আজি হেরি প্রেম-চক্ষে ভাবে দুটি আঁখি মুদি'
সাজিয়াছ এ কি অভিরাম?
কি সুন্দর! কি সুঠাম! শিরে শোভে লাল চূড়া,
মদিরলোচন বলরাম!

—০— শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। অগ্রহায়ণ। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী "জাতীয় সাহিত্যে ও জাতীয় চিত্তে লঘুতা" নামক সুদীর্ঘ শিরোনামে যে 'বহ্বারম্ভে'র সূত্রপাত করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় এই, উপসংহারে তাহা 'লঘুক্রিয়া'য় পরিণত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, "এক কারণে প্রতীচ্য দেশ সকলের সাহিত্যে লঘুতা প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহা জীবনসংগ্রামের তীব্রতা ও তজ্জনিত কার্য্যে ব্যস্ততা।" বঙ্কিম বাবুর ওস্তাদজী উপস্থিত থাকিলে নিশ্চয় বলিতেন, "এক কারণ ছোড়কে দুই কারণ হুয়া!" প্রতীচ্য "দেশ সকলের" সাহিত্যের মধ্যে তিনি কেবল প্রসঙ্গক্রমে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সাধারণ সাহিত্যে 'লঘুতা' থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারই নিম্ন স্তরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীর স্রোত প্রবহমান, তাহা অস্বীকার করিবার কারণ নাই। কোন্ প্রবাহে বুদ্বুদ নাই? কেবল উপরের বুদ্বুদ দেখিয়া সাহিত্য-প্রবাহের 'স্বরূপ' নির্ণীত হইতে পারে না। শাস্ত্রী মহাশয়, ফ্রান্স, জর্ম্মনী, রুসিয়া প্রভৃতি দেশকে 'প্রতীচ্য দেশ সকলে'র তালিকা হইতে বাদ দিয়াছেন। য়ুরোপের আধুনিক সাহিত্য এত উন্নত, গুরুতার তুলনায় তাহার লঘুতা এত অল্প, আমাদের ইবানীন্তন শিশু-সাহিত্যের তুলনায় সে সাহিত্য এমন বিরাট যে, আমাদের সাহিত্যের প্রসঙ্গে সে সাহিত্যের উল্লেখ করিলে, আমাদের লঘুতাই সূচিত হয়। য়ুরোপের তুলনায় য়ুরোপে জীবনসংগ্রাম তীব্র হইতে পারে; কিন্তু সেখানে এক প্রবল সম্প্রদায় জীবনসংগ্রামে সাহিত্যকেই আপনাদের অস্ত্র করিয়াছেন। বাহিরের যুদ্ধের সহিত তাহার সংস্রব নাই। সাহিত্য-ক্ষেত্রেই সে সংগ্রামের জয়-পরাজয় সীমাবদ্ধ, সাহিত্যের সেবক-বর্গই তাহার ফলভাগী। ব্যক্তিগত পরাজয়ে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি,—কিন্তু ব্যক্তিগত সাধনার পরাজয়ে সাহিত্যের ক্ষতি নাই; বরং জেতার জয়ে সাহিত্যেরই জয় হইতেছে। আমাদের জীবন্মৃত সমাজে এ বীরত্বের অবকাশ নাই। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—"আমাদের

জাতীয় চিত্তে লঘুতা প্রবেশ করিবার কথা নহে। তবে যদি লঘুতা আসে, তাহার অন্যবিধ কারণ অন্বেষণ করিতে হইবে।" সে কারণ এই,—(১) "কি এক প্রকার অবসাদ জাতীয় চিত্তকে ঘিরিয়া রহিয়াছে;" (২) "একখানি বহু শত মণ প্রস্তরের যাঁতার ন্যায় একটি বিদেশীয় শক্তি আমাদের উপর চাপিয়া রহিয়াছে;" (৩) "হিন্দু প্রকৃতিই আশাশীল নহে।" শাস্ত্রী মহাশয় পূর্ব্বে বলিয়াছেন, যাহারা জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত, তাহাদের সাহিত্যে লঘুতা প্রবেশ করে। এখানে বলিতেছেন, যাহারা জীবনসংগ্রামে হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহাদের সাহিত্যেও লঘুতা প্রবেশ করিবে। তবে আমরা পথ অবলম্বন করিব? মধ্যপথ? শাস্ত্রী মহাশয় তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। লেখক চিন্তার উদ্রেকমাত্রেই প্রবন্ধ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অবকাশ পান নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় চিন্তাশীল লেখকের প্রবন্ধেও এই কারণে 'লঘুতা প্রবেশ' করিয়াছে সে লঘুতা ভাষাকেও ক্ষমা করে নাই। "গভীর আলোচনার প্রতি অসহিষ্ণু", "যাহাতে ক্ষণেক হাস্যের উদয় করে" ও "মাসিক সাহিত্যের কাথ নিঙড়াইয়া দেয়" প্রভৃতিই তাহার সাক্ষী। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তের "গ্যালিলিওর মন্ত্র" কোন মতেই লঘু নহে। লেখক প্রবন্ধটিকে 'জীবনচরিতের খাতা-ভুক্ত' করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমাদেরও সে দুরভিসন্ধি নাই। ইহাতে দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, বক্তৃতা প্রভৃতি বিবিধ দুরূহ বিষয়ের সমাবেশ আছে। তাহার উপর ভাষার অত্যাচারে অনেক স্থলে বক্তব্য বিষয়ের সন্ধানই পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রবন্ধটিকে দুরূহ-খাতে জমা করিয়া লইলে বোধ করি কোনও ক্ষতি নাই। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষের "আর্য্যজাতির আদি দেবতা" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "সংসর্গ" নামক গল্পটির আখ্যানবস্তুর সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। গল্পটি বিকশিত হইবার অবকাশ পায় নাই। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "নায়েক ছেলে"রও আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। ইহাও বিজয় বাবুর লেখনীর যোগ্য হয় নাই। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "দুঃখের বোঝা" পত্রে রচিত একটি ক্ষুদ্র গল্প। আখ্যানবস্তু সামান্য;—সতীশচন্দ্র ইংরাজী পোষাক পরিয়া স্বদেশ-উদ্ধারে ব্রতী ছিলেন। সতীশের দিদি রাধারাণী ভাইকে প্রাণ দিয়া সাহায্য করিতেন। সতীশের ইঙ্গ-বঙ্গ-বেশ রাধারাণীর চক্ষুঃশূল ছিল। ভগিনীর শত অনুরোধেও ভ্রাতা সে মোহন বেশ ছাড়িলেন না; কিন্তু টালার দাঙ্গায় এক জন মুসলমান গোরা-ভ্রমে যখন সতীশকে তাড়া করিল, সতীশ তখন প্রাণের দায়ে গৌরপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া রাধারাণীর একখানি শাড়ী পরিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। সেই অবধি তিনি আর বিলাতী পোষাক ব্যবহার করিতেন না। একপ গল্প যেরূপ সুশাণিত ভাষায় জমিতে পারিত, গল্পের ভাষার সেরূপ ধার নাই। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত-শিক্ষা" আলোচনার যোগ্য। শ্রীযুক্ত রামদাস বসুর "বঙ্গাগিরি ও মহারাষ্ট্র রণতরী" সুখপাঠ্য ঐতিহাসিক রচনা। রামদাস বাবু এই প্রবন্ধে অনেক নূতন কথা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে বাঙ্গালী" প্রবন্ধ লেখকের অনুসন্ধান-পটুতার পরিচায়ক। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের "অজণ্টা গুহায় দুইদিন" সংক্ষিপ্ত ভ্রমণকাহিনী,—উল্লেখযোগ্য।

ভারতচন্দ্র।

কবি ও কাব্য।

১৭১২ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ভুরসুট পরগণাস্থ পেঁড়ো গ্রামে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় এক জন ধনবান ভূম্যধিকারী ও 'রাজা' নামে পরিচিত ছিলেন। জনরব, তাঁহার প্রায় তিন লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। (১) স্বীয় সম্পত্তি ও ধনরক্ষার জন্য তাঁহাকে কালোপযোগী ব্যবস্থাও করিতে হইয়াছিল। তিনি স্বীয় রাজধানী পরিখাবেষ্টিত ও সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। সেই গড়ের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান। (২) ভবানীপুরে ও পেঁড়োয় তাঁহার দুর্গও ছিল। নরেন্দ্রনারায়ণের চার পুত্রের মধ্যে ভারতচন্দ্র সর্ব্বকনিষ্ঠ।

"সত্যপীরের কথা"য় ভারতচন্দ্র নিজ পরিচয়ে লিখিয়াছেন,—

"ভরদ্বাজ অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ
সদাভাবে হত কংস ভূরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত ভারত ভারতী যুত
ফুলের মুখটি খ্যাত দ্বিজপদে রমতি॥"

"বিদ্যাসুন্দরের"ও আছে,—

"ভূরসিটে মহাকায়, ভূপতি নরেন্দ্র রায়
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তাঁর।"

বর্দ্ধমানরাজের সহিত অধিকারের সীমা-নির্ণয় লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে, নরেন্দ্রনারায়ণ মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের জননী মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর সম্বন্ধে কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। অপমানিতা রাজমাতার আদেশে বর্দ্ধমানের সেনাদল ভবানীপুরের ও পেঁড়োর গড় আক্রমণ করিয়া হস্তগত করে; নরেন্দ্রনারায়ণের সর্ব্বনাশ হয়।

(১) বিশ্বকোষ।
(২) R. C. Dutt—Literature of Bengal.

সম্পদসৌভাগ্যচ্যুত ভারতচন্দ্র মণ্ডলঘাট পরগণায় গাজীপুরের নিকটবর্ত্তী নওয়াপাড়া গ্রামে স্বীয় মাতুলালয়ে গমন করেন। তথায় অবস্থিতিকালে তাজপুর টোলে ব্যাকরণ ও অভিধান অধ্যয়ন করিয়া তিনি সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হয়েন। তাঁহার সংস্কৃতভাষায় অধিকারের প্রমাণ তাঁহার সকল রচনাতেই স্বপ্রকাশ।

এই সময় ভারতচন্দ্র তাজপুরের নিকটবর্ত্তী শারদাগ্রামবাসী জনৈক কেশরকুণী আচার্য্যের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে ভারতচন্দ্রের বংশমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। সেই কারণে ও অর্থকরী পারসী শিক্ষা না করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করাতে তিনি সহোদরগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়েন, এবং অভিমানে গৃহত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স চতুর্দ্দশবর্ষমাত্র।

গৃহত্যাগী, অভিমানী, তরুণ যুবক ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার নিকটবর্ত্তী দেবানন্দপুরগ্রামবাসী কায়স্থকুলোদ্ভব রামচন্দ্র মুন্সীর ভবনে উপনীত হয়েন, এবং গৃহস্বামীর যত্নে পারসী শিখিতে আরম্ভ করেন। "সত্যপীরের কথা"য় তাহার উল্লেখ আছে।—

"দেবের আনন্দধাম দেবানন্দপুর নাম
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুনসী।
ভাবতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়
হোয়ে মোরে কৃপাদায় পড়াইল পারসী।"

কৃতজ্ঞ কবি কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করিতে কোথাও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এই সময় তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিতেন। কিন্তু পারসী-পাঠেই তাঁহার প্রাণপণ ছিল। তিনি তাহাতেই বিশেষ চেষ্টিত হইতেন। তখন তাঁহাকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইত। "একবার রাঁধিয়া দুবেলা খাইতেন—একটী বেগুণ পোড়ার আধখানি দিনমানে খাইয়া আর আধখানি রাত্রির জন্য রাখিয়া দিতেন।" (৩)

এই সময় একটি ঘটনায় ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভা গগনমণ্ডলে বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। "ভারত যে নিগূঢ় কবিত্বরত্নের আকর, ইহার পূর্ব্বে তাহা কেহই জানিত না"। (৪) মুন্সীবাবুদিগের গৃহে সত্যনারায়ণের সিন্নি উপস্থিত হয়। পাঁচালী পড়িবার জন্য আদিষ্ট হইলে ভারতচন্দ্র প্রচলিত পুঁথি না পাঠ করিয়া ত্রিপদী ছন্দে গ্রথিত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। তাহাতে

(৩) চরিতাষ্টক।

(৪) রামগতি ন্যায়রত্ন—বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য।

সকলেই তাঁহার কবিত্বশক্তিদর্শনে বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছিলেন। আর একবার সর্দ্দি উপলক্ষে পূর্ব্ববারের মত অনুরুদ্ধ হইলে তিনি চৌপদী ছন্দে আর একটি কবিতা রচনা করিয়া পাঠ করেন। এই শেষোক্ত "ব্রতকথা সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা", অর্থাৎ ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে।

বিংশবর্ষ বয়সে পারসীতে কৃতবিদ্য হইয়া তবে ভারতচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ বর্দ্ধমানাধিপতির নিকট সামান্য কিছু সম্পত্তি ইজারা লইয়াছিলেন। তিনি ঐ সম্পত্তির মোক্তার স্বরূপ বর্দ্ধমানে প্রেরিত হয়েন। যথাকালে রাজস্ব দিতে না পারায় ঐ সম্পত্তি বর্দ্ধমানরাজ কর্ত্তৃক খাস করা হয়। ভারতচন্দ্র যুবকসুলভ ঔদ্ধত্য প্রযুক্ত আপত্তি করেন, এবং ফলে কারারুদ্ধ হয়েন। বর্দ্ধমান রাজদরবারে উকীলের দুর্দ্দশার কথা ভারতচন্দ্রের ভুলিবার কথা নহে সত্য। কিন্তু যদি বচনায় তিনি তাহার আভাষ দিয়া থাকেন, তবে স্বীকার করিতে হয়, কবি বৈষ্ণবোচিত ক্ষমায় দরবারের অপরাধ বিস্মৃত হইয়া আপনার স্মৃতিতে বিদ্রূপের প্রগাঢ় প্রলেপ দিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ভারতচন্দ্রকে অধিক দিন কারাক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই। কারারক্ষকের সহায়তায় তিনি রাত্রিযোগে পলায়ন করেন, এবং ভৃত্য সমভিব্যাহারে বর্দ্ধমানাধিকার ত্যাগ করিয়া কটকে মহারাষ্ট্রীয় সুবাদার শিবভট্টের আশ্রয়ে উপনীত হয়েন। কিছু দিন পরে ভারতচন্দ্র তাঁহার অনুমতি লইয়া নীলাচলে গমন করেন। শিবভট্ট দয়াপরবশ হইয়া আদেশঘোষণা করেন যে, ভারতচন্দ্র ও তাঁহার ভৃত্য বিনাকরে শ্রীক্ষেত্রবাসী হইতে পারিবেন; যখন যে মঠে ইচ্ছা, সসম্মানে থাকিতে পারিবেন; এবং প্রত্যহ একটি করিয়া বরবাণী আটকে (৫) পাইবেন। ভারতচন্দ্র কিছু কাল শঙ্করাচার্য্য-মঠে বাস করিয়া দেবপ্রসাদ ও রাজপ্রসাদ ভোগ করেন। এই সময় বৈষ্ণবসহবাসে তিনি বৈষ্ণব মতের আলোচনা করেন, এবং বৈষ্ণবমতের অনুরক্ত হইয়া পড়েন। তিনি বৈরাগীর বেশ ধারণ করিয়া শ্রীক্ষেত্র হইতে উদাসীন হইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন।

ভারতচন্দ্রের বৈষ্ণবমতানুরক্তি সম্বন্ধে মতান্তর আছে। বঙ্গসাহিত্যের এক জন ইতিহাসলেখক বলেন, ভারতচন্দ্র সত্য সত্যই বৈষ্ণবমতের অনুরক্ত হইয়াছিলেন। (৬) কিন্তু তিনি বলেন, "অন্নদামঙ্গলে" ব্যাসের মতান্তরগ্রহণের কথায় কবি

(৫) এক নাগরী আতপ চাউলের অন্ন, এক কাটরা দালের তরকারী ও এক কাটরা অরহরের দাউল।

(৬) R C Dutt—Literature of Bengal.

আপনার কার্য্যের কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। ব্যাস "ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হইল গোঁড়া শৈব।" তাহাতে শিব বলেন,—

"হরিহর দুই মোরা অভেদ শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥"

ভারতচন্দ্র অন্য ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা বলিবার পূর্ব্বে, তিনি কোন্ মতাবলম্বী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানা আবশ্যক। (৭) যদি তিনি বৈষ্ণবমতাবলম্বী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি মতান্তর গ্রহণ করেন নাই। তিনি যে শেষ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবমতাবলম্বী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদিগের এইরূপ বিশ্বাসের কারণ পরে বিবৃত করিব। শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় যেরূপ বিচারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ব্যাসের মতান্তর-পরিগ্রহণের কথায় ভারতচন্দ্র স্বীয় মতান্তর-পরিগ্রহণের কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, সেইরূপ বিচারে পরবর্ত্তিগণও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে যে, বহুদিন কৈফিয়তের মধ্যে বাস করিয়া বহু কৈফিয়ৎ লইয়া ও দিয়া তিনি সহজ ব্যাপারকেও কৈফিয়তের জটিলতামুক্ত করিতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্র প্রকৃত বিশ্বাসবশে ব্যাসের মতান্তর-পরিগ্রহণচ্ছলে হরিহরের অভেদত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন, মনে করিলেই, সহজ মীমাংসা হয়।

বঙ্গসাহিত্যের আর এক জন ইতিহাসলেখক ভারতচন্দ্রের বৈষ্ণবমতগ্রহণের আন্তরিকতায় সন্দিহান। (৮) ভারতচন্দ্রের নীলাচলবাসের প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—"এই সময় তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্মে (৯) অনুরাগ জন্মিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু তাঁহার লেখায় সেই অনুরাগ মধ্যে মধ্যে একটি ঈষদ্ব্যক্ত বিদ্রূপে পরিণত হইতে দেখা যায়,—'চল যাই নীলাচলে। খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছিব হাত, নাচিব গাইব কুতূহলে'। (১০) এই লেখায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ তীর্থের প্রতি কবির বেশ একটু সম্ভ্রমপূর্ণ পরিহাস লক্ষিত হয়।" অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,—"তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ কতকগুলি স্নিগ্ধমধুর শ্লেষাত্মক ধুয়াতে পরিণত হইয়া যায়।"

---

(৭) আমরা চেষ্টা করিয়াও ইহা জানিতে পারি নাই। কোন অভিজ্ঞ পাঠক এ বিষয় জানাইলে বাধিত হইব।—লেখক।

(৮) দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

(৯) বৈষ্ণব ধর্ম্ম না মত? বৈষ্ণব মত কি হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত নহে?

(১০) সম্পূর্ণ কবিতাটি পাঠ করিলে ইহাকে বিদ্রূপ সন্দেহ করিবার কারণ থাকে কি না সন্দেহ। আমরা উদ্ধৃত করিতেছি;—

পাঠ করিয়া স্বতঃই মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়,—দুর্ভাগ্য ভারতচন্দ্রের, না আমাদের? যখন মনে করা যায়, ভারতচন্দ্র যে সমাজে ও যে সভায় আপনার কাব্য-সম্পদ-ভাণ্ডার মুক্ত করিয়াছিলেন, সে সমাজে ও সে সভায় বোদ্ধার অভাব ছিল না, তখন বোধ হয় দুর্ভাগ্য আমাদের। আমরা বহুদেশের বহু টীকা সংগ্রহ করিয়া বিদেশীয় গ্রন্থকারদিগের রচনার ভাবগ্রহণের চেষ্টা করি, কিন্তু স্বদেশীয় কবিদিগের রচনা যথোচিত মনোযোগ সহ পাঠ করা আবশ্যক মনে করি না।

ভারতচন্দ্রের সমস্ত রচনায় কোথাও বৈষ্ণবমতের প্রতি বিদ্রূপ দেখা যায় না। "বিদ্যাসুন্দরে" ভারতের কৃষ্ণভক্তির ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান। "ভারতের গোবিন্দের চরণের আশ", "পরিণাম হরিনাম" ইত্যাদি নানা পদে সে ভক্তির প্রমাণ স্বপ্রকাশ। "মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি"র মধ্যেও ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন,—"ভারতায় কাতরায় কৃষ্ণভক্তিমস্তিকে।" তাঁহার

"চল চল সব ব্রজকুমারী
তরুতলে গিরা ভেটি মুরারি"

ইত্যাদি পদ আজও অনেকের কণ্ঠস্থ। অন্নদামঙ্গলের আরম্ভে দেবদেবীবন্দনা আছে। গণেশবন্দনায় কবি বলিতেছেন,—

"কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।"

শিববন্দনায় এই কথাই পুনরুক্ত হইয়াছে। সূর্য্যবন্দনায় তিনি বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণচন্দ্রভূপে চাহিবে স্বরূপে ভারতচন্দ্রের স্তবে।" লক্ষ্মীবন্দনায় তিনি বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণচন্দ্র বাসে থাক সদা হাসে রাজলক্ষ্মী স্থিরা হয়ে।" যে অন্নপূর্ণার মহিমা-কীর্ত্তনে অন্নদামঙ্গল রচিত, তাঁহার বন্দনায় কবির উক্তি,—

"রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের আপদ হর
গায়কের কণ্ঠে কর বাস।"

"চল যাই নীলাচলে। রে অরে ভাই।
ঘটাইল বিধি ভাগ্যবলে॥
মহাপ্রভু জগনাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
দেখিব অক্ষয়বটতলে॥
খাইয়া প্রসাদভাত মাথায় মুছিব হাত
নাচিব গাইব কুতুহলে॥
ভবসিন্ধু বিন্দু জানি পার হৈনু হেন মানি
সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে॥
দেখিয়া সে চাঁদমুখ পাইব কৈবল্যসুখ
সুধন্য ভারত ভূমণ্ডলে॥"

কৃষ্ণচন্দ্র কালীভক্ত,—"কৃষ্ণচন্দ্রহৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল।" কৌশিকীবন্দনায় কবি বলিয়াছেন,—"ভারতে করহ দয়া"; "কৃষ্ণচন্দ্ররায়ে রাখ রাঙ্গা পায়ে অভয় দেহ অভয়া।" কেবল "সরস্বতীবন্দনায়" কবি বলিয়াছেন,—"ভারতের ভারতী ভরসা।" আর "বিষ্ণুবন্দনায়" তিনি বলিয়াছেন,—

"ভারত ও পদ আশে নূতন মঙ্গল ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।"

"বিদ্যাসুন্দর" কি কেবল অশ্লীলতার চারুশিল্প? সে পুস্তক কি গোবিন্দ-গীত নহে?

"খাইয়া প্রসাদভাত মাথায় মুছিব হাত নাচিব গাইব কুতূহলে" ইহাই কি বিদ্রূপ? বৈষ্ণব কবির পক্ষে ইহা বলাই কি স্বাভাবিক নহে? জগন্নাথের রথযাত্রাকালে পুরীর রাজা স্বয়ং আসিয়া সম্মার্জ্জনী লইয়া চণ্ডালের কার্য্য করেন। এই ভক্তিপ্রকাশ রাজবংশের কুলাচার। (১১) এই দেবতার প্রসাদ কখনও পবিত্রতাভ্রষ্ট হয় না। সে প্রসাদভক্ষণকালে জাতিবিচার থাকে না। চণ্ডালও ব্রাহ্মণকে সে প্রসাদ দিতে পারে। পুরীর পুরোহিত ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বি-দত্ত প্রসাদ ভক্ষণ করেন। (১২) এ সম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাস বুঝাইবার জন্য বিদেশীয় ভিন্নধর্ম্মী ঐতিহাসিক ডাক্তার হণ্টার কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ নিম্নলিখিত গল্পটি প্রদান করিলাম। তিনি তাঁহার উড়িয়া ভৃত্যের নিকট ইহার সংগ্রহ করিয়াছিলেন। একবার এক জন গর্ব্বিত যাত্রী জগন্নাথধামে আসিয়া প্রসাদভক্ষণে অসম্মত হয়েন। ফলে নগরের বহির্দ্দেশে সেতু অতিক্রমকালে তাঁহার হস্ত পদ দেহচ্যুত হইয়া পড়ে। তিনি সেই অবস্থায় দীর্ঘ দুই মাস রাজপথে পতিত রহেন। তাহার পর এক দিন একটি সারমেয় সেই পথে গমন করিতেছিল; তাহার মুখচ্যুত লালাসিক্ত প্রসাদকণা রাজপথের ধূলায় পতিত হয়। সেই হতভাগ্য গর্ব্বান্ধ ব্যক্তি তখন কোন রূপে সেই স্থান পর্য্যন্ত যাইয়া সেই সারমেয়বদনভ্রষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ করেন। তখন তাঁহার নূতন হস্তপদাদি আবির্ভূত হয়। (১৩) এই মহাপ্রসাদ সর্ব্বপাপহর। শুষ্ক মহাপ্রসাদ বৈষ্ণবদিগের শ্রাদ্ধে পিণ্ডে প্রদত্ত হয়। ইহা এমনই পবিত্র। (১৩) ভক্তগণ যে প্রসাদ এইরূপ পবিত্র মনে করেন, তাঁহারা সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া, অন্য খাদ্যভোজনের পর যেমন হস্তমুখাদি প্রক্ষালিত

(১১) Stirling—Orissa.
(১২) Hunter—Orissa.
(১৩) Hunter—Orissa.
(১৪) Rajendra Lala Mittra—Orissa.

করেন. সেরূপ না করা অস্বাভাবিক নহে, বরং স্বাভাবিক। ইহার পর "নাচিব গাইব কুতূহলে"—ইহাই কি বিরূপ? নৃত্যাদিসহকৃত সঙ্কীর্ত্তন বৈষ্ণবমত-প্রচারের এক প্রধান অঙ্গ। দরবেশ-নৃত্যের মত বৈষ্ণবসঙ্কীর্ত্তনও ধর্ম্মমত্ততার সোপান। (১৫) 'ভাবলাগা'র দৃষ্টান্ত এখনও এ দেশে বিরল নহে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী-দিগেরও এইরূপ 'ভাব লাগে'—এই সময় (moments of ecstasy) তাঁহারা যেন সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে পারেন। (১৬)

শেষ কথা, ভারতচন্দ্রকে ভণ্ড মনে করিবার কারণ কি? বৈরাগীর বেশে বৃন্দাবনযাত্রায় তাঁহার কি স্বার্থ সিদ্ধ হইত? তখনও ধর্ম্ম হিন্দুর নিকট পার্থিব সকল সম্পদ অপেক্ষা আদরের। তখনও ভ্রাতৃবিচ্ছেদে গৃহত্যাগের জন্য সকলেই অনেক সম্পত্তি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইতেন। ধর্ম্ম তখনও ইচ্ছায় পরিধান ও ইচ্ছায় পরিহার করিবার মত আবরণমাত্রে পরিণত হয় নাই। বিশেষ বৈরাগীর গৈরিক বেশ তখনও দেশে ও বিদেশে 'ফ্যাশন' হয় নাই।

বৃন্দাবনের পথে ভারতচন্দ্র খানাকুল কৃষ্ণনগরে উপনীত হইলেন। তথায় তিনি গোপীনাথ জীউর মন্দিরে গমন করিলেন। সেই স্থানে ভক্তদল কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তিনি প্রসাদ খাইয়া কীর্ত্তন শুনিতে বসিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী ভৃত্য জানিত, সেই গ্রামে তাঁহার শ্যালীপতির বাস। ভারতচন্দ্র যখন তন্ময় হইয়া নামামৃতপানে বিভোর, সেই অবকাশে ভৃত্য তাঁহার শ্যালী-পতিকে সংবাদ দিয়া আসিল। তিনি আসিয়া বহু যত্নে ভারতচন্দ্রকে গৃহে লইয়া যাইলেন। তাঁহার অনেক অনুরোধেও ভারতচন্দ্র শ্বশুর গৃহে যাইতে সম্মত হইলেন না। তিনি দৃঢ়তাসহকারে বলিলেন, উপার্জ্জন করিতে না পারিলে আর গৃহে যাইবেন না। চরিত্রের এই দৃঢ়তা কবির জীবনে সর্ব্বত্র পরিস্ফুট।

শ্যালীপতি ভারতচন্দ্রকে শ্বশুরালয়ে লইয়া যাইলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃতপাঠকালে ভারতচন্দ্র স্বীয় মনোনীতা বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার পর, সংস্কৃতপাঠ ও সেই বিবাহ, এই দুই কারণে তিরস্কৃত হইয়া তিনি গৃহ-

(১৫) দরবেশ-নৃত্যে নর্ত্তকের দক্ষিণ বাহু ঊর্দ্ধ দিকে ও বাম বাহু নিম্ন দিকে থাকে। ঊর্দ্ধমুখ বাহুতে করতল যাচ্ঞার ভাবে ও অধোমুখ বাহুতে করতল দানের ভাবে প্রসারিত থাকে। স্বর্গ হইতে দেবপ্রভাব লাভ করিয়া পৃথিবীতে তাহার দানই যেন অভিপ্রেত, ইহাই ইহার ব্যাখ্যা (Simpson—Buddhist Praying Wheel.) বৈষ্ণবদিগের ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্যে মানবাত্মার স্বর্গকামনা সূচিত হইতে পারে।—লেখক।

(১৬) Oldenburg—Buddha.

ত্যাগ করেন। তাহার পর তিনি নানা বিপদে পতিত হয়েন। দীর্ঘকাল পরে পত্নীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। যিনি ভারতচন্দ্রের তরুণ হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার মায়াবন্ধনে বদ্ধ হইয়া ভারতচন্দ্র পুনরায় "সর্ব্বোপকারক্ষম" গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ভ্রাতৃগণের পূর্ব্বব্যবহারের স্মৃতি অভিমানী যুবকের হৃদয় হইতে অপনীত হয় নাই; তাই তিনি শ্বশুরকে নিষেধ করিলেন, যেন তিনি তাঁহার পত্নীকে ভারতের পিতৃগৃহে প্রেরণ না করেন। সংসারী হইয়া ভারতচন্দ্র আবার উদরান্নসংস্থানের চেষ্টায় ব্যস্ত হইলেন।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র প্রণেতা ভারতচন্দ্রের বৃন্দাবনযাত্রায় বিঘ্নপ্রকাশিয়া তাঁহার শ্বশুরালয়-গমনের কথা বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—"তিনি স্ত্রীর আদরে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না,—নিজের অভ্যস্ত ব্যঙ্গসহকারে এক স্থলে লিখিয়াছেন—'দুই স্ত্রী নহিলে নহে স্বামীর আদর। সে রসে বঞ্চিত রায় গুণাকর।' (১৭) যে পত্নীর ব্যবহার সংসারবিরাগী ভারতচন্দ্রকে পুনরায় সংসারী করিয়াছিল, সেই পত্নীর আদরে তিনি "বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলেন কি না" সন্দেহ! আপ্যায়িত না হইলে তিনি সংসারী হইতেন না; শেষজীবনে রাজসভার কোলাহল হইতে দূরে গঙ্গাতীরে সেই পত্নীর সাহচর্য্যে জীবনসায়াহ্ন শান্তিসুখস্নিগ্ধ করিতেন না। যিনি সহোদরদিগের দুর্ব্ব্যবহার ক্ষমা করিতে পারেন নাই, তিনি পত্নীর দুর্ব্ব্যবহার বিস্মৃত হইতে পারিতেন না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বহুবিবাহকারিণীকে বিদ্রূপ করিয়া কবি লিখিয়াছিলেন,—

"এ সুখে বঞ্চিত কবি রায় গুণাকর।
দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর॥"

বিস্ময়ের বিষয়, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসলেখক ভারতচন্দ্রের ভক্তির উচ্ছ্বাসকে বিদ্রূপ ও শাণিত বিদ্রূপকে গভীর মতাভিব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়াছেন!

ইহার পর ভারতচন্দ্র ফরাসডাঙ্গায় উপনীত হইলেন। তিনি গোন্দলপাড়ার কোন ব্রাহ্মণগৃহে আহার করিয়া ফরাসী গভর্মেণ্টের দাওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট কর্ম্মের উমেদারী করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত চৌধুরী মহাশয়ের পরিচয় ছিল; মহারাজ সময় সময় আবশ্যকমতে তাঁহার নিকট ঋণগ্রহণ করিতেন—সেই সূত্রে উভয়ের মধ্যে বাধ্যবাধকতাও ছিল। ভারতচন্দ্রের বিদ্যা, বুদ্ধি ও কবিত্বশক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া চৌধুরী মহাশয় তাঁহার প্রতি

(১৭) "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" লেখক মহাশয়ের উদ্ধৃত ছন্দোবিবরে বিকৃত পাঠ আমরা কোথাও দেখি নাই।—লেখক।

কৃপাপরবশ হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে স্বীয় সভাকবি নিযুক্ত করিলেন। এত দিনে ভারতচন্দ্রের প্রতিভাপন্ন-বিকাশের অন্তরায় জলদজাল অপসৃত হইল; তিনি ভারতী ভরসা করিয়া যশ-অর্জ্জনের সুযোগ পাইলেন।

ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের কৃতজ্ঞতার ঋণ সুদ সহ পরিশোধ করিয়াছেন; তাঁহাকেও বঙ্গসাহিত্যের অক্ষয় স্বর্গে আসনদান করিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি-রূপে ভারতচন্দ্র "অন্নদামঙ্গল", "বিদ্যাসুন্দর" ও "মানসিংহ" রচনা করিলেন, এবং কৌশলে তিনখানি এক সূত্রে গ্রথিত করিলেন। প্রীত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে "গুণাকর" উপাধিতে ভূষিত করিলেন। ভারতচন্দ্র স্ত্রীপরিবারের কোনও তত্ত্ব লয়েন না দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে তাঁহার পরিবারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁহাকে আপনার সকল কথা জানাইয়া বলিলেন, গঙ্গাতীরে বাস করিবার সুযোগ পাইলে তিনি পরিবার লইয়া সংসারধর্ম্ম করেন। ইহা অবগত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয় কবিকে গঙ্গাতীরে স্বীয় অধিকারস্থ মূলাযোড় গ্রাম বার্ষিক ৬০০৲ টাকা রাজস্বে ইজারা দিলেন, এবং তাঁহার গৃহ-নির্ম্মাণের সাহায্য করিলেন।

সুদীর্ঘকাল নানারূপ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া ভারতচন্দ্র পারিবারিক জীবনের সুখ-স্বাদ লাভ করিবার অবকাশ পাইলেন।

এই সময় বর্দ্ধমানের মহারাজ তিলকচাঁদের মাতা বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে রাজধানী ত্যাগ করিয়া মূলাযোড়ের পার্শ্ববর্ত্তী কাউগাছী গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পাছে তাঁহার অশ্বগজাদি মূলাযোড়ের বৃক্ষাদি নষ্ট করে, এবং তিনি ব্রহ্মস্বহরণ-পাপে পতিত হয়েন, এই ভয়ে স্বীয় কর্ম্মচারী বামদেব নাগের নামে মূলাযোড় গ্রাম পত্তনী লইলেন। নাগের অত্যাচারে প্রজাগণ উত্যক্ত হইয়া উঠিল। ভারতচন্দ্র সেই উপলক্ষে নাগাষ্টক নামে পরিচিত অষ্টশ্লোক রচনা করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের সমীপে প্রেরণ করিলেন। এই শ্লোকসমষ্টি, করুণ ও হাস্য, এই দুই রসের ছায়ালোকে ক্রীড়াসধুর। পাঠ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র নাগের অত্যাচারনিবারণের উপায় করিলেন, এবং ভারতচন্দ্রকে মূলাযোড়ে ১৬ বিঘা ও আনারপুরের অন্তর্গত গুস্তে গ্রামে ১৫০ বিঘা ভূমি ব্রহ্মোত্তর-দান করিলেন।

ভারতচন্দ্র মূলাযোড় হইতে গুস্তেয় যাইয়া বাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু মূলাযোড়বাসীরা তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে যাইতে দিল না। ভারতচন্দ্র মূলাযোড়েই বাস করিতে লাগিলেন।

ভারতচন্দ্র মূলাযোড়েই স্বীয় পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কয় বৎসর পারিবারিক সুখ সম্ভোগ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয়কীর্ত্তিশালী ভারতচন্দ্র ৪৮ বৎসর বয়সে বহুমূত্ররোগে গঙ্গাতীরে তনুত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন, বহুমূত্র হইতে তাঁহার রোগ শেষে ভয়ক বা বিষমাগ্নিতে পরিণত হইয়াছিল।

কথিত আছে, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি-রূপে ভারতচন্দ্র রাজচিত্তবিনোদনার্থ বহু ক্ষুদ্র কবিতার রচনা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, "রসসাগরে"র মত সমস্যা-পূরণ ভিন্নও তিনি প্রত্যহ একটি করিয়া ক্ষুদ্র কবিতা রাজসভায় উপহার দিতেন। সে সকল এখন লুপ্ত। প্রতিভার পরিশ্রমের অবকাশরঞ্জনার্থ রচিত সেই সকল অকিঞ্চিৎকর কবিতা জলবুদ্বুদেরই মত ক্ষণস্থায়ী হয়। তাহার অনেক কবিতা আবার সাময়িক বিষয় লইয়া রচিত,—মুহূর্ত্তের হাস্য পরিহাসেই তাহার লয়। কাল সে সকল শুষ্কপত্রের মত উড়াইয়া বিস্মৃতির অন্ধকার অতলে লইয়া গিয়াছে।

সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পারস্য, তিন ভাষায় রচিত সেই সকল কবিতার মধ্যে, অবিলুপ্ত কয়েকটি কবিতা ছাড়িয়া দিলে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে আমরা কেবল নিম্নলিখিত কয়খানি পাইয়াছি—দুই প্রকার "সত্যপীরের কথা", "রসমঞ্জরী", অসমাপ্ত "চণ্ডী" নাটক, "চৌরপঞ্চাশতে"র বঙ্গানুবাদ, "অন্নদামঙ্গল", "বিদ্যাসুন্দর" ও "মানসিংহ"। "চণ্ডী" নাটক বাঙ্গালা, হিন্দী ও সংস্কৃত মিশ্রিত।

বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, এবং ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক কবিদিগের রচনার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, ভারতচন্দ্রের রচনা অধিক নহে। আমাদের মনে হয়, ইহাতেও তাঁহার বুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইংরাজী সাহিত্যে টেনিসনের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদল সকল বিষয়েরই আতিশয্য করিয়া গিয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় ভূখণ্ডের ইতিহাস ও উপকথা লইয়া তাঁহারা স্নেহ, প্রেম, করুণা, ভীতি, সকলেরই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন; মানব-চরিত্রের দেবত্ব ও দানবত্ব উভয়ই অত্যুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছিলেন; পুণ্য ও পাপ উভয়েরই আতিশয্য দেখাইয়াছিলেন। আতিশয্যের উৎপীড়নে পাঠক-সমাজ শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম সন্ধান করিতেছিলেন। টেনিসন তাঁহাদিগকে সেই শান্তি দিয়াছিলেন। টেনিসন স্বয়ং প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ যেরূপ অতিবিস্তৃতিদোষদুষ্ট রচনার প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সংক্ষিপ্ত না হইলে, তিনি পাঠকসমাজে আদর পাইবেন না। (১৭) তিনি তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অক্ষয় যশ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

(১৭) Tennyson—A Memoir.

অতিবিস্তৃতি ও পুনরুক্তি ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী কবিদিগের অনেকেরই রচনার সর্ব্বপ্রধান দোষ। যে স্থানে সংক্ষিপ্ত হইলে রস গাঢ় হইত, সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিত, সে স্থানে তাঁহারা রচনাকে অনাবশ্যক বিস্তৃত করিয়া ফেলাইয়া রসের প্রগাঢ়তা নষ্ট করিয়াছেন, সৌন্দর্য্য ম্লান করিয়াছেন। একটি মধুর ভাব, চিন্তা, বা কথা পাইলে তাঁহারা কখন অতিবিস্তৃতিতে, কখনও বা পুনরুক্তিতে তাহাকে তিক্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন। অধিক দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

রামের বনগমনের পর ভরত ও শত্রুঘ্ন যখন নাথবিরহিত অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন, তৎকালে কুব্জার প্রতি শত্রুঘ্নের ব্যবহার মূল রামায়ণে এইরূপ,—

লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন যখন রামবনগমনে দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন চন্দন-সারলিপ্তাঙ্গী, সর্ব্বাভরণভূষিতা কুব্জা রজ্জুবদ্ধা বানরীর ন্যায় গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। দৌবারিক তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে আকর্ষণ করিয়া শত্রুঘ্নকে বলিল,—

"যস্যাঃ কৃতে বনে রামো ন্যস্তদেহশ্চ বঃ-পিতা।
সেয়ং পাপা নৃশংসা চ তস্যাঃ কুরু যথামতি॥" (১৮)

অর্থাৎ, যাহার জন্য রাম বনবাসী হইয়াছেন, এবং আপনাদিগের পিতা মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই সেই পাপাচারিণী নৃশংসস্বভাবা কুব্জা, আপনি ইহার যেরূপ ব্যবস্থা হয় করুন।

কুব্জা ইহার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করুক,—

"এবমুক্ত্বা চ তেনাশু সখীজনসমাবৃতা।
গৃহীতা বলবৎ কুব্জা সা তদ্‌গৃহনাদয়ৎ॥"

ইহা বলিয়া শত্রুঘ্ন বলপূর্ব্বক সখীজনসমাবৃতা কুব্জাকে ধরিলেন। সে চীৎকার করিয়া গৃহ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

কুব্জার সখীরা ভীতা হইয়া কৌশল্যার আশ্রয় লইবার মন্ত্রণা করিতে লাগিল। এ দিকে—

"স চ রোষেণ সংবীতঃ শত্রুঘ্নঃ শত্রুনাশনঃ।
সঙ্কর্ষ ভরা কুব্জাং ক্রোশন্তীং পৃথিবীতলে॥"

তাহার ভূষণসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। শত্রুঘ্ন কুব্জাকে গ্রহণ করিয়া কৈকেয়ীকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ীও ভীতা হইয়া ভরতের আশ্রয় লইলেন। তখন ভরত বলিলেন, "অবধ্যাঃ সর্ব্বভূতানাং প্রমদাঃ ক্ষম্যতামিতি।" অর্থাৎ, রমণী প্রাণিমাত্রেরই অবধ্যা। ইহাকে ক্ষমা কর। তিনি আরও বলিলেন,

(১৮) অযোধ্যাকাণ্ড অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

নারীহত্যা করিলে রামচন্দ্র সম্ভাষণও করিবেন না, নহিলে তিনি পাপস্বভাবা জননীকে সংহার করিতেন। তখন

"ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণানুজঃ।
ন্যবর্ত্তত ততো দোষাৎ তাং মুমোচ চ মূর্চ্ছিতাম্॥"

ভরতের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন দোষ প্রযুক্ত উক্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন,—এবং সেই মূর্চ্ছিতাকে মুক্ত করিলেন।

ক্রোধাতিশয়ে শত্রুঘ্ন কুব্জাকে বলে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং ভরত মাতৃহত্যার কথাও মনে স্থান দিয়াছিলেন। কিন্তু কবি তখনই সে কর্ম্ম দোষাবহ বলিয়াছেন।

কৃত্তিবাসের "বাগায়ণ" মূল "রামায়ণের" অমৃতময়ী কথা সহজ ও সরল করিয়া বঙ্গের গৃহে গৃহে সুধারিতরণ করিয়াছে ও করিতেছে। তাহাতে দেখিতে পাই,—

"শত্রুঘ্ন কুপিত হয়ে ধরে তার চুলে। কুব্জী বলে কৈকেয়ী করহ পরিত্রাণ।
চুলে ধরি কুব্জীরে ফেলিল ভূমিতলে॥ ভরত শত্রুঘ্ন মম লইল পরাণ॥
হিচড়িয়া লয়ে যায় তাহারে ভূতলে। শত্রুঘ্ন প্রবেশে ক্রোধে কৈকয়ীর ঘর।
কুমারের চাক যেন ঘুরাইয়া ফেলে॥ চুলে ধরি কুব্জীরে সে আনিল সত্বর॥
মরি মরি ডাকে কুব্জী পরিত্রাহি ডাকে। চুল ধরি লয়ে যায় কুব্জে যায় ছুট।
চুল ছিঁড়ে গেল সে কৈকেয়ীঘরে ঢোকে॥ শত্রুঘ্নে দেখিয়া কৈকেয়ী দিল রড॥"

কৈকেয়ীর ভয়, "চেড়ীরে মারিয়া পাছে প্রহারে আমায়।". ক্রোধমত্ত শত্রুঘ্ন কৈকেয়ীকে বহুবিধ তিরস্কার করিয়া শেষে বলিলেন,—

"যদি তোমায় বধি প্রাণে দুঃখ নাহি ঘুচে।
মাতৃবধ করিয়া নরকে ডুবি পাছে
তোমার চেড়ীরে মারি তোমার সম্মুখে।
জ্বলিয়া পুড়িয়া যেন মর সেই শোকে॥"

সুতরাং চেড়ীর আবার দুর্গতি আরম্ভ হইল;—

"চুলে ধরি চেড়ীরে মাটীতে মুখ ঘসে।
দেখিয়া কৈকেয়ী দেবী কাঁপিছে তরাসে॥
বুকে হাটু দিয়া সে কুব্জীর ধরে গলা।
মুষলের বাড়ীতে ভাঙ্গিল পায়ের নলা॥
একে ত কুৎসিত কুব্জী তায় হৈল খোঁড়া।
সর্ব্ব গায়ে ছড় গেল যেন বস্ত বেড়া॥
অচেতন হৈল কুব্জী স্বাসমাত্র আছে।"

তখনও তাহার নিস্তার নাই। এমন সময় ভরত "সুবচন" বলিলেন, তিনি কেবল

"শ্রীরামের ডরে" মাতৃহত্যায় বিরত। "নারীহত্যা মহাপাপ"—সে পাপ করিলে পাছে শ্রীরাম বর্জ্জন করেন। তখন শত্রুঘ্ন নিরস্ত হইলেন। ইহাতে রামের প্রতি ভরত শত্রুঘ্নের যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশিত হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই ভক্তির আতিশয্য তাঁহাদিগের চরিত্র হইতে অসহায়া রমণীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচারজনিত পাপের কলঙ্ককালিমা অপসৃত করিতে পারিল না। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে রমণীর প্রতি যেরূপ অনাবিল শ্রদ্ধা উপদিষ্ট হইয়াছে, তেমন আর কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে হইয়াছে কি না সন্দেহ। সেই শ্রদ্ধার পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্মণে। তাই তিনি রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা সীতার অলঙ্কারদর্শনে বলিয়াছিলেন ;—

"নাহং জানামি কেয়ূরে নাহং জানামি কুণ্ডলে।
নূপুরে ত্বভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ॥" (২০)

অর্থাৎ, আমি কেয়ূর ও কুণ্ডল চিনি না। নিত্য তাঁহার পাদবন্দনা হেতু নূপুরই চিনি। সেই ক্ষত্রিয়কুমার লক্ষ্মণের তেজঃপুঞ্জ ক্ষত্রিয় ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্রে এই কলঙ্ক একান্তই অপ্রযোজ্য। কিন্তু ইহাতে বাঙ্গালীর আতিশয্যপ্রিয়তা পরিতৃপ্ত হয়। তাই বাঙ্গালীর চিরপ্রিয় কবি এই চিত্র অঙ্কিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে কৃত্তিবাসের "রামায়ণ", কাশীরামের "মহাভারত" যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তেমন আর কোন পুস্তক করে নাই। কাশীরামের কাব্য হইতে কয়টি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি ;—

ভীম পদ্মান্বেষণে গমন করিয়া সরোবরকূলে উপনীত হইলেন। সেই সরোবর অতি মনোহর উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত।—

"নানা পুষ্প বনে, মধুকরগণে
মধুপানে আনন্দিত॥
কোকিল কাকলি, গুঞ্জরিছে অলি,
বিবিধ পক্ষীর রব।
* * * *
সুবাসিত জলে কনকপঙ্কজে
মধু পান করে ভৃঙ্গ।
তথি লাখে লাখ হংস চক্রবাক
বিহরে রমণীসঙ্গ॥" (২১)

(২০) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

(২১) বনপর্ব্ব।

আবার শূরসেন বনে "ভীমার্জ্জুন অন্বেষণে নকুলের যাত্রা"য়—

"দেখি সরোবর হরিষ অন্তর
বিহরে কুভ বিহঙ্গ।
আরো নাথে নাথ হংস চক্রবাক
বিরাজে রমণীসঙ্গ॥" (২২)

ডিম্ব হইতে "আচম্বিতে" গরুড়ের জন্ম হইলে,—

"দেখিতে দেখিতে অঙ্গ লাগিল বাড়িতে।
প্রাতে হৈতে ক্রমে যেন সূর্য্যতেজ বাড়ে॥
বনে অগ্নি দিলে যেন দশ দিক জোড়ে॥" (২৩)

আবার সাগরমন্থনে শেষ যখন "অত্যন্ত ঘর্ষণ" সহ্য করিতে অসমর্থ হইল, তখন তাহার সহস্র মুখপথে গরল বহিতে লাগিল,—

'সিন্ধুর ঘর্ষণ অগ্নি সর্পের গরল।
দেবের নিশ্বাস অগ্নি মন্দার অনল॥
চারি অগ্নি মিশ্রিত হইয়া এক হৈল।
সিন্ধু হৈতে আচম্বিতে বাহির হইল॥
প্রাতঃকাল হৈতে যেন সূর্য্যতেজ বাড়ে।
দাবানল বাড়ে যেন শুষ্ক বন পোড়ে॥" (২৪)

"অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমিবে আমার" এই উক্তি বহু জনের মুখে বহুবারই উক্ত হইয়াছে। যখনই কোন বীর বাণবর্ষণ করেন, তখনই "বরিষা কালেতে যেন বর্ষে জলধরে।" দুই দলে কোলাহল "প্রলয়ের কালে যেন উথলে অর্ণব।" দুই জন বীরের যুদ্ধ হইলেই "পূর্ব্বে যুদ্ধ হৈল যেন রাবণ শ্রীরাম।"

প্রাতমিত্রপারিষদাদিবেষ্টিত রাজসভায় সিংহাসনোপবিষ্ট দুষ্মন্ত যখন তপোবন-পালিতা সরলা শকুন্তলাকে পত্নী বলিয়া চিনিতে পারিলেন না, তখন লজ্জাম্রিয়মাণা, ক্রোধকম্পিতা, অভিমানস্ফুরিতাধরা উপেক্ষিতা বলিতে লাগিলেন,—

"পূর্ব্ব মুনিগণ উক্তি শুন নরবরে। সর্ব্বদা দুঃখিত সেই সর্ব্বদা উদাস॥
প্রতিমূর্ত্তি হৈয়া পুত্র জন্মায়ে উদরে॥ ভার্য্যাবন্ধুলোক ইহলোকে বঞ্চে সুখে।
তে কারণে ভার্য্যারে জননীসমা দেখি। নরকে সংহতি হৈয়া তারে পরলোকে॥
সহ দোষ কৈলে ভার্য্যা পণ্ডিতে উপেখি। স্বামীর শ্রীমন্তে ভার্য্যা আগে যদি মরে।
অর্দ্ধেক শরীর ভার্য্যা সর্ব্ব শাস্ত্রে লেখে। পথ চাহি থাকে ভার্য্যা স্বামী অনুসারে॥

(২২) বনপর্ব্ব।
(২৩) আদিপর্ব্ব।
(২৪) আদিপর্ব্ব।

ভার্য্যা সম বন্ধু রাজা নাহি মর্ত্ত্যলোকে ॥ মরিলে স্বামীরে উদ্ধারিয়া লয় স্বর্গে।
পবন সহায় সতী পতিব্রতা নারী। হেন নীতিশাস্ত্রে আছে কহে মুনিবর্গে ॥
যাহার সহায়ে রাজা সর্ব্ব ধর্ম্ম করি ॥ ভার্য্যা হৈতে নরপতি দেখে পুত্রমুখ।
ভার্য্যা বিনা গৃহ শূন্য অরণ্যের প্রায়। যে পুত্র হইতে লোক ভুঞ্জে স্বর্গসুখ ॥
বনে ভার্য্যা সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বলায়। ভার্য্যা বিনা কবে পুত্র কাহার শকতি।
ভার্য্যাহীন লোকে কেহ না করে বিশ্বাস। দেব ঋষি মুনি আদি যত মহামতি।"

এত ক্ষণে যদি বা ভার্য্যার মহিমাকীর্ত্তন শেষ হইল, তবে সঙ্গে সঙ্গে আবার পুত্রের গুণকীর্ত্তন আরব্ধ হইল ;—

"পুত্রের সমান রাজা নাহিক সংসারে। অধ্যয়নে গুরু শ্রেষ্ঠ পুত্র আলিঙ্গনে ॥
জন্মমাত্র মুখ দেখি পিতামাতা তরে ॥ ধূলায় ধূসর পুত্রে করি আলিঙ্গন।
পিণ্ডদানে পুত্র তার করয়ে উদ্ধার। হৃদয়ের সর্ব্ব দুঃখ হয় ত খণ্ডন ॥
হেন রীতি আছে রাজা বেদের প্রভাব ॥ হেন পুত্র দাঁড়াইবা তোমার সম্মুখে।
চতুষ্পদে গাভী শ্রেষ্ঠ দ্বিপদে ব্রাহ্মণে। আলিঙ্গন কর রাজা পরম কৌতুকে ॥ (২৫)

তাহার পর আবার পুত্রের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সম্ভাবিত কীর্ত্তির পরিচয় আরব্ধ হইল। দুষ্মন্ত স্থির হইয়া সকল কথা শুনিলেন। এই ধৈর্য্যগুণে কি তাঁহার পত্নীপ্রত্যাখ্যানপাপের অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত হইল না ?—

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে—শ্রীকৃষ্ণ—

"আকাশমার্গেতে রৈয়া বিবিধ বসন লৈয়া
দ্রৌপদীরে সদনে যোগায়।
যত দুঃশাসন কাড়ে তত্তেক বসন বাড়ে
আচ্ছাদন করি সর্ব্বগায় ॥
লোহিত পিঙ্গল পীত নীল শ্বেত বিচিত্র
নানা চিত্র বিচিত্র বসনে।
বিবিধ বর্ণের শালী দুঃশাসন ফেলে ফাড়ি
পুঞ্জ পুঞ্জ হৈল স্থানে স্থানে ॥
পর্ব্বতপ্রমাণ বাস দেখি লোকে লাগে ত্রাস
চমৎকার হইল সভাতে।" (২৬)

মূলে আছে—

"ততস্তু ধর্ম্মোহন্তরিতো মহাত্মা সমাবৃণোদ্বিবিধৈঃ বস্ত্রকূটৈঃ।
আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যাস্তু বিশাম্পতে।
তত্রোপমেয়ং বস্ত্রং প্রাদুরাসীদনেকশঃ ॥

(২৫) আদিপর্ব্ব।
(২৬) সভাপর্ব্ব।

নানারাগবিরাগাণি বসনান্যব বৈ প্রভো।
প্রাদুর্ভবন্তি শতশো ধর্ম্ম না পরিপালনাৎ ॥"

অর্থাৎ, মহাত্মা ধর্ম্ম অন্তরিত থাকিয়া বিবিধ সুবস্ত্রে তাঁহাকে সমাবৃত করিলেন। মহারাজ দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিলে তদ্রূপ অনেক বস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইল। হে প্রভো, ধর্ম্মের প্রতিপালন হেতু নানারাগরঞ্জিত শত শত বসন প্রাদুর্ভূত হইয়া।

কাযেই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কাশীরামের অত্যুক্তি মূলানুসরণের ফল, এমন কথা বলিবারও অবকাশ নাই।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী হইতে কয়টি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি।—শিববিবাহে নাগবাদিগের ববদর্শনে গমন ও নারীগণের পতিনিন্দা, এবং খুল্লনার বিবাহে বর-দর্শনে রামাগণের বিভ্রম ও রামাগণের পতিনিন্দা, একই রূপ। ধনপতির ও শ্রীমন্তের বিনিময়দ্রব্যের তালিকা পাঠককে চার বার পাঠ করিতে হইয়াছে। শ্রীমন্তের পিতার বিবাহবর্ণনায় ও শ্রীমন্তের বিবাহবর্ণনায় প্রভেদ অকিঞ্চিৎকর। শ্রীমন্ত যখন পিতার অন্বেষণে সিংহলযাত্রা করিলেন, তখন তিনি পিতার গমনপথেই গমন করিলেন। পিতাপুত্রের সিংহলের প্রথম অভিজ্ঞতাও একই রূপ। কবিও পূর্ব্ববর্ণনার পুনরাবৃত্তি করিয়া আপনার শ্রমলাঘব করিয়াছেন। কিন্তু নিরপরাধ পাঠকের শ্রমবিষয়ে তিনি উদাসীন। সপত্নীর আদরে ব্যথিতহৃদয়া লহনা কেবলই বলেন,—

"উহারি হাতে রাজা শাঁখা অই বরণে গোরী।
অই কি জানে ছলনা মোহন চাতুরী।
অব্যাজে দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ।"

তাঁহার ভর্ত্তা দৃঢ় হইলে "উহার নাকে দিত পদ।" চণ্ডী যখন কালকেতুর ভবনে আগমন করিলেন, তখন তাঁহার কাঁচুলি-বর্ণনায় কবি ৭২ ছত্রে দশাবতারলিখন করিয়াও নিরস্ত হয়েন নাই, আরও ৬২ ছত্রে অন্যান্য বিবিধ লিখন সম্পন্ন করিয়াছেন। বিবিধ লিখনের মধ্যে মুনি হইতে শুশুক পর্য্যন্ত সকলেরই স্থান আছে।

ঘনরাম তাঁহার শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে অম্বিকার কাঁচুলি-বর্ণনায় মুকুন্দরামকে নিষ্প্রভ করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন। "হৈমকান্তি কৃষ্ণলীলা কাঁচুলি লিখন।" কবি ৩৬ শ্লোকে কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতে জলপিপি, ফিঙ্গা, ফানি, চাঁস, বাঁশ-পাতা, এমন কি, বৃক্ষশাখায় সবৎস দোহনক্রীড়া-পর্য্যন্ত বানর, সবই বর্ত্তমান। অধিকন্তু আমরা অবগত হই যে, "ডাহুক ডাহুকী নাচে ডিম্বে দিয়া তা।" (২৭)

(২৭) আখড়া পালা।

ভক্তবৎসল দেবতা তপ্ত হৈলে সুধন্নাকে অনলে ও প্রহ্লাদকে শৈলে ও জৌগৃহে পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তেমন কর্ম্ম তিনি আর কখনও করেন নাই। কারণ, তাঁহার মুখে ও তাঁহার ভক্তের মুখে "শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে" এই সব কীর্ত্তিকথা আমাদিগকে ছয়বার শুনিতে হইয়াছে।

"সংসারে সবার বটে ঐ নায়েতে ভরা" কথাটি ভাল হইতে পারে, কিন্তু ইহার একই গ্রন্থমধ্যে পুনরুক্ত হইবার বিশেষ যোগ্যতা কোথায়?

"দবায় তরল"—ইহাতে ভাবপ্রকাশপ্রণালীটি মৌলিক ও মনোরম হইতে পারে। "তরাসে তরল" উক্তিতে অনুপ্রাসের অনুরোধ অলঙ্ঘনীয় হইতে পারে; কিন্তু ইহাতেও কবি নিরস্ত হয়েন নাই। তিনি "ভাবিয়া তরল" পর্য্যন্ত লিখিয়া তবে ক্ষান্ত হইয়াছেন।

ব্যাঘ্রের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও "দেখিল সংসারচিত্র ফলার উপর।" (২৮)

ময়না সহরে "নিদাটী"র ফলবর্ণনা এত বিস্তৃত যে, পাঠ করিতে করিতে পাঠকেও সে ফল অনুভব করিতে হয়। (২৯)

কাশীরাম দাস বলিয়াছেন, "নখচ্ছেদে কি কাজ কুঠারপরিগ্রহ।" (৩০) ঘনরাম সেই কথাই গ্রন্থমধ্যে একাধিকবার বলিয়াছেন,—

"নফরের সাধ্য কেন ঠাকুরের ভাব।
নখে কাটা যায় যাহা কি কাজ কুঠার॥"

ভারতচন্দ্রের রচনা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সরস; সম্পূর্ণ, অথচ স্বল্প। ইহা ভারতচন্দ্রের রচনার এক প্রধান গুণ, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ, এই গুণ তাঁহার সমসাময়িক ও পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের রচনায় বিরল।

কোন শ্রদ্ধেয় সমালোচক ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন,—"এই গ্রন্থগুণে ভারতচন্দ্র প্রাচীন বঙ্গকবিসমাজে যেরূপ উন্নত আসন গ্রহণ করিয়াছেন, সেই আসন তিনি কবিকঙ্কণসম্মুখে পাইবার যোগ্য কি না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সন্দিহান।" (৩১) কোন কবির রচনা সম্বন্ধে মতান্তর বিস্ময়কর নহে। কিন্তু আমার স্মরণ হইতেছে, কোন সমালোচক এই দুই কবির রচনার সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, কবিকঙ্কণের রচনা স্রোতস্বতীর সহিত ও ভারতচন্দ্রের রচনা

(২৮) কামিদল বধ পালা।
(২৯) জাগরণ পালা।
(৩০) বনপর্ব্ব।
(৩১) গঙ্গাচরণ সরকার—বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা।

সরসীর সহিত তুলনীয়। তিনি মনে করেন নাই যে, যে কাব্যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বিনষ্টিত নহে, তাহার প্রথম ও প্রধান কার্য্য সৌন্দর্য্যসঞ্চারে চিত্তরঞ্জন। সে কার্য্য কাননকন্দরাদিনিঝরবাহিনী বক্রধারায় প্রবাহিতা স্রোতস্বতীর অপেক্ষা উপবনপ্রহ্লাদিনী সরসীর দ্বারাই সহজে সম্পন্ন হয়। বিশেষ কবিকঙ্কণের কাব্য উপন্যাস হইলেও, বঙ্গদেশের সমতল ভূমিতে প্রবাহিতা সাগরসান্নিধ্যে মন্দবেগবতী নদীর দশাগ্রস্ত। সে নদীগর্ভে নক্রাদির অভাব নাই; আবার সেই জলমধ্যে শৈবাল জন্মিয়াছে, শৈবালমূলে পঙ্ক সঞ্চিত হইতেছে। ভারতচন্দ্রের রচনা অজস্র বিকচকুসুমশোভাময় ভ্রমরগুঞ্জনমুখরিত উপবনের মধ্যভাগে অবস্থিতা সরসীরই মত। সেই সরসীর স্ফটিকবারিবক্ষে প্রমোদ-তরণী বসন্তবায়ুবিকম্পিতাংশা হাস্যপরিহাসস্মিতাননা শুদ্ধান্তশোভিনীদিগকে অঙ্কে লইয়া রাজহংসীর মত ভাসিয়া যায়। বায়ুহিল্লোলে তরুশাখাসীনে বিহগের কলগান তাঁহাদিগের শ্রবণে অমৃতবর্ষণ করে। তীরের সুমনসম্ভবন দর্শনে তাঁহাদিগের দীপ্ত কৃষ্ণতার নয়নে আনন্দালোক বিকশিত হইয়া উঠে। যক্ষের উত্তানমধ্যস্থ সরসীর মত সে সরসীর সোপানমার্গ মরকতশিলাবদ্ধ। তাহার স্বচ্ছ-সলিলে স্নিগ্ধবৈদূর্য্যনালসমন্বিত বিকশিত কনককমল শোভমান। সেই কমলশোভিত সলিলে ক্রীড়াশীল হংসদল মানসসরসেও যাইতে ইচ্ছুক নহে। আবার সেই সরোবরতীরে ইন্দ্রনীলরচিত-শিখর, কনককদলীশোভিত ক্রীড়াশৈল বিদ্যমান। সেই ক্রীড়াশৈলে কুরুবকপরিবৃত মাধবীমণ্ডপের সন্নিধানে চলদলস রক্তাশোক ও কেশরতরু দণ্ডায়মান। বৃক্ষদ্বয়মধ্যে স্ফটিকপীঠসম্প্রথ মণিময়ী বেদিকায় বদ্ধমূল অনতিপ্রৌঢ়বংশপ্রায় কাঞ্চনবাসদণ্ড,—তন্বী, শ্যামা, শিখরিদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, ক্ষীণমধ্যা, চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা, নিম্ননাভি, শ্রোণীভারালসগমনা, পীবরযৌবনভারাবনতা যক্ষনারীর রত্নরশিঞ্জনসহকৃত করতালবাদ্যে নৃত্য করিয়া ক্লান্তা দিবাবসানে সেই বাসযষ্টিতে আশ্রয় লয়। সে সৌন্দর্য্য অলকাতেই সম্ভব; সে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি কবির ক্ষমতাবলে আনীত সুরলোকের এক খণ্ড সমুজ্জ্বল সারাংশ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ফিরিঙ্গি বণিক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পুরাতন বাণিজ্যপথ।

In no year does India drain our Empire of less than fifty-five millions of *Sesterces* giving back her own wares in exchange, which are sold at one hundred times their prime cost.—Pliny.

জগদ্বিখ্যাত রোমক সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়কালেও তাহার সুপরিচিত ইতিহাস-লেখক মর্ম্মপীড়িত হইয়া লিখিয়া গিয়াছিলেন,—অগ্নিমূল্যে ভারতবর্ষের শিল্পদ্রব্য ক্রয় করিয়া, রোমক সাম্রাজ্য প্রতি বর্ষেই ভারতবর্ষকে অকাতরে অর্থদান করিতে বাধ্য হইয়া থাকে! সে দিনের কথা এখন স্বপ্নের ন্যায় অলীক বলিয়াই মনে হয়।

তথাপি তাহা স্বপ্ন নহে;—ঐতিহাসিক সত্য। কোন্ পুরাকালে ভারতবর্ষ এইরূপে শিল্পদ্রব্য-বিনিময়ে বিবিধ দূরদেশ হইতে অর্থলাভ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। এত পুরাতন কাহিনী কোন দেশেই লিপিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তখন প্রাচ্যের ভুবনার অধিকাংশ প্রতীচ্য জনপদ নিরক্ষর বর্ব্বর জাতির আবাসভূমি বলিয়াই পরিচিত ছিল। ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যে তাহার নাম "ম্লেচ্ছদেশ"। সে দেশের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ভারতীয় সাহিত্যের কোনরূপ প্রয়োজন বা আগ্রহের কারণ বর্ত্তমান ছিল না। এখন ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ফলে সেই প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। যে দেশ গ্রহণ করিত, সেই দেশ এখন মুক্তহস্তে দান করিতেছে। যাহারা পীতার্ত্ত পশুচর্ম্মাবৃত অসভ্যদেহে যথা-বিন্যস্ত পট্টবস্ত্র সংযুক্ত করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিত, তাহারাই এখন নগ্নদেহে বিদেশের নিকট বস্ত্রভিক্ষা করিয়া কোনরূপে লজ্জারক্ষা করিতেছে!—কিরূপে কত দিনে এই অচিন্তিতপূর্ব্ব ভাগ্যবিপর্য্যয় সংঘটিত হইল, তাহার ইতিহাস অধ্যয়ন করিবার জন্য কাহার না কৌতূহল উপস্থিত হয়?

সে ইতিহাস সর্ব্বথা শোচনীয় হইলেও, সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ। তাহার উপকরণ নিতান্ত অপ্রচুর। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের অনুসন্ধানকৌশলে ক্রমশঃ নানা বিলুপ্ত-তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে; ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের সহিত ম্লেচ্ছদেশের পুরাতন বাণিজ্য-সংস্রবের পরিচয় প্রকাশিত করিয়া, সভ্যসমাজকে বিস্মিত করিয়া

তুলিতেছেন। দিন দিন যে সকল পুরাতত্ত্ব সংকলিত হইতেছে, তাহার গতি কেবল এক দিকেই প্রবাহিত। এ কালে যেমন প্রতীচ্য জনপদ হইতে শিক্ষা-দীক্ষা-শিল্প-বাণিজ্য অবিচ্ছিন্ন প্রবল প্রবাহে নিয়ত প্রাচ্য জনপদের দিকেই অকুতোভয়ে প্রধাবিত হইতেছে, সেকালে ইহার বিপরীত অবস্থা বর্ত্তমান ছিল। যে সকল প্রাচ্য জনপদ হইতে শিক্ষা-দীক্ষা-শিল্প-বাণিজ্য নিরন্তর প্রতীচ্য জনপদে প্রধাবিত হইয়া, সভ্যতা-বিস্তারে প্রতীচ্য মানবসমাজের সমুন্নতিসাধনের সহায়তা করিয়াছিল, তন্মধ্যে ভারতবর্ষের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লিখিত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের সূক্ষ্ম-শিল্প ভারতবর্ষের নাম জগদ্বিখ্যাত করিলেও, তাহার কথা সুদূর পাশ্চাত্য-দেশে সকলের নিকট সুপরিচিত হইতে পারে নাই। যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান যত সীমানিবদ্ধ, সেই বিষয়ে কল্পনার প্রাবল্য তত অধিক হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল। অধিকাংশ পাশ্চাত্যদেশে ভারতবর্ষ অলৌকিক রত্নভূমি বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। কি এসিয়া, কি ইউরোপ, যে কোনও মহাদেশের সমৃদ্ধ জনপদ পুরাকালে পাশ্চাত্য-সমাজে সুপরিচিত ছিল, সকল জনপদই ভারতবর্ষের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়াই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। যাহার স্পর্শমাত্র লৌহপিণ্ড সুবর্ণময় হইত, তাহা যে কত বহুমূল্য, তাহার ইয়ত্তা কি? এইরূপে সভ্যতা-বিকাশের প্রথম প্রভাত হইতেই পাশ্চাত্য মানবসমাজে ভারতবর্ষের অলৌকিক ঐশ্বর্য্যের কথায় আস্থাস্থাপন করিয়া, কল্পনাবলে তাহাকে কল্পবৃক্ষ বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করিয়াছিল।

পুরাতন পৃথিবীতে ভারতবর্ষ, কল্পবৃক্ষের মতই বিবিধ কাম্যফল বিতরণ করিয়া, পাশ্চাত্য জনসাধারণের অন্ধবিশ্বাস অটল করিয়া তুলিয়াছিল। এই বিশ্বাস এখনও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কল্পবৃক্ষ ক্রমে ক্রমে ফল-ফুলশূন্য-পাখীপত্রহীন নীরস কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে; তথাপি পাশ্চাত্য-সমাজের বদ্ধমূল পূর্ব্বসংস্কার সমূলে উৎপাটিত হয় নাই। "কোম্পানী বাহাদুরে"র জন্মদিনে এই বিশ্বাস সমধিক প্রবল ছিল। কিরূপে "কোম্পানী বাহাদুর" এ দেশের পুরাতন সুখসৌভাগ্যের বিপর্য্যয় সংঘটিত করিবার শক্তিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে, ভারতবর্ষের পুরাতন বাণিজ্য-কাহিনীর আলোচনা আবশ্যক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের পুরাতত্ত্ব-সংকলনের অসীম অধ্যবসায়ে এ বিষয়ের নানা ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জনসমাজের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকিয়া জলে স্থলে নানা পথে বাণিজ্য-বিস্তারে অগ্রসর হইয়াছিল। পূর্ব্বাঞ্চলে কোন্ পথে কত দূর

পর্য্যন্ত ভারত-বাণিজ্য বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, তাহার সহিত বর্ত্তমান আলোচনার সংস্রব নাই। পশ্চিমাঞ্চলে কোন্ পথে কত দূর পর্য্যন্ত ভারত-বাণিজ্যে বিস্তৃতি-লাভ করিয়াছিল, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র, ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। তাহার অধিকাংশ কেবল উত্তালতরঙ্গ-তাড়িত সমুদ্রবেলা। যে অল্পাংশে স্থলভাগের সহিত সংস্রব, তাহাও নদ, নদী, পর্ব্বত ও মরুভূমির আধিক্যবশতঃ দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া রহিয়াছে। জলপথ ভিন্ন স্থলপথে ভারত-বাণিজ্য পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তৃত হইবার পক্ষে বিঘ্নবাধার অভাব না থাকিলেও, স্থলপথই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বাণিজ্য-পথ বলিয়া প্রতিভাত হয়। (১) সে পথে ইচ্ছামত বহু পণ্যদ্রব্য বহন করা সবিশেষ আয়াসসাধ্য বলিয়া ক্রমে জলপথে বাণিজ্যবিস্তারের চেষ্টা হইয়া থাকিবে। এক্ষণে পূর্ব্বকথা বিলুপ্ত ও তাহার রহস্যভেদ করিবার উপায় তিরোহিত হইয়াছে। যত দিনের কথা অবগত হইবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে অতি পুরাকাল হইতে জল স্থল উভয় পথেই ভারতবাণিজ্য প্রবাহিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাশ্চাত্য ইতিহাসলেখকগণ এই সকল পুরাতন বাণিজ্য-পথের নানারূপ নামকরণ করিতেছেন। পুরাতন সাহিত্যে এই সকল নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বুঝিবার ও বুঝাইবার সুবিধার জন্যই এইরূপ নামকরণ আবশ্যক হইয়াছে।

স্থল-বাণিজ্য-পথের আরম্ভ সিন্ধুতীরে। তথা হইতে গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া এই পথ বহির্ভাগে বিভক্ত হইয়া, ক্রমে পশ্চিমাঞ্চলে অগ্রসর হইবার জন্য কাস্পীয় হ্রদের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় তটেই প্রধাবিত হইত। কাস্পীয় হ্রদের উত্তর তটের বাণিজ্যপথ ভল্গানদী ও কাস্পীয় হ্রদের সঙ্গমস্থলে জলপথে পরিণত হইত। কাস্পীয় হ্রদের দক্ষিণতটে বাণিজ্যপথের এক শাখা কৃষ্ণসাগরতটে উপনীত হইয়া জলপথের সহিত মিলিত হইত;—অপর শাখা স্থলপথে দক্ষিণাবর্ত্তে পুরাতন কাস্পীয় রাজ্যে উপনীত হইয়া তথা হইতে ভূমধ্যসাগরতটে ক্ষণকাল বিশ্রামলাভ করিয়া, পুনরায় দক্ষিণাবর্ত্তে মিশর দেশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইত। এই সর্ব্বপ্রাচীন স্থল-বাণিজ্যপথের "কাস্পীয় পথ" নামকরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার প্রধান লক্ষ্য ভূমধ্যসাগর বলিয়া, ইহাকে "ভূমধ্যসাগর-পথ" বলিলেই সুসঙ্গত হয়। এই পথে

(১) The most ancient of the three routes was the middle one through Syria.—Hunter's History of British India. জলপথই যে সর্ব্বপুরাতন বাণিজ্যপথ, তাহার কোনও প্রমাণ উল্লিখিত হয় নাই বলিয়া এই সিদ্ধান্তে আস্থাস্থাপন করিতে সাহস হয় না। স্থলপথই স্বাভাবিক সুপরিচিত পুরাতন বাণিজ্যপথ।

ভারতবর্ষের বাণিজ্যদ্রব্য কেবল কাস্পীয় হ্রদ, কৃষ্ণসাগর, বা ভূমধ্যসাগরতীরে প্রবাহিত হইয়াই নিরস্ত হইত না; তথা হইতে আধুনিক ইউরোপের সকল দেশেই নানা পথে প্রবাহিত হইয়া, পশ্চিম এসিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও সমগ্র ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষের অনিচ্ছিন্ন বাণিজ্যসূত্র বন্ধন করিয়া দিত। ভারতবর্ষ যে এই পুরাতন বাণিজ্য-পথে কত দেশের মনোহরণ করিয়া সমৃদ্ধিলাভ করিত, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। অন্যান্য দেশের উদ্যমশীল বণিক সম্প্রদায় ভারতীয় বণিকদিগের নিকট হইতে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া, তাহা জলে স্থলে বিবিধ পথে বিবিধ দেশে বিক্রয় করিয়া ধনশালী হইত।

স্থল-বাণিজ্য-পথ অতি পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষের নিকট সুপরিচিত ও সুনিশ্চিত হইলেও, এই পথে পণ্যদ্রব্য বহন করিবার অসুবিধার অবধি ছিল না। কখন সঙ্কটে, কখন নৌকায়, কখন অশ্ব বা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, কখন নিবিড় অরণ্যে, কখন দুর্লঙ্ঘ্য গিরিসঙ্কটে, কখন বা উত্তপ্ত মরুমরীচিকায় পরিশ্রান্ত হইয়া, বণিকেরা অতি অল্প দ্রব্যই স্থলপথে বহন করিতে পারিতেন। তাহাও আবার দস্যুতস্করের আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ভয়ে অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হইত না। জলপথ নিয়ত তরঙ্গসঙ্কুল, অপরিচিত ও অনিশ্চিত। কখন সুধীর সমীরণ, কখন বা প্রবল প্রভঞ্জন তাহাকে নিরতিশয় অব্যবস্থিতচিত্ত মহাদৈত্যের মত পরাক্রমশালী করিয়া রাখিয়াছে। তথাপি নৌবিদ্যাবিশারদ নাবিকগণের চালনকৌশলে স্থলপথ অপেক্ষা জলপথই শ্রমাধিক লাভের পথ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। এই পথ ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল হইতে পারস্য, আরব ও মিশর দেশের বিবিধ "বন্দর" পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। ইহার দুই শাখাই ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এক শাখা পারস্যোপসাগরে, অপর শাখা লোহিতসাগরে প্রধাবিত হইত। পারস্যোপসাগরের শাখা কালদীয়-রাজ্যে উপনীত হইয়া, স্থলপথের সহিত মিলিত হইত; লোহিতসাগরের শাখা মিশর-রাজ্যে উপনীত হইয়া, স্থলপথের সহিত মিলিত হইত। এই দুই জল-বাণিজ্যপথ যথাক্রমে "কালদীয় পথ" ও "মিশরীয় পথ" নামে অভিহিত হইতে পারে। স্থলপথের ন্যায় জলপথেও অন্যান্য দেশের নাবিকবর্গ ভারতীয় বাণিজ্যভাণ্ডার বহন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত। জল স্থল উভয় পথেরই এক লক্ষ্য,—প্রাচ্য রাজ্যের পণ্যবিনিময়ে প্রতীচ্য রাজ্যের ধনাহরণ। এই লক্ষ্য দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের সৌভাগ্যবর্দ্ধন করিয়া, ভারতবর্ষের নাম জগদ্বিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছিল।

সুদূর পাশ্চাত্য জনপদে ভারতীয় শিল্পদ্রব্য সকল সময়ে ভারতবর্ষের নামে

পরিচিত হইত না; যে দেশ বা বন্দর হইতে তাহা আনীত হইত, তাহার নামেই পরিচিত হইত। এক্ষণে যে রক্তবস্ত্র "টর্কি রেড" নামে পরিচিত, এক সময়ে তাহা "এড্রিনোপোলিস্ রেড" নামে পরিচিত ছিল; অথচ তাহা ভারতবর্ষে সুরঞ্জিত হইয়াই পাশ্চাত্য জনপদে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত! অনেক প্রতীচ্য রাজ্যের পুরাতন সাহিত্যে ভারতবর্ষের নাম উল্লেখিত না থাকিবার প্রকৃত কারণ কি, এই একটি-মাত্র দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়, হোমরের অমর কাব্যে ভারতবর্ষের নাম উল্লিখিত না থাকায়, অনেক পাশ্চাত্য লেখক হোমরের তিরোধানের পর ভারতবাণিজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল,এই মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি সকলেই এই মত ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। (২) ভারতীয় শিল্প-দ্রব্যই যে প্রতীচ্য জনপদকে সভ্যজনোচিত বিবিধ ভোগ্যবস্তুর সন্ধান প্রদান করিয়া ক্রমে ক্রমে নিরতিশয় ভোগাভিলাষী করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার নানা প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যে সকল বাণিজ্যপথে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাঞ্চলে বাহিত হইত, তাহার উভয় পার্শ্বেই বিবিধ সম্পন্ন জনপদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ভারতীয় পণ্য-দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিয়া সৌভাগ্যশালী হইয়া-ছিল। এইরূপে কাল্দীয় রাজ্যের অভ্যুদয়; এইরূপে ব্যাবিলনের সৌভাগ্যগর্ব্ব; এইরূপে ফিনিসীয় বণিকবর্গের অসাধারণ বাণিজ্যোন্নতি; এইরূপেই মিশর, গ্রীস, রোম প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রতীচ্য পুরাতন সাম্রাজ্যের অলৌকিক ঐশ্বর্য্যবিকাশ। প্রাচীন মিশর যে মৃতদেহসংরক্ষণকৌশলের জন্য জগদ্বিখ্যাত, তাহার উপকরণ ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত। প্রাচীন ইহুদীর নরপতি সলমন যে অলৌকিক ঐশ্বর্য্য-বিজ্ঞাপক রত্নালঙ্কারের জন্য ইতিহাসে সুপরিচিত, তাহা ভারতবর্ষ হইতেই অগ্নি-মূল্যে ক্রীত।—এ সকল কথা এখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। ভারতবর্ষের পুরাতন বাণিজ্যপথ অধিকার করিবার আশায় নিরন্তর এত সমরকোলাহলে এসিয়ার পশ্চিম প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইত! এই বাণিজ্যপথ যখন যে জাতির অধিকারভুক্ত হইয়াছে, তখনই সেই জাতি শুল্কসঞ্চয় করিয়া, পণ্যদ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ে অর্থসঞ্চয় করিয়া, অল্পদিনের মধ্যেই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই বাণিজ্যপথ যখন যে জাতির অধিকার-বিচ্যুত হইয়াছে, তখনই

(২) Homer does not mention the name of India but he was acquainted with the art-wares of Sidon, a Mediterranian out port of the eastern trade. —Hunter's History of British India. vol. I. P. 19.

সেই জাতি দেখিতে দেখিতে বায়ুতাড়িত ধূলিপটলের ন্যায় সৌভাগ্যবেলা হইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে! তাহাদের পুরাতন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি কত স্থানে নীরবে এই পুরাকাহিনীর অতীতসাক্ষিরূপে দণ্ডায়মান আছে। এই সকল কারণে ভারতীয় বাণিজ্যপথ করতলগত করিবার প্রবল প্রয়াস সকল জাতির মধ্যেই অল্প বিকমাত্রায় লক্ষিত হইয়াছে। এই পথ কখন কাল্দীয় রাজ্যের অধিকারে, কখন ইহুদীয় জাতির অধিকারে, কখন বা পারস্য, গ্রীস ও রোমের অধিকারে আনীত হইয়াছে। সেকালে এই সকল পুরাতন জাতি ভারতবর্ষের শিল্পদ্রব্যের ন্যায় বহুমূল্য দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা করে নাই; তাহারা কেবল ভারতবর্ষের নিকট ক্রয় করিয়া অন্যত্র বিক্রয় ও তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্যই পুরাতন বাণিজ্যপথ অধিকার করিবার আশায় শত সমরক্ষেত্রে বীরশোণিতে বসুন্ধরা কবিরাক্ত করিয়াছে! পাশ্চাত্য জাতির এই সকল অন্তর্বিপ্লব ভারতীয় স্থল-বাণিজ্যের অপকারসাধন করে নাই; বরং বিবিধ জাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি সাধিত হইয়া, ভারতবর্ষের অর্থাগমের পথ উত্তরোত্তর প্রশস্ত হইয়াছে।

স্থলপথের ন্যায় জলপথেও নানা প্রতিদ্বন্দ্বী কলহ-কোলাহলে লিপ্ত হইত। তাহারা কেবল বহন করিবার, কেবল ক্রয়বিক্রয়ের "দালাল" হইবার, কেবল ভারতবর্ষের পণ্যদ্রব্য বিদেশে বিস্তার করিবার অধিকারলাভার্থই কলহ-কোলাহলে লিপ্ত হইত। ইহাতে মিশর ও আরব দেশের লোকে ক্রমে ক্রমে সাগরপথে নৌচালন-কৌশল আয়ত্ত করিয়া, শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ভূমধ্যসাগরতীরের ফিনিসীয় বণিক ভারতীয় পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিবার আশায়, অর্ণবপোত সুসজ্জিত করিয়া, বাণিজ্যপথগামী অশ্ব বা উষ্ট্রশ্রেণীর খরখুরোত্থিত ধূলিপটলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, দিনগণনা করিত। আরবীয় নাবিকগণ প্রথমে স্বদেশের উপকূল-ভাগে ভারতীয় অর্ণবপোতের সমাগমপ্রতীক্ষায় কালক্ষয় করিতে করিতে, অবশেষে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া, সর্ব্বাগ্রে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া, বিদেশে বিক্রয় করিবার অধিকার সংস্থাপিত করিয়াছিল।

তখন সমুদ্রযাত্রার প্রবল প্রভাব ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিল। তখনও অনুদার সংকীর্ণ শিক্ষা ভারতবাসীকে গৃহকোটরনিবদ্ধ পেচকের ন্যায় অলীক গার্হস্থ্যসম্ভোগকেই মানবজীবনের পরমপুরুষার্থ বলিয়া মনুষ্যত্বহীন দাস-জাতিতে পরিণত করিতে সমর্থ হয় নাই! তখন তাহারা যে পথে উত্তাল তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া দ্বীপোপদ্বীপে পদার্পণ করিয়াছে, সেই পথে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের

সহিত শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতার আদর্শ বহুদূরদেশে প্রধাবিত হইয়া, কত অজ্ঞাত মানবসমাজকে সমুন্নত করিয়াছে; স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে, কত অজ্ঞাত রাজ্যের ধনরত্ন আহরণ করিয়া, ভারতবর্ষের সুখসৌভাগ্য বর্দ্ধিত করিয়াছে। ভারতবর্ষের চরণরেখাঙ্কিত সেই পুরাতন বাণিজ্যপথ অদ্যাপি বর্ত্তমান। কিন্তু সে পথে আর ভারতীয় বাণিজ্যস্রোত প্রবাহিত হইতেছে না! কোন্ সময় হইতে এই পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়, তাহার ইতিহাস সযত্নে সংকলিত হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইস্‌লাম-বিপ্লব।

The Caliph's curtains were of brocade with elephants and lions embroidered in gold. Four elephants caparisoned in peacock-silk stood at the palace-gate; and on the back of each were eight men of Sind.—Sir. W. Hunter.

ইস্‌লামের অভ্যুদয় পৃথিবীর ইতিহাসের একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা। ইস্‌লামের নামে যাঁহারা ইতিহাসে বিবিধ কলঙ্কের আরোপ করিয়া ইস্‌লাম-দিগ্বিজয়-কাহিনী নিতান্ত ভীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে ইতিহাসের মর্য্যাদারক্ষার জন্য আগ্রহপ্রকাশ করেন নাই। যাহার নাম পুরাতন পৃথিবীর সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত, এরূপ অভিনব জাতি সহসা অভ্যুত্থান করিয়া এসিয়া খণ্ডের পশ্চিমাঞ্চল অধিকার করিবামাত্র দেখিতে না দেখিতে এসিয়া হইতে আফ্রিকা এবং আফ্রিকা হইতে ইউরোপে আত্মশক্তিবিস্তার করায়, ইউরোপীয় লেখকবর্গও সেই উদ্যমোন্মত্ত প্রবল জাতির প্রতি সমুচিত সমাদর প্রদর্শন করিতে সম্মত হইতেন না। সে অনুদার ধর্ম্মান্ধ সংকীর্ণ সংস্কার ক্রমে দূরীভূত হইতেছে। মূলসূত্রের অনুসন্ধান করিলে, ইস্‌লামের অভ্যুদয়কেই পরোক্ষভাবে আধুনিক ইউরোপের অচিন্তিতপূর্ব্ব অসীম অভ্যুদয়ের মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

ইস্‌লাম বহুজাতি-সম্মিলিত শক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ। যাহারা বৌদ্ধ, সৌর বা মূর্ত্তিপূজক রূপে এসিয়া খণ্ডের সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল অধিকার করিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে বিবিধ সুখ দুঃখ, জয় পরাজয় ও উন্নতি অবনতির ভিতর দিয়া ধীরে

বীরে অগ্রসর হইতেছিল, তাহারাই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সহসা এক অজেয় মহাশক্তিরূপে পৃথিবীর ইতিহাস উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। আরবের অনুর্ব্বর মরুভূমির মধ্যে জন্মলাভ করিয়া এই শক্তি যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়, তখন ভারতীয় পুরাতন বাণিজ্য-পথ ইস্‌লামের অধিকারভুক্ত হইতে বিলম্ব হয় নাই। ইস্‌লাম যাহাদিগকে ধর্ম্মরীক্ষায় দলভুক্ত করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিল, তাহারা কেবল অসিহস্তে ধরাতল রুধিরাক্ত করিয়াই জীবনযাপন করে নাই। তাহারা পূর্ব্বেও বাণিজ্য করিত, পরেও বাণিজ্য করিতে বিস্মৃত হয় নাই। মুসলমান খলিফাগণের বসোরা, বোগদাদ প্রভৃতি বাণিজ্যপ্রধান স্থান এইরূপেই জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে খলিফা ওমরের সংস্থাপিত বসোরা নগরী, এবং খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে খলিফা অল্ মন্‌শুরের বোগদাদ নগরী ভারতীয় স্থল-বাণিজ্য-পথের প্রধান কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল। জলপথে যে সকল পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে পারস্যোপসাগর দিয়া এক সময়ে "কালদীয় পথে" পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত, বসোরা নগরী তাহারই ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে ক্রমশঃ স্ফীত হইতে লাগিল। ইউরোপ যাহা কিছু ভারতীয় পণ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইত, তাহা ইস্‌লামের অধিকারভুক্ত হইল, এবং ইউরোপের পুরাতন সুখসৌভাগ্য তিরোহিত হইবার উপক্রম ঘটিল।

খৃষ্টজন্মভূমি মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইবার পর, ইউরোপের খৃষ্টধর্ম্মানুরক্ত বীরপুঙ্গবগণ তাহার উদ্ধার-সাধন করিবার আশায়, অকুতোভয়ে যুদ্ধযাত্রা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার মুখ্য লক্ষ্য ধর্ম্মকলহ বলিয়া ইতিহাসে সুপরিচিত হইলেও, তাহার সহিত বাণিজ্যকলহও সম্মিলিত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য-পরায়ণ নাবিকবর্গ ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মযুদ্ধোন্মত্ত বীরবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া, কিছু দিনের জন্য ভারতীয় বাণিজ্যপথ পুনরায় হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা সফল হইয়া অল্প দিনেই হয় ত পুরাতন বাণিজ্যপথে ইউরোপীয় বণিকবর্গের পুরাতন বাণিজ্যাধিকার সুসংস্থাপিত করিতে পারিত। কিন্তু মধ্য এসিয়ার তুর্কিগণ প্রবল হইয়া, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে, ক্রমে ক্রমে সমগ্র স্থল-বাণিজ্যপথ হইতে ইউরোপের সমস্ত সংস্রব চিরকালের জন্য বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। "সমুদ্রীয় পথে" ভারতীয় বাণিজ্য প্রবাহিত করিয়া, তদ্দ্বারা পুরাতন স্থল-বাণিজ্য-পথের প্রাধান্য লোপ করিবার জন্য বহুকাল নানা চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুয়েজ হইতে নীল নদ পর্য্যন্ত জলপ্রণালী খনিত হইয়াছিল; লোহিতসাগরতীরে

নূতন বন্দর সংস্থাপিত হইয়াছিল,—মিশর দেশই ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইবে, এইরূপ অনুমিত হইয়াছিল। ইস্‌লামের অভ্যুদয়ে তাহাও ক্রমে ক্রমে ইউরোপের হস্তবিচ্যুত হইয়া গেল। রাজ্যাধিকার অপেক্ষা বাণিজ্যাধিকারের চেষ্টাই ভূমধ্যসাগরবর্তীদের পুরাতন জনপদবাসিগণের প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। স্থলপথ অপেক্ষা জলপথই কলহ-কোলাহলের প্রধান ক্ষেত্রে পরিণত হইল। ইস্‌লাম স্থলপথে বিজয়পতাকাহস্তে দেশ হইতে দেশান্তরে অধিকারবিস্তার করিল। ইস্‌লাম জলপথেও রণতরণী সজ্জীভূত করিয়া, জলযুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। পুরাকালে ভূমধ্য-সাগরবর্তীদের যে সকল জাতি নির্ব্বিবাদে বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত, তাহাদের মধ্যে কেহ বাণিজ্যের জন্য, কেহ বা বাণিজ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করিবার জন্য, বাণিজ্যপোতকে রণপোতে পরিণত করিতে আরম্ভ করিল। এক দিকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমর-কোলাহল, অন্য দিকে প্রতীচ্য দলদস্যুর আক্রমণ ও লুণ্ঠন-কৌশল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভূমধ্য-সাগরে অরাজকতার অত্যাচার ক্রমে বদ্ধমূল করিয়া দিল।

একদা যে বাণিজ্য-পথ সিন্ধু ও কেতুর অধিকারভুক্ত থাকিয়া, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য রাজ্যের মধ্যে বিবিধ পণ্যসম্ভার বিনিময় করিতে গিয়া জ্ঞানবিস্তারে পুরাতন সভ্যসমাজকে সমুন্নত করিত; সর্ব্বত্র সুখসৌভাগ্য বিবর্দ্ধিত করিয়া, শান্তি-সাম্রাজ্য-সংস্থাপনের আশায় সমগ্র মানব-সমাজকে এক অখণ্ড মহাপরিবারে পরিণত করিবার আয়োজন করিত;—সে শান্তি তিরোহিত হইয়া গেল। নূতন আশা, নূতন উৎসাহ, নূতন নীতি, নূতন পথে প্রতীচ্য মানব-সমাজকে প্রাচ্য-বিদ্বেষে পূর্ণ করিতে লাগিল। ইহাই ইতিহাসে "ইস্‌লাম-বিপ্লব" বলিয়া পরিচিত।

প্রতীচ্য লেখকবর্গ যে ভাবে এই "ইস্‌লাম-বিপ্লব" লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহাতে পাঠকচিত্ত ইস্‌লামের নামে ঘৃণা, ঈর্ষ্যা ও অসঙ্গত ইস্‌লাম-বিভীষিকায় পূর্ণ হইয়া উঠিত। ইস্‌লাম কেবল ধ্বংসলীলার দানবশক্তি বলিয়াই প্রতিভাত হইত। নিয়ত কৃপাণস্কন্ধে রক্তকুরা নরশোণিতে প্লাবিত করাই যেন ইস্‌লামের ধর্ম্ম; কুঠারহস্তে পৃথিবীর পুরাতন কীর্ত্তিচিহ্ন খণ্ড-বিখণ্ডিত করাই যেন ইস্‌লামের পুণ্যব্রত; জলে স্থলে ছল-প্রতারণায় নিয়ত পরস্বাপহরণ করাই যেন ইস্‌লামের প্রধান লক্ষ্য;—অধিক কি, মানব-সভ্যতার উজ্জ্বল প্রদীপ ফুৎকারে নির্ব্বাপিত করিয়া উন্নতি-সোপান তমসাচ্ছন্ন করাই যেন ইস্‌লামের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বলিয়া কত পাশ্চাত্য ভাষায় কত অপূর্ব্ব ইতিহাস, আখ্যায়িকা ও

মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল! সে দিন ধীরে ধীরে সুদূরে চিরপ্রস্থান করায়, আধুনিক সত্যানুসন্ধানপ্রীতি নূতন ভাবে ইসলামের অভ্যুদয়-কাহিনী কীর্ত্তন করিতে অগ্রসর হইয়াছে।

ইস্‌লাম সত্য সত্যই কৃপাণকরে বহুদেশের বহু সমরক্ষেত্র নরশোণিতে সম্প্লাবিত করিয়াছিল।—ইস্‌লাম সত্য সত্যই কুঠার-হস্তে বহু পুরাতন কীর্ত্তি-চিহ্ন বিলুপ্ত করিবার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইস্‌লাম সত্য সত্যই জলে স্থলে ছল-প্রতারণায় পরস্বাপহরণের চেষ্টা করিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু তাহাই পৃথিবীর বহু জাতির প্রথম অভ্যুদয়কালের সাধারণ কাহিনী। তাহা ঝটিকা-সমাগমের প্রথম প্রকোপ। সে প্রকোপ প্রশমিত হইবার পর, ইস্‌লাম জ্ঞান-বিস্তারে ইউরোপের নবজীবনদানের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইস্‌লামের ধ্বংসলীলার অভাব নাই; ইস্‌লামের গঠনপ্রতিভার সমুচিত সমাদর সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইতিহাস যথাযোগ্য আয়োজন না করায়, ধ্বংসলীলাই ইস্‌লামের একমাত্র ঐতিহাসিক চিত্র বলিয়া পরিচিত হইয়া রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের সহিত ইস্‌লামের প্রথম সংস্রব কেবল বাণিজ্য-সংস্রব। সে সংস্রবে ভারতবর্ষ বিক্রেতা, ইস্‌লাম ক্রেতা; ভারতবর্ষ বণিক্-রাজ, ইস্‌লাম তাহার পণ্যবাহক। পুরাকাল হইতে যাহারা পারস্যোপসাগর ও লোহিতসাগর উত্তীর্ণ হইয়া পুরাতন "কালদীষ" ও "মিশরীয়" পথে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত, তাহারা মূর্ত্তিপূজার পরিবর্ত্তে ইস্‌লামের নরধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বব্যবসায় পরিত্যাগ করে নাই। স্থলপথে ও জলপথে তাহাদের পুরাতন বাণিজ্যযাত্রা পূর্ব্ববৎ প্রচলিত ছিল। এই বাণিজ্যপ্রবাহ সেকালের সমগ্র এসিয়াখণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের সুদৃঢ় সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়া দিয়াছিল। সুদূর চীন, জাপান ও প্রশান্তমহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জ হইতে যে সকল পণ্যদ্রব্য সিংহলে সংগৃহীত হইত, তাহার সহিত অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের শিল্পসম্ভার মিলিত হইয়া, সিংহলকে প্রাচ্য-পণ্যদ্রব্যের অনন্ত ভাণ্ডারে পরিণত করিয়াছিল। এই পণ্য-সংগ্রহের জন্য আরবীয় নাবিকগণ তৎকালে এসিয়া-খণ্ডের সমগ্র সমুদ্রোপকূলে গতিবিধি করিত। তাহাদের অর্ণবপোত সিংহল হইতে মালাবারতীরসংলগ্ন সমুদ্রবক্ষে সিন্ধু-সাগরসঙ্গমের নিকটবর্ত্তী পুরাতন পথেই পারস্যোপসাগরে প্রবেশ করিত। এই সুদীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় তাহাদিগকে পণ্য-সংগ্রহের জন্য, পণ্য-বিনিময়ের জন্য ও খাদ্য-সঞ্চয়ের জন্য ভারতবর্ষের বিবিধ বন্দরে উপস্থিত হইতে হইত। তাহাদের বাণিজ্যপোতে

বণিক ভিন্ন তীর্থযাত্রিগণও ইস্‌লামের পুণ্যতীর্থ দর্শন করিবার আশায় আশ্রয় গ্রহণ করিত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে এইরূপে ইস্‌লাম-বাণিজ্য-পোত সিংহল হইতে সিন্ধুসাগর-সঙ্গমের নিকটবর্ত্তী হইলে, সন্ধুনিবাসী হিন্দুগণ তাহাদের প্রতি অসদ্ব্যবহার করায়, ইস্‌লাম-শক্তি জলপথে সিন্ধুরাজ্য-আক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ইহাই ইস্‌লামের প্রথম অভিযান। তাহার সহিত অকারণ নর-শোণিতপিপাসা বা দিগ্বিজয়-লালসার সংস্রব ছিল না;—তাহা কেবল অত্যাচারের প্রতিবিধানকামনায় অত্যাচার-প্রয়োগ। তাহাই মানবসমাজের চিরন্তন ঐতিহাসিক তথ্য। এই অভিযানে সিন্ধুদেশের সহিত ইস্‌লামসাম্রাজ্যের যে সংস্রব সংস্থাপিত হয়, তাহা ইস্‌লামের বোগদাদ রাজধানীকে জ্ঞানালোচনায় সমুন্নত করিবার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। খলিফাগণ হিব্রু, গ্রীক ও সংস্কৃত সাহিত্য হইতে জ্ঞানাহরণ করিবার আশায় আরবীয় ভাষায় গ্রন্থানুবাদ করাইতে প্রবৃত্ত হইয়া, অল্পকালেই আরবীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া, তাহার গৌরবঘোষণায় সুদূর ইউরোপের দ্বারদেশে উচ্চচূড় বিদ্যামন্দির-নির্ম্মাণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তখন ইউরোপ পূর্ব্বাশিক্ষা-বিচ্যুত অনুন্নত অর্দ্ধশিক্ষিত কলহকোলাহলময় মানবসমাজে পরিব্যাপ্ত। তাহারা ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মান্ধ হইয়া নিরপরাধ নরনারীকে চিতামঞ্চের যূপকাষ্ঠে বন্ধন করিয়া, জীবিতাবস্থায় অগ্নিসৎকার করিত; তাহারা ধর্ম্মমতের প্রাধান্যরক্ষার্থ, স্বাধীন সত্যনিষ্ঠ বিমল জ্ঞানজ্যোতিকে পাশবশক্তিবলে পরাহত করিয়া, ধর্ম্মবিস্তার করিত; তাহারা গ্রীস ও রোমের পুরাতন সাহিত্যনিহিত জ্ঞানভাণ্ডারকে কুসংস্কারলব্ধ অলীক উপাখ্যানবোধে প্রত্যাখ্যান করিয়া বর্ব্বর হইয়া উঠিয়াছিল। ইস্‌লামের বিবিধ বিদ্যালয় ইউরোপের অন্তর্গত স্পেনরাজ্যে যে জ্ঞানবিস্তারে ব্যাপৃত ছিল, তাহা হইতে চিকিৎসাবিদ্যা ও গণিতবিজ্ঞান সমগ্র ইউরোপে ব্যাপ্ত হইবার সূত্রপাত হইল। ভারতবর্ষ, গ্রীস, মিশর প্রভৃতি পুরাতন সভ্য দেশের সযত্নসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার হইতে ইস্‌লাম বহুশ্রমে যে জ্ঞানরত্ন-সংকলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে এসিয়া হইতে আফ্রিকা ও আফ্রিকা হইতে ইউরোপে ব্যাপ্ত হইয়া, পাশ্চাত্য মানবসমাজের সমুন্নতিলাভের কারণ হইয়া উঠিল। সমগ্র মানবসমাজের সভ্যতার ইতিহাসে ইহাই ইস্‌লামের অতুল কীর্ত্তি;—তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য।

যখন ইস্‌লাম এইরূপে আধুনিক ইউরোপকে নবজীবনদানে প্রবৃত্ত, তখন ইউরোপীয় মানবসমাজ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহে ভারতবর্ষের দিকে আকৃষ্ট হইতে

লাগিল। ভারত-বাণিজ্য হস্তগত করিবার উপায়-উদ্ভাবন করাই সমগ্র ইউরোপের প্রধান ও প্রবল আকাঙ্ক্ষার পরাকাষ্ঠায় পরিণত হইল। সেকালের এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ভারতবর্ষে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার বর্ত্তমান আকাঙ্ক্ষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সেকালের ইউরোপীয় জনসমাজ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার কৌশলে ভারতবর্ষের সমকক্ষ বা শ্রেষ্ঠ হইবার আশা কল্পনা করিতেও সাহস করিত না। তাহারা কেবল নির্ব্বিবাদে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য-বহন ও তাহার ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে অর্থোপার্জ্জন করিবার অধিকার লাভ করিতে পারিলেই পরিতৃপ্ত হইত। ইস্‌লাম-বিপ্লব সে আশা নির্ম্মূল করিয়া, সমস্ত সুপরিচিত পুরাতন বাণিজ্যপথ করতলগত করিয়াছিল। তাহা আর সহসা ইস্‌লামের হস্তচ্যুত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ইস্‌লামের রণতরণী জলপথে নবশক্তির বিকাশ-সাধন করিয়া, সর্ব্বত্র অজেয় হইয়া উঠিয়াছিল;—ইস্‌লামের সেনাবল স্থলপথকে ইউরোপীয় জনসমাজের পক্ষে নিরতিশয় দুর্গম করিয়া তুলিয়াছিল। শক্তি-পরীক্ষায় অগ্রসর হইয়া, ইউরোপীয় খৃষ্টানগণ এসিয়ার মুসলমানের সহিত যে সকল যুদ্ধকলহে লিপ্ত হইতেন, তাহাতে কখন কখন জয়লাভ করিলেও, তাহার ফল দীর্ঘস্থায়ী হইত না। অবশেষে ইস্‌লামের হস্তে পুরাতন বাণিজ্যপথ সমর্পণ করিয়া, ইউরোপীয় জনসমাজ নূতন পথের আবিষ্কার করিবার জন্যই ব্যগ্র হইয়া পড়িল। পুরাতন পথ বন্ধ হইল না; সে পথে ভারত-বাণিজ্য ধীরে ধীরে ইউরোপে বিস্তৃত হইতে লাগিল; কিন্তু তাহার প্রধান অংশ আর ইউরোপীয় খৃষ্টানগণকে সমৃদ্ধিদান করিল না। তাহা ক্রমে ইস্‌লামের সৌভাগ্য বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। ইহাতেই ইউরোপকে কেবল ক্ষতিস্বীকার করিয়া, অল্পমূল্যে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে হইত; ইহাতেই ইউরোপ দিন দিন অর্থমোক্ষণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

এই সময়ে ইউরোপে শিল্পচর্চ্চার সূত্রপাত হয়। কিন্তু শিল্পদ্রব্যের অধিকাংশ উপকরণের জন্য ইউরোপকে প্রাচ্যরাজ্যের মুখাপেক্ষী হইয়া, নিতান্ত অসহায় অবস্থায় কালযাপন করিতে হইত। ইস্‌লাম ইউরোপকে যে তীব্র তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, তাহা যদি ইউরোপকে উদ্যমশূন্য করিতে পারিত, তাহা হইলে ইস্‌লামই পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান মহাশক্তিরূপে অদ্যাপি মানবসমাজের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিত। ইস্‌লামের নবোদ্যম যাহা অধিকার করিয়াছিল, তাহা অধিকদিন রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। ইউরোপ বাহুবলে পরাজিত হইলেও, হৃদয়বলের অপরাজিত উৎসাহে স্বাধীনতালাভের উপায়-উদ্ভাবনে নিরত যত্ন

শীল হইয়াছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মানবসমাজের এই প্রকৃতিগত প্রবল পার্থক্যই ইস্‌লামের অবসাদের ও ইউরোপের অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক কারণ। এক পথে প্রতিহত হইয়া, অন্য পথের আবিষ্কারের জন্য ইউরোপ যে অপূর্ব্ব-অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছে, তাহা মানবসমাজের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। অভিনব বাণিজ্যপথের আবিষ্কার-কামনায় ইউরোপ জল স্থল উভয় পথেই ধাবিত হইয়াছিল। যাঁহারা এই দুষ্কর কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকের নাম বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। যাঁহাদের নাম অদ্যাপি লোক-সমাজে সুপরিচিত, তাঁহারা কিরূপে উদ্যমে, কত ক্লেশে, কত অধ্যবসায়ে, স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

একের চেষ্টায় যাহা কিছু সংসাধিত হইতে পারে, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। রাজা ভিন্ন জনসমাজের অন্য কাহারও একাকী কোন বৃহদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া সফলকাম হইবার আশা নাই। নানা কারণে বাণিজ্যব্যাপারে বহু জন একত্র মিলিত হইবার প্রয়োজন উপলব্ধ হইতে লাগিল। ইস্‌লাম-বিপ্লবই ইউরোপকে এই মহাশিক্ষা প্রদান করিবার প্রকৃত কারণ। বণিকবর্গের সমবেত শক্তি একত্র প্রয়োগ করিবার প্রথম প্রয়োজন ইস্‌লাম-বিপ্লব-কালেই অনুভূত হইয়াছিল। সে প্রয়োজন যেমন বাণিজ্যরক্ষার্থে সমবেত শক্তির একত্র প্রয়োগের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছিল, সেইরূপ নূতন বাণিজ্যপথের আবিষ্কারকালেও সমবেত শক্তির একত্র প্রয়োগের উপকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহাই ইউরোপীয় বিবিধ কোম্পানীর মূলসূত্র;—ইহাই ইতিহাস-বিখ্যাত "কোম্পানী বাহাদুরে"র জন্মলাভের ঐতিহাসিক মূলসূত্র।

মাতৃপূজা।

শুধু অশ্রুজলে, শুধু মন্ত্র-উচ্চারণে,
শুধু, তুচ্ছ অতি ক্ষুদ্র হীন উপচারে
শ্যামা কি প্রসন্ন হবে ভাবিয়াছ মনে—
জাগিবে জীবনজ্যোতিঃ অমা-অন্ধকারে?
কার পাপে স্নেহহীন মায়ের অন্তর,
অন্ধ ত্রিনয়ন,—মাতা নগ্না শবাসনা?
নাহি খড়্গ,—রক্তসিক্ত ও মহাখর্পর;
শিবাসম লালসিছে তূর্ণার্ত্ত রসনা।
জ্বাল' মাতৃভক্তি-বুকে—হোম-অগ্নিশিখা,
ভস্ম হোক্ যুগব্যাপী আত্মদ্রোহ পাপ।
ঢাল রক্ত—কণ্ঠে বক্ষে হানহ ছুরিকা,—
মৃত্যু হতে মুক্তি হোক্—যাক্ অভিশাপ।
শুভ্রবক্ষে-অভিষিক্তা—অমানিশিশেষে
দেখা দিক্ শ্যামা রাজরাজেশ্বরী বেশে।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ।

৩। তাল-নারিকেলের দেশে।

রথযাত্রার আয়োজন।

এই ত আমি শ্রীরাগমে আবার ফিরিয়া আসিলাম। এখন রাত্রি। সম্মুখে বৃহৎ বিষ্ণুমন্দিরের প্রাচীর। যেখানে কেবল ব্রাহ্মণেরা বাস করে—ইহা সেই গণ্ডির মধ্যে অধিষ্ঠিত, এবং আমি এক্ষণে বীথির সেই অংশে উপস্থিত হইয়াছি, যেখান হইতে সমস্ত মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করা যায়। এইখানে চন্দ্রালোকে রথটি অপেক্ষা করিতেছে। উহার উপর একপ্রকার সিংহাসন কিংবা একপ্রকার চূড়া-বিশিষ্ট মঞ্চ;—উহার গায়ে লাল রঙের, পাণ্ডু রঙের, রাংতা ঝক্‌মক্ করিতেছে; উহার ছাদ মন্দির-চূড়ার অনুকরণে নির্ম্মিত ও বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত। ঐ সমস্তের তলদেশে যে আসল বস্তুটি অবস্থিত, উহা ব্রাহ্মণ-ভারতের ন্যায় পুরাতন;—উহা উৎকীর্ণ কাষ্ঠফলক-সমূহের একটা গুরুভার প্রকাণ্ড স্তূপ;—এরূপ প্রকাণ্ড যে, মনে হয় না, উহাকে কেহ কখন নড়াইতে পারে। কিন্তু, এই বিভূষিত স্তূপটি—এই ঝক্‌মকে অতি প্রকাণ্ড চূড়াসমন্বিত মঞ্চটি আজ বেশ শোভনভাবে স্থাপিত হইয়াছে। এখন উহাকে রেশম ও রাংতার চাকা, বাঁশের কাঠামে কাগজ মোড়া, খুব হাল্‌কা অথচ একটা খুব জম্‌কালো জিনিস বলিয়া মনে হইতেছে। রথের চারিধারে দলবদ্ধ হইয়া যে সকল শুক্ল-বেশধারী লোক দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের উপর চাঁদের কিরণ পড়িয়াছে:—এই সকল ভারতবাসী রাত্রিকালে প্রায়ই সূক্ষ্ম মলমল বস্ত্রে স্বকীয় গাত্র ও মস্তক আবৃত করিয়া উপছায়ার ন্যায় বিচরণ করে; কিন্তু যেন চন্দ্রালোকও যথেষ্ট নহে, উহারা আবার মশাল লইয়া আসিয়াছে। কেন না, বিকট বিরাট কূর্ম্ম-সদৃশ এই রথটির গায়ে, বৎসরের মধ্যে একবার চাকা লাগাইবার জন্য উহা-দিগকে আজ বিশেষরূপে খাটিতে হইবে। এই রথচক্রগুলি, উচ্চতায় মনুষ্যের অর্দ্ধ-শরীর ছাড়াইয়া উঠে; এই চক্রগুলি পুরু কাষ্ঠফলকের দুই স্তরকে নির্ম্মিত; কাষ্ঠফলকগুলি উল্টা-উল্টিভাবে সন্নিবেশিত, এবং লোহার প্রেক্ দিয়া আবদ্ধ। ইতিমধ্যেই উহারা রথ টানিবার রসি ভূমির উপর লম্বা করিয়া বিছাইয়া রাখিয়াছে; এই রসি ব্রহ্মার জঙ্ঘার ন্যায় স্থূল; বিরাট রথ-যন্ত্রটি নাড়াইবার জন্য তিন চারি শত উন্মত্ত লোক এই রসিতে আপনাদিগকে জুড়িয়া দিবে।

এই সময়ে মন্দিরটি—এই প্রস্তররাশির প্রকাণ্ড স্তূপটি একেবারেই জনশূন্য, নৈশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, শব্দগভীরতায় ও নিস্তব্ধতায় ভীষণ। জনপ্রাণী নাই, কেবল পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের কতকগুলি ব্রাহ্মণ উৎসব-উপলক্ষে আসিয়া এইখানে আশ্রয় লইয়াছে; এবং সাদা চাদর মুড়ি দিয়া, সানের উপর সটান পড়িয়া নড়ার মত ঘুমাইতেছে। দূর-দূরান্তরে লম্বমান মিটমিটে প্রদীপগুলা জ্যোৎস্নালোকের সহিত যেন পাল্লা করিয়া, পুত্তলিকা-সমূহের ও স্তম্ভারণ্যের অনন্ততা আরও বর্দ্ধিত করিতেছে।

যে বীথি-পথটি দিয়া, কাল প্রভাতে, রথযাত্রা আরম্ভ হইবে, উহা মন্দিরের ভীষণ দস্তুর প্রাকারের চারিধার দিয়া গিয়াছে। এই প্রশস্ত সরল পথটি, প্রাকার ও ব্রাহ্মণদিগের পুরাতন গৃহ-সমূহের মধ্য দিয়া চলিয়াছে; ছোট ছোট থাম, বারাণ্ডা, বিকট-প্রস্তর-মূর্ত্তি-বিভূষিত সোপান-শ্রেণী—এই সকলের জটিল মিশ্রণে গৃহগুলি পূর্ণ। পথটি আজ সজীব হইয়া উঠিয়াছে; কেন না, আজ রাত্রে প্রায় কেহই নিদ্রা যাইবে না। এই সকল শুভ্র-বসন-ধারী লোকেরা দলে দলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; মনে হইতেছে যেন, চন্দ্রমার বিরাট ছায়া-মূর্ত্তিখানি উহারা প্রত্যেকে আংশিকভাবে নিজ নিজ দেহে প্রকটিত করিতেছে, এবং দেব ও পশুসমূহের "পিরামিড"—সেই প্রকাণ্ড বিরাট গুরুতর বিষ্ণু-মন্দিরের কৃষ্ণবর্ণ চূড়াগুলি সর্ব্বোপরি রাজত্ব করিতেছে। উচ্চবর্ণের রমণীরা, বালিকারা, গৃহ হইতে বাহির হইতেছে; যে ভূমিখণ্ড চষিয়া—গভীর মাটি খুঁড়িয়া, বিষ্ণুদেবের রথ কাল যাত্রা করিবে, সেই পুণ্যভূমিকে চিত্রিত ও অলঙ্কৃত করিবার জন্য, উহারা স্ব স্ব গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া চলা-কেবা করিতেছে; সচরাচর উহারা প্রাতঃকালেই ঐ লাল মাটি বিচিত্র রঙ্গের রেখায় অঙ্কিত করে; রথটি খুব প্রত্যূষেই যাত্রা করিবে। আজ রাত্রিটি কি পরিষ্কার! এই চাঁদের আলোয় দিনের মত সমস্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আর এই রমণীদিগের নিকট—এই বালিকাদিগের নিকট এত জুঁই ফুলের মালা রহিয়াছে—এত ফুলের হার তাহাদের কণ্ঠে ঝুলিতেছে যে, মনে হয়, যেন তাহারা ধূপাধার সঙ্গে করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে।

ঐ দেখ এক জন নবযুবতী—গঠনটি বেশ ছিপ্‌ছিপে—জরির কাজ করা কালো রঙ্গের মলমল-শাড়ী পরিয়াছে; দেখিতে এমন সুশ্রী যে, না ইচ্ছা করিলেও, তাহার সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়। যতবার সে মাটির দিকে নীচু হইতেছে—যতবার সে উঠিতেছে, ততবারই তাহার বাহু ও চরণদ্বয় হইতে নূপুর বলয়ের মধুর ঝঙ্কার শ্রুত হইতেছে; যে সকল মনঃকল্পিত নক্‌সা সে ভূমির উপর আঁকিতেছে, তাহাতে তাহার অপূর্ব্ব কল্পনা-লীলার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। * * * আজিকার রাত্রে যে ব্যক্তি

আমার প্রদর্শক, তাহার নাম "বেল্লনা"—উচ্চবর্ণের লোক; স্ত্রীলোকটির সহিত সে সাহস করিয়া কথা আরম্ভ করিয়া দিল, এবং আমার হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল —তাহার সাদা গুঁড়া আমাকে সে কিছু দিতে পারে কি না,—যদি দেয়, তাহা হইলে আমিও তাহার গৃহের সম্মুখস্থ ভূমিটি চিত্রিত করিয়া দিই। সে একটু মুচ্‌কি-হাসিয়া সঙ্কোচের সহিত তাহার চূর্ণাধারটি আমার নিকট পাঠাইয়া দিল, সে স্বয়ং আমার হস্ত স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইল। আমার হস্ত হইতে কিরূপ নক্সা বাহির হয়, দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া, এই সকল উপছায়াবৎ শুভ্রবসন-ধারী লোকেরা আমার চারি দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

বিষ্ণুর সাঙ্কেতিক চিহ্নটি আমি অতি পরিপাটীরূপে লাল-মাটির উপর চিত্রিত করিলাম। তখন, বিস্ময় ও মমতা-সূচক অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি চারি দিক হইতে সমুত্থিত হইল। তখন সেই রূপসী ভারত-ললনা স্বয়ং সেই চূর্ণাধারটি আমার হস্ত হইতে ফিরিয়া লইল; এমন কি, তাহার কল্পিত নক্সা-রচনার কাজে আমাকে সহকারী করিতেও সম্মত হইল:—চারিধারে গোলাপ ফুলের ও তারার নক্সা কাটিয়া তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যবিন্দুতে এক একটি Ibiscus ফুল বসাইয়া দিতে হইবে।—ইহাই তাহার নক্সার কল্পনা।

যাহা হউক, ইহাই যথেষ্ট—যথেষ্ট অপেক্ষাও বেশী। একটা অবিবেচনার কাজ করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া আমার সহিত জড়িত কোন কষ্টকর স্মৃতি তাহার মনে না থাকিয়া যায়; এবং তাহার নিকট হইতে অন্ততঃ শিষ্টাচার-সম্মত একটি বিদায়-দৃষ্টিও যাহাতে লাভ করিতে পারি—এই হেতু আমি এই সময়ে সরিয়া পড়াই শ্রেয় মনে করিলাম।

ও দিকে সমুজ্জ্বল চূড়াসমন্বিত কনক-পত্র-মণ্ডিত বিষ্ণু-রথের চারিধারে, শুক্ল-বসনধারী লোকেরা দলে দলে সম্মিলিত হইয়াছে। দ্বিপ্রহর রাত্রি আগতপ্রায়। এইবার কি একটা রহস্য ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইবে, তাহারই আয়োজন হইতেছে। আমার তাহা দেখিবার অধিকার নাই। উৎসব-ঘটা ও জাঁকজমক বর্দ্ধিত করিবার জন্য, বড় বড় সুলক্ষণ হস্তী (তন্মধ্যে একটির বয়স শতবর্ষ) রথের নিকট সমানীত হইয়াছে, উহারা জরির কাজ করা সাজে সুসজ্জিত; চন্দ্রালোকে শরীর ঝলাইতেছে —যেন প্রকাণ্ড কতকগুলা কর্দ্দমের ঢিপি। এই ঘোর নিশাকালেও বৃহৎ ছত্র সকল উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—ছত্রের প্রান্তদেশে তাঁবার চাকতি। অষ্টাদশবর্ষীয় এক দল ব্রাহ্মণযুবক ত্রিশূলের অনুকরণে নির্ম্মিত ত্রি-শাখা ও ত্রিশাখা-বিশিষ্ট মশাল লইয়া উপস্থিত হইল।

এইক্ষণে যে রহস্যব্যাপারটি অনুষ্ঠিত হইবে, তাহা এই ঃ—ইতর-সাধারণের অদর্শনীয় সেই পবিত্র সাঙ্কেতিক বিগ্রহটিকে—শ্রীরাগমের সেই অনন্যসাধারণ প্রকৃত বিষ্ণুমূর্ত্তিটিকে আজ মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে—সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র যে স্থান—সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাওয়া হইবে। এই বিগ্রহটি বিশুদ্ধ স্বর্ণে গঠিত,—পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গের উপর শয়ান। রথের সম্মুখে একটি মঞ্চের উপর—প্রাচীন ধরণের একটি মন্দিরাকার গৃহের অভ্যন্তরে স্থাপিত হইবে; গৃহটি এই উদ্দেশ্যেই বিশেষরূপে নির্ম্মিত; বিগ্রহের পাদদেশে দীপমালা জ্বলিবে, এবং পুরোহিতেরা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকিবে। তাহার পর কল্য প্রভাতে, যাত্রোৎসবের সময়ে, বিগ্রহটিকে ঐ মন্দির-গৃহের একটা জান্‌লার ভিতর দিয়া বাহির করিয়া রথের উপর—মন্দির-চূড়ার ন্যায় একটা চন্দ্রাতপের নীচে—বসান হইবে। বিগ্রহটি উহার ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিবে। পূর্ব্বোক্ত মন্দিরগৃহে ফিরিবার সময় যতবার এই শ্রীরাগমের বিষ্ণুমূর্ত্তি বাহির হইবে, বলা বাহুল্য, ততবারই উহাকে কাপড় দিয়া খুব ঢাকিয়া লইয়া যাইতে হইবে। কাপড় দিয়া ঢাকা হউক, বা না হউক, সে একই কথা; কেন না, যাহাতে অদীক্ষিত ব্যক্তিগণ বিগ্রহটিকে দেখিতে না পায়, এই জন্য উহাকে রাত্রিতেই গৃহাভ্যন্তরিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু এ বৎসর, পূর্ণিমা তিথিতে উৎসবের দিনটা পড়ায়, লোকেরা আমাকে দূরে সরিয়া যাইতে বলিল; কারণ, আমিই এখানে একমাত্র বিদেশী; আর বাস্তবিকই রাত্রিটা খুব পরিষ্কার।

তখন আমি, অন্য ব্রাহ্মণ পথিকদিগের ন্যায়, মন্দিরের অভ্যন্তরেই (যে প্রস্তর-ময় গলির উপর দিয়া রথ চলিবে, তাহা হইতে অবশ্য বহুদূরে) শয়ন করিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। চারি দিক ঘোর নিস্তব্ধ; সেপাইদের শৈত্য প্রায় যেন গোরস্থানের ন্যায় স্থিতিশীল। মধ্যে মধ্যে, অর্দ্ধ-নিঃশব্দ পদক্ষেপে লোকেরা নগ্নপদে অতি সাবধানে মন্দিরের সানের উপর যাতায়াত করিতেছে। প্রার্থনা মন্ত্রাদির অস্ফুট গুঞ্জন শুনিতে শুনিতে মন্দিরের সেই শব্দযোনি বিলীন-মণ্ডলের নীচে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। * * *

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার সংসার।

সুখের চেয়ে সোয়াস্তি বরং ছিল ভাল! বিবাহ করিয়া কি বিপদেই পড়িয়াছি! তবে কি আমার বিবাহ নিষ্ফল হইয়াছে? রাম বল! এমন কথা কোন

গণ্ডমূর্খ বলে? এই ছয় বৎসর বিবাহ হইয়াছে, ফলে তুলে এরি মধ্যে পাঁচটি! সে ফলের অপ্রতুল নাই। ফল বুঝিতে আমি অন্য ফলের কথা ভাবিতেছিলাম।

অনূঢ় অবস্থায় আমার সংসারে বিশৃঙ্খলা ছিল না, বিবাহের ফলে এখন শৃঙ্খলা সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে। তখন সকালে উঠিয়া খবরের কাগজের সঙ্গে চা-টুকু বা কোকোটুকু-নিয়মমত টেবিলের উপর পাইতাম, তার সঙ্গে দুখানা টোষ্টও পাইতাম, দুটা ডিমও থাকিত। এখন অনেক মাথা খোঁড়া ও সাধ্য সাধনারও একটু নেবুর রস, বা চিনেতার জল, বা দুটো আদা ছোলাও মেলা দায়। কে দেয়? সবাইকারই হাত জোড়া; কেউ ত আর বসে' নাই। অথচ এই সব ঝি চাকর রামুন তখনও ছিল। তখন আমি স্নানাগার হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই ঠাকুর ভাত বাড়িয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। এখন স্নান করিয়া পূজা আহ্নিকের মত নিজের "ঠাঁই" নিজে করিয়া লওয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। "ভাত কই" "ভাত কই" করিয়া চীৎকার করিতে করিতে গলা ভাঙ্গিয়া গেলে খবর পাওয়া যায়, "এই নিয়ে যাচ্ছি।" খাইবা উঠিয়া গেলে আঁব ছেঁক। বা নুন-নেবুর পাতা আসিয়া পড়ে। আঁচাইবার জল বাহিরের কলে পাওয়া যায় যদি ১১টার মধ্যে আহার শেষ করিতে পারি। আহারান্তে পান বা মসলা যে জোটে না, এমন কথা বলিতে পারি না; কিন্তু সে বেলা হইয়া যাইবার পর। বাড়ীতে ভদ্রলোক আসিলে পান সুপারির মিতব্যয়িতা দেখিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করে। অথচ দেখিয়াছি, পান সুপারির বাবদে যে খরচ পড়ে, তাহাতে অন্তত এই খরচে পানের সদাব্রত করা যায়। *

পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে এমন লোকটা জনটা আলাপী বন্ধু বান্ধব সময়ে অসময়ে প্রায়ই আসিত, এবং চিনিবাস খানসামা ও ইহু বাবুর্চিতে মিলিয়া হয় ত বা দুটো চপ, নয় ত বা দুখানা কাটলেট, নিদেন গরম অমলেট ভাজিয়াও তাহাদিগকে কিছু জলযোগ করাইয়া দিত। এখন শুধু এক গ্লাস খাবার-জল চাহিলে গোলযোগের সম্ভাবনা।

আগে যে জিনিসে সম্পূর্ণ সুপ্রতুল হইত, এখন তাহার তিন গুণ জিনিসেও খই পাব না। কারণ?—আমার বেজায় লোক খাওয়ান ও চাকর বাকরের চুরি।

---

* স্ত্রী-নিন্দা মহাপাপ। পাপের ভরা আর বাড়াইব না। সত্য কথাই বলি, পান কাটি আমার স্ত্রী আর কাহাকেও সাজিতে দেন না; নিজেই সাজেন। তাই মেশের ঝিয়ের সাজা পান তাঁর সাজা পানের তুলনায় অমৃত।

অথচ এই চাকর বাকরের হাতেই পূর্ব্বে আমার যথাসর্ব্বস্ব ন্যস্ত ছিল, এবং কখনও একটি পয়সার এ দিক ও দিক হয় নাই। চাকরেরা আর আগেকার মত কাজ করে না। "চিনিবাসকে রাখার কি দরকার? দুখানা কাপড় কোচান আর কাচা, এই ত ওর কাজ। মাতাদিনটা কি করে? কেবল তামাক সাজে, আর পাখা টানে! সমস্ত দিনে খুকীটাকে একবার ধরতে পারে না।" অথচ ডাক,—"ওরে মাতাদিন! মহেন্দ্রবাবুকে তামাক দিয়ে যা।"

"নেই।"

"কেন? কোথা গেল?"

"খুকীকে মাসীমার রকে হাওয়া খাওয়াচ্চে।"

"চিনিবাস?"

"আজ নতুন ঝি আসেনি, তাই বৌমার ঘরের কাজ কচ্চে। বল্লুম, বাবা ডাকচেন; বল্লে, আমি এখন ছাবপোকা বাচ্ছি, তার পর বালিসের তুলো বেরিয়ে পড়েছে—শেলাই করে দিয়ে তবে যাব।"

"কেন, বুড়ী কি কচ্ছে?"

"সে এখন গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দিতে গেছে—তার পর গঙ্গা নেয়ে আসবে। বৌমা তাকে বিছানা ছুঁতে দেয় না।"

সুতরাং খাটুনিটা সমস্তই আমার স্ত্রীর, অতএব তাঁর সাধ মেজাজ যদি সপ্তমে চড়েই থাকে, তবে তাতে দোষের এমন কি আছে?

শুতে আমার একটু রাত্তির বরাবরই হয়। আগে ভোরের দিকের ক' ঘণ্টা ঘুমাইতাম ভাল, এবং উঠিতেও একটু বিলম্ব হইত। এখন ঠিক তার বিপরীত। পাশের ঘরে লোক থাকিলে কি হইবে? তাঁর ঘরে আমি সন্ধ্যা থেকে গিয়ে না থাকলে ভয়ে আমার স্ত্রীর ঘুম হয় হয় না, এবং আমি ঘরে যাবামাত্রই তাঁর নাসিকাধ্বনি আরম্ভ হয়। বই বা কাগজ নিয়ে প্রথম রাতটা কাটাই, তার পর ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু সে কতটুকু? শেষ রাত্রে খুকীর ঘুম ভেঙ্গে যায়, এবং সে কান্না জোড়ে; সুতরাং তাকে humour করতে হয়; তার মাকে জাগান ungallant হবে, সুতরাং তা ত আর হয় না। ছেলে মেয়েদের মধ্যে যে যখন খুকী বা খোকা থাকে, তখন এই রকম করে' তার তুষ্টিসাধন করতে গিয়ে প্রায়ই কবসা হয়ে যায়, সুতরাং বাইরে বেরিয়ে পড়ি। তার পর চপেটাঘাতে যখন সব ছেলে মেয়েদের পিঠের কুলো ও গলার শাঁখ বেজে ওঠে, তখন বোঝা যায়, আমার স্ত্রীর নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। তার পর প্রাতঃকৃত্যাদিতে মনঃসংযোগের পালা। এ

দিকে "নাগা সন্ন্যাসীর" দল সব হয় ত শীতের কুয়াসায়, নয় ত বর্ষার ধারার ভিতর দিয়া "নগ্নদেহে কুতূহলে" আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি কোনও দিন কোনও গলিকে খুঁজিয়া পাতিয়া তাদের গায়ে জামা ও পায়ে জুতা নিজে পরাইয়া দিতে না পারি, তবে এই সকল বিলাসসামগ্রী সে দিন তাহাদের অঙ্গে উঠিয়া চরিতার্থ হইবার অবকাশ পায় না। তোমরা বলাবলি করিতেছ, কেন, ঝি চাকরগুলা কি করে? আমিও তাই বলি, কিন্তু তোমাদের বা আমার বলাতে কি আসে যায়? তা ছাড়া, ঝি চাকরেরাই যদি এই সব কুকার্য্য করিয়া বেড়ায়, তবে আমার সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্মাচরণের যোগাড় করিয়া দিবে কে? দাঁত পরিষ্কার করিবার জন্য থোড়ের সুতা, প্রত্যেক নখ সাফ করিবার জন্য এক ঘড়া করিয়া জল, এবং যে বাসী দালান দিয়া চলিয়া অশুচি হইবার অপরাধে ছেলে মেয়েরা ধনঞ্জয় ভোগ করে, তাহার পবিত্রতাসাধন করিবার সমস্ত আয়োজন করিয়া দিবে কে?

গোরাবক্স দরজীর দেনাও শোধ হয় না, আমার স্ত্রীর শ্রীঅঙ্গে জ্যাকেট সেমিজও ওঠে না। কেশবিন্যাস দূরে থাক, চুলটা আঁচড়ে একটা কাঁস দিবার সময়ও আমার কর্ম্মিষ্ঠা গৃহিণীর হইয়া উঠে না।

সেফ্‌টি-পিনের খরচ আমার কিছু অতিরিক্ত। কারণ, ছেলেপুলের জামার বোতাম ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া গেলে, তাহাদের বোতাম-জন্ম ঘুচিয়া সেফ্‌টি-পিন-ত্ব লাভ হয়। যদি রিপুকর্ম্মভয়ানা ডাকাই, তবে আমার স্ত্রীর ক্রোধের সীমা থাকে না; কেন না, তিনি মনে করেন, তাঁর গতরের প্রতি আমার নজর পড়িতেছে! কিন্তু গলায় একটা কিছু জড়াইয়া রাখিবার আবশ্যক হউক, এবং একটি পিন চাও, নিঃসঙ্কোচে "নাই" বা "দেখ্‌তে পাচ্চি না" বলিয়া তিনি কর্ম্মান্তরে যাইবেন।

সকল বারেই ছেলেদের খেলনা আনিয়া দেয়, আমিও দি। কিন্তু খেলনা আসিবা-মাত্রই তাহা চাবির মধ্যে গিয়া পড়ে। ছেলেরা যদি তাহার জন্য বায়না করে, তবে তাহারা আর এক খেলা দেখিতে পায়, তাহার ফলে কাহারও বা পিঠে, কাহারও বা গালে, আঙ্গুলের দাগ পড়ে।

বিস্তর দাম দিয়া সুপরিচিত শিল্পীদের আঁকা যে সব ছবি কিনিয়া টাঙ্গাইয়াছিলাম, সে সব ঘরের এক কোণে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া দুরন্ত ছেলের মত দাঁড়াইয়াছে। তার পরিবর্ত্তে কালীঘাটের পট ও মেলিন্দ ফুডের রাধা-কৃষ্ণ প্রকোষ্ঠের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। বিছানা নির্ভাজ টানা হওয়া চাই, তাই কর্ণার-সেল্‌ফ্‌ ও তাহাদিগের শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ কারুকার্য্যময় অলঙ্কার সকল

দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ল্যাজারসের বাড়ীর সেক্রেটেরিয়েট টেবিল এখন দুধের বাটি, ঝিনুক, জলের গেলাস, চিনি মিছরী বাতাসা, পানের গামলা, দোক্তার কৌটা, দড়ি, চিরুণী, আরসী, সিঁদুর, প্রভৃতি রাখিবার পেতেন হইয়াছে। টেনিসনের গ্রন্থ এখন দুধের বাটী চাপা দিয়া সরপোষের কাজ করে, এবং রস্‌কিনের "সেভ্‌ন ল্যাম্পস্" মাথা দিয়া তাঁর সিঁদুরের কাগজ চাপিয়া থাকায় আমার সহধর্ম্মিণীর সধবা-জীবন বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণে মহিমান্বিত হইয়া উঠে।

বিবাহের যৌতুকে যে পালঙ্ক পাইয়াছিলাম, তাহা এখন কাছারীঘরে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মহেন্দ্র সরকার শোয়। কেন না, তাহাতে অত্যন্ত ছারপোকা।

রোগ হইলে আমার স্ত্রীর ঔষধে অরুচি হয়, এবং আরোগ্যের সুখে কুপথ্যে রুচি দেখা দেয়। কাল্পনিক রোগে ছেলেদের ঔষধ দিতে বিলম্ব হইলে আমার স্ত্রীর মাতৃস্নেহ উদ্বেল হইয়া সংসার ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করে; কিন্তু আসল ব্যাধির সময় ঔষধ খাওয়াইতে ভুল হইয়া যায়;—মায়ে ঔষধাদি খাওয়াইলে ফল হয় না, এই সকল শাস্ত্র বাহির হয়।

আমাদের যে ঝি তিন পুরুষ মানুষ করিয়াছিল, তাহার মাহিয়ানা ছিল এক টাকা। মরিবার আগে তার দুই টাকা করিয়া পেন্সন বরাদ্দ হইয়াছিল। আমার স্ত্রীও ঝি সরবরাহ করিয়া থাকেন। কেহ দু' দিন থাকে, কেহ দশ দিন; অর্থাৎ, মেজাজের পরিচয় পাইতে দশ দিনের বেশী কাহারও লাগিতে দেখি নাই। বেতন ৩৲ টাকার বেশী নয়। জলখাবারের চারি আনা মাসে, এবং আর চারি আনা নারকেল তেলের জন্য। পান ও পানের মশলা, দশমীর জলখাবার, একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার ভাতের বদলে কটি, তিনখানি গামছা, ছয়খান কাপড়, রাত্রে ৯টার আগে ছুটি ও সকালে ৭টার পর আসা, এবং বেলা ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত শুন, এবং তক্তাবাসে লাভের লোভ, এই সকল সর্ত্তে বন্ধ হইবা, আমার স্ত্রী ঝি আমদানি করিয়া থাকেন, এবং রপ্তানীও খুব চটপট হয়। বৎসরের মধ্যে মহেন্দ্র সরকারকে বিস্তর নাম ফাঁদিতে ও অনেক জগাখরচ করিতে হয়। স্বজাতি-(পুরুষ)-প্রীতির-উপরোধে একবার এই ঝিয়ের প্রসঙ্গ ইঙ্গিতে উত্থাপন করিয়াছিলাম; ফলে চিনিবাস তিন দিন মুখে দুটা ভাত গুঁজিবার অবসর পায় নাই। গাড়ীভাড়ার বাকি, ধোবার বাড়ী দিবার কালে পকেটে ও ঘর ঝাড়িবার সময় টেবিলের উপর হইতে কুড়িয়ে পাওয়া রেজকির খাতিরে আজও টেঁকিয়া আছে। ছেলেটার উপর মায়াও পড়িয়াছে, তাই ছাড়িয়া যাইবার নোটিস দেয় নাই। কিন্তু সে জন্য ভাবনা নাই, শীঘ্রই দিবে।

স্ত্রীর আমার বুদ্ধি যেমন প্রখর, স্মরণশক্তিও তেমনই তীক্ষ্ণ ও আশ্চর্য্য। গয়লা যখন পাঁচ সেরের দরে হিসাব ধরে, তখন তিনি বলেন, "রসো, পাঁচ সের ক'রে হ'লে এক টাকায় ক' সের হ'ল?" ভিখারীকে মুষ্টান্ন দিবার কালে মনে পড়ে, জ্ঞাতিদের মধ্যে অমুকের সন্তান হইয়াছে, আমাদের শুভাশৌচ, ভিক্ষা দিতে নাই। কিন্তু যখন আর পাঁচ ঘরের মেয়েদের নিন্দা করিয়া হরমণি ঠাকরুণ দু'জনের মত সিদে একলা বাঁধিয়া লইয়া যান, তখন বোধ হয় অশৌচত্ব কাটিয়া গিয়া গুভটা শুভতর হইয়া উঠে। এ দিকে আমার স্ত্রী হিসাবী খুব। সংসারে দিলে পাচ্ছে মারা যায়, বা আদায় হইতে বিলম্ব হয়, এ জন্য আবশ্যক হইলে নিজের ছেলের জন্য এরারুট কিনিতে বা জামেয় মেয়ের জন্য দুইখানা বিস্কুট কিনিতে দুইটা পয়সা বাহির হয় না; কিন্তু তাঁর ভাই আসিলে সেই একই দিনে দু' টাকা খরচ করিয়া চপ্ কাটলেট সন্দেশ রাবড়ী ইত্যাদি আনাইয়া খাওয়াইয়া দেন; ঘরে খাবার করিলে পাছে অন্যে ভাগ পায়। বুদ্ধিমতী গৃহিণী অভাবের মুখে চাঁপা দিয়া সম্মানের শঙ্খে ফুৎকার দেন। জন্ম বোকা স্ত্রীর মত তাঁর নিকট অমন মুড়ি মিছরীর একদর নয়। সংসার করা কি সামান্য কথা? একটা প্রকাণ্ড ব্যবসা চালান—বরং সহজ! এখানে চক্ষুলজ্জা করিলে ঠকিতে হয়।

টাকা ধার দেওয়া ও তাহার সুদ আদায়ের ব্যাপারটা আর তোমাদের শুনিয়া কাজ নাই। কেন না, তাহা হইলে তোমাদের স্ত্রীরা শিখিবে, আমার স্ত্রীর ব্যবসা মাটী হইবে। সুতরাং সে কথা আর বলিব না। সাংসারিক অবস্থার উন্নতিকল্পে আমার স্ত্রীর এরূপ ছোট খাট আরও অনেক ব্যবসা আছে।

আগে যখন তহবিল সরকারের কাছে ও হুকুম আমার কাছে ছিল, তখন ডাকিবামাত্র গাড়ী পাইতাম। এখন আর আমি পাই না, কিন্তু আমার স্ত্রী একখানার স্থলে দশখানা পাইয়া থাকেন; অর্থাৎ, অবৈতনিক হাকিমকে ঘণ্টা হিসাবে বাঁধা সোয়ারী দেওয়া ও "মা-জী"কে আরোহী করায় প্রভেদ অনেক। এ দিকে হচ্ছে ঘরের খেয়ে বনের মহিষ চরাণ, অপরটি কালীঘাট ও গঙ্গাস্নানের পুণ্যসঞ্চয়। চাকরদিগের মধ্যে শুকলাল দরওয়ানই গৃহিণী ঠাকুরাণীর প্রিয়পাত্র; কেন না, সে তার নিজের কর্ত্তব্য ছাড়া "মা-জীর" দরুণ সকল কাজ করিবারই সময় পায়। অর্থাৎ, চিঠি বহা বা বাড়ী-ঢোকি

---

* বাড়ীর জামাই, অর্থাৎ আমার ভগ্নীপতি আসিলে, ব্যবস্থা অন্যরূপ। তখন চপ কাটলেটের জন্য টাকা পড়ে না; লুচি আলুর দম ধোকা প্রভৃতির জন্য পয়সা বাহির হয়।

দিবার কালে দেখিতে পাইবে, সে হয় ভুট্টাওয়ালী খোট্টানীর দোকানে দাঁড়াইয়া গল্প জমাইতেছে; নয় ত গঙ্গামৃত্তিকা আনিতে গিয়াছে; নয় ত গঙ্গার পুণ্যসলিলে বাঁধিবার ইন্ধন ধুইয়া প্রবিত্র করিয়া রাখিতেছে; নয় ত ভিজা কাপড়ে "মা-জী"র জলখাবার আনিতে গিয়াছে; নয় ত "মা-জী"র সোয়ারীর সঙ্গে গাড়ীতে বাইবে বলিয়া আবদার বাঁধিতেছে। যখন এই সকল সৎকর্ম্মে শুকলাল নিযুক্ত না থাকে, তখন দেখিবে, সে "মা-জী"র আত্মীয় কুটুম্ব যে যেখানে আছে, তাহার তত্ত্ব লইয়া ফিরিতেছে।

শুকলালকে তাড়াইয়া একটা মুসলমান দরওয়ান রাখিবার প্রসঙ্গ একবার উত্থাপন করিয়াছিলাম। ফল যাহা হইয়াছিল, তাহা যেন তোমাদের ভাগ্যে না ঘটে।

আমার সহিত কথা কহিবার কালে আমার স্ত্রীর অবগুণ্ঠন অকস্মাৎ দেড় হাত বাড়িয়া গিয়া কলা-বৌএর ঘোমটার মত লম্বা হইয়া পড়ে, দেখিতে পাই। কিন্তু বাড়ীতে যখন কোনও লোক আসে, ঠিক সেই সময় আমার সুমধুরভাষিণীর কণ্ঠস্বরে সপ্তস্বরের সুরগ্রাম খেলিতে থাকে। আমার লজ্জাবতীর অভিধানে ইহারই নাম লজ্জা।

ছেলেরা দুষ্টামী করে, এবং আমার স্ত্রী যখন তাহাদিগকে আঁটিয়া উঠিতে না পারেন, তখন তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্য আমাকে বাহির হইতে ডাকিয়া লইয়া যাওয়া হয়। গিয়া দেখি, তাহারা নিতান্ত নির্দ্দোষ শিশুসুলভ আমোদে ব্যস্ত। শাসন করিব কি, তাহাদের সে আমোদে যোগদান করিয়া আমি নিজেই অনেকটা আনন্দ উপভোগ করি। আমার স্ত্রী তাহা দেখিয়া মহা ক্ষাপা হইয়া উঠেন। কিন্তু যে সময় সত্যই তাদের শাসন প্রয়োজন, সে-সময় তাঁর নিজের অভিলষিত কাজের খাতিরে তাদের অন্যায় বায়নাকে প্রশ্রয় দেওয়া ও ঘুস দিয়া তাহাদের মুখ বন্ধ করা হয়। আমার স্ত্রীর মতে ইহাই শিশুশিক্ষা।

যদি বলি, "আচ্ছা সূর্য্যমুখী ও তোমার মত সোনামুখীতে তফাৎ কি, বল দেখি?" তার উত্তর পাই, "আর যাই হ'ক, বরণডালা সাজাবার বিষয়ে আমরা দু'জনে এক; পার ত একটা কুন্দর যোগাড় দেখ না।" যদি বলি, "বল দেখি, 'যাও প্রফুল্ল। একবার জয়ন্তীর পাশে গিয়া দাঁড়াও, উভয়ে মিলিয়া সনাতন ধর্ম্ম পূর্ণ কর,' এর মানে কি?" তবে তিনি বলেন, "কেন, আমি কি তোমার কাছে এগজামিন দিতে এসেছি নাকি?"

মেজাজ গরম করিয়াও দেখিয়াছি। ক্বচিৎ ফল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই উল্টা উৎপত্তি হয়। অধিকন্তু আমার বন্ধু অনাথের মতে, এরূপ মেজাজ

সম্বন্ধে কতিপয় প্রবন্ধ রচনা করি, এবং বঙ্গীয় পাঠকের নিকট মুসলমান ধর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিবার চেষ্টা করি। আমার প্রবন্ধসমূহ কলিকাতার অগ্রগণ্য সাময়িকপত্র 'সাহিত্য' ও 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রশ্ন। আপনি বঙ্গ-সাহিত্য সম্বন্ধে সংপ্রতি 'ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট' পত্রে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সেই জন্য, অথবা আপনি গ্রেট বৃটেনের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য বলিয়াই আপনাকে মনোনীত করা হইয়াছে?

উত্তর। ইহার সহিত আমার রচিত প্রবন্ধের কোনও সম্পর্ক নাই। 'সাহিত্য' নামক বাঙ্গালা মাসিকপত্রের সম্পাদক সাহিত্য-পরিষদে আমার নামোল্লেখ করেন। আমি M. R. A. S. বলিয়াই যে পারসী শব্দের বঙ্গভাষায় বর্ণান্তর কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছি, এমন নহে। সাহিত্য-পরিষদের সদস্যবর্গের মধ্যে ঐরূপ উপাধিধারী অনেক ব্যক্তি আছেন। এই সাহিত্য-পরিষৎ অল্পদিনের নহে। প্রায় দশ বৎসর হইল, উক্ত সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এ কথা স্মরণ রাখিবেন। সাহিত্য-পরিষদের সদস্যবর্গের মধ্যে সার্ উইলিয়ম ওল্ডেভারবরণ, সার্ জর্জ্জ বার্ডউড, সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাহীন তাড়িতবার্ত্তার উদ্ভাবনকর্ত্তা ডাক্তার জে. সি. বসু, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ডাক্তার মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি মিঃ মিত্র, বিচারপতি মিঃ ঘোষ, মিঃ আর. সি. দত্ত সি. আই. ই., বঙ্গদেশের লীগাল রিমেমব্রান্সার মিঃ বি. এল. গুপ্ত আই. সি. এস., মিঃ সি. দে এম. এ., আই. সি. এস্, মোলাপুরের ভূতপূর্ব্ব সেসন জজ মিঃ এস্. এন্. ঠাকুর আই. সি. এস্. ও অন্যান্য আরও অনেক লোক আছেন। সাহিত্য-পরিষদের ছয় শত সদস্য ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞানগৌরবে সমগ্র বঙ্গভূমির প্রতিনিধিস্থানীয়, ইহা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। আপনি বোম্বাইয়ের অধিবাসী, বঙ্গদেশ যে জ্ঞানসম্পদে ভারতের প্রদেশসমূহের অগ্রণী এ কথা বোধ করি স্বীকার করিবেন।

প্রশ্ন। এই ছয় শত সদস্যের মধ্যে পারসীভাষায় অভিজ্ঞ কতিপয় ব্যক্তি অবশ্যই আছেন?

উত্তর। সাহিত্য-পরিষদের সদস্যবর্গের মধ্যে কতিপয় পারস্যভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন। আমার পিতৃব্যপুত্র মিঃ বি. দে আই. সি. এস্. মহাশয়ের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তিনি পারসী ভাষায় 'অনর্স' পরীক্ষায় সম্মানসহকারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে চারি সহস্র টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। মিঃ বি. এল. গুপ্ত, আই. সি. এস্ মহোদয় পারস্য ভাষায় পারদর্শী। কলিকাতায় বহুসংখ্যক বঙ্গবাসী মুসলমান গ্রাজুয়েট আছেন। ইঁহারাও পারসী জানেন।

প্রশ্ন। আপনি কি বলিতে চাহেন, এই সদস্যবর্গের মধ্যে কেহই মাতৃভাষার এই অভাব পূরণের চেষ্টা করেন নাই?

উত্তর। তিন জন সদস্য পারসী শব্দের বর্ণান্তর বিষয়ে কতিপয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পরিষৎ উক্ত মন্তব্যসমূহ সংশোধনার্থ আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই মন্তব্য নির্ভুল নহে। সংশোধন করিতে গেলে মন্তব্যগুলিকে আবার নূতন করিয়া লিখিতে হইবে।

প্রশ্ন। সাহিত্য-পরিষৎ আপনার দ্বারা কোন্ কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করাইতে চাহেন?

উত্তর। আমার দ্বারা বঙ্গাক্ষরে আরবী ও পারসী শব্দের যথাযথ বর্ণান্তর কার্য্য সম্পাদন

করাই পরিষদের অভিপ্রেত। সংস্কৃত ও বঙ্গীয় বর্ণমালার পার্থক্য অতি সামান্য। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক প্রাচ্য মহাসমিতির অধিবেশন হয়। সমিতি বর্ণান্তর বিষয়ে যে বিজ্ঞানসম্মত নিয়মাবলীর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমি ঐ রীতির অনুসরণ করিব, স্থির করিয়াছি।

প্রশ্ন। বঙ্গীয় বর্ণমালা কি সংস্কৃত বর্ণমালার অনুরূপ?

উত্তর। একপ্রকার অনুরূপ বলা যাইতে পারে। কেবল কতিপয় বঙ্গীয় বর্ণের ও সংস্কৃত বর্ণের মধ্যে উচ্চারণের পার্থক্য লক্ষিত হয়।

প্রশ্ন। পরিষৎ বর্ণান্তরপ্রণালী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আপনাকে মনোনীত করিবার পরেই কি ঐ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে?

উত্তর। বর্ণান্তরবিষয়ক নিয়মাবলী প্রচলিত না থাকাতে বিগত দশ বৎসর হইতে আমি বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছি। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আমি পারসী কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করি। ইংরাজ লেখকেরা সাধারণতঃ ফিরদউসির সময় হইতে পারসী কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন। আমি ঐ রীতির অনুসরণ করি নাই। পারস্য দেশের হোমার ফিরদউসির সময় পর্য্যন্ত আসিয়াই আমার রচিত ইতিহাস শেষ হইয়াছে। পারসী ও সিরীয় শিলালিপি হইতে ইতিহাসের সূচনা করিয়াছি। পারসী শব্দাবলী ইংরাজী অক্ষরে বর্ণান্তরিত করিতে আমাকে কিছু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক প্রাচ্যসমিতির অধিবেশনে এই সমস্যার মীমাংসা হয়। কিন্তু ইহাতেও আমার অসুবিধা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই। মুসলমান সাহিত্য সম্বন্ধে সন্দর্ভ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া দেখিতে পাইলাম, রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর নির্দ্দিষ্ট বর্ণান্তর-প্রণালী তত কাজে লাগিতেছে না। গত দশ বৎসর ধরিয়া আমি বর্ণান্তর বিষয়ে কতিপয় নিয়ম-প্রণয়নের চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এক্ষণে সাহিত্য-পরিষৎ ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করায়, আমার নবোৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে।

প্রশ্ন। এই কার্য্য সম্পাদন করিতে আপনার কত সময় লাগিবে? কাজটি অনায়াসসাধ্য নহে।

উত্তর। প্রাচ্য-সমিতি ইউরোপীয় বর্ণমালার সাহায্যে প্রাচ্য অক্ষরসমূহের বর্ণান্তর-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কিরূপে আরবী ও পারসী 'ধ্বনি' (Sound) সংস্কৃত (বাঙ্গালা) অক্ষরে যথাযথ প্রকাশিত করা যায়, সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করেন নাই। যাহাতে মনীষিগণ আমার প্রণীত বর্ণান্তরপদ্ধতির বিশ্লেষণ করিয়া দোষ উদ্ঘাটন করিতে না পারেন, তজ্জন্য আমাকে শতগুণ শ্রমস্বীকার করিতে হইবে।

প্রশ্ন। মিঃ—মিত্র, আপনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা আপনার শক্তি ও রুচির অনুযায়ী বটে। ভবিষ্যতে এই কার্য্য সম্পাদন করিয়া আপনি যশস্বী হইবেন। কিন্তু কাজটি বোধ করি আয়াসসাধ্য নহে।

উত্তর। না; কাজটি সহজসাধ্য নহে। 'ঐতিহাসিক ব্যাকরণের অনুশীলনলব্ধ জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত এবং বাঙ্গালী-পাঠকের বোধগম্য করিয়া আমাকে বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এই কার্য্যসম্পাদনকালে 'নিরুক্ত' (Etymology) বিষয়ক নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী এবং উচ্চারণের

(Sound) সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্যের প্রতি আমাকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বঙ্গভাষায় যে সকল আরবী ও পারসী শব্দ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, আমি ইতিমধ্যে তাহার সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। উক্ত শব্দাবলীর মধ্যে কতিপয় শব্দ অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি শব্দ এরূপ রূপান্তরিত হইয়াছে যে, তাহাদিগের স্বরূপনির্ণয় অতীব দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। আপনি শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, পরিষদের অন্যান্য সদস্যেরা শব্দসমূহের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই তালিকাটি সংশোধনার্থ পরিষৎ আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমি পরিষৎকে বলিয়াছি যে, আন্তর্জাতিক সমিতির উচ্চারণ-পরিবর্ত্তন-বিষয়ক নিয়মানুসারে আমাকে কার্য্য করিতে হইবে।

প্রশ্ন। আপনি কি মনে করেন, পরিষৎ সকল বিষয়ে আপনার মতানুবর্ত্তী হইবেন?

উত্তর। আমার মতের দৃঢ়তা কিরূপ, তাহা আপনি অবগত আছেন; কি সাহিত্য, কি রাজনীতি,—কোন বিষয়েই আমি কখনও অন্ধভাবে কাহারও অনুসরণ করি না। আমি বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে কার্য্য করিব। কোন ভাষাতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিই আমার কার্য্যে প্রতিবাদ করিবার অবকাশ পাইবেন না। আমি বর্ণান্তর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পর সাহিত্য-পরিষৎ আমাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করেন। আরবী ও পারসী শব্দের বর্ণান্তর বিষয়ে আমি সংস্কৃত বৈয়াকরণ পাণিনির ষত্ব ও ণত্ব বিধানের অনুবর্ত্তী হইব না, এ কথা আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছি। তাঁহারাও আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। পারসী ও বাঙ্গালা-শব্দের উচ্চারণগত সাম্যসংক্রান্ত নিয়মাবলীর অনুশীলন, উভয় ভাষার বহুবর্ষব্যাপিনী আলোচনা ও বিবিধ অনুসন্ধান সাপেক্ষ। সাধারণতঃ প্রচলিত পদ্ধতি বজায় রাখিতে গিয়া বর্ণান্তর কার্য্যে অনেকে ভ্রমপ্রমাদে পতিত হন। অনেকে আবার শৈথিল্যবশতঃ বৈদেশিক শব্দের স্বেচ্ছ বর্ণবিন্যাস গ্রহণ করিয়াও ভ্রান্ত হন। ইংরাজী ভাষাতে আরবী শব্দের উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করাও অতীব দুরূহ কার্য্য। কিন্তু বর্ণান্তরকালে যথাসাধ্য প্রকৃত উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ নিয়মের অনুসরণকে অতিবিজ্ঞতা বলা যাইতে পারে না। শব্দের বিকৃত বর্ণবিন্যাসের সংশোধনের কাল অতীত হইয়াছে বলিয়া তর্ক উপস্থিত করিলে ভবিষ্যবংশীয়দিগের অসুবিধার বৃদ্ধি করা ভিন্ন আর কিছু হয় না। যখন ইংরাজী K ও Q এই দুইটি অক্ষরের ব্যবহার করিলে সুচারুরূপে কাজ চলিতে পারে, তখন কেবল C দ্বারা তিনটি আরবী অক্ষরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার প্রয়োজন কি? এবং যখন ইংরাজী অক্ষরসমূহের উপরে ও নিম্নভাগে বিন্দু প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট করিলে ইংরাজী ভাষায় অপরিচিত শব্দের উচ্চারণ চলিয়া যায়, তখন ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন না করিবার কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারি না। ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে আরবী ও পারসী শব্দের উচ্চারণ সংস্কৃত অক্ষরে বহুপরিমাণে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিতে পারা যায়। পারসী বর্ণমালায় বাক্যের পরিচালক স্বরবর্ণের অস্তিত্ব নাই। পারসী ভাষায় সর্ব্বসমেত বত্রিশটি অক্ষর (তন্মধ্যে আটাশটি আরবী) ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। তবে স্বরবর্ণ কিরূপে উচ্চারিত হয়?

উত্তর। প্রথমে যে কোরাণ লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে স্বরবর্ণের (সাঙ্কেতিক) চিহ্ন ছিল না। কোরাণের ঐরূপ পাণ্ডুলিপি এখনও পারিসের ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে দেখিতে পাওয়া

যায়। রেনা (Renan) ও লেনর্মো (Lenormant) বলেন, উক্ত পাণ্ডুলিপিসমূহ Semitic অক্ষরের অনুরূপ বর্ণমালায় লিখিত। আরবী বর্ণমালায় স্বরবর্ণের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। এই অভাবের প্রতিকারকল্পে (১) উচ্চারণের বিশেষত্বব্যঞ্জক বিন্দুসমূহ, (২) স্বরবর্ণের সাঙ্কেতিকচিহ্ন ব্যবহৃত হইতেছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। তদ্দ্বারা সিরীয়, হিব্রু ও আরবী, এই তিনটি Semitic ভাষার যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতি সাধিত হইয়াছে। উচ্চারণজ্ঞাপক বিন্দুসমূহ ব্যবহৃত হওয়ায় সমআকৃতিসম্পন্ন অক্ষরসমূহের পার্থক্যনিরূপণ অনায়াসসাধ্য হইয়াছে। আর স্বরবর্ণের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হওয়ায় পরিবর্ত্তন-যোগ্য শব্দের নির্দ্দেশ ও বিভিন্ন প্রকৃতির উচ্চারণ-পরিজ্ঞাপনের সুবিধা হইয়াছে। আরবী ও পারসী ভাষায় স্বরবর্ণের কেবল তিনটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে। দশটি সংস্কৃত স্বরবর্ণের উচ্চারণ পরিব্যক্ত করিতে তাহাদের দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণের উপরিভাগে, এবং একটি উহার নিম্নভাগে ন্যস্ত বেশিত হয়। পারসী ভাষায় দশটি বিভিন্ন কণ্ঠধ্বনি (Vocal Sound) আছে। আলিফ্ (Alph) বে (w) ও ইয়া (y) লিখিবার সময়ে সময়ে স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করা হয়।

প্রশ্ন। ব্যঞ্জনবর্ণের বিষয়ে আপনার কোনও মন্তব্য নাই বলিয়া বোধ হয় আপনি কোন মন্তব্য করেন না?

উত্তর। উক্ত ভাষা দুইটির ব্যঞ্জনবর্ণসমূহের উচ্চারণগত সাম্য-বিধান অনায়াস-সাধ্য নহে। ইংরাজী বর্ণ দ্বারা যথাযথ ব্যক্তি করিতে পারে, বঙ্গ ও সংস্কৃত বর্ণমালায় এমন কোন বর্ণ নাই। তদ্ভিন্ন দুরুচ্চার্য্য আরবী অক্ষর "জইন্" (Jim) ও "কাফ্"এর (qaf) এর যথাযথ উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করিতে আমাকে বিশেষ ক্লেশস্বীকার করিতে হইবে। সমগ্র ইউরোপীয় বর্ণমালায় "জইন্" (Jim) অক্ষরের প্রকৃত উচ্চারণ-পরিজ্ঞাপক কোনও বর্ণই নাই। এই জন্য ডাক্তার ষরস্ (Forbes) রোমান বর্ণ (') সাহায্যে উহার উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। হিব্রু "জইব" (Jim) এর উচ্চারণ সম্বন্ধে অদ্যাপি কেহ স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। সুতরাং আরবী "জইন" উচ্চারণ সম্বন্ধে উহার অনুরূপ কি না, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। আরবী "জইন্" অক্ষর নিম্নতর ভাগের পেশীসমূহের সাহায্যে উচ্চারণ করিতে হয়। qaf সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। পূর্ব্বে ইহার নীচে একটি বিন্দু সন্নিবিষ্ট করিয়া উহার উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করা হইত। এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে Q ব্যবহৃত হইতেছে। আরবী অক্ষর লাম (Lam) সাধারণতঃ ইংরাজী L এর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু আরবী article ('সর্ব্বনাম')-আল্-(al=the)-এর অন্তর্নিবিষ্ট-হইলে, উহার পরবর্ত্তী অক্ষরের প্রকৃতি-অনুসারে লাম্-এর প্রকৃত উচ্চারণের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। এই প্রকার লাম্-এর (Lam) উচ্চারণের পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু উহার আকৃতি অবিকৃত থাকে। "লাম্" (ل) অক্ষরটির সন্নিবেশ-বৈচিত্র্যবশে উহার উচ্চারণেরও বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। ফরাসী রোঁদ্রে (rondre) শব্দের অন্তর্গত 'এন্'-(N)-এর মত সময়ে সময়ে ইহার উচ্চারণ অনুনাসিক হইয়া থাকে। কখন কখন অনেকটা 'এম্'-এর (M) উচ্চারণও প্রকাশ করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন শব্দনিচয় পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমানভাবে উচ্চারিত হয় না। টাইগ্রীস নদীর তীর হইতে আট-লাণ্টিক মহাসমুদ্রের উপকূলে গমন করিলেই উভয় দেশের অধিবাসীদিগের আরবীশব্দের উচ্চারণগত

যাইতে পারে। এই অক্ষরটি নানাভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে। তুরকী, পারসী ও ভারতীয় মুসলমানেরা এই অক্ষরটিকে 'এস্'-এর (S) ন্যায় উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সিরিয়া ও মিশর দেশে এই অক্ষরটির উচ্চারণকালে প্রায়ই লোকে উহাকে ফরাসী ব্যঞ্জনবর্ণ 't' র (tt) ন্যায় উচ্চারণ করে। আরবী অক্ষর 'টা'র উচ্চারণ সংস্কৃত ষোড়শতম অক্ষরের উচ্চারণের অনুরূপ এবং ইংরাজী অক্ষর 't'র (T) অপেক্ষা ইহার উচ্চারণ অধিকতর দন্ত্য ও কোমল। আধুনিক আরবী ও পুরাতন আরবীর মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। আধুনিক গ্রীক্ ও থুসিডাইডিস্ (Thucydides) ভাষার মধ্যে যে-পার্থক্য, এই-পার্থক্য তাহার অনুরূপ।

পারসী ভাষার উচ্চারণেও বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয়।—Bári, Nálish, Khizl, Gilj, Rízi, Záviil, Súghdi প্রভৃতি পারসী ভাষার নানাপ্রকার উপভাষা (dialects) আছে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্থানের পাঁচদে বিভাগের পর রুসীয় পণ্ডিত M. Shúkovski কয়েক বৎসর প্রাদেশে অবস্থিতি করেন, এবং ১১টি বিভিন্ন উপভাষার অনুশীলন করিয়া তৎসম্বন্ধে রুসীয় ভাষায় পাঁচখানি বৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি এইরূপে উপভাষাসমূহের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন :—

(১) সিরাজ; (২) কাশান; (৩) সেমনান-তিহ্রাণ; (৪) ইস্ফাহান। আমি যত দূর অবগত আছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস, ঐ পুস্তকসমূহ অদ্যাপি ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হয় নাই। Ibnul Muqaffa হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় মুসলমান লেখকই পারসী, পহ্লবী ও দারীর আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের আলোচনা অধুনাতন ভাষাবিজ্ঞানের মতে সন্তোষকর হয় নাই। এই উপভাষানিচয়ের প্রধান প্রধান বিশেষত্ব-সমূহ আদর্শ পারসী ভাষার সহিত উক্ত উপভাষা-সমূহের সম্পর্ক নির্দ্দেশপূর্ব্বক শব্দগত পরিবর্ত্তন নিরূপিত করিয়া থাকে। M. Shukovskiর পরেই পারসী উপভাষাসমূহে অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে M. Clément Huart ও অধ্যাপক ব্রাউনির নাম উল্লেখযোগ্য। বর্ণাস্তর বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিতে হইলে, এই সকল উপভাষার ও অধুনাতন পারসী প্রাকৃত-ভাষাগত ধ্বনিসমূহের পরিবর্ত্তনের অনুশীলন করা আবশ্যক। উস্তাদ-ই-জান্‌কারাণের বৃদ্ধ জিলানীর চরিত্র ও সিরাজী জাকার-কোয়ারিজা ডানি প্রণীত নাটকের মাস্তো আলি খাঁ চরিত্র পারসী ভাষার ধ্বন্যাত্মক নিয়মাবলীর সুন্দর পরিচয় প্রদান করিতেছে। নিরঞ্জা হবিব্ প্রণীত 'দস্তুর-ই-সুখন্' নামক গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় পারসীরা আরবী ভাষার চতুর্থ, দ্বাদশ ও চতুর্দ্দশ বর্ণ অবিকল ইংরাজী 'S'এর মত, এবং alif-কে aliph-এর ন্যায় উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কোন পুস্তকের সাহায্যেই পারসী প্রাকৃত ভাষার ধ্বনি সমূহ যথাযথ আয়ত্ত করা যায় না। প্রত্যেক ধ্বনির স্বরূপনির্ব্বাচন ও উহার ঝঙ্কারবৈচিত্র্য নিরূপণোপযোগিনী বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি, বিবিধ ভাষার ধ্বনিনিচয় ও পারস্যবাসী শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিসমূহের সহিত কথোপকথনে শ্রুতিকুশলতা ও অবিকৃতশক্তি শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই কেবল এই কার্য্যে নৈপুণ্য লাভ করা যায়। যাঁহারা অভিনিবেশসহকারে অধুনাতন পারসী ভাষার উচ্চারণ বিষয়ে অনুশীলন করিতেছেন, তাঁহারাই জানেন, সিরাজি ভাষায় লিখিবার সময় nán (bread) লেখা হয় বটে, কিন্তু উচ্চারণকালে লোকে উহাকে núm-উচ্চারণ করিয়া থাকে। এরূপ নানি-শাভাদ (Nani-Shavad), উচ্চারণকালে Nami-Shad উচ্চারিত হয়। আমার

মৌলবী এক জন শিক্ষিত সিরাজী (Shirázi), কিন্তু দ্রুত কথোপকথনকালে তিনি প্রায়ই ক্রিয়ার অতীতকালজ্ঞাপক 'শুদ্'-এর বিভক্তি dálএর 'd' র উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন,—নামিরাড্ বলিতে নামিরা বলিয়া বসেন। যাঁহারা পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিবেন, এই সকল উপভাষার আলোচনা তাঁহাদিগের পক্ষে বিশেষ ফলোপধায়ক।

আরবের অধিবাসীরা যে ভাবে আরবী শব্দের উচ্চারণ করে, পারসী ভাষায় উক্ত শব্দ সেইরূপ যথাযথ উচ্চারিত হয় না। পারসীরা তাহাদিগের মাতৃভাষার ধ্বনিবিষয়ক নিয়মানুসারে আরবী অক্ষরের উচ্চারণ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া, উক্ত অক্ষরসমূহ পারসী ভাষায় প্রচলিত ও অনুরূপ-ধ্বনিবিশিষ্ট অক্ষরনিচয়ের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ ain এই অক্ষরটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অক্ষরটি আরবী ভাষায় দীর্ঘ-উচ্চারণ-সম্পন্ন কণ্ঠ্যবর্ণ, কিন্তু পারসী ভাষায় উহা সামান্য (hiatus)* মাত্র। উভয় ভাষার বর্ণের এইরূপ উচ্চারণগত বৈষম্য থাকাতেই আমাকে বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইতেছে। বর্ণবিন্যাস যথাযথ না হইলে শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে; যথা amadanএর অর্থ আগমন, কিন্তু amdan = ইচ্ছাপূর্ব্বক। সুতরাং আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, এই কার্য্য কিরূপ কঠিন।

প্রঃ। অভিধানের সাহায্যে কি আপনার অসুবিধা দূরীভূত হয় না?

উঃ। হইলে ভালই হইত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হয় না, কোন অভিধানই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে; অনেক সময় অভিধানের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইতে হয়। কেবল তাহাই নহে, কোন কোন অভিধানে শব্দসমূহের অপ্রচলিত উচ্চারণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। Mr. Wollaston প্রণীত Persian-English Dictionary এই শ্রেণীর বর্ত্তমান অভিধান-সমূহের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু বৈদেশিকের পক্ষে অভিধানখানি সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। Wollaston লিখিয়াছেন,—mara bartarf shudan; সিরাজের কোনও অধিবাসী তাঁহার এই লিপিপ্রণালী দেখিলেই বলিবে, তিনি প্রথম শব্দের উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। শব্দটি (Maraz) মারাজ্ হওয়া উচিত ছিল।

প্রঃ। তাহা হইলে অক্ষর ও শব্দের যথাযথ উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইলে শ্রুতিনৈপুণ্য ও কণ্ঠের পরিশ্রম আবশ্যক; অথবা স্বভাবসিদ্ধ শক্তি না থাকিলে কেবল প্রভূত শ্রম স্বীকার করিলেও ঐ কার্য্য সাধিত হইবার নহে।

উঃ—সংস্কৃত বর্ণমালার সাহায্যে আরবী, ওষ্ঠ্য, দন্ত্য, তালব্য বর্ণের উচ্চারণ অনায়াসেই পরিব্যক্ত করা যায়; কিন্তু কতিপয় উচ্চারণবৈচিত্র্যসম্পন্ন কণ্ঠ্যবর্ণ এবং রাসন (lingual) বর্ণের উচ্চারণ কিরূপে পরিব্যক্ত করা যায়? রুবেন অভিধানের গ্রন্থকার উচ্চারণ-নির্দ্দেশ বিষয়ে যে বিন্যাস-প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন, বৈদেশিক ধ্বনির পরিজ্ঞাপনার্থ আমাকে সেই প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইয়াছে। সেই জন্য আমি ধ্বনিবৈচিত্র্যসম্পন্ন আরবী ও পারসী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবার জন্য রেখা (—) প্রণালীর উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বৈদেশিক শব্দ লিখিবার জন্য ইংরাজীতে ইটালিক অক্ষর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমি বাঙ্গলা ভাষায় ঐ

* Hiatus পারিভাষিক শব্দ। ইহার অর্থ এই,—concurrance of two vowels in two successive syllables or words.

প্রণালীর অক্ষর-ব্যবহার করিবার জন্য বঙ্গীয় বর্ণমালার যাহাতে পরিবর্ত্তন বিষয়ে আলোচনা করিতেছি।

প্রঃ। তাহা হইলে, আপনি এমন একটি প্রণালীর উদ্ভাবন করিতে চাহেন, যাহা নিখনী-বঙ্গীয় সামঞ্জস্যের সহিত বিস্তৃতির ও ঐক্যের সম্মিলনে লোকের আদরণীয় হইবে।

উঃ—আমি ঐরূপ করিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু জানি না, আমার চেষ্টা কত দূর ফলবতী হইবে। সম্পূর্ণরূপে আরবী বর্ণমালার অনুশীলন করিতে হইলে, পুরাকালের ফিনীসীয় বর্ণমালারও আলোচনা আবশ্যক। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যভাষাবিৎ Nolmeke, প্রাচীন ফিনিসীয় বর্ণমালা ও অধুনাতন আরবী (Nashki) অক্ষরসমূহের সাদৃশ্য প্রদর্শন করেন। ফিনিসীয়ান বর্ণমালা হইতে অদ্যকার সেমেটিক বর্ণমালা উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথা অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করিয়াছেন। মিঃ হেলিভি (Halevy) বলিয়াছেন, ফিনিসীয় বর্ণমালা মিশরের চিত্রাক্ষর (Hieroglyphs) হইতে উৎপন্ন। কিন্তু মিঃ ডিকি (Dgecke)-বলেন, ফিনিসীয় বর্ণমালা আসীরীয় লিপিতে ব্যবহৃত অক্ষরসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। দক্ষিণ আরব হইতে ডামস্কসের পূর্ব্বপ্রান্তে পর্য্যন্ত দেশসমূহে বিভিন্ন আরবী বর্ণমালা প্রচলিত আছে; সাধারণ বর্ণমালা—উক্ত বর্ণমালাসমূহের একটি বিশেষ সংমিশ্রিতস্বরূপ। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে Waddington, Wetzstein ও Devegnié বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে উক্ত বিভিন্ন বর্ণমালার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট, ব্যাপক ও প্রকৃষ্ট বর্ণান্তরপ্রণালীর প্রণয়ন গুরুতর পরিশ্রম ও অনুশীলন সাপেক্ষ।"

মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় এক্ষণে যে সকল দোষ বিদ্যমান, প্রস্তাবিত বর্ণান্তর প্রণালীর সাহায্যে তাহার অপনোদন কিরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাহা ভাষা-সংস্কারপ্রয়াসী নারায়ী পণ্ডিত উল্লিখিত আলোচনা হইতে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এই কার্য্য যথারীতি সম্পাদন করিতে হইলে, পারসী ভাষায় প্রগাঢ় বুৎপত্তি ও অসাধারণ অধ্যবসায় আবশ্যক। যিনি ধ্যানরত তপস্বীর ন্যায় নিভৃত কক্ষে বসিয়া মুসলমান সাহিত্যের অনুশীলনে চিত্তসমাধান করিয়াছেন, তাঁহাকে উত্তরকালে বঙ্গবাসী রঙ্গের Grimm নামে অভিহিত করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বকে স্মরণ করিবে।

কথা।

ধর্ম্মাধর্ম্ম।

ধর্ম্মাধর্ম্ম বলিয়া একটা কথা আছে। সময় পাইলেই আমরা তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হই। সংসার-আশ্রমে শিশুর অর্থহীন কলরবের জ্বালায় অনেক সময় আমাদিগকে সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিতে হয়। ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার তদপেক্ষাও বিরক্তিকর। কিন্তু মনেরও একটা ধর্ম্ম আছে। সেটা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

ধর্ম্ম কি, আমরা জানি না। আমরা যাহা বকি, তাহার বার আনার অর্থ জানি না। অথচ কোথা হইতে বকিবার প্রবৃত্তি আসিয়া জুটে, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না।

মধুর কথায় বলিলে ধর্ম্মের গৌরব অনেকটা রক্ষিত হয়। কিন্তু যাহারা ধর্ম্ম কি কখনও অনুভব করে নাই, অর্থাৎ ধর্ম্মের ধার ধারে না, তাহাদিগের নিকট মধুরতার আশা করা বিফল।—ধর্ম্ম-জগতে কর্কশবাক্যসংগ্রামের ফল যে কখনও ভাল হইয়াছে, তাহা শুনা যায় নাই।

শৈশবকাল হইতে আমরা যাহা শুনিয়া আসিয়াছি, এবং এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই একবার বীরভাবে নাড়াচাড়া করিয়া দেখিলে, বোধ হয় বড় তর্কবিতর্কের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পুরানো পড়া মনে রাখা বড় দুষ্কর। ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি ও বীজগণিতের কথার একটাও যে এখন মনে আছে, তাহা অধ্যাপক ভিন্ন কয় জন সাহস করিয়া বলিতে পারেন?

এই বিরাট বিশ্বের গোটাকতক নিয়ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে অনেক সন্দেহ মিটিয়া যায়।

কষ্ট না করিলে সুখ হয় না, পরিশ্রম না করিলে আনন্দ হয় না,—এটা অতি পুরাতন কথা। পরিশ্রম কিংবা কষ্টের অর্থ, দান। আমাদিগের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহা দান করিলে, তৎপরিবর্ত্তে আনন্দলাভ হয়। দেওয়াটা কষ্ট, কিন্তু পাওয়াটা সুখ। তর্কালঙ্কারের সন্দেহ হইয়াছিল যে, গ্রীষ্মকালে গাত্র ঘর্ম্মে কেন? এবং দ্বিতীয় সন্দেহ যে, গাত্র ঘর্ম্মপরিপ্লুত হইলে গৃহিণী বাতাস করেন না কেন? ইহার মূলে নিশ্চয়ই কোনও প্রচ্ছন্ন বিধান আছে। যদি ঘর্ম্ম বাহির না হইত, তাহা হইলেও কষ্ট, এবং বাহির হইলে যদি প্রাণপ্রিয়ার কোমলকরব্যঞ্জিত পাখার বাতাস না পাওয়া যায়, তাহা হইলেও কষ্ট। কাজেই হয় ত নিজের হাতে সারারাত্রি পাখা করিতে হইবে, কিংবা পাখাওয়ালা রাখিতে হইবে। উভয়ই কষ্টকর। উপরন্তু গৃহিণীর নিদারুণ স্বভাব লক্ষ্য করিয়া মনের কষ্টও না হইয়া যায় না। ইহার মধ্যে কোন্‌টা ধর্ম্ম, এবং কোন্‌টা অধর্ম্ম, তাহার বিচার করিতে গেলে, গৃহিণীকেও মনের কথা বলিতে হয়। এবং তাহার উত্তরে জানা যায় যে, গৃহিণীর সমস্যাও কর্ত্তার ন্যায়। কাজেই অবশেষে চটাচটি হইয়া উঠে, এবং ধর্ম্মস্রোত বাড়িতে থাকে। ইহার মধ্যে জগদীশ্বরের অভিপ্রায় কি, তাহা দেখাইতে গিয়া প্রবীণ পুরুষেরা বলিয়া থাকেন যে, উভয়ে উভয়কে বাতাস কর। ইহার নাম সহানুভূতি। সহানুভূতি না হইলে ইহার মীমাংসা হইতে পারে না। কথাও বলা যায়।

প্রাচীনকালে গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের সেবা করিতেন, এবং যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর সেবা করিতেন। কাজেই যোগশাস্ত্রের মীমাংসা সহজেই হইয়া যাইত। এ কালের বিজ্ঞান এক সুরে বলিতেছেন যে, শক্তি এক রকমে ব্যয় করিলে তাহা অন্য রকমে আসে। গ্রীষ্মের চোটে ঘাম হইলে শক্তির হ্রাস হইয়া পড়ে, কাজেই দুঃখ হয়; কিন্তু গাত্র শীতল হইলে আবার সুখ হয়। পাখার বাতাস করিলে চটপট সুখ হয়; কিন্তু সেটা প্রকৃতির চালাকী। পাখা-সঞ্চালনের পরিশ্রম দিয়া সেই সুখটুকু খরিদ করিতে হয়। অন্য লোকে করিলে শারীরিক পরিশ্রমের মূল্য স্বরূপ ব্যয় করিতে হয়। বাতাসে ও শিশিরে পড়িয়া থাকিলে রোগের উৎপত্তি হয়। কাজেই গৃহিণীর বাতাস ছাড়া আর কোন উপায় নাই। সতী সাধ্বী তৎপরিবর্ত্তে প্রতিদান চাহেন না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, কোন রকম তাহার মূল্য গৃহিণীর প্রাপ্য। তাহা না মিলে দিগুণ ঘামিবার সম্ভাবনা। এই সকল কচকচি ও জঞ্জালের মধ্যে পড়িয়া অনেকে অবশেষ ঘামিলেও কষ্ট পান না। তাঁহারা সংযমী। তাঁহারা জানেন যে, সুখ-দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম—"মাত্রাস্পর্শের ফেরফার"। তাহার স্থিতি মনে। অতএব নিজে কোন সুখের আশা না করিয়া, এবং দুঃখ সুখ উভয়েই জলাঞ্জলি দিয়া কেবল গৃহিণীকে বাতাস করিতে থাকেন। ইহাতে যে আনন্দ হয়, তাহা সুখও নয়, দুঃখও নয়। সেটা তবে কি? যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহাদের মতন গভীরভাবে তলাইয়া দেখিলে সকলেই জানিতে পারিবেন যে, ধর্ম্ম-জগৎটা এইরূপ। কেহ এই কথা বুঝিতে পারিলে, এমন জানিতে পারা যায় যে, তিনি গুরুস্থানীয় হইয়া পড়েন। অর্থাৎ, জড়ের মধ্যে থাকিয়াও তিনি জ্ঞানী, সুখের মধ্যে থাকিয়াও তিনি নিঃস্পৃহ, ইত্যাদি—এবং পরমানন্দ অমর।

সুখ দুঃখের লক্ষণ বেতর। শাস্ত্রের মতে সুখ দুঃখ উভয়কেই মন হইতে বাদ দিতে হইবে। নতুবা বাস্তবিক আনন্দ কি, তাহা বুঝা যাইবে না। অন্যমনস্কভাবে গোঁকে তা দিলে অনেকটা এই আনন্দের ভাব বুঝা যায়। দেহের সহিত ইহার কোনও সংস্রব নাই। ইহার প্রমাণ অতি সোজা।

[কতকগুলি সুখ দুঃখের লক্ষণ।]

১। পরের সুখে দুঃখিত হওয়া। ইহা অতি নিকৃষ্ট, এবং ফলে আনন্দজনক নহে।

২। পরের দুঃখে সুখী হওয়া। ঐ।

৩। পরের সুখে সুখী হওয়া। মাঝারি গোছ, যদি প্রাপ্তির আশা না থাকে।

৪। পরের দুঃখে দুঃখী হওয়া। ঐ। কিন্তু প্রাপ্তির কোনও আশা নাই।

৫। নিজের সুখে সুখী হওয়া। কাজেই হইতে হয়। কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী।

৬। নিজের দুঃখে দুঃখী হওয়া। ঐ

৭। নিজের সুখে দুঃখী হওয়া। বিতরণ করিলেই প্যাঠা চুকিয়া যায়। তাহাতে আনন্দ আছে।

৮। নিজের দুঃখে সুখী হওয়া। ইহা নং ৭ এর ফল, কেন না, বিতরণ করিয়া যে আনন্দটুকু হয়, ইহা তাহাই।

৯। পরের সুখে দুঃখে এবং নিজের সুখে দুঃখে সমভাব। মোটের মাথায় শেষটা ভাল, কিন্তু প্রথমটা যেন কেমন কেমন।

Law of conservation of Energy and dissipation of Energy নামক একটা জটিল বিধান বহুক্ষণ হইতে বহু গ্রন্থে দেখিয়া আসিতেছি। দান না করিলে জ্ঞানও হয় না, আনন্দও হয় না, অস্তিত্বও থাকে না। এই জগতের মূলে, শুনিতে পাওয়া যায় যে, অতি পুরাতন একটা শক্তি আছে, যাহার এক অংশ বিক্ষুব্ধিত হইলে দুঃখের সৃষ্টি হয়, অন্য অংশে তৎপরিবর্ত্তে সুখের উৎপত্তি হয়। ইহারই জন্য তুমি মরিয়া গেলে আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি, এবং কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে ভাবনা ও ভয়ে অধীর হইয়া পড়ি। এই মায়াময় শক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়াও যাহার জ্ঞান হয় নাই, তাহার সম্মুখে এখনও অনন্ত পাঠ্যদশার ক্লেশ বিস্তৃতভাবে পড়িয়া আছে।

জগতের যে কোনও উদ্দেশ্য থাকুক না কেন, সৃষ্টির মূলে যাহাই থাকুক না কেন, শাস্ত্র অতি ধীরভাবে বলেন যে, আমরা কর্ম্ম করিতে আসিয়াছি, এবং কর্ম্ম করিয়া অর্থাৎ খাটিয়া মরিতে আসিয়াছি। চন্দ্র সূর্য্য, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা, সকলেই খাটিয়া খাটিয়া সারা। আমরা পরিশ্রমের মূলধন ক্রিয়া পুঁজি স্বরূপ কিছু লইয়া আসি, সেইটুকু ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলে জগৎ বলে, অমুক জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেইটুকু ব্যয় করিতে করিতে তৎপরিবর্ত্তে কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলে জগৎ বলে, অমুক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। বিরাট বিশ্বে অসংখ্য জীবের এই দান প্রতিদান ও ব্যবসায়ের নাম জন্ম মৃত্যু। যত দূর ক্ষুদ্র মানববুদ্ধিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে, এই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে যাহা লাভ হয়, তাহার নাম জ্ঞান। মূলে অজ্ঞান, শেষে জ্ঞান। ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ প্রভৃতি আত্মরক্ষার নিমিত্ত যে সকল কৌশল শিক্ষা করে, তাহাও জ্ঞান। কষ্ট পাইবা, দৈহিক সুখের লালসায় ধাবিত হইয়া, এবং তাহার ফলভোগ করিয়াও যে আনন্দলাভের নিমিত্ত সকলেই ব্যগ্র, তাহার মূলে যে কত

বড় বিপরীত রেখা আঁকিয়া টানিয়া গিয়াছি, তাহা কাহারও মনে থাকে না। থাকিলে সংসার বিস্মৃতি-মায়া-বিচ্যুত হইয়া কোনকালে অদৃশ্য হইয়া পড়িত। এই বিস্মৃতির কারণ ইহাই বোধ হয় যে, আমাদিগের জ্ঞান ফুটিয়া উঠে নাই। এখনও অনেক দিন পড়িয়া আছে। অনেক সহিতে বাকি আছে। অনেক আনন্দ ও নিরানন্দ ভোগ করিতে হইবে। একটা জীবের ইতিহাস, একটা সমাজের ইতিহাস, একটা যুগের ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখিলেও ইহার আদি অন্ত পাওয়া যায় না। এই পৃথিবী ছাড়া অনেক পৃথিবী আছে, এই সৌর জগৎ ছাড়া অনেক সৌর জগৎ আছে। কোথা হইতে জীব পুঁজি লইয়া আসে, কোথায় যায়, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া হাস্যাস্পদ ব্যাপার। এই চতুর্দ্দশভুবনব্যাপী, মহাশক্তিশালী শাস্ত্রোক্ত ও সকলধর্ম্মপূজ্য ঈশ্বরের স্বরূপ কি, এবং ধর্ম্ম কি, তাহা আমাদিগের সামান্য পুঁজি দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। যদি ঈশ্বর সর্ব্বময় হন, তবে তাঁহারই একভাগ দুঃখে, অজ্ঞানে, মর্ম্মাহত ও প্রপীড়িত হইয়া অন্যভাগে যাহা সঞ্চয় করিতেছে, তাহারই হয় ত কতকটা লক্ষণের নাম জ্ঞান। এই মহাসংগ্রাম ও মায়ার মধ্যে পড়িয়া একভাগের পুনঃপুনঃ বিস্মৃতি ও অজ্ঞান, এবং অন্যভাগের পুনঃপুনঃ জাতিস্মরতা ও জ্ঞান, বহুশাস্ত্রের ও দর্শন প্রভৃতির বিচার্য্য বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই আমরাও সেই প্রশ্ন প্রিয়ার মধ্যে-মধ্যে মন নামক পদার্থটাকে গাঁটাইয়া ও গুণ গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়াইয়া দুঃখ ও সুখ উভয় ফল লাভ করিয়া থাকি।

খাবার বেমালুম ক্ষয় হইলে সুখ হয়, কিন্তু ক্ষয় হইতেছে দেখিলে দুঃখ এবং ভয়ও হয়। বহু-স্ত্রী বিবাহ করিয়া মুখুর্য্যে মহাশয় অবিরত বিপদে পড়িয়াছিলেন, অবশেষে শাস্ত্ররূপ পুরাতন দর্পণে আত্মার রূপ দেখিয়া, পূর্ব্বপুরুষদের ন্যায় তিন প্রকারের অমানিশায় নির্ব্বিঘ্নে মানবলীলা সম্বরণ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। নারিবার পর মুখুর্য্যের পুনর্জ্জন্ম লইয়া গোল বাধিল।

গোলযোগের কারণ কয়েকজন দেবতাগণের মতামত। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, এবং তাঁহারই বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন মত সর্ব্বত্র প্রচলিত। এই বিভিন্ন মতামত লক্ষ্য করিয়া অনেকেই ঈশ্বরের সম্পূর্ণত্বের উপর সন্দেহ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ঈশ্বর স্বয়ং মানবরূপ তার্কিকগণের মুখে স্বীয় অস্তিত্ব-সন্দেহরূপ অগ্নি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লন। কিংবা দার্শনিক ভাষায় তাঁহার অন্তিত্ব এই অপূর্ব্ব কৌশল দ্বারা আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আত্মা আত্ম-প্রকাশক। অগ্নি প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে, কাষ্ঠ, চকমকির পাথর ও দীপশলাকা ও ধূম প্রভৃতি পদার্থসমূহ প্রথমে রঙ্গালয়ে অভিনয় করিয়া যান। মুখুর্য্যের সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছিল। বাহাত্তর বৎসর বয়ঃক্রমে মুখুর্য্যের মৃত্যু হয়, অর্থাৎ মুখুর্য্যে

দেহরূপ কাষ্ঠ খড় ও ঘুম প্রভৃতির দর্প চূর্ণ করিয়া জ্ঞানাগ্নিরূপ কিঞ্চিৎ জ্বলিয়া অন্বেষণে অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু অগ্নি লুপ্ত হইলেও বিশ্বক্ষেত্রে নিহিত থাকে। সেটার পুনর্বিকাশ কর্ম্মে। অর্থাৎ, যদি দেহরূপী কাষ্ঠ খড় প্রভৃতি পরস্পর রঙ্গালয়ে আবার বিশেষপ্রকারে সংঘর্ষিত হয়, তবে সেইরূপ কর্ম্মে মুখুর্য্যের মত অগ্নিকণার পুনরাবির্ভাবের কথা। এই কর্ম্মপ্রবৃত্তি কোথা হইতে আসে, তাহা আমাদিগের মত ক্ষীণবুদ্ধি মানবের আবিষ্কার করা সুকঠিন। কিন্তু মুখুর্য্যেরূপী অগ্নিকণার তারতম্য আছে। মুখুর্য্যে যতটুকু কম জানিতেন, এবং যতটুকু বেশী জানিতেন, ঠিক সেই রকমের লোক সংসারে পাওয়া সুকঠিন; এবং মুখুর্য্যে যে সময়ে মরিয়াছিলেন, তখন তাঁহার জ্ঞানের যে অবস্থা, তাহার উত্তরাধিকারিস্বরূপ কোনও পুত্র মুখুর্য্যের জন্মে নাই। প্রকৃতির বিধান এই যে, বৃদ্ধ বয়সে, বিশেষতঃ ঠিক মৃত্যু-কালে, কাহারও পুত্রসন্তান জন্মে না। মুখুর্য্যেরূপী বৃক্ষের যে পুত্রফল জন্মিয়াছিল, তিনি পূর্ব্বজন্মে তিব্বতদেশীয় লোমের ব্যবসায় করিতেন। সুবিধা পাইয়া মুখুর্য্যের ও তদীয় প্রথমা গৃহিণীর যুক্ত ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া একটা ব্যবসায়ের উপযোগী দেহলাভ করেন। মধ্যে মুখুর্য্যের চুরি করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কনিষ্ঠা স্ত্রী তাঁহাকে বাধা দিত। সেই সময় কনিষ্ঠার ঔরসে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি চুরি করিতে গিয়াও বাধাবশতঃ সফলকাম হইতে পারেন নাই।

এইরূপে একই অগ্নি হইতে অনেক প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিলেও, একই বৃক্ষ হইতে বহু ফল জন্মগ্রহণ করিলেও, স্বয়ং মুখুর্য্যের মৃত্যুকালের ধ্বনি ভবসাগরের অন্যপারে আটকাইয়া থাকিল, এবং কর্ম্মদেবতাগণ সম্পূর্ণ-মুখুর্য্যে মহাশয়ের বাহাদুরী জগতে দেখাইবার জন্য প্রতিধ্বনি-সঞ্চারের বন্দোবস্ত করিলেন। মতভেদের কারণ এই যে, মরণকালে মুখুর্য্যে যতটুকু জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য আবার পুনরভিনয় করিবার আবশ্যকতা ছিল কি না।

অর্থাৎ, মুখুর্য্যের এক দিকে যেমন জ্ঞান হইয়াছিল, অন্য দিকে তেমনই সন্দেহও ছিল। বহুবিবাহ করা যে একটা জঞ্জাল, এবং পাপ, তাহা মুখুর্য্যে বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু মুখুর্য্যে মোটে তিনটি বিবাহ করিয়াছিলেন। হয় ত চারিটি বিবাহ করা পাপ না হইতে পারে। হয় ত দুইটি বিবাহ করিলে পাপের মাত্রা কমিয়া যাইতে পারে। হয় ত বিবাহ করাই পাপ, কিংবা দুইটি বিবাহ করিলে একটি সাধ্বী পুণ্যবতী হইয়া গৃহের আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারে। এই প্রত্যেক সন্দেহের নিমিত্ত কোন শ্রেণীর কর্ম্মদেবতাগণ মুখুর্য্যের চারিটি বিবাহের ক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন, কেহ দুইটি, এবং কেহ একটি! স্বয়ং মুখুর্য্যে জড়ভরতের মত, প্লেগাক্রান্ত

রোগীর মত, দুঃখোদ্বেগে বসিয়া কর্ম্মদেবতাগণের এই অপূর্ব্ব রহস্য পর্য্যালোচনা করিয়া কিসিরা গোঁফে তা দিতে লাগিলেন।

ফলকথা, মুখুর্য্যের ঠিক কত দূর জ্ঞান জন্মিয়াছিল, এবং ঠিক কত দূর জন্মে নাই, তাহা মুখুর্য্যে স্বয়ং জানিতেন না, এবং চিত্রগুপ্তের পুরাতন যুগের বহিখুলি নূতন যুগে অন্য আকার ধারণ করাতে কর্ম্মজগতের রীতি নীতি প্রভৃতির বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। কিন্তু জগতের বিধান লুপ্ত হইবার নহে। কাযেই মুখুর্য্যে আবার জন্মিলেন। পূর্ব্বজন্মে মুখুর্য্যে জানিতেন যে, তিনটি গৃহিণীর কলরবে যাহা হয়, তাহার নাম ভয়। এ জন্মে জানিলেন যে, একটি গৃহিণীই পূর্ব্বজন্মের তিনটির সমান, সুতরাং অনর্থক তিনটি বিবাহ না করিয়া একটির উপর ভরসা করিলেই যথেষ্ট। যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা জানেন, তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা না করিয়া এক ঈশ্বরের চরণে মন সমর্পণ করিলেই যথেষ্ট। কাজেই যুগধর্ম্ম অনুসারে, একবিংশতিহস্ত মানব-দেহ, সহস্রাধিক বর্ষ পরমায়ু প্রভৃতি খাটো হইয়া রেলের গাড়ীর ন্যায় অল্প সময়ের মধ্যে দিল্লী হইতে আগ্রায় লইয়া আসে, এবং যার ধর্ম্মাধর্ম্মেরও সেইরূপ তারতম্য হয়।

পুরাকালের সহিত তুলনা করিলে ধর্ম্মাধর্ম্মের মাত্রার যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এখন কথা ছাড়া আর সকল-গুলিই সংক্ষিপ্ত। ঈশ্বর ক্ষুদ্র, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে তর্ক বৃহৎ। পরমাণুও ছোট, কিন্তু পরমাণুর কথা বড়। পুরাকালে দেহটা বড় ছিল, কাজেই পাতঞ্জলের একটা সূত্রে একবিংশতিহস্তপ্রমাণ দেহ অধীর হইয়া পড়িত। কথা কহিবার যো ছিল না। দেহটা ক্রমে কমিয়া কথাটা বাড়িয়াছে। কথার বোঝা বহা যায়, কিন্তু দেহের বোঝা বহন করা শক্ত। আয়ু ক্ষুদ্র, কিন্তু আয়ু-রক্ষা-প্রণালী বড়। এই সকল উদাহরণ দৃষ্টে বেশ বুঝা যায় যে, জ্ঞানের মাত্রা প্রসারিত ও কর্ম্মের মাত্রা আকুঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। পুনর্জ্জন্ম ঘন ঘন হওয়াতে মানবসংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। মহাকাল এ যুগের ইতিহাসের পাতাগুলি দ্রুতগতি উল্টাইয়া যাইতেছেন। নেম পরিচ্ছেদ কেবল পুনরাবৃত্তি মাত্র, কেহ ভাল করিয়া দেখে না। সুখ দুঃখ এত শীঘ্র পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিতেছে, ধর্ম্মাধর্ম্ম এরূপভাবে কালপথে দৌড়িতেছে যে, অবসানের বড় দেরি নাই। বোধ হয়, কর্ম্মদেবতাগণ কথাগুলা দেহ হইতে পিটিয়া বাহির করিয়া নূতন যুগের গোড়াপত্তন করিতেছেন। এই দুর্দ্দিনে কথাটা কমাইয়া দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, কিংবা অন্ততঃ চুপ করিয়া বসিয়া বেকুবের মত ইতস্ততঃ তাকাইলেও, ভগবানের ধর্ম্মের বিধান পালন করা হয়। তবে একটা কথার পৃষ্ঠে কথা আছে, সকলই নিয়তি, সকলই নিয়তি।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। পৌষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতশিক্ষা"—দ্বিতীয় প্রবন্ধে অনেকগুলি সমীচীন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "উত্তরাধিকার" একটি চলনসই ক্ষুদ্র গল্প। কিন্তু আখ্যানবস্তুর অনুপাতে ভারতউদ্ধার-পরামর্শের মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক। "মার্কিনের অতিশ্রমশীলা শিক্ষিতা মহিলা" প্রবন্ধে লেখকের নাম নাই। আরম্ভে দেখিতেছি,—"অনেকের ধারণা, এ দেশের সেটা কুসংস্কার বলিলেও চলে যে, স্ত্রী-শিক্ষা দিলে রমণীর রমণীত্ব, গৃহবধূর ব্রীড়াসঙ্কুচিত ভাব এবং তাঁহার স্ত্রীজাতিসুলভ সৌন্দর্য্য লোপ পায়।"—না; স্ত্রী-শিক্ষার ফল এমন পোচনীয় হইতে পারে না। "স্ত্রীশিক্ষা"র ছদ্মনামে যে কুশিক্ষা ও যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিতেছেন, তাহারই ফল এইরূপ। শিক্ষার নামে দুর্নীতির সমর্থন করিবেন না :—"সমালোচকের সুর" যদি "সপ্তমে চড়ে"; তাহা হইলেও গোড়ামীর জয়ঢাক বাজাইবেন না। মার্কিন মহিলার দৃষ্টান্তেই প্রতিপন্ন হয়,—আমাদের দেশে প্রচলিত 'স্ত্রী-শিক্ষা' শিক্ষানামেরই যোগ্য নয়। শিক্ষিতসমাজে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নাই;—বিরোধ শুধু শিক্ষার স্বরূপ লইয়া। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার নেতা স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষার অপাচারে বিরক্ত হইয়া স্বয়ং স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মেয়েকে বিবি করিবার ব্যবস্থা তাঁহারও চক্ষুঃশূল ছিল। কেশব বাবু কি স্ত্রী-শিক্ষার শত্রু ছিলেন?—সংস্কারকগণ ভুলিয়া যান, যাঁহারা নূতনমাত্রেরই গোঁড়া,—তাঁহারাও পুরাতন গোঁড়াদেরই মত দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। স্ত্রীশিক্ষার নামেই যাঁহারা মাতিয়া উঠেন, তাঁহারা বুঝিতে চাহেন না,—"পিত্তলক কাটারী কামে নাহি আওল, উপরহি ঝলনক সার।" সম্পাদকের "আগামী কংগ্রেস" পাঠযোগ্য, চিন্তনীয়। সম্পাদক মহাশয় বলেন,—"রাজনৈতিক আন্দোলন নিষ্ফল, ইহা বলাই ভুল।" মন্তব্যটি "অ্যাক্সিয়ম্" স্বতঃসিদ্ধ নহে, তাহা না বলিলেও চলে। রাজনৈতিক আন্দোলনের অঙ্কুরেই যাঁহারা ফলের প্রত্যাশা করেন, তাঁহারা মরীচিকায় ভ্রান্ত। আপাততঃ আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রায় নিষ্ফল, এবং এই সর্ব্বগ্রাসী স্বার্থসর্ব্বস্ব 'ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিজমে'র যুগে সম্ভবতঃ আরও বহুকাল আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন নিষ্ফলই থাকিবে। কংগ্রেস যে বীজবপন করিয়াছেন, ভবিষ্যতে তাহার ফল ফলিবে,—যদি আমরা নিষ্কাম সাধনায় মগ্ন থাকিতে পারি; যদি আমরা চরিত্রের চর্চ্চা করিতে পারি; যদি আমরা অম্লানবদনে মাতৃভূমির চরণে ব্যক্তিগত স্বার্থ বলি দিতে শিখি। আত্মসুখ-সর্ব্বস্ব স্বার্থপরের আন্দোলন কোলাহলমাত্র। মনে রাখিতে হইবে, অসংযত কোলাহল 'আন্দোলন' নহে। ত্যাগশূন্য বৃথা চীৎকারের একমাত্র পুরস্কার,—ক্ষোভের নিষ্ফল।

ভারতী। পৌষ। "সন্ধ্যার প্রতি" শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের একটি চলনসই কবিতা। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর "জুলিয়াস সিজারে"র অনুবাদ করিতেছেন। এবার দ্বিতীয় অঙ্ক প্রকাশিত হইয়াছে। অনুবাদের ভাষা শিথিল ও প্রাণহীন। অনুরূপ অনুবাদে মূলের কতকটা অঙ্গহানি অপরিহার্য্য। কিন্তু সুষমাশূন্য ভাষায় ভাবের সৌন্দর্য্য মলিন হইয়া যায়। তথাপি যাঁহারা মূলের রসাস্বাদে অক্ষম, জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর অনুবাদে তাঁহারা উপকৃত হইবেন। শাস্ত্রেও মধুর অভাবে গুড়ের ব্যবস্থা আছে। যাহা অসম্ভব,—দুর্লভ, তাহার অনুকল্পও প্রশস্ত। জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতা আমাদের আদর্শ হউক। বাঙ্গালা সাহিত্যে জ্যোতি-

রিপ্রনাথ বাবুর ন্যায় একনিষ্ঠ সাধক নিতান্ত দুর্লভ, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিব। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল এবার "পশ্চিম ভারতে নাগপূজা"র পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ সঙ্কলিত প্রবন্ধে প্রমাদের উল্লেখ আবশ্যক। তাহাতে প্রবন্ধের গৌরবই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। নূতন লেখকগণ মূল উৎসের নামনির্দ্দেশে এত সঙ্কুচিত হন কেন, বলিতে পারি না। "যাঁহারা না বলিয়া পরের দ্রব্য" নিজের করিয়া লন, এখন তাঁহাদিগকেও ত লেখক বলিতে হয়; অবশ্য 'দ্বিতীয় ভাগে' তাঁহাদের অন্য অভিধান আছে। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরীর "তৃপ্তি" কবিতাটি বুঝিতে পারিলাম না।—

"এই যে নিখিল ধরা কর্ম্মপাকে ঘুরিতেছে,
এই যে গগনমার্গে কোটী তারা ছুটিতেছে।"

একবারে গদ্য; কিন্তু তত্ত্বটি বড়ই গুরুতর, তাহাতে সন্দেহ নাই। দর্শন-বিজ্ঞানের পারা বচনাটিতে এত অধিক যে, পাঠকের পক্ষে অন্ততঃ কতকটা ঘুরপাক নিতান্তই অবশ্যম্ভাবী। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বেহারী উপকথা" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনূদিত "বলি-অববোধ" নামক গল্পটি সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ বটে, কিন্তু ভাষার আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়ের "শঙ্কর চক্রবর্ত্তী" বিবরণে গরীয়ান। স্বদেশী মহাপুরুষের চরিত্রকীর্ত্তন করিয়া লেখক স্বয়ং ধন্য হইয়াছেন, আমাদেরও ধন্য করিয়াছেন। উপসংহারে ভাষায় উদ্দীপনা আছে। কিন্তু প্রবন্ধের প্রারম্ভে ভাষার বৈরূপ্য ঘর্ঘর শব্দে কানে তালা ধরিয়া যায়,—"বঙ্গের বর্ত্তমান সাহিত্যরথিগণের পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসা জাতীয় জীবনের উন্নতিস্রোতে ভাষা ও ভাবের বক্তব্য ও কর্ত্তব্যের অপূর্ব্ব মিশ্রণ ও সমাহারের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য আয়াসসাধ্য হইলেও অতীব কার্য্যকারিতা দ্বারা বয়াধাদ্ব প্রয়াস শিক্ষাবৈদগ্ধ্য বঙ্গীয় মস্তিষ্কে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় না, ইহাই দুঃখ।" তাহার উপর আবার এইরূপ ভাষা বুঝিবার দুঃখ। কিন্তু দুঃখই সার, বুঝিতে পারিলাম না। "অস্তিত্বসংরক্ষণের পারিপার্শ্বিক নির্ম্মল সুখ" কি? লেখকের ভাষায় ওজস্বিতা আছে, এবং উপসংহারের উদ্দীপনাও উপভোগ্য বটে। তাই ভবিষ্যতের আশায় ভাষার দোষনির্দ্দেশ করিলাম। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "গোবিন্দ দাস" নামক যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধটি পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। "সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় মিথিলায় গোবিন্দ দাসের অনেকগুলি পদ পাইয়া স্থির করিয়াছেন, সেগুলি গোবিন্দ ঝা নামক মৈথিল কবির রচিত।" আলোচ্য প্রবন্ধে দীনেশ বাবু বিবিধ প্রমাণ ও যুক্তির বলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—"বাঙ্গালা দেশেই বহুসংখ্যক গোবিন্দ দাস পদ লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী এক জন বিশিষ্ট পদকর্ত্তা। মিথিলার গোবিন্দ ঝা নামক কবির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা অনাস্থা প্রদর্শন করি না, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস যে বুধুরী নিবাসী, তৎসম্বন্ধে আমাদের বিধামাত্র নাই।" 'ধারানিধি' গোবিন্দকে মাতৃভাষার অঙ্কে ফিরাইয়া দিয়া দীনেশবাবু আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

জাহ্নবী। পৌষ। শ্রীযুক্ত হারেন্দ্রনাথ দত্তের "প্রপঞ্চ" নামক শিক্ষাপ্রদ ক্ষুদ্র সন্দর্ভটি উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী সরলাবালা দাসীর "সন্ধ্যায়" নামক কবিতাটির মাধুর্য্যে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। শ্রীযুক্ত জলধর সেন "লঙ্কো-ভ্রমণে"র প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন, "বর্দ্ধমান হইতে মেলগাড়ী ছাড়িল।" হাবড়া হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত এ যাত্রা মুক্তিলাভ করিল, আমরাও আশ্বস্ত হইলাম। সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, জাহ্নবীর প্রবাহ চিরপ্রবাহিত থাকুক।

ফিরিঙ্গি বণিক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নূতন স্থল-বাণিজ্য-পথের সন্ধান-চেষ্টা।

The modern first-class Powers,—France, Germany, Austria, Russia, Italy, Great Britain,—were not yet built up. Spain was still divided between Castile, Aragon and the Moors. Europe remained a continent of principalities, duchies, counties, little oligarchies, and little republics. —*Sir W. Hunter.*

ইস্‌লাম-বিপ্লব-বিপর্য্যস্ত ইউরোপীয় খৃষ্টান-সমাজ যখন ভারত-বাণিজ্যের অভিনব স্থলপথ আবিষ্কৃত করিবার চেষ্টায় পূর্ব্বাভিমুখে পর্য্যটক প্রেরণ করিতে আরম্ভ করে, তখন ইউরোপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছত্রভঙ্গ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তখনও ইউরোপীয় প্রবল পরাক্রান্ত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া, খৃষ্টান-সমাজকে পূর্ণাবয়বরূপে শক্তিশালী করিতে সমর্থ হয় নাই। যে বলে বলীয়ান্ হইয়া আধুনিক ইউরোপ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, তখন পর্য্যন্ত সেই জ্ঞানবল সঞ্চিত হয় নাই। তখনও প্রাচ্যরাজ্যের তুলনায় প্রতীচ্য রাজ্য অশিক্ষিত। এক দিকে নানা নূতন শিক্ষার সন্ধানলাভ করিয়া, অন্য দিকে রক্তপ্লুত মুসলমান-শক্তির নিকট উপর্য্যুপরি অপদস্থ হইয়া, সমগ্র ইউরোপেই শক্তিসঞ্চয়ের জন্য প্রবল আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। যে সকল বাণিজ্যপ্রধান ইউরোপীয় মহানগর একদা ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়া, আশাতীত ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে খৃষ্টানজগতের নয়নাবীকে নিয়ত প্রলুব্ধ করিত, ইস্‌লাম-বিপ্লবে তাহা জনশূন্য অরণ্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া, সমগ্র ইউরোপকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইউরোপ তাহার জন্য হাহাকার করিয়াছিল, সেই করুণ আর্ত্তনাদ পুরাতন সাহিত্যের মধ্যে অদ্যাপি থাকিয়া থাকিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তাহা অসমর্থ অপরার্থ আত্মগৌরব-বোধশূন্য অবসন্নজাতির চিত্তক্ষোভ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বেদনায় ইউরোপকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই ব্যথাই ব্যথামোচনের উপায়-উদ্ভাবনের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা উত্তেজিত করিয়াছিল। ইউরোপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত হইলেও, ধর্ম্মাচার্য্য পোপ খৃষ্টান ইউরোপের সর্ব্বাদিসম্মত প্রধানপুরুষ বলিয়া তখনও সুপরিচিত ছিলেন।

গোপ হইতে নগণ্য নাবিক পর্য্যন্ত সকলেই স্বতন্ত্রভাবে একই চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। নূতন স্থল-বাণিজ্য-পথের সন্ধান-চেষ্টা এইরূপে আরব্ধ হয়।

আরব হইতে মুসলমান-ধর্ম্ম এসিয়াখণ্ডের জলে স্থলে ব্যাপ্ত হইবার সময়ে, বৌদ্ধধর্ম্মই এসিয়ার অধিকাংশ নরনারীর প্রচলিত ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত ছিল। দেশভেদে, কালভেদে, পাত্রভেদে, শাক্যসিংহের দার্শনিক ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত কত লোকাচার দেশাচার জড়িত হইয়া, এসিয়ার বৌদ্ধধর্ম্মকে বহুসংখ্যক বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ইস্লাম্ পশ্চিম-এসিয়াখণ্ডে ধর্ম্মরাজ্য বিস্তৃত করিবার সময়, সকল স্থানে বলিফাগণের রাজশাসন স্বীকার করে নাই;—ধর্ম্মে এক হইয়াও, রাজ্যতন্ত্রে স্বতন্ত্র থাকিয়া, এসিয়ার মুসলমানগণ দেশভেদে নামভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে।

যাহারা খৃষ্টজন্মভূমি অধিকার করিয়া, সমগ্র ইউরোপের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে আহূত হইয়াছিল; তাহাদের পদোন্নতি লক্ষ্য করিয়া, তাতার দেশের মুসলমান বীরগণ তাহা অধিকার করিবার আশায় দলে দলে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাঞ্চলে ধাবিত হইতে আরম্ভ করে। পূর্ব্ব দিক্ হইতে তাতার ও পশ্চিম দিক হইতে ইউরোপ যুগপৎ আক্রমণ করিয়া, উদীয়মান ইস্লামশক্তিকে চূর্ণ করিবা, এসিয়ার পুরাতন বাণিজ্যপথ ভাগ করিয়া লইবে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। যে মন্ত্রে উত্তরকালে ইউরোপ সমগ্র এসিয়াখণ্ডে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, প্রথম সংঘর্ষকালেই সেই মন্ত্র প্রথমবার ব্যবহৃত হয়। তাতারদেশের মুসলমানকে দিয়া ইস্লামের মূলশক্তি পরাস্ত করিবার জন্য ইউরোপ উপহার উপঢৌকন সমভিব্যাহারে খৃষ্টসাহেবদিগের জয়স্কন্ধাবারে দূত প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন।

তাতারগণ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পারস্যদেশে, কাস্পীয়ান-তীরে ও কৃষ্ণসাগর-তটে অধিকার বিস্তার করিয়া, অধিকাংশ বাণিজ্যপথ করতলগত করিয়াছিল। ভল্গা নদী ও কাস্পীয়ান্-হ্রদের সঙ্গমস্থল এসিয়া-ইউরোপের বাণিজ্য-পথের সর্ব্বপ্রধান সন্ধিস্থল বলিয়া পরিচিত ছিল। তাতারগণ ভল্গা নদীর সন্ধিস্থলেও শিবির-সন্নিবেশ করিয়াছিল। সুতরাং সেই পথে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য অনায়াসে সমগ্র ইউরোপে ব্যাপ্ত হইতে পারিবে ভাবিয়া, ইউরোপীয় ধর্ম্মাচার্য্য ও তাঁহার অনুগত প্রধান শিষ্য ফরাসী নরপতি সেণ্ট্ লুই তাতারদিগের সহিত মিত্রতাসংস্থাপনের জন্য নানারূপ আয়োজন করিয়াছিলেন।

দৌত্য সফল হইল না। এসিয়া আত্মবিক্রয় করিল না। তাহা বাহুবলে অপহরণ করিবার শক্তি না থাকায়, ইউরোপকে অগত্যা ক্ষুণ্ণহৃদয়ে তাতার-সৌহার্দ্য পরিত্যাগ করিতে হইল। সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগ্নমনোরথ হইলেও, এই দৌত্যকার্য্যে ইউরোপ অনেক শিক্ষালাভ করিল। কৃষ্ণসাগর ও কাস্পীয়ান্ হ্রদের তীর হইতে মধ্যএসিয়ার মরুভূমি পর্য্যন্ত যে পুরাতন বাণিজ্য-পথ প্রচলিত ছিল, তাহার সমগ্র ভৌগোলিক-বিবরণ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাহা লিখিত ও অনুবাদিত হইয়া, ইউরোপের বিবিধ প্রদেশে সযত্নে অধীত হইতে লাগিল। মুসলমান-শক্তির অভ্যন্তরেই যে তাহার অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসবীজ গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহারও নানা পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এই দৌত্যকার্য্য, সফল হইলে, মধ্যএসিয়ার ন্যায় ইউরোপকেও হূনযুদ্ধের কৌশল-উদ্ভাবনে চিরনিবিষ্ট করিয়া, অশ্বশালার অশ্বপালকরূপে জীবনযাপন করিতে বাধ্য করিত। জলপথ উপেক্ষিত হইয়া, ইউরোপের আধুনিক সমুন্নতিলাভের প্রধান পথ চিররুদ্ধ করিত। এসিয়ার ন্যায় ইউরোপকেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া, ক্ষুদ্র জয়পরাজয় লইয়াই, ব্যাপৃত থাকিতে হইত। দৌত্য সফল হইল না বলিয়াই, ইউরোপকে বাধ্য হইয়া নূতন স্থল-বাণিজ্য-পথের সন্ধান-চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হইল। এই সামান্য ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে পর্য্যালোচনা করিলে, ইউরোপের ইতিহাসের একটি নগণ্য ঘটনা বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু আনুপূর্ব্বের সহিত একত্র পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাকেই আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান ঘটনাবলীর সংখ্যাভুক্ত করিতে হয়। মনীষিগণ সেই ভাবেই এই দৌত্য বিবরণী পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া, ইউরোপ পথভ্রান্ত হইবার প্রথম উপক্রমেই সাবধান হইতে সমর্থ হইয়াছিল।

কৃষ্ণ-সাগর-পথে ভারতীয়-পণ্যদ্রব্য-বহনের অভিনব স্থল-বাণিজ্যপথ আবিষ্কার করিবার আশায়, রাজদূত ব্যতীত নানা ধর্ম্মাচার্য্য ও পরিব্রাজকগণও পদব্রজে ভূপ্রদক্ষিণে বহির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে "মার্কো পোলো"র নাম জগদ্বিখ্যাত। তিনি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাংশে চতুর্ব্বিংশতি বৎসর এসিয়াখণ্ডের জলে স্থলে নানা দেশে পর্য্যটন করিয়া ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী অদ্যাপি সযত্নে মুদ্রিত ও অধীত হইয়া থাকে। তিনি স্থলপথে চীনদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া, ভারতবর্ষের উপকূল-সংলগ্ন সমুদ্রপথে পারস্যরাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। ভারত-বাণিজ্যের জল স্থল সকল পথেরই সন্ধানলাভ করিয়া বিশ্ববিখ্যাত পরিব্রাজক যখন স্বদেশে

উপনীত হইলেন, তখন স্থল অপেক্ষা জলপথের কথাই আলোচিত হইবার সূত্রপাত হইল। কৃষ্ণসাগরের তীরে স্থলবাণিজ্য-পথের সন্ধান করিবার চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইবার সময়ে, আর এক দল অনুসন্ধাননিপুণ পরিব্রাজক ভূমধ্যসাগর-পথে মিশরদেশে উপনীত হইয়া, তথা হইতে সিরিয়ার বাণিজ্য-পথের অনুসন্ধান করিবার জন্য যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এইরূপে বিবিধ উপায়ে স্থলবাণিজ্য-পথের সন্ধানচেষ্টা পরিচালিত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোনও অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কার-সাধন করিতে হইলে, পরিণামে সর্ব্বথা সফলকাম হইবার জন্য "অধ্যবসায়" তাহা বিচারবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিলে, কালে কাম্যফল প্রদান করিয়া, সকল শ্রম সফল করিয়া থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার উদাহরণের অভাব নাই। ইউরোপ যে অসুতোভয়ে অপরাজিত অধ্যবসায়ে ভারতবাণিজ্যপথের সন্ধান-চেষ্টায় তিন শত বৎসর অক্লান্ত-চরণে এসিয়ার মরুগিরি ও মহারণ্যে বিচরণ করিয়া গলদ্ঘর্ম্ম হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে অধ্যবসায় বিচারবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করায়, অল্পদিনের মধ্যেই ইউরোপ বুঝিয়াছিল, স্থলপথে সিদ্ধকাম হইবার সম্ভাবনা নাই।

তখনও বাষ্প-যান প্রচলিত হয় নাই; তখনও লৌহবর্ত্মে পৃথিবীর পূর্ব্ব-পশ্চিমকে অনায়াস-গম্য করিয়া, কৌতূহল-প্রিয় ভুবনভ্রমণশীল বিলাসিবর্গের বিলাসক্ষেত্রে সমগ্র এসিয়াকে উৎসর্গ করিবার কৌশল ইউরোপের অধিগত হয় নাই। সে দিন ইউরোপের শ্বেতচর্ম্ম ও রক্তনেত্র, এসিয়াবাসীকে সভয়ে সঙ্কুচিতচরণে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া সমুচিত সমাদরপ্রদর্শনের শিষ্টাচারশিক্ষায় মনুষ্যত্বহীন করিয়া, দৃষ্টিমাত্রে দিগ্বিজয়সাধনের অব্যর্থ কৌশল উদ্ভাবিত করিতে সমর্থ হয় নাই। সে দিন বড় কঠিন দিন বলিয়াই পরিচিত ছিল। তখন বৌদ্ধপ্রভাব তিরোহিত হইয়া, সৌজন্য-সদাচার তিরোহিত হইয়াছিল। তখন কৃষক তাহার হলফলক লইয়া তরবারি নির্ম্মাণ করিত;—এসিয়া তাহার পুরাতন প্রফুল্লবদন ভ্রূকুটীকুটিল বিভীষিকার আধার করিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে প্রতীচ্য-বিজয়ে যাত্রা করিবার জন্য অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন মধ্য-এসিয়া, জীবনপ্রভাত,—ইউরোপের জীবন-সন্ধ্যা। তখন এসিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপে—সর্ব্বত্র—কেবল তরবারির কথাই সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য কথা। সে দিন যাঁহারা ইউরোপ হইতে এসিয়ায় উপনীত হইয়া বাণিজ্য-পথের সন্ধান-

চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবার আশা ছিল না বলিয়া, সে চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। ব্যর্থচেষ্টাই জলপথের দিকে লোকচিত্ত আকৃষ্ট করিয়া, ইউরোপের অভ্যুদয়সাধনের কারণ হইয়াছিল। ব্যর্থ-চেষ্টার ইতিহাসই চেষ্টা-সাফল্যের প্রকৃত ইতিহাস। সে কথা বিস্মৃত হইয়া, অধ্যবসায়শূন্য অব্যবস্থিতচিত্ত অকর্ম্মণ্য আধুনিক ভারতবাসিগণ বাণিজ্যোন্নতিসাধনের জন্য আহূত হইবামাত্র ব্যর্থ-চেষ্টার উল্লেখ করিয়াই উদ্যমহীন হইয়া পড়িতেছে। দেখিয়াছি—করিয়াছি—যথেষ্ট হইয়াছে—আর কেন—আশা নাই—এ-সকল কথা যে ইউরোপে একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল, তাহা বলিতে হইলে ইতিহাসের অবমাননা করা হয়। ইউরোপেও কত লোকে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে, কত লোকে ব্যর্থচেষ্টার বিষময় ফলে সর্ব্বান্ত হইয়াছে, কত কবি, কত নাট্যকার উপহাসবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য গদ্যে পদ্যে বিদ্রূপ প্রকাশ করিয়া "ভস্মের উপর পিণ্ড" সংযোগ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু যে বসিয়া পড়িয়াছিল, সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে;—এক পথে প্রতিহত হইয়া, অন্যপথে ধাবিত হইয়াছে;—পুনঃ-পুনঃ ব্যর্থমনোরথ হইয়াও, পুনঃপুনঃ সামর্থ্যবলে আত্মজয় করিয়া, পরিণামে সাফল্য-লাভে কৃতার্থ হইয়াছে। ইউরোপীয় অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক মূল সূত্র এই সকল ব্যর্থ-চেষ্টার বিলুপ্ত ঘটনাবলীর মধ্যেই লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে।

স্থলপথে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া জলপথের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সময়ে, স্থলপথের আশা একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। ইউরোপ অদ্যাপি সে আশা ত্যাগ করিতে পারে নাই। রুসিয়া যে সুদীর্ঘ লৌহবর্ত্মে এসিয়ার সহিত ইউরোপকে সংযুক্ত করিবার আয়োজন করিতেছে, তাহার অধিকাংশ কেবল পুরাতন স্থল-বাণিজ্যপথের—ভারত-সৌভাগ্যচরণাঙ্কিত সুপরিচিত পুণ্যপথ! সেই পথে বৌদ্ধ শ্রমণ জগদ্ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, বণিগ্‌বর্গের আশ্রয়ে দেশ হইতে দেশান্তরে সুজ্ঞিত্র প্রচারিত করিতেন। তাহার উভয় পার্শ্বে অদ্যাপি যে সকল পুরাকীর্ত্তি ভস্মাচ্ছন্ন হইয়া বৌদ্ধবিজয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস-সূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা পুনর্ব্বার আবিষ্কৃত ও আলোচিত হইতেছে। তাহাকে এসিয়ার পুরাতন পুণ্যপথ ভিন্ন কি বলিব? যে পথে গমনাগমনকালে এসিয়াবাসিগণ পৃথিবীর ইতিহাসে সৌর্য্য বীর্য্য জ্ঞান বৈরাগ্য সিদ্ধিবিজ্ঞান গৌরবে পরাক্রান্ত হইয়া ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছে, তাহাই এসিয়ার

পুরাতন পুণ্যপথ। সে পথের পার্শ্বে এসিয়ার অতীত গৌরব অদ্যাপি যেন ছায়া-কলেবরে দণ্ডায়মান।

ইউরোপ-যখন জলপথে ভারতবর্ষে উপনীত হইবার সৌভাগ্য লাভ করে, সেদিন ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া ইউরোপীয়গণ দেখিয়াছিল,—স্থলপথে তাহাদের কোন কোন স্বদেশী পর্য্যটক তখনও ভারতবর্ষে উপনীত হইতেছে! যাহারা মিশরীয়-পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারাও সহসা অধ্যবসায় পরিত্যাগ করে নাই। জলপথ আবিষ্কৃত হইবার পর প্রয়োজনের অভাবেই স্থল-বাণিজ্যপথের সন্ধান-চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় জনসমাজ ভূমণ্ডলের বিবিধ অবিজ্ঞাত প্রদেশ আবিষ্কৃত করিবার জন্য লালায়িত হইবার কথা ইতিহাসে সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন অবিজ্ঞাত নূতন দেশের আবিষ্কার-কামনা বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। তাহা কেবল চির-পরিচিত ভারতবর্ষের অভিনব বাণিজ্যপথের সন্ধানচেষ্টার আকস্মিক ফল। এই সকল অভিনব আবিষ্কার-ব্যাপার যদি ইউরোপের পক্ষে উত্তরোত্তর উন্নতিসোপানে আরূঢ় হইবার কারণরূপে উল্লিখিত হয়, তবে ভারতবর্ষকেই তাহার মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

স্থলপথে ভারতবর্ষে উপনীত হইবার পক্ষে যে সকল বাধাবিঘ্ন ইউরোপের পক্ষে তৎকালে পুরাতন বাণিজ্য-পথ নিরতিশয় দুর্গম করিয়া রাখিয়াছিল, জলপথে সেরূপ বাধা বিঘ্নে ইউরোপকে পরাস্ত হইবার আশঙ্কা ছিল না। এসিয়া কোন্ পুরাকালে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিবার জন্য নৌচালন-কৌশলের উদ্ভাবন করিয়াছিল, তাহার সন্ধানলাভ করিবার উপায় নাই। সমুদ্রোপকূলের সকল দেশই তাহাতে লিপ্ত হইয়া থাকিবে। ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূল স্মরণাতীত পুরাকাল হইতেই সমুদ্র-যাত্রা-কোলাহলে প্রতিধ্বনিত। ভূমধ্যসাগরতীরের পুরাতন পরাক্রান্ত নরসমাজ অতি পুরাকাল হইতেই সমুদ্রপথে বিচরণ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তথাপি এসিয়া ও ইউরোপের নৌবিদ্যার পার্থক্য ছিল। ইউরোপীয়গণ যে সমুদ্রপথে বিচরণ করিতেন, তাহা ভূবেষ্টিত বৃহদায়তন হ্রদ ভিন্ন মহাসাগর নামে কথিত হইতে পারে না। এসিয়ার সমুদ্রোপকূলনিবাসী নাবিকগণের পক্ষে এরূপ ভূবেষ্টিত সমুদ্রপথে বিচরণ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহাদিগকে নিয়ত মহাসাগরে বিচরণ করিয়া, দেশদেশান্তরে গমনাগমন করিতে হইত। এই পথে প্রতি-

বন্দীর সংখ্যা অল্প; তাহাদের সকলেরই লক্ষ্য ভারতবাণিজ্যের কল্যাণে অর্থোপার্জ্জন। সুতরাং এসিয়ার সমুদ্রযাত্রা কেবল জলযান-গঠন-কৌশল, এবং সীমাশূন্য সমুদ্রপথে জলযানচালন-কৌশল উদ্ভাবিত করিয়াই নিরস্ত হইয়া রহিয়াছিল। জলযুদ্ধের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই বলিয়া তাহার কৌশলজালবিস্তার করিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা আরব্ধ হইবার প্রয়োজনও অনুভূত হয় নাই। ইউরোপে পুরাকাল হইতেই সে প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। সংকীর্ণ প্রণালী-পথের সংঘর্ষ-সম্ভাবনা পরস্পরকে পরস্পরের পরাজয়সাধনের কৌশল-উদ্ভাবনার্থ উত্তেজিত করিয়া, ইউরোপীয়গণকে জলযুদ্ধনিপুণ বীরজাতিতে পরিণত করিয়াছিল। তাহারা স্থলে অপেক্ষা জলপথেই সমধিক শৌর্য্যপ্রকাশ করিতে পারিত। তথাপি তাহারা মহাসাগর সম্বন্ধে বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয় নাই। যখন জলপথের সন্ধান-চেষ্টা ইউরোপকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল, তখন ইউরোপের সুবিখ্যাত নাবিকবর্গও মহাসাগর অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইবার জলপথ আবিষ্কার করা সম্ভব বলিয়া সহসা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পুরাতন জল-বাণিজ্য-পথ।

Certain men have supposed, following a foolish tradition, that the Atlantic is united on the south with the Indian Ocean.—*Joannes Philoponus.*

বিদ্যালয়ের বালকগণের বিশ্বাস,—ভাস্কো ডি গামাই ভারতবর্ষে আসিবার জলপথ আবিষ্কৃত করিয়া ইউরোপের অধিবাসিগণকে নূতন জল-বাণিজ্য-পথের সন্ধান প্রদান করেন। কিন্তু অতি পুরাকালেও এই পথের সন্ধান ইউরোপে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। মিশরদেশের পণ্ডিতবর্গের নিকট তাহার জনশ্রুতি সুপরিচিত ছিল। তথা হইতে সে কথা সমগ্র ইউরোপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মধ্যযুগের জ্ঞানগৌরববিচ্যুত ইউরোপীয় মানবমনাজ সে জনশ্রুতিতে আস্থাস্থাপন করিতে সম্মত হইত না। তাহারা আফ্রিকার পশ্চিমোপকূলের অজ্ঞাত স্থানের সহিত পরিচিত ছিল। তাহার দক্ষিণে কোথায়ও যে স্থলভাগের শেষ হইয়া পশ্চিম

সমুদ্রের সহিত পূর্ব্ব সমুদ্রের সংযোগ থাকিতে পারে, সে কথা অল্প লোকেই চিন্তা করিতে সম্মত হইত। তাহারা ভাবিত,—দক্ষিণে কেবল অত্যুত্তপ্ত মরুস্থল; সে দেশে মানবসমাজ অবস্থান করিতে পারে না! সুতরাং সে পথে অগ্রসর হইবার জন্য কাহারও কোন কৌতূহল বা সাহস হইত না।

স্থল-বাণিজ্যপথ অধিকার করিবার আশা ব্যর্থ হইবার আশঙ্কা ক্রমে প্রবল হইয়া, ইউরোপকে জল-বাণিজ্য-পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার জন্য পুনঃপুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিল। এই সময়ে জলবাণিজ্যপথের পুরাতন বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। নিশর হইতে লোহিতসাগরের পথে ভারতবর্ষে আগমনের পুরাতন জলবাণিজ্যপথের কথা ইউরোপে অপরিজ্ঞাত ছিল না। এই পথে ভারতবর্ষের বহু বণিক্ সাগর পারের বিশ্বর রাজ্যে গমনাগমন করিতেন। এই পথে কোন কোন রাজদূত রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী পর্য্যন্ত গমন করিত, এ কথাও শুনিতে পাওয়া যাইত। এসিয়া ও ইউরোপের মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া নিশর দেশ ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের প্রধান পণ্যশালা বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। ভূমধ্যসাগর হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগরে গমনাগমনের পথ সুপরিচিত ছিল। সেই পথে রোমক সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়কালে বিলাসলোলুপ রোমান নাগরিকগণের বসনাতৃপ্তিদায়ক শুগ্লি-শুক্তি ইংলণ্ড হইতে আনীত হইত। কিন্তু আটলাণ্টিক মহাসাগরের পশ্চিমে বা দক্ষিণে কেবল অনন্ত জলরাশি দিগ্‌বলয়ে বিলীন হইয়া, সে পথে অধিক দূর অগ্রসর হইবার জন্য কাহাকেও প্রলুব্ধ করিত না। সেই এক দিন, আর এই এক দিন। এ দিনের বালকবৃদ্ধও সে দিনের ইউরোপীয় জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতবর্গের এই অকারণ দ্বিধা ও অসঙ্গত অজ্ঞতার কাহিনী পাঠ করিতে বসিয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারে না। তথাপি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে, ইউরোপের অবস্থা এইরূপ শোচনীয় ছিল। ইউরোপের ইতিহাসই তাহার সাক্ষী।

"বিগত পাঁচ শত বৎসরের পৃথিবীর ইতিহাসের সহিত ভারতবর্ষের নাম চিরসংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তাহার বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও সমগ্র সভ্য দেশের সাহিত্যে তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল পুরাতন প্রমাণের সংগ্রহ ও সমালোচনা করিয়া, সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার ডবলিউ হণ্টার বৃটীশভারতের যে সুবিস্তৃত ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার সূচনামাত্র প্রকাশিত হইতে না হইতেই ঐতি-

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পর্য্যটকরাজ ইবন বতোতার নাম বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত হইয়াছে। তিনি চতুর্ব্বিংশতি বৎসর এসিয়া ও আফ্রিকার নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া যে সকল বিবরণ সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, তাহা ইউরোপীয় বিবিধ ভাষায় অনূদিত হইয়া সভ্যসমাজের নিকট সুপরিচিত হইয়াছে। তাহাতে পুরাতন জল-বাণিজ্যপথের বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইবন্ বতোতা পৃথিবীতে পাঁচটিমাত্র বাণিজ্য-প্রধান প্রসিদ্ধ বন্দর দেখিতে পাইয়াছিলেন। একটি কৃষ্ণসাগরতীরে; একটি মিশর দেশে; একটি চীন সাম্রাজ্যে; এবং দুইটি ভারতবর্ষের মালাবার উপকূলে। তন্মধ্যে একটি "ক্যালিকট" নামে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই সকল বন্দর প্রাচ্যবাণিজ্যের বিজয়-গৌরবে ভারতবর্ষের নাম সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। সেকালের বাণিজ্যের কথা কেবল ভারতবর্ষের কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে যে সকল পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হইত, তাহার একাংশ প্রশান্তমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে ও চীন-জাপানাদি সুদূর দেশে প্রেরিত হইত; অপরাংশ প্রতীচ্য রাজ্যে প্রেরিত হইত। যাহা পূর্ব্বাঞ্চলে প্রেরিত হইত, তাহার বিনিময়ে পূর্ব্বাঞ্চলের বিবিধ পণ্যদ্রব্য আনীত হইয়া তাহাও পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত হইত। ভারতবর্ষ কাহারও নিকট ক্রয় করিত না; পূর্ব্বে পশ্চিমে আপন পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিত; এবং পূর্ব্বাঞ্চল হইতে সংগৃহীত পণ্যদ্রব্যও পশ্চিমাঞ্চলে বিক্রয় করিয়া স্বদেশের ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব বিবর্দ্ধিত করিত। এই বাণিজ্যব্যাপারে স্থলপথ অপেক্ষা জলপথেরই প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। তজ্জন্য মিশরদেশের ন্যায় সিংহল দ্বীপও প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সম্মিলন-ক্ষেত্র বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছিল। ইসলাম ইহার অংশ ভোগ করিবার জন্য সমুদ্রপথে শীঘ্রই প্রাধান্যলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের যে সকল দ্বীপপুঞ্জ একদা শৈব ও বৌদ্ধধর্ম্মের শঙ্খঘণ্টা-নিনাদে মুখরিত ও ধূপ-গুগ্‌গুল-গন্ধে আমোদিত হইয়া, শিক্ষা দীক্ষা, ভাষা সাহিত্য ও আচার ব্যবহারে, দ্বীপবাসিগণকে ভারতীয় সভ্যতায় সমুন্নত করিয়া, ভারতবর্ষের বাহিরে বৃহত্তর ভারতবর্ষের সৃষ্টি করিবার আয়োজন করিয়াছিল,

---

হাসিলের নশ্বর জীবন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাঁহার সংকল্পিত সুবৃহৎ গ্রন্থের যে অত্যল্পাংশমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহার নাম ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয় হইবে। ভারতবর্ষের আধুনিক ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ইতিহাস-সঙ্কলন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সময়ে, সকল লেখককেই হন্টারের নিকট কৃতজ্ঞহৃদয়ে ঋণ-স্বীকার করিতে হইবে।

যেখানে ক্রমে ক্রমে ইস্‌লামের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, ভাষা ও সাহিত্যে, অদ্যাপি মুসলমানের বিজয়ঘোষণা করিতেছে।

পুরাতন জলবাণিজ্যপথে মুসলমানের আধিপত্য প্রবল হইলে, মুসলমানাধিকৃত মিশর দেশ ভারতবাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল। সে পথে খৃষ্টান ইউরোপের অগ্রসর হইবার আশা তিরোহিত হইয়া গেল। ভূমধ্য-সাগর ও লোহিতসাগরের মধ্যে যে সংকীর্ণ স্থলভাগ অতিক্রম করিয়া ভারতীয় পণ্যদ্রব্য ইউরোপে আনীত হইত, তাহা মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইলে খৃষ্টান ইউরোপের পক্ষে পুরাতন জলবাণিজ্যপথের প্রধান প্রবেশদ্বার অবরুদ্ধ হইয়া গেল। ভূমধ্যসাগরে ইস্‌লাম শক্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। স্থলপথের ন্যায় জলপথেও, প্রাচ্য এসিয়া প্রতীচ্য ইউরোপকে পদে পদে অপদস্থ করিয়া, এসিয়ার বিজয়-গৌরবে ইউরোপকে অবসন্ন করিবার উপক্রম করিল!

এই সঙ্কট-কাল ইউরোপের ইতিহাসের প্রধান পরীক্ষা-কাল। এই সময়ে অসহায় হইয়া, ইউরোপ অধ্যবসায়হীন অবসন্ন অবস্থায় আপন দুর্ভাগ্যকে চিরসহচর করিয়া উদ্যম-প্রযোগে অসম্মত হইলে, ইউরোপের ইতিহাস ভিন্ন ভাবে লিখিত হইত;—ভারতবর্ষের ইতিহাসও ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করিত। ইউরোপ কঠিন পরীক্ষায় নিপতিত হইয়াও, লক্ষ্যচ্যুত হয় নাই। তাহাই ইউরোপের আধুনিক অভ্যুদয়ের প্রধান কারণ।

এই সময়ে ইউরোপের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। গ্রীসের জ্ঞান-গৌরব ও রোমের রাজশক্তি এক সময়ে ইউরোপকে সমুন্নত করিবার আয়োজন করিলেও,* সে আয়োজন সর্ব্বাংশে সফল হয় নাই। প্রধান প্রধান মহানগর ভিন্ন, সমগ্র দেশ সে পুরাতন সভ্যতার ফললাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। যাহারা মহানগরে বাস করিয়া সভ্য হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারাও সভ্যতার প্রকৃত অমৃতফলে বীতরাগ হইয়া, তাহার বিবিধ কুফল লাভের জন্যই লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল! সম্ভোগ-লালসা প্রবল হইয়া সংযম-সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছিল। জ্ঞান কেবল সম্ভোগের উপায় উদ্ভাবন করিত; ধর্ম্ম কেবল বাহ্যাড়ম্বরে সম্ভোগকে সম্ভজনীয় করিয়া তুলিত; লোকাচার কেবল মানবসমাজকে নিয়ত

* What we call Greeks and Romans are chiefly the citizens of Athens and Rome.—MaxMuller's India, what can it teach us, p. 121.

পশু-স্বভাবের দিকেই প্রাণপণে আকর্ষণ করিত! ইহার ফল ফলিতে বিলম্ব ঘটিল না। ইউরোপ শীঘ্রই সৌভাগ্য-বিচ্যুত হইল। অজ্ঞানতার অন্ধকারে পূর্ব্বশিক্ষা বিলুপ্ত হইয়া গেল! এসিয়ার খৃষ্ট-ধর্ম্ম ইউরোপে প্রচারিত হইবা-মাত্র, তাহার দেবভাবসুন্দর সন্ন্যাসীর সৌম্যমূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল! ইউরোপ ধর্ম্মান্ধ হইয়া উঠিল, নিয়ত শয়তানের কথা চিন্তা করিতে করিতে শয়তানের কথারই প্রচার করিতে লাগিল। জ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে চিরবিরোধ সঙ্ঘটিত হইয়া উঠিল। যাহা কিছু নূতন, তাহা শয়তানের কুটিল কৌশল বলিয়া ব্যাখ্যাত হইবামাত্র, জনসাধারণ তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়া, আত্মার সদ্গতিরক্ষার্থ ব্যাকুল হইয়া পড়িল! ধর্ম্মাচার্য্যগণ স্ব স্ব পদমর্য্যাদা বর্দ্ধিত করিবার আশায়, অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য নানারূপ ধর্ম্মান্ধতার আবরণ-সৃষ্টি করিয়া, লোক-লোচন আচ্ছন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইস্‌লামের সহিত খৃষ্টান-সমাজের ধর্ম্মযুদ্ধ বিঘোষিত হইলে, খৃষ্টানের ধর্ম্মান্ধতা অধিকতর কঠোর হইয়া উঠিল!

দুর্দ্দশার দিনে দুর্ম্মতি আসিয়া মানবসমাজের জ্ঞানচক্ষু আবৃত করিয়া দেয়। ইউরোপের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া উঠিল। ইউরোপ স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে জলপথে নৌচালন করিত; ভূমধ্যসাগর ইউরোপের নিকট জলপথের ন্যায় সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু ভূমধ্যসাগরের ইউরোপীয় অর্ণবপোত কেবল ক্ষেপণীবলেই পরিচালিত হইত। বায়ুবলে সমুদ্রপথে পোতচালনা করিবার কৌশল অতি পুরাকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।—ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যপোত সেই নৈসর্গিক বায়ুপ্রবাহের উপর নির্ভর করিয়াই, ভারতবর্ষ হইতে বর্ষান্তরে গমনাগমন করিত। প্রয়োজনের অভাবে ভূমধ্যসাগরে সে উপায়ে পোতচালন-কৌশল অবলম্বিত হইত না। দিগ্‌দর্শনশলাকা আবিষ্কৃত হইলেও, ধর্ম্মান্ধ খৃষ্টান নাবিকগণ তাহাকে শয়তানের যন্ত্র মনে করিয়া, তাহার ব্যবহার করিতে সম্মত হইত না। কেহ যে যন্ত্র ব্যবহার করিয়া পোতচালনা করিতে সাহস করিবে, যেকোন খৃষ্টান নাবিক সেরূপ অর্ণবপোতে পদার্পণ করিয়া তাহার পরকালের সদ্গতিকে সঙ্কটাপন্ন করিতে সাহসী হইত না! এরূপ অবস্থায় পুরাতন জলবাণিজ্যপথে প্রতিহত হইয়া, নূতন জলবাণিজ্য-পথের অনুসন্ধান করা অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম্মান্ধ ইউরোপের পক্ষে কত না কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল!

ইস্‌লামের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্ব হইতে ভূমধ্যসাগরে ফিনিসীয় বণিগ্‌বর্গের

প্রাধান্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। তৎপূর্ব্বে, একদা পুরাতন মিশররাজ্যই ভূমধ্যসাগরের অদ্বিতীয় অধিপতি হইয়া, সমগ্র ইউরোপে বাণিজ্য-যাত্রা করিয়া ধনোপার্জ্জন করিত। মিশর কালক্রমে সেই পুরাতন জলবাণিজ্যপথের অধিকার-বিচ্যুত হইলে, নূতন জলবাণিজ্য-পথের সন্ধান-চেষ্টায় নানারূপ আয়োজন করিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক দিকে ভূমধ্যসাগর, অন্য দিকে লোহিতসাগর নামক দুইটি ভূবেষ্টিত ক্ষুদ্র উপসাগরের সহিত সুপরিচিত থাকিলেও, মিশরবাসিগণ ভারতমহাসাগরের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। শিল্প বিজ্ঞান-মণ্ডিত দর্শন বিদ্যায় মিশরদেশ পুরাকালেই উন্নতিলাভ করে। তখন কোনরূপ অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কার মিশরবাসিগণকে অভিনব তত্ত্বালোচনায় নিরস্ত করিত বলিয়া বোধ হয় না। তাহারা আফ্রিকার একাংশে বাস করিয়া, অপরাংশের সম্বন্ধেও কিয়ৎপরিমাণে ভৌগোলিক জ্ঞান-সঞ্চয়ে সফলকাম হইয়াছিল। তাহারা আফ্রিকার চতুর্দ্দিকে সাগরজলরাশির অস্তিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, পূর্ব্বসাগর হইতে পশ্চিম সাগরপথে ভূমধ্যসাগরে উপনীত হইবার সম্ভাবনায় কোনরূপ সংশয় প্রকাশ না করিয়া, অভিনব জলবাণিজ্যপথের সন্ধান-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য-ব্যাপারে ফিনিসীয় বণিগ্বর্গের প্রাধান্য লুপ্ত করিয়া মিশরের প্রাধান্যসংস্থাপনের প্রবল প্রলোভন মিশরের রাজা প্রজা সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই নূতন জলবাণিজ্যপথ আবিষ্কৃত করিবার জন্য আগ্রহের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

খৃষ্টাবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে মিশরাধিপতি ইতিহাসবিখ্যাত ফ্যারাও নিকো লোহিতসাগর হইতে এক দল নাবিক প্রেরণ করেন। তাহারা লোহিতসাগর হইতে ভারতসাগর, তথা হইতে আটলাণ্টিক সাগর, এবং তথা হইতে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া, পুনরায় মিশরদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ইহাতে তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। সেকালের গঠনকৌশলহীন ও চালনকৌশলহীন ক্ষুদ্রকায় অর্ণবপোতের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অল্পকালে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিবার সম্ভাবনা না থাকায়, নূতন জলবাণিজ্যপথের সন্ধান লাভ করিয়াও, মিশরাধিপতি তদ্দ্বারা উপকার লাভ করিতে পারিলেন না। নাবিকগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, এক অলৌকিক কাহিনী কীর্ত্তন করিতে লাগিল। তাহাদের সুদীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার প্রথমভাগে, সূর্য্যদেব বাম দিক হইতে উদিত হইতেন; শেষভাগে, সেই সূর্য্যদেব দক্ষিণ দিক হইতে উদিত হইতেন।

নাবিকগণ ইহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু জনসাধারণ সে কথায় আস্থাস্থাপন করিতে পারিল না। আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলের সমুদ্রপথে মিশর হইতে দক্ষিণাভিমুখে পোতচালনা করিবার সময়ে, সূর্য্যদেবের বাম দিক হইতে উদিত হইবার কথা। আফ্রিকার পশ্চিমোপকূলের সমুদ্রপথে উত্তরাভিমুখে পোতচালনা করিবার সময়ে, সূর্য্যদেবের দক্ষিণ দিক হইতেই উদিত হইবার কথা। ইহা একালের বালকবৃন্দও অলীক কাহিনী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে না। কিন্তু সেকালে হেরোদোতসের ন্যায় মনীষিবর্গও ইহাতে আস্থাস্থাপন করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া, প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্য জনপদে বাণিজ্যপোত চালনা করিবার এই সকল পুরাতন প্রমাণ ইউরোপের অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু ইউরোপ তাহাতে আস্থাস্থাপন করিতে পারিত না। এরূপ পুরাকাহিনী অলীক কাহিনী বলিয়াই প্রত্যাখ্যাত হইত। বিষুব-রেখা পৃথিবীকে উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে;—সে কথা অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু বিষুব-রেখা যে সকল জলস্থলের উপর দিয়া অবস্থিত আছে, তাহার স্বাভাবিক তাপাধিক্য সম্বন্ধে নানারূপ অতিশয়োক্তি প্রচারিত হইয়াছিল। এত উত্তাপ যে, তাহা মানবশক্তিকে ভস্ম করিয়া ফেলিবে! বিষুব-রেখার নিকটে যখন এত উত্তাপ, তাহার দক্ষিণে হয় ত উত্তাপাধিক্যের অবধি নাই! এই সকল জ্ঞানান্ধ ভ্রান্ত-সংস্কার ইউরোপকে বহুকাল পর্য্যন্ত আফ্রিকার দক্ষিণাংশে গমনাগমনের কল্পনা পরিত্যাগ করিতেই শিক্ষাদান করিয়াছিল। ইউরোপীয় পুরাতন সাহিত্যে আফ্রিকার পশ্চিমোপকূলের সমুদ্রপথ অবিজ্ঞাত। আটলাণ্টিক মহাসাগর যেন এক অভেদ্য কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন! তাহা অপরিজ্ঞাত—অপরিজ্ঞেয়—অন্ধকার! এই বিশ্বাস কেবল ইউরোপকেই উপহাসাস্পদ করে নাই;—ইস্‌লামের পক্ষেও ইহা উপহাসের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। ইস্‌লাম এক সময়ে প্রতীচ্য মানবসমাজে জ্ঞানবিস্তারকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াও, স্বয়ং বহু বিষয়ে অজ্ঞের ন্যায় আচরণ করিতেন। মুসলমান মনীষিগণ বলিতেন,—আটলাণ্টিক মহাসাগরে অধিক দূর অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই! মুসলমানগণ আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া, আটলাণ্টিক সাগরপথে ইউরোপে পদার্পণ করিবার সন্ধান লাভ করিল, মুসলমানকে ইউরোপ হইতে তাড়িত করা সহজ হইত না। কিন্তু ইস্‌লাম-প্রতিভা সে পথে পরিচালিত হয় নাই; তাহা কেবল বিষুব-রেখার উত্তরপার্শ্বের জলস্থল লইয়াই পরিতৃপ্ত ছিল। ইউরোপের এই পুরাতন

ভ্রান্তসংস্কার সহসা-বিদূরিত হয় নাই। ইহার জন্য যেরূপ আত্মত্যাগ ও লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা ইউরোপের ইতিহাসে সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। যাঁহার অদম্য উৎসাহ, অবিচলিত অধ্যবসায় ও অপরাজিত আত্মত্যাগ ইউরোপের এই চিরসঞ্চিত ভ্রান্ত-সংস্কার-বিদূরিত করিয়া, মহাসাগর-পারের বিবিধ অভিনব রাজ্যে ইউরোপীয় অধিকার-বিস্তারের পথপ্রদর্শন করিয়াছিল, তিনি আধুনিক ইউরোপের নবজীবনদাতা। তাঁহার কথা ইউরোপের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তাঁহার জীবনকাহিনী ইউরোপের দেশে দেশে প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার পবিত্র সমাধি-ক্ষেত্র ইউরোপের পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার নাম রাজকুমার হেনরী। তিনি নাবিক-রাজ বলিয়াই সুপরিচিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অপরাজিত অধ্যবসায়।

"The mystery, which since creation had hung over the Atlantic, and hidden from man's knowledge one-half of the surface of the globe, had reserved a field of noble enterprise for Prince Henry the Navigator."—*R. H. Major's Prince Henry the Navigator.*

আটলাণ্টিক মহাসাগর-তীরে পর্ত্তুগাল নামক যে ক্ষুদ্র স্থান অদ্যাপি মানচিত্রে একটি স্বতন্ত্র ইউরোপীয় রাজ্যরূপে অঙ্কিত হইয়া আসিতেছে, তাহা একদা রোমক-সাম্রাজ্যের একটি নামগোত্রহীন নগণ্য উপবিভাগ বলিয়াই প্রাতন সভ্যসমাজে পরিচিত ছিল। লোকসংখ্যা অধিক ছিল না। যাহা ছিল, তাহারও অধিকাংশ কেবল দীনদরিদ্র নিরক্ষর নরনারী। তাহারা কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, রোমকসাম্রাজ্যের পাদুকা বহন করিত। তাহারা যে কদাপি শিক্ষায় সমুন্নত হইবে; তাহারা যে রণকৌশলে অজেয় হইয়া উঠিবে; তাহারা যে নৌবিদ্যাবিশারদ প্রধান পুরুষ বলিয়া জগদ্বিখ্যাত হইবে; তাহারাই যে ইউরোপের নবজীবনলাভের পথপ্রদর্শন করিয়া, ইতিহাসে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিকলাপে অমরপদবী লাভ করিবে;—সে কথা ভবিষ্যতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। ইস্‌লাম-শক্তি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে, এই দেশ ইস্‌লামের পদভরে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। স্পেন্ ও পর্ত্তুগাল ইস্‌লাম-গৌরবে জগদ্বিখ্যাত হইলেও, দেশের লোক

তাহাতে গৌরবলাভ করে নাই। সে গৌরব ইস্‌লাম একাকী উপভোগ করিত। দেশের লোক কেবল বিস্মিত-নেত্রে ইস্‌লামের অভ্রভেদী মন্দির-চূড়ার গঠনকৌশলের প্রশংসা করিয়া, ইস্‌লামের ক্রীতদাস হইয়াই, মানব-জীবন চরিতার্থ করিত।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই অনুন্নত মানবসমাজ সহসা সমুন্নতি-লাভের উপায় প্রাপ্ত হইল। ইস্‌লামই তাহার পরোক্ষ কারণ। ইস্‌লাম বিবিধ-বিদ্যালয়ে জ্ঞানবিস্তারকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া, খৃষ্টান ইউরোপকে মুসলমান ধর্ম্মের আশ্রদানের চেষ্টা করায়, সমগ্র ইউরোপে এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব ধর্ম্মান্ধ সমর-পিপাসা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টান ইউরোপের যে দেশ যত নিরক্ষর, সেই দেশ তত নরশোণিতলোলুপ অশান্তহৃদয়ে মুসলমানের কণ্ঠচ্ছেদ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল! খৃষ্টধর্ম্মের বিমল শান্তিপিপাসা তিরোহিত হইয়া গেল। জনসমাজ রাজ্য চাহিল না, বাণিজ্য চাহিল না, সম্ভোগ চাহিল না, ঐশ্বর্য্যবিলাসিতা অশান্ত হইল না;—চাহিল কেবল ক্ষমাশূন্য সীমাশূন্য দয়াশূন্য অগণ্য ধর্ম্মযুদ্ধ। এই যুদ্ধোন্মাদ জলে স্থলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ইহাতেই পর্ত্তুগাল মুসলমান-শাসন উৎখাত করিয়া, বাহুবলে স্বাধীন হইয়া উঠিল।

স্বাধীন শক্তি উভয় হস্তে সম্মুখের অভেদ্য অন্ধকার ঠেলিয়া, দৃঢ়পদে উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে শিক্ষালাভ করিল। ত্রয়োদশ-শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্ত্তুগাল সম্পূর্ণরূপে মুসলমান-শাসন-পাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া, আল্‌ফন্‌সো নামধেয় তৃতীয় নরপালকে সিংহাসনে সংস্থাপিত করিল। শান্তি প্রত্যাবর্ত্তন করিল; সমৃদ্ধি করতলগত হইল; যে দেশ রোমক-সাম্রাজ্যের নিতান্ত নগণ্য প্রদেশ বলিয়া উপেক্ষিত হইত, তাহাই ইউরোপের প্রধান রাজ্য-রূপে পরিচিত হইল। পর্ত্তুগালের ইতিহাসের এই অভিনব অভ্যুদয়-যুগের বিস্তৃত কা[illegible] নানা ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া, সভ্যসমাজে সুপরিচিত হইয়াছে।

যাঁহারা বাহুবলে মুসলমান-শক্তি প্রতিহত করিয়া পর্ত্তুগালকে স্বাধীন করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা ধর্ম্মবীর-নামে সুপরিচিত। খৃষ্টান-সমাজপতি ধর্ম্মাচার্য্য পোপ খৃষ্টানধর্ম্মের কল্যাণকামনায় নবোদ্গত ইস্‌লাম-শক্তির বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠ খৃষ্টানগণকে নিয়ত উত্তেজিত করিতেন। তাহাতে ইউরোপের সকল দেশেই বহুসংখ্যক ধর্ম্মবীর মুসলমানের সহিত রক্তকলহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা নানা দেশ হইতে

নানা পথে খৃষ্টজন্মভূমির উদ্ধারসাধনার্থ সমরক্ষেত্রে মিলিত হইবার জন্য যখন যুদ্ধযাত্রা করিতেন, বা যুদ্ধান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, তখন ইউরোপীয় জনসমাজ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মবীর-রূপেই পূজা করিতে ধাবিত হইত। এই সকল ধর্ম্মবীরদিগের মধ্যে পর্ত্তুগালের ধর্ম্মবীরগণ বিশেষ সমরনৈপুণ্য লাভ করিয়া, ইউরোপের সকল দেশেই বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ইস্‌লাম-বিদ্বেষ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছিল, তাঁহাদের ধর্ম্মোন্মাদ স্বদেশপ্রীতির সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছিল। যেখানে মুসলমান, সেইখানেই পর্ত্তুগালের ধর্ম্মবীরগণ অসিহস্তে ধাবিত হইবার জন্য লালায়িত, মুসলমান-নিপাত-সাধনই যেন তাঁহাদিগের ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বারাধ্য মূলমন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল! তাঁহাদের ধর্ম্মোন্মাদের পুরাকাহিনীর কীর্ত্তন করিতে হইলে, আধুনিক ইতিহাসলেখকবর্গও ইহার উল্লেখ করিয়া থাকেন। পর্ত্তুগালের স্বদেশবৎসল সুবিখ্যাত ইতিহাস-লেখক পর্ত্তুগালের রাজ্যস্থাপন ও রাজ্যবিস্তারের মূল কারণ বিবৃত করিবার সময়ে স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়া গিয়াছেন,—"যাঁহারা ধর্ম্মার্থ আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের পবিত্র শোণিতেই রাজ্যস্থাপন ও রাজ্যবিস্তার সুসম্পন্ন হইয়াছিল।"† মুসলমান-বিজয় সুসম্পন্ন হইলেও, এই ধর্ম্মোন্মাদ সহসা বিস্মৃত হইতে পারে নাই। নিকটের মুসলমান বিজিত হইলে, দূরের মুসলমানকে জয় করিবার জন্য, এবং মুসলমানের অনধিকৃত রাজ্যে খৃষ্টধর্ম্মের সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য, বহুকাল পর্য্যন্ত প্রবল উৎসাহ প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজা প্রজা সকলেই তাহার জন্য অর্থদান করিতেন; বীরপুরুষগণ আহূত হইবামাত্র ধর্ম্মযুদ্ধে জীবন-বিসর্জ্জন করিবার জন্য সমরে ধাবিত হইতেন; কখন বা নিতান্ত তুচ্ছকারণে যুদ্ধকলহের সৃষ্টি করিয়া, জীবন্মুক্তিলাভের সহজ পথ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যাকুলতা-প্রদর্শন করিতেন!

---

* In the stern school of adversity the latent energies of the race had been gradually developed. Religion, or rather religious fanaticism was the inspiring principal, the very main-spring of every movement, of every heroic exploit. Their wars were rather *Crusades* than patriotic struggles. They fought the Moor rather as an enemy to the faith, than as the invader of their country.—*Portuguese Discoveries by Rev. Alex. J. D. D'Orsey, B. D.*

†"The Kingdom was founded in the blood of Martyrs and by Martyrs was spread over the globe."—*De Barros.*

তৎকালে স্পেন-পর্ত্তুগালের অপর পারে আফ্রিকার উপকূলে মুসলমান-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভূমধ্যসাগরেও মুসলমান-রণতরণী জলপথে আধিপত্য বিস্তার করিত। মুসলমান-বিদ্বেষ যেমন স্থলপথে ধর্ম্মযুদ্ধে জীবন-বিসর্জ্জন করিবার জন্য ইউরোপকে উত্তেজিত করিয়াছিল, সেইরূপ জলপথেও রণতরণী সজ্জীভূত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। পর্ত্তুগাল অল্পদিনের মধ্যেই জলপথেও প্রবল হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে পর্ত্তুগালের প্রথম রণতরণী নির্ম্মিত হইল। ইউরোপীয় জনপদনিচয়ের মধ্যে—নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়াও, পর্ত্তুগাল জলে স্থলে বৃহৎ বিজয়-গৌরব-লাভের যোগ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

ইংরাজ ইতিহাসলেখকগণ পর্ত্তুগালের এই অসাধারণ কৃতিত্বলাভের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া, তাহার মূলে ইংলণ্ডের-সংস্রব থাকা ব্যক্ত করিবার জন্য, নানা ঐতিহাসিক কারণ-পরম্পরার উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের ধর্ম্মবীরগণ কখন কখন পৃথিবীমধ্যে বিশ্রামলাভার্থ কিছুক্ষণের জন্য পর্ত্তুগালে অবতীর্ণ হইতেন; তাঁহারা কখন বা ধনুর্ব্বাণহস্তে পর্ত্তুগালের প্রজাবৃন্দের পক্ষাবলম্বন করিয়া মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিতেন; রাজকুমার হেন্‌রীর জননী ইংলণ্ডের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন;—এই সকল পুরাতত্ত্বের উল্লেখে পর্ত্তুগালের অভ্যুদয়ের মূলে ইংলণ্ডের প্রবল প্রভাব আবিষ্কার করিবার জন্য যাঁহারা ইতিহাসরচনা করিতেছেন, তাঁহারা ইংরাজ। হয়ত তাঁহাদের স্বদেশ-প্রীতি অভিব্যক্ত হইলেও, ঐতিহাসিক বিচার-বুদ্ধির প্রাথর্য্য অভিব্যক্ত হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না।

পর্ত্তুগাল ক্ষুদ্র হইলেও, তাহার ক্ষুদ্রতার মধ্যেই প্রবল শক্তি-বীজ গুপ্ত-ভাবে বর্ত্তমান ছিল। ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশে কেবল ধর্ম্মোন্মাদ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; পর্ত্তুগালের ধর্ম্মোন্মাদের সহিত স্বদেশপ্রীতিও মিলিত

* The English alliance formed the key-stone of the policy of John the Great. The friendship of Portugal and England had, indeed, been of slow and solid growth. Towards the close of the twelfth century a body of London crusaders halted on their way to the Holy Land to help the Portuguese against the Moors. The end of the thirteenth and beginning of the fourteenth centuries found king Diniz. "The Laboured" in close correspondence with our Edwards I and II. &c &c.—*Sir W Hunter's History of British India vol I. 58.*

হইয়াছিল। পর্ত্তুগালের স্বদেশ-বৎসল ইতিহাস-লেখকের মতে ধর্ম্মবীরগণের আত্মোৎসর্গই পর্ত্তুগালের অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক মূল-সূত্র। তাহা কেবল অপরাজিত অধ্যবসায়ের বিজয়-কাহিনী। পর্ত্তুগালের আধুনিক অভ্যুদয়-কাহিনী যত সংক্ষেপে ও সরলভাবে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, প্রকৃত অভ্যুদয় তত সংক্ষেপে বা সরলভাবে সাধিত হইতে পারে নাই। তাহার জন্য আল্‌ফন্‌সো নামধেয় তিন-জন নরপতি দীর্ঘকাল কেবল পূর্ব্বসূচনার সূত্র-পাত করিয়াই জীবন-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। সাঞ্চো ও ডিনিজ নামধেয় নরপালদ্বয়ের সময় কৃষি-শিল্পবাণিজ্যের সমুন্নতিসাধন-চেষ্টায় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। চতুর্থ আল্‌ফন্‌সো নামধেয় নরপালকে স্পেন-পর্ত্তুগালের গৃহকলহ শান্ত করিতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া জীবনক্ষয় করিতে হইয়াছিল। এই সকল বাধাবিঘ্ন দূর করিলেও, পর্ত্তুগালের অভ্যুদয়-পথে আরও অনেক প্রবল বিঘ্নবাধা বর্ত্তমান ছিল। ধর্ম্মাচার্য্যগণ ধর্ম্মযুদ্ধার্থ উৎসাহদান করিতেন; সামন্তগণ উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া, ধর্ম্মার্থ জীবনবিসর্জ্জন করিতেন;—এই উভয় শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই, নরপতি সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা রাজশক্তিকে গ্রাহ্য করিতে অসম্মত হইয়া, পর্ত্তুগালে যে গৃহবিবাদের সূত্রপাত করেন, তাহাতেই পর্ত্তুগালের সকল আশা আকাশ-কুসুমে পরিণত হইত। পতিত জাতির অভ্যুদয়লাভের পথে যাহা কিছু বিঘ্ন বাধা বর্ত্তমান থাকিতে পারে, পর্ত্তুগালের পক্ষে তাহার অভাব ছিল না। কে কাহাকে মানিতে চাহিত? মুসলমানবিদ্বেষ কেবল ধর্ম্মযুদ্ধকালেই সকল পক্ষকে সাধারণ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এক পথে পরিচালিত করিত। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পর, সকলে স্বস্বপ্রধান হইয়া, রাজশক্তির সর্ব্বাংশে অবমাননা করিতে ত্রুটি করিতেন না। খৃষ্টীয় ১৩৮৫ অব্দে আল্‌জুবারোটার সমর-ক্ষেত্রে রাজশক্তি জয়-যুক্ত হইয়া, পর্ত্তুগালের অভ্যুদয়লাভের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিল। পর্ত্তুগালের ইতিহাস-বিখ্যাত জন-দি-গ্রেট এইরূপে রাজসিংহাসনের মর্য্যাদা-সংস্থাপনে কৃতকার্য্য না হইলে, পর্ত্তুগালের ইতিহাস জগদ্বিখ্যাত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইত না।

---

* Yet all the efforts of the Kings, though occasionally Successful, failed to curb the turbulance of the feudatories till the battle of Aljubarrota in 1885, gained by John I. over the rebels, effectually crushed insubordination, and restored the dignity of the Crown.—*Dialogos-de-varia-Historia.*

জন-দি-গ্রেট যথার্থই চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য। তাঁহার সুদৃঢ় শাসন কিঞ্চিদূন অর্দ্ধশতাব্দীকাল পর্ত্তুগালকে ভূমণ্ডলের সকল প্রদেশেই সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই নরপতি ১৩৮৫ হইতে ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পর্ত্তুগালের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি যখন সিংহাসনে পদার্পণ করেন, তখন তরুণজীবন। তখন ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডের সুযোগ্য পুত্র জন-অব্-বণ্ট ইউরোপে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি স্পেন্-দেশের রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেও, স্পেন্-পর্ত্তুগালের গৃহকলহে পর্ত্তুগালের পক্ষাবলম্বী হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সে কলহের অবসানে জন-দি-গ্রেট পর্ত্তুগালের সিংহাসনে আরোহণ করিলে, জন-অব্-ঘণ্টের দুহিতার সহিত তাঁহার পরিণয়-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডীয় রাজকুমার ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে দুহিতৃদ্বয় সমভিব্যাহারে পর্ত্তুগালে উপনীত হইয়া কন্যাদানের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্পেন্-পর্ত্তুগালের অধীশ্বরদ্বয় তাঁহার জামাতৃদ্বয় বলিয়া মনোনীত হইবামাত্র, শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। এই বিবাহ-সূত্রে স্পেন্-পর্ত্তুগালের গৃহকলহের পূর্ব্বতন সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। যে তিনরাজকুমারী পর্ত্তুগালের রাজমহিষী হইলেন, তাঁহার নাম ফিলিপা। তিনি রূপেগুণে রাজলক্ষ্মী বলিয়াই ইতিহাসে উল্লিখিত। তাঁহার ধর্ম্মজীবন আড়ম্বরশূন্য আত্মত্যাগের জন্যই সুবিখ্যাত। তিনি রাজমহিষী হইয়াও ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় নিয়ত ধর্ম্মকর্ম্মেই জীবন-যাপন করিতেন। ইতিহাস-বিখ্যাত রাজকুমার হেন্‌রী ইঁহারই পঞ্চম পুত্র। তিনি সর্ব্বাংশে জননীর ধর্ম্মজীবনের আত্মত্যাগপ্রবৃত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া, তরুণজীবনে চিরকুমারব্রত গ্রহণ করিয়া, স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইহাই আধুনিক ইউরোপের নবজীবন-দাতার জন্ম ও বাল্যকাহিনীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

মাল্য-দান।

সুকুল জহরলাল জীবিকার লাগি'
স্বদেশের নিরাময় জলবায়ু ত্যজি'
বঙ্গের অস্বাস্থ্য কোণে—ক্ষুদ্র পল্লীমাঝে

অজ্ঞাত ধনীর গৃহে সভয়ে সঙ্কোচে
যেদিন দর্শন দিল, সেদিন তাহার
লাঠি লোটা গাঁটরপাট্টা সম্বল কেবল!
কর্ত্তা সেকালের লোক, বনেদী ভূস্বামী,
অঙ্গনে ঘুরিতেছিলা, সঙ্গে আগে পাছে
হিন্দুস্থানী রক্ষিবর্গ;—এমন সময়
ব্রাহ্মণ জহরলাল সহাস্য-আননে
ভাবী প্রভু পাশে আসি' উপবীত ছুঁয়ে
আশীর্ব্বাদ জানাইয়া দাঁড়া'ল নীরবে।
জহরের দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ গঠন
সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব বিনম্র স্বভাব—
লাগিল বুড়ার চোখে;—সেই দিন হ'তে
জহর ধনীর গৃহে পাইল প্রবেশ।
আজ ত সে জমাদার, দলের প্রধান!
এ দিকে সে মহাজন, দশগুণ সুদে
প্রজাদের ধার দেয় আপদে বিপদে;
নিজ প্রাপ্য বুঝে লয় হিসাবীর মত;
বাকী আদায়ের লাগি' লাঠি কাঁধে ফেলি'
আপনি বাহির হয় রৌদ্র বৃষ্টি ভুলি'!
আপনা নিগ্রহ করি' ক্লেশে প্রাণপণে
আসিছে সঞ্চয় করি' কৃপণের মত;—
রূপসী ষোড়শী কন্যা আজিও অনূঢ়া
রয়েছে দরিদ্র-গৃহে; এ ভাবনা তারে
দিন দিন করিতেছে পীড়ন তাড়ন!
তদুপরি মাতা, গৃহকর্ত্রী ভ্রাতৃজায়া
দূর হ'তে প্রবাসীরে বার বার করি'
'সুরজ হয়েছে বড়' স্মরণ করায়ে
দিতেছে গঞ্জনা।
কোথায় পণের কড়ি?
সে দুর্ম্মূল্য আজিও ত হয় নি সঞ্চিত!

কে বুঝে সে কথা ? অভাবের অভিযোগ
ধৈর্য্যক্ষমাহীন।
পাঠক, পশ্চিমে চল ;
ভগ্ন তনু, রুগ্ন মন বাঙ্গালিনী ছাড়ি
দেখে আসি কবিচিত্র মানবের ঘরে
রূপের সার্থক স্বপ্ন—তরুণীর ছবি,
স্বাস্থ্য-উদ্ভাসিত কান্তি সজীব হৃদয়!
দেখে আসি, একাকিনী কেমনে সুরজ
গম ভাঙ্গে গুঞ্জরিয়া মধুর কজরী ;
সুখস্পর্শে হর্ষভরে কাকলী করিয়া
মর্ম্মে মর্ম্মে চরিতার্থ, ঘুরিতেছে জাতা ;
কাঁকন বাজিছে তালে, নাচিছে বেশর,
আঁটা-কাঁচলীতে আঁটা বক্ষ দুলিতেছে,
কালো কেশ এলো হ'য়ে পড়েছে ছড়ায়ে!
অড়হর-শীর্ষগুলি কাঁপায়ে তপন
ফিরিছে পশ্চিম বায়ু ; আহীর-বালক
গৃহ-মহিষের পাল চরাইছে গোঠে,
মন ঘুরিতেছে, বেথা শিশু বৃদ্ধ মিলে
ফাঁদ পাতি বসি' আছে ধরিতে বুলবুল!
—থামিল কজরী ; লুণ্ঠিত নিচোলবাস
সরমে আকুল হ'য়ে এলো কেশপাশে
চাহিল লুকাতে।
প্রতিবেশী বংশীলাল
কখন দাঁড়াল আসি নিঃশব্দচরণে ;
বিমুগ্ধ দেখিতেছিল পাদপদ্মতলে
তুচ্ছ গম ব্যর্থ জন্ম করিছে সার্থক
আপনারে চূর্ণ করি'। চারি চক্ষে হ'ল
চকিতে মিলন দীর্ঘ বিরহের তরে ;
ধীরে ফিরে চলে গেল যুবক নীরবে।
উল্লাস-তরল-কণ্ঠে তৃপ্তি-সুখোচ্ছ্বাসে

মধ্যাহ্নের বিদ্ধ করি' অদূরে মধুরে
কে ওই উঠিল গাহি' গজলে সহসা
মিলনের আবাহন অভিযান ভরা ?
যুবতী হাসিয়া পুন ধরিল ঝঞ্জরী
মৃদুস্বরে। ধীরে ধীরে এলো কেশ হ'তে
নিচোল পড়িল খসি' ; বুঝি সাথে সাথে
কর্ম্ম হ'তে মনটিও পড়েছে খসিয়া !
দূর হ'তে দূরান্তরে সঙ্গীতের তান
হইল করুণতর ; যেন গায়কের
তপ্তঅশ্রুভারাক্রান্ত অব্যক্ত হৃদয়
রসালমৃণাললোভী মরালের মত
বাঞ্ছিতেরে বেড়ি' বেড়ি' লাগিল কূজিতে !
সেই সুরে সেই ছন্দে সেই তান-লয়ে
কি মিনতি কি বিনতি, ব্যাকুল প্রকাশ
ক্রমে ক্ষীণ—ক্ষীণতর সঙ্গীতের রেখা
শূন্যে মিলাইয়া গেল স্বপনের মত !
যুবতী উঠিয়া, গৃহে পশিল নিশ্বাসি'।
বংশীলাল একমাত্র যুবা বংশধর
নিরভিভাবক, শূন্য সম্পন্ন-গৃহের।
সহৃদয় রঙ্গপ্রিয় সদানন্দ-মন,
তবু শিশুটির মত সরল নির্ম্মল।
তিতির লড়ায়ে আর ভ্রাতারে পড়ায়ে
ধনীর দুলাল এই দোনে-নন্দনের
স্বচ্ছন্দে কাটিত দিন। নিদাঘ-নিশায়
গৃহে গৃহে শয্যাগুলি পড়িত বাহিরে,
জ্যোৎস্নাযামিনীর সেই প্রশান্ত নিশীথে
বংশী বাজাইত বাঁশী নিজ গৃহে বসি' ;
নীরবে শয্যায় পড়ি' মোহিতা সুরজ
করিত শ্রবণ ভরি' সুরসুধা পান,
স্বপনে স্বপনে দিত নিশি কাটাইয়া !

কত দিন কত স্নিগ্ধ বসন্তপ্রভাতে
যখন আমের বাগে পশি' মন্দ বায়ু
সুঘ্রাণ উড়ায়ে দিত, শাখা-অন্তরালে
ঘুঘু বন-কপোতের প্রথম কূজন
আসিত সমীরে ভাসি'। বংশী সাধ ক'রে
আসিত আপন ক্ষেতে 'জনার' তুলিতে।
সেই ভোরে আম-বাগে বাজিত ঘুঙ্গুর,
উড়িত কেশের সাথে মিশি' নীলাম্বরী,
ঝরা-আম কুড়াইতে এসেছে সুরঙ্গ,
যত করে, নাহি ভরে অবাধ্য আঁচল!
এইরূপে দুই জনে মাঠে ঘাটে বাটে
চকিতে মিলন হয়। কভু সে মিলন
শুধু মিষ্ট-অনুভূতি অব্যক্ত প্রাণের;
কভু চোখে চোখে শুধু প্রশ্ন সুগভীর;
কভু হাস্যবিনিময়! কিন্তু কোন দিন
এ অপূর্ব্ব যুগলের প্রেমের মন্দিরে
ভাষার মঙ্গল-শঙ্খে বাজে নি আরতি!
তবু দোঁহে প্রাণে প্রাণে কত আপনার!
মূক-প্রেম ধরা দেয় মৌনী প্রকৃতির
নিঃশব্দ ইঙ্গিত সম শান্ত মহিমায়;
ভাষা সে প্রকাশাতীত রহস্যে পশিয়া
আপনারে করি' তোলে জটিল আবিল!
এ দিকে পণের মুদ্রা হ'ল যবে জড়,
প্রবাসী জহরলাল চলিল স্বদেশে।
পথে দু' একটি তীর্থে লভিয়া বিশ্রাম
সুকৃতি সঞ্চয় করি' হ'ল অগ্রসর;
নিজ-পল্লীসন্নিকটে লব্ধ-আশা সম
অধীর বাষ্পীয় রথ থামিল যখন,
জহর নিশ্চিন্ত সুখে ফেলিয়া নিশ্বাস
নামিয়া পড়িল ত্বরে। গৃহ-অভিমুখে

চলিল চঞ্চলপদে ; আনন্দ-চপল
মন তার কোন্ কালে চলে গেছে ঘরে !
স্বদেশের মায়ামাটী মায়াকাটী সব
পরশি' জাগায়ে দিল সুপ্ত কল্পনারে ;
মনে এল কত কথা ; কত প্রিয় মুখ !
সেই মাতৃহীন মেয়ে ! বংশের প্রদীপ,
একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র অভিরাম শিশু !
জহর কন্যারে ডাকি' প্রবেশিল গৃহে ;
ত্বরিত সে স্নেহাহ্বানে ব্যাকুল বিস্ময়ে
বহুক্ষণ পারিল না কহিবারে কিছু !
বৃদ্ধা মাতা কাছে বসি' প্রৌঢ় শিশুটিরে
সানন্দে কম্পিত কর লাগিলা বুলাতে ;
ভ্রাতৃবধূ মৃদু হাসি' প্রীতিসম্ভাষণে
তুষিলেন প্রবাসীরে। সাত বছরের
বংশের প্রদীপ সরি সংশয়ে সঙ্কোচে
ভীত কৌতূহলী নেত্রে আগন্তুক পানে
রহিল চাহিয়া ! শেষে একান্ত নির্ভয়ে
স্নেহাদরে ধরা দিল নিমেষের মাঝে।
মুহূর্ত্তে বৈচিত্র্যহীন দীনের কুটীর
নীরব উৎসবস্রোত লাগিল বহিতে।
সহসা জহরলাল মুমূর্ষুর মত
উঠিল বিবর্ণ হ'য়ে ; প্রাণ হ'তে স্নেহে
বাঁচায়ে এনেছে যাহা দীর্ঘ পথ হ'তে,
সেই চিরকষ্টার্জ্জিত পরিপূর্ণ থলি
কোন্ অসতর্ক ক্ষণে এসেছে হারায়ে !
কিছুক্ষণ নিরুদ্দেশে নিষ্ফল সন্ধানে
ঘুরিয়া জহরলাল ফিরে এল ঘরে।
মিলনকৌতুকদীপ্ত প্রবাসীর গৃহ
একেবারে হ'য়ে গেল বিষাদমলিন।
জ্বলিল না সন্ধ্যাদীপ আর ; পিতা পুত্রী

আর দুটি সমদুঃখী বিলাপিনী নারী
অনাহারে সে রজনী করিল যাপন।
পরদিন অপরাহ্নে বংশীলাল আসি'
বয়োবৃদ্ধ জহরের পাদস্পর্শ করি'
বসিল নিকটে। রহিল সে মিতভাষী
বহুক্ষণ অন্যমনে চিন্তায় বিভোর;
অবশেষে স্থান কাল কিছু নাহি গণি'
অধীর-উৎকণ্ঠাতপ্ত বিশুষ্ক অধরে
জড়িত স্খলিত কণ্ঠে আশায় নিরাশে
কহিল অ-বাক্‌পটু,—কর যদি দান
তব কন্যারত্ন দীনে, করিবে উদ্ধার
উদাসীন লক্ষ্যহীন একটি জীবন!—
রত্নলোভী দুরাকাঙ্ক্ষ কাঙ্গাল, দাতারে
জানায়ে বাঁচিল যেন মর্ম্মের প্রার্থনা!
আপনার ভাবে-ভোর, সরল-উৎসাহে
সে সংসার-অনভিজ্ঞ লাগিল কহিতে,—
ভাবিও না পণ লাগি'; আমি ঘৃণা করি
শুল্ক লয়ে শোণিতের আদান-প্রদান!—
না বুঝি' জহরলাল উত্তরিল রোষে,—
দু'দিনের অর্থবল, হে ধৃষ্ট বালক,
তারি এত অহঙ্কার! চাহিছ ঘুচাতে
চিরন্তন কুল-দৈন্য? পঙ্গু নহি আমি,
জানি আমি আপনাতে করিতে নির্ভর;
তব অযাচিত কৃপা-রাখ তুলে কোন
পরমুখাপেক্ষী তরে, দাম্ভিক যুবক!
ক্ষোভে রোষে যুবকের ফুটিল না কথা,
হ'ল মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ; অমনি স্মরণে
ভাসিয়া উঠিল কার মোহিনী প্রতিমা;
সেই চিরসুধাময়ী কৃপা-নির্ঝরিণী
সে কি হতে পারে এই পাষাণের মেয়ে!

শুদ্ধ বালকের মত, বদ্ধ পাগলের
প্রায়, অকস্মাৎ প্রলাপ উচ্চারি' শূন্যে
দ্রুতপদে হ'ল যুবা গৃহের বাহির।
গৃহে গিয়া আদরের পোষাপাখীগুলি
দিল উড়াইয়া সব; সেই প্রিয় বাঁশী
কত উৎসবের দিনে, স্তব্ধ অবসরে,
কত মধুযামিনীর জ্যোৎস্নায় মিশিয়া
খুলেছে যে হৃদয়ের নিরুদ্ধ দুয়ার,
কত গজলের তানে আকুল আহ্বানে
হাসিয়াছে কাঁদিয়াছে ফিরিয়াছে সাথে,
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তারে নির্ম্মমের মত!
দ্বার দিয়া শয্যা'পরে লাগিল লুটিতে!
দুঃখছায়াস্পর্শহীন একান্ত ভঙ্গুর
পেলবজীবনবৃন্তে প্রথম আঘাত,
এই প্রবল আঘাত! বহুক্ষণ পরে
বাহিরিল দ্বার খুলি' অভিমানী যুবা
বিবর্ণ বিশুষ্ক মুখ, যেন বনঘোর
সদ্য ঝঞ্ঝারণ-শান্ত গম্ভীর-গগন।
দুই মাস গেল চলি'। এই দীর্ঘ দিন
সুরজেরে রংমহালে দেয় নাই দেখা;
এক দিন সুরজেরে নিভৃতে পাইয়া
জানা'ল সকল কথা। সেদিন প্রথম
দুটি রুদ্ধ বাসনার নিঃসহ উত্তাপ
বিষাদের অশ্রুজলে পূত প্লুত হ'য়ে
মূর্ত্তি ল'য়ে ধরা দিল ভাষার বন্ধনে।
কহিতে লাগিল যুবা, জানিও, এ দেহে
যতদিন এক বিন্দু বহিবে শোণিত,
পারিব না তব আশা করিবারে ত্যাগ,
দুরাশারে বুকে করি' করির পালন।
শোন, যাহা স্থির ক'রে আসিয়াছি আজ,

তোমার পিতার সাথে কাল উষাকালে
করিব বিদেশযাত্রা, তোমারি লাগিয়া—
দীর্ঘ প্রবাসের মাঝে রহিব বিলীন—
তোমাহারা অন্ধকারে। ফিরিব যখন
তোমার পিতার মন করি' অধিকার—
তোমারেও পাব না কি চির-অধিকারে?
কিন্তু তার আগে তুমি কর অঙ্গীকার,
যাবৎ না ফিরি আমি, রহিবে আমারি?
দেহে মনে ততদিন কেবল—আমারি?
হারাবে না আপনার কুমারী-গৌরব
মিষ্ট ছল কিংবা কষ্ট বলের নিকটে?
উত্তরিল দৃঢ়স্বরে প্রেমগর্ব্বস্ফীতা,—
করিলাম অঙ্গীকার।—কহিল যুবক,—
হাতে হাত দিয়ে ওই চন্দ্রপানে চাহি'
কর হে শপথ তবে, ভুলিবে না কভু
এই শান্ত রজনীর নিস্তব্ধ বাসরে
উঠিল নক্ষত্রলোকে যে মিনতি মোর!—
ভুলিব না অঙ্গীকার।—কহিল যুবতী।
সেই প্রথম পরশ; রহিল স্তম্ভিত
করপুটে করপুট, গগনবিহারী
মিলন-উৎসুক দুটি মেঘের মতন।—
মুহূর্ত্তে বহিয়া গেল তাড়িত-প্রবাহ
দুটি থর-থর দেহে। মাথার উপরে
চকোর উড়িতেছিল; বহিয়া আসিল
গ্রামের নেপথ্য হ'তে কোকিলকাকলী;
আসন্নবিরহত্রাসে দুটি মুগ্ধ প্রাণ
ক্ষণেক বিহ্বল রহি', স্বপ্ন হইতে জাগি'
মৃগমিথুনের মত সচকিত হ'য়ে
দুই জনে দুই পথে দ্রুত গেল চলি'।
তার পরে যথাকালে প্রতিবেশী দুটি

সুদূর প্রবাসে এল। কবে ধীরে ধীরে
বংশী প্রৌঢ় জহরের অশ্রান্ত সেবায়
আপনারে সঁপি' দিল ভক্ত ভৃত্য সম।
পাকশালে প্রবেশিয়া পাইত জহর
যথাস্থানে রন্ধনের উপচারগুলি,
দেখিত শয়নকালে শয্যা আছে পাতা।
প্রথম ধনীর হাতে হেন সেবা নিতে
ব্যস্ত সঙ্কুচিত হ'ত দরিদ্র জহর;
সনির্ব্বন্ধে বংশীলালে করিত বারণ।
ক্রমে ক্রমে অভ্যাসের অজ্ঞাত নেশায়
সঙ্কোচের গুরুভার লঘু হ'য়ে এল,
কৃতজ্ঞতা শুষ্ক হ'য়ে প্রভুত্বে দাঁড়াল,
পরুষ কঠিন হ'য়ে। যুবা ধৈর্য্য ধরি'
সহিতে লাগিল সেই অন্যায় বিচার।
জহর পড়িল রোগে। দীর্ঘ দিন ধরি
রোগীর নিঃসঙ্গ ক্লিন্ন রোগশয্যাপাশে
অবহিত শুশ্রূষায় নিপুণ সেবায়
লগ্ন মগ্ন হ'য়ে ছিল যুবা বংশীলাল।
জহর নীরোগ হ'য়ে কহিল সস্নেহে,—
শোধিতে নারিব কভু তোমার এ ঋণ।
বংশীর অন্তর হ'তে কি যেন প্রার্থনা
সহসা ফুটিতে চেয়ে রহিল নীরব।
নববর্ষ এল বঙ্গে। এবার জহর
কন্যা বিবাহের লাগি' হইল ব্যাকুল;
আপন সঞ্চিত অর্থ মিলিল স্বপন
প্রভুর সদয় দানে, ভাবিল জহর,
কোনমতে শুভকর্ম্ম হ'য়ে যাবে শেষ।
স্বদেশযাত্রার দিন স্থির করি' শেষে
কহিল সে বংশীলালে,—চল, একসাথে
যেমন এসেছি দোঁহে, ফিরি সেইরূপে।

বংশী নতজানু হ'য়ে কহিল বিনয়ে,—
সকলি তোমার হাত! যদি দাও আশা,
তবেই ফিরিব ঘরে! নহে এই শেষ!
অকস্মাৎ জহরের পা দুটি জড়ায়ে
ঝর্ ঝর্ অশ্রুজলে লাগিল ধোয়াতে।
নিস্তব্ধ নির্জ্জন কক্ষে নীরব মিনতি
প্রহত হইতেছিল কঠিন প্রাচীরে!
কহিল জহরলাল,—ছাড় তার আশা;
ধিক্ যুবা, এই তব বলের বড়াই?
ছিঁড়িতে পার না ক্ষীণ একটি বাঁধন?—
বালকের মত যুবা সাধিল, কাঁদিল।
অটল জহরলাল।—সহসা বঞ্চিত
উঠিয়া, ক্ষিপ্তের প্রায় খর-দৃষ্টি হানি'
চলে গেল কক্ষ হ'তে, অস্ফুট-ভাষায়
উচ্চারিয়া অভিশাপ মর্ম্মান্তিক খেদে,—
যাও, যাও; এই স্পর্দ্ধা এ কঠিন পণ
একটি কুসুম-কবে চূর্ণ, দেখে এস!
তখন এ অনাদৃতে আসিবে সাধিতে!
এ দিকে জহরলাল ফিরে এল দেশে;
শুভদিনে শুভক্ষণে শেষে একদিন
জহরের নির্ব্বাচিত সুসজ্জিত বর
আনন্দ বিশাল আর জলন্ত মশাল
অন্তরে বাহিরে ল'য়ে, ধীরে বাহিরিল
সচকিত পল্লীপথে কন্যাযুগয়ায়!
দস্যু যেন প্রবেশিছে গৃহস্থের ঘরে,
পশিল সদলবলে বিবাহ-প্রাঙ্গণে!
একটি বিহ্বল আর্ত্ত নারী-হৃদয়ের
সমস্ত গৌরবগর্ব্ব আশা শান্তি সুখ
দস্যুরি নতন বলে লইল লুটিয়া!
যথাকালে কর্ম্মস্থলে ফিরিল জহর।

ললাটের ঘর্ম্ম মুছি' ঝোলা-ঝুলি রাখি'
বংশীলালে হেরি' কাছে কহিল নিবাসি',
এতদিনে পরিত্রাণ!—ঘরের লক্ষ্মীরে
দিয়েছি পরের করি' জনমের মত!
প্রৌঢ় একবিন্দু অশ্রু ফেলিল মুছিয়া।
যুবা দেখিল না তাহা, তখন তাহার
বিমথিত হৃদয়ের প্রচণ্ড বিপ্লবে
একদণ্ডে বিশ্বভূমি হ'য়ে গেছে লয়।
উত্তপ্ত বেদনাক্লিষ্ট মাথার ভিতরে
প্রলয়ের শঙ্খনাদ হতেছে সঘনে!
একবার মনে হ'ল, নিষ্ঠুর জহর
করিয়াছে পরিহাস! দেখিল চাহিয়া,
সে মুখ অম্লান স্থির চাতুরীবিহীন।
বৃশ্চিকদষ্টের প্রায় সহসা ছুটিয়া
উপাধানে মুখ ঢাকি' কহিতে লাগিল
গুমরি' আপন মনে,—ওরে উপাধান,
ওরে মোর চির-সাথী অজিন্ন-আশ্রয়,
তোর কোলে মাথা রাখি' সোনার শৈশবে
দেখেছি সোনার স্বপ্ন; কৈশোরে যৌবনে
কত আনন্দের দিনে একান্তে নীরবে
তোর বুকে লুকায়েছি অধীর উচ্ছ্বাস
উচ্ছল সুখের! দুর্দ্দিনে আহত সম
কতবার তোর বুকে লুকায়েছি মুখ!
ওগো লজ্জানিবারণ, আজ ঢাক মোরে
বাহিরের কৌতূহলী খর-দৃষ্টি হ'তে!
হে দুঃখ, হে প্রিয়, তোর ব্যর্থ অশ্রু দিয়ে
করিব না অবমান। নিব প্রতিশোধ;
তার পরে এস তুমি অনন্ত অপার
হতাশের চির-সাথী হে মৌন-রোদন!
মনে হ'ল, বিশ্বমাঝে যত নারী আছে

সবাই প্রলয়ঙ্করী ; সবাই পাষাণী ;
দেবী ব'লে পূজা পায় মূঢ়ের নিকটে !—
হা পুরুষ, প্রাণভরা অভিমান ল'য়ে
এস না বুঝিতে তুমি রমণী-হৃদয় !
স্বজন সমাজ আর ধর্ম্মেরে লঙ্ঘিয়া
নারী যবে ভালবাসে আপনার কাছে
থাকে যে সে অপরাধী ; শুরু কর্ত্তব্যেরে
দ্বিগুণ আবেগে তাই ধরে সে আঁকড়ি'।
প্রাণ দিয়ে প্রাণাধিকে ভাণমাত্র ল'য়ে
শূন্য দেহ ডালি দেয় সংসারের পায়।
প্রথম ভাবিল যুবা, যোগ্য প্রতিশোধ,
রূপসী বিবাহ করি তারে বিস্মরণ।
পরক্ষণে মনে হ'ল, দু'বার কি কেহ
পারে ভালবাসিবারে ? তবে কেন মিছে
একটি কোমল প্রাণ করিব নিষ্ফল ?
শেষে যাহা হ'ল স্থির, তার ফলে যুবা
জানিল, প্রেমের শুভ্র তুঙ্গ শৃঙ্গ হ'তে
সহসা গভীর পঙ্কে এসেছে নামিয়া !
সুতিক্ত ঔষধে যেন রোগীর নিকটে,
চিরপ্রেমপরায়ণ কল্পনা-প্রবণ
হৃদয়ে লিপ্সার স্পর্শ লাগিল তেমন !
শেষে তাতে শক্তি এল ; তবু তাহা যেন
প্রাণহীন শুধু এক উদাস বিলাস।
বার বার মোহঘোরে অন্ধকারাগারে
একটি সুদূর-স্মৃত দেবীর প্রতিমা
মুক্তির আলোক ল'য়ে পশিত সস্নেহে ;
রংশী তারে জোর ক'রে দিত তাড়াইয়া।
বহুদিন গেল চলি ; তবু বংশীলাল
সুরজেরে কোন মতে নারিল ভুলিতে ;
প্রেমের নিকটে কাম হারায়ে গরিমা

ছলে বলে আপনারে রাখিল জাগায়ে।
তাই জীর্ণবয়সে এক প্রেম ছাড়ি'
নিত্য নূতনের পাছে ধাইল ঘুরিতে।
বাঁকে না সরল বাঁশ; বাঁকালে তাহারে
থামে না সে মধ্যপথে, যাবৎ না করে
আপনারে বিনাশের অতলে নিক্ষেপ!
বারেক সরল যুবা বুঝিল যখন
অকারণে হয়েছে সে বঞ্চিত লাঞ্ছিত,
আপনারে একেবারে দিল ভাসাইয়া
দিশাহারা অন্ধকার নিপাতের স্রোতে।
কত বর্ষ গেছে চলি'; এর মাঝে কত
ঘটেছে ঘটনা। মরেছে জহরলাল;
কন্যার বৈধব্য তারে হয় নি সহিতে।
বিবাহান্তে তিন বর্ষ না হইতে গত
স্থবির বিধবা হ'য়ে তপস্বিনী সাজি'
মর্ম্ম মাঝে অগ্নি জ্বালি' করিতেছে তপ,
কোন্ দেবতার লাগি?—সুধায়ো না তাহা!
সে রহস্য থাক্ ঢাকা শোকের তিমিরে!
গুরু কর্ত্তব্যের ভরা আলোহীন পথে
অবিশ্রান্ত শ্রান্ত পান্থ বহিতে বহিতে
রঙ্গিল অতীত পানে যদি চেয়ে দেখে
বারেক, ক্ষণেক তরে,—ক্ষমা নাই তার?
পঞ্চদশ বর্ষ পরে স্বদেশের পানে
চলিয়াছে বংশীলাল! এ কি সেই যুবা,
পবিত্র সুন্দর শুভ্র প্রভাতের মত?
এ যে রোগে অত্যাচারে ভগ্নজীর্ণ-তনু;
পাপে তাপে অবসন্ন অকালস্থবির!
সর্ব্বশেষে যে নারীরে নির্ভর মানিয়া
করিল সে শয্যাসখী, সেও কিছুদিনে
দুই দিবসের শিশু দিয়ে উপহার

তারে ছাড়ি' মনোমত্ত করিল বরণ!
স্বহস্তলালিত সেই প্রাণাধিক ফুলে-
অঙ্কের যষ্টির মত বক্ষে আঁকড়িয়া
ফিরিছে সে গৃহপানে। দীর্ঘ পথ বাহি'
বাষ্পোদ্গারী মায়াবণ ঝরিল যখন,
স্বদেশের পুণ্যভূমি ঠেকিল চরণে,
উদাস উদ্বেগহীন চলিল প্রবাসী
ধীরপদে গৃহমুখে। পথে-সেতে তারে
কেহ সুধায় না ডাকি'! ক্রূর কৌতূহলে
অজ্ঞাত অপরিচিত খর-দৃষ্টিগুলি
বিঁধিতে লাগিল তারে। শুনায়ে শুনায়ে
ক্রীড়ারত এক গাল অশিষ্ট বালক
তার পক্ককেশ গায়ে ব্যঙ্গ বরষিল!
পরলোকপ্রত্যাগত প্রেতাত্মার মত
অভাগা ভাবিতেছিল, কি না ছিল মোর?
প্রেম হয়েছিল ব্যর্থ, কি ছিল তাহায়?
পবিত্র সমাধিসম তবু যদি আহা!
আমার সে অনাবিল ভদ্র অতীতেরে
শুধু সাজাতাম, শুধু পূজিতাম পূজা
বন্ধনার সুরভিত কুসুমে কুসুমে,
জীবন কাটিয়া দেহ সৌরভে গৌরবে!
আমার অতীতে কই স্মৃতির সুঘ্রাণ?
আজ কিছু-নাই মোর, কেহ নহি আমি!
সঙ্গীব সরস এই জনতাপ্রবাহে
কি বাহুল্য কি নীরস অস্তিত্ব আমার!
এই কর্মকোলাহল ঘন গোলাকারে
কত লুপ্তি, কত মুক্তি, কত আয়োজন
নব নব আনন্দের! কোথা আছি আমি?
সকলি বিচিত্র এ যে নাহি পরিচয়!
হায় কবি পলাতক, হায় পরিত্যক্ত

হে আমার জন্মভূমি, তুমি কি গো সেই ?
বল বল কোন্ দোষে, কোন্ মোহিনী বেশে
রাখিয়া গিয়াছি তোমা বিলাস-অভাতে,
কেন দেখিলাম আজি নিবিড় অন্ধকার
রূপহীন বর্ষীয়সী তোমার রূপসী !
শৈশবের সুখ-স্বপ্ন, কৈশোরের সাধ,
যৌবনের লীলাগার, প্রৌঢ়ের স্মরণ,
তুমি সেই জন্মভূমি ! আন, ফিরে আন্
তোর সাথে সেই দিন ! সেই প্রিয় মুখ,
সেই আশা, সেই বাণী, সেই প্রেম ভাষা,
মায়ামুগ্ধ পরাণীর স্বপন-গহনে !
বালকের ক্রোড়ে লভি যুবা তাপিতের মত
দৌড়িতে লাগিল প্রৌঢ় ; যেন কারো সাথে
মুহূর্ত্ত বিলম্ব হ'লে নাহি হবে দেখা !
যখন সে ফিরে পথ দেখিতে না পায়,
শ্বশুরের দ্বারদেশে রয়েছে দাঁড়ায়ে।
বুঝিতে নারিল, কোন্ মায়ার আবেশ
দিশাহারা জলমগ্ন নাবিকের মত
আনিয়া ফেলেছে তারে ত্রিতাপ-কূলে !
এসেছিল পিত্রালয়ে দেখিতে সুরজ
পীড়িত পিতৃব্যপুত্রে ; আজ ফিরে যাবে
পুন পতিগৃহে। শিবিকা প্রস্তুত দ্বারে ;
সুরজ অঙ্গনে ছিল, আবে দেখি' যেন
উঠিল সে চমকিয়া,—এ যে সেই মুখ !
আজও একদৃষ্টে চাহি কিছুক্ষণ
সহসা উঠিল ডাকি', —সুরজ ! সুরজ !
হা ভ্রষ্টে লাবণ্যের জীবন্ত সমাধি !
অশ্রুহীন বিষাদের নিবিড় ছায়ায়
একান্তে মিলিল দুটি প্রবীণ প্রবীণা !
দেহে চিরপরিচিত, তবু দুই জনে

কি বিচ্ছেদ ব্যবধান আজ কায়-মনে,
কি স্বতন্ত্র কি বিচিত্র দুটি নক্ষত্রের!
একটু ঔদাস্যভরে যত্নে তুলে রাখ,
শেষে পুরাকাল পরে পূর্ব্ব-স্মৃতি ক'রে
চেয়ে তারে, যত পড়ে, যত লও ভ্রাণ,
কিছুতে সে আদরের আর নাহি থাকে লেখা;
মনে হবে, যেন কোথা—কত দূর এসে
অতীতের সাথে সব ছিন্ন হ'য়ে গেছে!
সুরঙ্গ সঙ্কেত করি' গৃহের সকলে
কহিল, সহিতে দূরে। নিভৃতে নীরবে
সুখোন্মনী দুই জনা রহিল নিশ্চল,
বিরহি-যুগল আজ কি পরিবর্ত্তি!
পূর্ব্বের আবেগ ল'য়ে স্মৃতির সেতার
যতই বাজাতে যায় প্রাণপণ বলে,
ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় তার, আসে না ঝঙ্কার!
দোহার জীবন-সেরা তবু দুই জনে—
দুই লেখে নির্ব্বাসিত দুটি তারা সম
আছে জাগি'। আর যত গত-ইতিহাস
দুর্ভাগ্য দুঃস্বপ্ন ভ্রান্তি নিষ্প্রভ বুঝি সব!
খুলে গেল দু' জনের হৃদয় বিবর,
কহিল সুরঙ্গ,—মোরে করিও বিশ্বাস,
পরঙ্গ-লোকে আছে ভীরু বলহীন
ক্ষুদ্র নারী-হৃদি ল'য়ে বহু দিন বুঝি'
করিয়াছি তার পরে আত্মবিসর্জ্জন।
কেমনে কাহার সাথে হ'ল পরিণয়,
কিছুতো বিরশা আমি নাহি জানি কিছু।
বংশীর হৃদয়াকাশে সংগমের মেঘ
এত দিন গেল নামি'। আজ বংশীলাল
বুঝিল, বহুতর নারী-প্রকৃতির
ভিন্ন শ্রেণীভুক্তা, নহে ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতা।

নারীর চরম শক্তি, আত্ম-বিসর্জ্জনে ;
নহে তাহা স্বার্থীন্ধের বিদ্রোহঘোষণা !—
তীব্রবেগে সর্ব্বশক্তি যুগ্ম অনুরাগে
বাঁধিল দুহিতে তারে ; জীবনের ভার
বড় গুরু মনে হয় ! কহিল কাতরে
অনুতপ্ত বংশীলাল,—আমি ?—হায় হায়,
এই আমি ?—আজ তব করিব বিচার ?
দর্পের উচ্ছিষ্টভোজী অন্ধ কুক্কুর
মন্দির-বাহিরে পড়ি' দীননেত্রে থাকে
শুধু কৃপা-প্রতীক্ষায় ; যা পায় প্রসাদ
দেবতার, ধন্য মানি' করে তা গ্রহণ !—
তোমার পবিত্র স্মৃতি কলঙ্কিত করি
আমি শুধু—আমি দেবী—কৃপার ভিখারী !
বীরে ধীরে শোচনীয় আত্ম-ইতিহাস
শিশুসম অকপটে করিল প্রকাশ।
সঙ্গী বালকের গালে চাহি অকস্মাৎ
তর্জ্জনীনির্দ্দেশে তারে দেখায়ে কহিল
পূর্ণ পিতৃগর্ব্বভরে,—এই শিশু মোর
রসাতলজাত এই শেষচিহ্নলেশ,
কলঙ্কনিষ্ঠুর এই নির্ম্মোক বালক,
গরল-মথিত সুধা, আছে মোর সাথে !
দৈব-আশীর্ব্বাদ সম দীর্ঘ অভিশাপে,
করুণাকোমল কণ্ঠে কহিল সুরঙ্গ
পুলকিত চমকিত কম্প বংশীলালে,—
এ নারীর প্রেম-স্বর্গে কল্পনা-নন্দনে
যে দেবতা স্থাপি করি দিয়াছিনু দেখা,
অধীন ম্লানকান্তি অকলঙ্ক যুবা,—
আমি ভালবাসিয়াছি সেই বংশীলালে !
চিরকাল সেই ছবি আঁকা রবে প্রাণে।
পুরুষের প্রেম—কর্ম্মক্লান্ত জীবনের

ক্ষণ মুগ্ধ অবসর! জান না তাহারে,
ভাবিয়াছ জীবনের সর্ব্বস্ব তাহারে।
সতৃষ্ণনয়নে চাহি' মানিকের পানে
কহিল,—একটি টিকা দাদি তা'র কাছে,
আবরণ শিশুটির কর অপসার,
ওর স্মিত বিভাসিত অকলঙ্ক মুখে
তোমার কিশোর মূর্ত্তি দেখিতেছি আঁকা।
বাৎসল্য-করুণ তা'র স্নিগ্ধ তোমার,
সহিও এ অপরাধ পূর্ব্বস্নেহ স্মরি';
এই ভেবে ক্ষমা দিও, স্বার্থান্ধ হৃদয়
কারো শেষ স্মৃতিচিহ্ন হারাল জাড়িতে!
এত বলি', কোলে টানি' বিস্মিত শিশুরে
সোহাগে আবেগে স্নেহে দুরু দুরু নিনাদে
মাতৃরেহবাণীহীন অন্তর ভূমিতে
করিল নিমেষ-মাঝে চির-আপনার!
বংশীলাল সকাতরে উঠিল চীৎকারি',—
পাষাণী, পাষাণ-কন্যা, আজ ভিখারীরে
তার শেষকণা হ'তে করিবে বঞ্চিত?
এই সঙ্গ-ভীরুতার অন্তরে বন্যার
কি রহিল মোর? মোর সন্ন্যাসীপটুকু
থর থর কম্পান্বিত মত বিরহাতে
এনেছিনু বাঁচাতে কি হারাতে এরূপে?
ভেদি' বংশীলালপ্রাণে, সাধীর হৃদয়
ত্রস্তে কণ্ঠ হ'তে খুলি' রুদ্রাক্ষের মালা
স্বহস্তে তাহার গলে দিল পরাইয়া;
ঠিক সেইক্ষণ শিকটের শিবালয়ে
বাজিয়া উঠিল শঙ্খ! চঞ্চলি' নিমেষ
বালকেরে ক্রোড়ে চাপি' শিবিকায় উঠি'
রুদ্ধ করি' দিল দ্বার। চলিল শিবিকা;
যতক্ষণ দেখা গেল, মূঢ় বংশীলাল

কৃষ্ণ শিবিকার পাশে রহিল চাহিয়া ;
শিবিকা অদৃশ্য হ'লে, সে ও মুহূর্ত্তেক
আঁধারী গৃহমুখে চলিল ফিরিয়া।
সে করুণ অপরাহ্নে পাণ্ডুচন্দ্রলেখা
পথিকের সাথে তার স্তিমিত স্তম্ভিত
মোহময় অশ্রুময় কল্পনা-স্বপনে
উঠিল স্মৃতির মত ভাসিয়া।
পথে যেতে নানাগাছি চুমি' বার বার
রাখিল মাথায় ধরি' ; রহিল আবেগে,—
আজ যাহা পাইয়াছি এ বুকের কাছে,
এ প্রাণের মাঝে, তাই লয়ে জীবনের
অবশিষ্ট দিনগুলি প্রেয়সীর কাটাতে।
এই ক্ষমা এই দয়া এই স্নেহভরে
বিধাতার চির-ক্ষমা লইব মাগিয়া।—
এত বলি', নানাগাছি চুমিয়া আবার।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

বেদান্ত দর্শন।

অদ্বৈত মত।

আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈত মতে ব্রহ্মই এক অদ্বিতীয় বস্তু—আর যাহা কিছু সকলই অবস্তু। তাহাই যদি হইল, যদি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন কিছু নাই, ইহাই স্থির হইল, তবে যে এই বিবিধবৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ অতিক্ষণ আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে, ইহা আসিল কোথা হইতে? এ জগৎ মিথ্যা কিরূপে ধারণা করি? তদুত্তরে অদ্বৈতবাদীরা দৃষ্টান্ত দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করেন। তাঁহারা বলেন,—রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়, শুক্তিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়, মরীচিতে (সূর্য্যকিরণে) যেমন মরীচিকা-ভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রম হইতেছে। ইহা ভ্রমমাত্র—এতদ্দ্বারা জগতের

বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। রজ্জুতে সর্প-ভ্রমে আমরা ত্রস্ত হই, শুক্তিতে রজত-ভ্রমে আমরা প্রলুব্ধ হই, মরীচিতে মরীচিকা-ভ্রমে আমরা আশ্বস্ত হই; কিন্তু তা' বলিয়া সে ভ্রম, ভ্রম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। কারণ, যে আধারে সেই ভ্রমের অধ্যাস, সেই আধারের জ্ঞান হইলেই ভ্রম বাধিত হয়। তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, সর্প, রজত, মরীচিকা—ইহারা ভ্রমের বিজৃম্ভণমাত্র; রজ্জু, শুক্তি, মরীচিই সত্য পদার্থ—এইরূপ যখনই জীবের এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তখনই ব্রহ্মে আরোপিত জগদ্ভ্রম বাধিত হয়। তখন

---

* এ সম্বন্ধে যোগবাসিষ্ঠের উপদেশ এইরূপ,—

স্বপ্নে জাগ্রদ্ভ্রমস্তদ্বদ্ দৃশ্যো জাগ্রত্যসম্ভ্রমঃ।
মৃতির্জন্মসদৃক্‌রূপা মৃত্যাবুন্মাপ্যনন্তরং।—নৈর্ঋতি সিষ্ঠ, উৎপত্তিপ্রকরণ, ৬৪।২৪।

ন কথঞ্চন যন্নাস্তি তদ্ উল্লেখমাত্রে তজ্জগৎ।
অস্মিন্নেষা পরিত্রাণা ভ্রান্তিঃ সৃষ্টিরনিত্যতা।—ঐ। ঐ

যথা তরঙ্গা জলধৌ তথৈতাঃ সৃষ্টয়ঃ পরে।
উৎপদ্যন্তেঽপতন্ত্যন্তে ব্রহ্মণ্যেব মহাম্বুধৌ।
তস্মাদ্ নাস্তিস্বভাবেঽস্মিন্ বিশ্বাভাসে অসদ্বস্তুনি
মৃগতৃষ্ণা জলচয়ে কৈবাস্থা সর্গভঙ্গয়ে॥
ভ্রান্তয়শ্চ ন তত্রান্যাস্তা স্বদেব পরং পদম্।—ঐ। ঐ। ঐ। ২৯-৩১।

অন্যত্র কিন্তু যোগবাসিষ্ঠ বহু ব্রহ্মাণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন,—

যথা সূর্য্যোদয়ে গেহে ভ্রমন্তি ত্রসরেণবঃ।
তথৈবে পরমাকাশে ব্রহ্মাণ্ডাস্ত্রসরেণবঃ।—যোগবাসিষ্ঠ, উৎপত্তি, ২৯-৩৭।

জগতের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে গৌড়পাদাচার্য্য মাণ্ডুক্য-কারিকায় এইরূপ নির্দ্দেশ করেন;—

স্বতো বা পরতো বাপি ন কিঞ্চিদ্ বস্তু জায়তে।—মাণ্ডুক্য-কারিকা, ৪।২২।
সদসদ্ সদসদ্বাপি ন কিঞ্চিদ্ বস্তু জায়তে।—ঐ, ৪।৩১।
আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা।—ঐ, ৪।৩১।
প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ।
মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতম্ অদ্বৈতং পরমার্থতঃ।—ঐ, ১।১৭।
আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা।
বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতা।—ঐ, ২।৬।
[বিতথৈঃ=মৃগতৃষ্ণিকাদিভিঃ সদৃশত্বাৎ—শঙ্কর।]
অনিশ্চিতা যথা রজ্জু রন্ধকারে বিকল্পিতা।
সর্পধারাদিভির্ভাবৈ স্তদ্বদাত্মা বিকল্পিতঃ॥

ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই প্রতীতি হয় না। সেই জন্য প্রবোধ-চন্দ্রোদয়-কার বলিয়াছেন,

যৎ তৎ বিদ্বন্ নিমীলতি জগদ্ভ্রান্তোনিজোদ্গারোন্মুখম্।

"যেমন রজ্জু-জ্ঞানের বলে সর্প-ভ্রম তিরোহিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞান হইলে জগদ্‌ভ্রম বাধিত হয়।"

তবেই দেখা যাইতেছে যে, জগৎ না থাকিয়াও, যাহা আছে তাহা হইতেছে। কিসে এরূপ হয়? তদুত্তরে অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে, ব্রহ্মের যে মায়া-শক্তি, সেই শক্তির দুইটি সামর্থ্য আছে, আবরণ ও বিক্ষেপ। আবরণ-শক্তির ফলে জীব নিজেকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র মনে করে, এবং বিক্ষেপ-শক্তির বলে এই জগদ্‌ভ্রম-রূপ অঘটন ঘটন সাধিত হয়। সেই জন্য তাঁহারা মায়াকে 'অঘটন ঘটন-পটীয়সী' এই সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। জগৎ নাই, অথচ জগৎ আছে, এইরূপ ঘটাইতেছে মায়ার এতই সামর্থ্য। অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে, এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ, ইন্দ্রজালবিদ্যার এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ঐন্দ্রজালিক যখন দর্শকের নিকট কেবল বিস্তার করে, তখন ত দর্শকের মনেও প্রতীতি হয়, যেন সে কতকি দেখিতেছে, শুনিতেছে। অথচ, দৃষ্ট শ্রুত—সমস্তটাই ভ্রম; বস্তুতঃ, যেন দেখিবার বা শুনিবার কিছুই নাই।

নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জ্বাং বিকল্পো বিনিবর্ত্ততে।
রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং তদ্বদাত্মবিনিশ্চয়ঃ॥—ঐ, ২।১৭-১৮।
স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্বনগরং যথা।
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ॥—ঐ, ২।৩১।

All this is not real but phenomenal; it belongs to the realm of Avidya—Nescience and vanishes as soon as true wisdom or Vidya has been obtained, * * It has been called a general cosmic Nescience. * * Shankara looks upon the whole objective world as the result of Nescience, he nevertheless allows it to be real for all practical purposes (Vyabahamtham). But apart from this concession, the fundamental doctrine of Shankara always remains the same. There is Brahman and nothing else.—Max Muller's Indian Philosophy, pages 199, 201, 202 & 205.

সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক স্থলে ইন্দ্রজালের উল্লেখ আছে। রামায়ণে মায়া ইন্দ্রজাল-শক্তিপ্রভাবে রামের মায়া-মুণ্ড ও ধনুকের ভ্রম উৎপাদন করিয়া সীতাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। রত্নাবলীতে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের মিত্র জনৈক ঐন্দ্রজালিক আকাশে সিংহাসনে সমাসীন ব্রহ্ম ইন্দ্র প্রভৃতি দেবাইয়া দর্শককে মোহিত করতঃ অবশেষে কাল্পনিক অগ্নিভয় উৎপাদন করিয়া কারারুদ্ধা নায়িকার উদ্ধারসাধন করিয়াছিল।

এই কথা বিশদ করিবার জন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইন্দ্রজালের এক চমৎকার ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন—ভূমার্থে যুক্ত ক্রীড়া। *

* এ বাজী এখনও প্রচলিত আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এক জন সাহেব এই খেলার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া ইংরাজী সাময়িকপত্রে ইহার যে বিবরণ লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইন্দ্রজালের যে কিরূপ অঘটন-ঘটন-পটুতা—তাহা ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইবে।

Many stories have been printed of the marvellous magic of the Indian *fakir* but the *Express* publishes one which it would be difficult to beat. It is interesting to note that the writer says he saw the trick performed. The narrative is as follows :—We have all heard of the wonderful trick of the Indian *fakir* whereby a person appears to climb up into the sky on a piece of rope or twine. Yet comparatively few of us have read detailed accounts of the manner in which it is performed. This is probably the greatest trick ever invented, for it is performed in the open—in any field or square.

The *fakir's* paraphernalia usually consists of a small boy and a dirty bag filled with a promiscuous jumble of nuts, shells, and what not.

Having selected his site the *fakir* begins operations by producing a ball of string apparently from no-where and, after tossing it about for a while, throws it high into the air, retaining the free end of the string in his hand. Then up and up goes the ball growing smaller and smaller the higher it goes until it disappears from observation. To all appearances it has sailed up until it reached the nearest stratum of clouds, vanishing behind them. No sooner has the ball disappeared than the *fakir* lets go the free end of the string, so that you have a line of twine extending from about five feet of the ground to heaven knows where.

The old man will then begin a very clever little pantomime. He sets to work by yelling and gesticulating wildly, and apparently being much annoyed that the cord, at which he tugs and tugs remains steadfastly in space. As a last resort he calls the boy, telling him to climb the cord and bring the ball down.

Then you will see the spectacle of a lad of twelve or fourteen summers, climbing hand over hand of a line of cotton twine about the thickness of a large pin, up and up, higher and higher, he goes, until he also appears to vanish behind the clouds which hid the ball. When last seen he looks to be just about the size of the ball when it disappeared. Then you have a couple of splendid rage that would make a name for any tragedian. The old man working himself into a perfect fury by yelling, dancing, and gesticulating. "Am I to be made an idiot of by a ball of string and a fool by a broth of a boy" Allah forbid "I will teach them both; they may not trifle with one so old and wise" That is the substance of what he says.

Then he will thrust his arm into his filthy old bag and draw forth the most

অঘটন-ঘটনের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর নাই।

প্রতীচ্য-দেশে কিছুদিন হইতে হিপ্‌নটিজ্‌ম্ বিদ্যার আলোচনা হইতেছে। ইহা আমাদের সেই প্রচলিত যাদু-বিদ্যারই রূপান্তর। হিপ্‌নটিজ্‌ম্ সম্বন্ধে অনেকে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। তদ্দ্বারাও মানব অঘটন-ঘটন-পটু সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে।

---

murderous-looking knife you ever saw, and, placing it between his teeth and grasping the twine in both hands, he deliberately begins to climb up the cord, hand over hand, even as the boy had done before him. And presently he, too, disappears. By that time his audience, European as well as Native, are gaping skywards like so many idiots. There is half a minute's absolute silence, followed by an agonising yell so piercing that it makes one's flesh creep merely to think of it. A second after—though it seems an age—a dark object comes hurtling down from the sky, until, with a sickening thud, it lands on the ground a few feet in front of the audience.

When the writer last saw this feat performed an army surgeon formed one of the party, and the medical man coolly examined the mass, which proved to be the head of the boy who had climbed the cord. It was severed from the body at about the middle of the neck. A closer scrutiny showed that the face wore a horrible expression, while blood poured from the divided arteries and veins. The twitching of the newly-cut muscles and the wind-pipe, and the clearly-severed joints of the cervical vertebræ were quite plain to the army surgeon and to the rest of the party, all of whom knew a little of anatomy from the field hospital. Presently down came an arm, cut off through the shoulder joint. A moment later the other arm dropped.

The doctor said the *Fakir* carved cleverly enough to have been a Surgeon at the Royal College. Then came one leg, then the other, and finally the trunk. A moment later the old man was seen coming down the string, and when he dropped to the ground from the end of it, it was seen that he was literally covered with gore from head to foot. The knife still held between his teeth was fairly dripping with blood. His eyes appeared wilder than ever, his features drawn and he paced back and forth for a few seconds like a chained tiger.

Then he collected the head, limbs and trunk and tossed them into the old bag. While watching this action his audience lost sight of the string and the knife, and never saw them again. Slinging the bag over his shoulder, he walked away. This was only a bluff; he had not yet received any *bakshish* and he never would depart without that. He had moved off only a few paces when it was plain that something was moving inside the bag.

The old man stopped, assumed a surprised expression, put the bag down on the ground and in a moment out crawled the boy, as sound in mind and limb as he had ever been. The boy began to smile, and the old man smiling and *salaaming* came forward for his money. This he got in very liberal amount and off he went, leaving his late audience standing mystified, confused, flabbergasted.

কোন ব্যক্তিকে 'হিপ্‌নটাইজ' করিয়া যদি যাদুকর সংকল্প দ্বারা তাহার ভ্রম-উৎপাদনের ইচ্ছা করেন, তবে সহজেই তাহাকে সে ভ্রম সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মান যায়। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, যাদুকর হিপ্‌নটিক-নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে বলিলেন, তোমার সম্মুখে সিংহ বা সর্প রহিয়াছে; সে অমনই ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া গেল। অতি গ্রীষ্মের সময় বলিলেন, আজ বড় শীত; সঙ্কল্প-মাত্রে সে অমনই শীতে কম্পিত-কলেবর হইল। কোথাও কিছু নাই, বলিলেন, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; সে অমনই ধারাহতের অভিনয় করিতে লাগিল। এইরূপ নানা অঘটন-ঘটন হিপ্‌নটিজ্‌ম্ দ্বারা ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে, এমনই সংকল্প বলে ব্রহ্ম মায়া-শক্তি দ্বারা জীবের জগদ্-ভ্রম উৎপন্ন করিতেছেন। তিনি ঐন্দ্রজালিক-চূড়ামণি; ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া জীবকে মোহিত করিতেছেন।

য একো জালবান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।
সর্বান্ লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ॥—শ্বেতাশ্বতর, ৩।১।

"যিনি এক মায়াবী সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর; সমস্ত লোক শক্তি দ্বারা শাসন করেন।"

ইহাই দার্শনিকের পরিচিত Idealism—বিজ্ঞানবাদ। ইংলণ্ডের বার্কলি প্রথম এই মতের প্রচার করেন; পরে হিউম, মিল প্রভৃতি এ মতের বিস্তার করিয়া মাধ্যমিক বৌদ্ধের অনুরূপ শূন্য-বাদে উপনীত হইয়াছিলেন। অদ্বৈত-বাদ কিন্তু শূন্য-বাদ নহে। এ মতে জগদ্-ভ্রমের আধার শূন্য নহে,—ব্রহ্ম। অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে, ব্রহ্মই জগৎ-রূপে বিবর্ত্তিত হন। দুগ্ধ

On looking for traces of the recently committed tragedy, the party became aware that where the ground had been red with blood a moment ago no trace was left. Yet the doctor had picked up and handled the different members of the boy's body as they had come tumbling down from the sky, had examined them, and was perfectly positive that the cutting had been the work of a skilful surgeon or student of anatomy.

There is, as far as the writer is aware, only one way in which people who have witnessed these genuine Hindu *fakir*'s tricks account for them. The *fakirs* must mesmerise or hypnotise their audience, placing them in such mental state that they imagine the whole performance—even the doctor, for instance, being befuddled into believing that he had handled the dismembered limbs. How it is done does not matter. It is the acme of conjuring.

যেরূপ দধি-রূপে বিকারপ্রাপ্ত হইয়া পরিণত হয়, এ সেরূপ নহে। ব্রহ্মের নিজের স্বরূপ অক্ষুণ্ণ থাকে, তিনি কোনরূপে বিকৃত বা পরিণাম-গ্রস্ত হন না। তাঁহার কূটস্থ অবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা ব্যত্যয় হয় না; অথচ তিনি জগদ্রূপে প্রতিভাত হন। ইহারই নাম বিবর্ত্ত।*

সতত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥

যেই জন্য শঙ্করাচার্য্য শূন্য-বাদ-পরিহারের উদ্দেশ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

ন ভাবস্য উভয়প্রতিষেধ উপপদ্যতে শূন্যবাদপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চিৎ হি পরমার্থম্ আশ্রিত্য জগদ্ব্যবহারার্থঃ প্রতিষিধ্যতে যথা রজ্ব্যাদিষু সর্পাদয়ঃ।

অথাতো আদেশো নেতি নেতি ইতি তত্র কল্পিতরূপপ্রত্যাখ্যানেন ব্রহ্মণঃ স্বরূপবেদনমিদম্ ইতি নির্ণীয়তে। তস্যাস্পদং হীদং সমস্তকার্য্যং 'নেতি নেতি'-ইতি প্রতিষিধ্যম্। মৃত্তিকা-কার্য্যস্য বাচারম্ভণং শরাদিভ্যোঽসত্ত্বমিতি নেতীতি প্রতিষেধনম্ ন তু ব্রহ্মণঃ, সর্ব্বকল্পনা-মূলত্বাৎ * * তস্মাৎ প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণি কল্পিতস্য প্রতিষেধতি পরিশিষ্যতে তদেতি নির্ণয়ঃ।

অর্থাৎ, "জগৎ ও জগতের আধার উভয়েরই প্রতিষেধ উপপন্ন নহে; কারণ, তাহা হইলে শূন্য-বাদের প্রসঙ্গ হয়। কোন পরমার্থ আছেনই। তাহাকে অবলম্বন করিয়াই অপরমার্থ বাধিত হইতেছে। "নেতি নেতি" দ্বারা কার্য্যেরই প্রতিষেধ সুসঙ্গত; কারণ, কার্য্য—অসৎ, কল্পিত, কথামাত্র। যেমন রজ্জুতে সর্পের প্রতিষেধ হয়। নেতি নেতি—"ইহা নয়, ইহা নয়"—এই বাক্য উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মে কাল্পিত অবস্তুর প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই সমস্ত কার্য্য,—ব্রহ্ম যাহার আস্পদ বা আধার,—সেই কার্য্যেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম কখন প্রতিষিদ্ধ হইতে পারেন না। যেহেতু, তিনি সকল কল্পনার মূল। অতএব,

* As the rope is to the snake, so Brahman is to the world. There is no idea of claiming for the rope a real change into a snake and in the same way no real change can be claimed for the Brahman when perceived as the world.

—Max Muller's Indian Philosophy, p. 300.

† বিবর্ত্তবাদ যে শূন্যবাদ নহে, তাহা শঙ্করাচার্য্য ব্র. সূ. ২।১।৩ ও ব্র. সূ. ২।১।৯ সূত্রের ভাষ্যেও প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

—Creation is not real in the highest sense in which Brahman is real—but it is real in so far as it is phenomenal; for nothing can be phenomenal except as the phenomenon of something that is real. * * All that we should call phenomenal, comprehending the phenomena of our inward as well as of our outward experience, was unreal. But as the phenomenal was considered impossible with-

ইহাই স্থির যে, মনঃ কল্পিত এই (অসৎ) প্রপঞ্চই বাধিত হইতেছে; ব্রহ্ম (যিনি সৎ বস্তু) অবশিষ্ট থাকিতেছেন।

তবে কি জগৎ স্বপ্নের মত অলীক? এ কথাও শঙ্কর স্বীকার করেন না। তিনি ৩।২।১ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

কিং প্রমেবেদং স্বপ্নেঽপি পারমার্থিকী সৃষ্টিরাহোস্বিন্মায়ামাত্রেতি। * * তস্মাৎ তথারূপস্যৈব সংধ্যে সৃষ্টিরিতি। এবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ মায়ামাত্রং তু কাৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ (ব্র. সূ. ৩।২।৩)। মায়ৈব সংধ্যে সৃষ্টির্ন পরমার্থসত্যেত্যুপপদ্যতে * * তস্মান্মায়ামাত্রং স্বপ্নদর্শনম্। * * পারমার্থিকস্তু নায়ং সংধ্যাশ্রয়ঃ সর্গো বিরোধিসর্গবদ্ ইত্যভিপ্রায়েণ প্রতিপাদ্যতে। ন চ বিয়দাদিসর্গস্যাপি আত্যন্তিকং সত্যত্বমস্তি। প্রতিপাদিতং হি "তদনন্যত্বম্ আরম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ" (ব্র. সূ. ২।১।১৪) ইত্যত্র সমস্তস্য প্রপঞ্চস্য মায়ামাত্রত্বং। প্রাক্ তু ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানাদ্ বিয়দাদিপ্রপঞ্চো ব্যবস্থিতরূপো ভবতি সংধ্যাশ্রয়স্তু প্রপঞ্চঃ প্রতিদিনং বাধ্যতে ইতি। অতো বৈশেষিকমিদং সংধ্যস্য মায়ামাত্রত্বমুদিতম্।—৩।২।৪ সূত্রের ভাষ্য।

'জাগৎ অবস্থার ন্যায় স্বপ্নেও কি পারমার্থিক সৃষ্টি, অথবা মায়া-ময়ী সৃষ্টি? "স্বপ্নেও সত্য সৃষ্টি" এই মতের নিরাস করিয়া সূত্রকার বলিতেছেন, "মায়ামাত্রন্তু" ইত্যাদি (৩।২।৩)। স্বপ্নে যে সৃষ্টি, তাহা মায়িকমাত্র; তাহাতে সত্যের গন্ধও নাই। অতএব স্বপ্ন-দর্শন মায়াময়। সুতরাং যে সৃষ্টি স্বপ্নকে আশ্রয় করিয়া উত্থিত হয়, তাহা আকাশাদি সৃষ্টির ন্যায় পারমার্থিক নহে; ইহাও প্রতিপন্ন হইল।' পাছে এইমাত্র বলিলে জগতের সত্যতা স্বীকার করা হয়, এই আশঙ্কায় শঙ্করাচার্য্য সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন, কিন্তু আকাশাদি সৃষ্টি যে আত্যন্তিক সত্য, তাহা নহে। ২।১।১৪ সূত্রে

---

the noumenal that is without the real Brahman, it was in that sense real also, that is, it exists and can only exist with Brahman behind it. * * It exists through Brahman and would not be at all but for Brahman. * * The danger with Shankara's Vedantism was that what to him was simply phenomenal should be taken for purely fictitious. * * Maya is the cause of a phenomenal, not of a fictitious world.—(Max Muller's Indian Philosophy, pp. 211, 214, 215 & 213.)

Even the apparent and illusory existence of a material world requires a real substratum which is Brahman just as the appearance of the snake in the simile requires the real substratum of a rope * * Buddhist philosophers held that everything is empty and unreal and that all we have and know are our perceptions only. * * Shankara himself argues most strongly against this extreme idealism and * * enters into full argument against the Buddhism of the Buddhists. * * The Vedantist answers that though we perceive perceptions only these perceptions are always perceived as perceptions of something

—Max Muller's Indian Philosophy, p. 209-11.

সমস্ত প্রপঞ্চই যে মায়ামাত্র, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তবে স্বপ্ন-সৃষ্টি ও জাগ্রৎ-সৃষ্টির প্রভেদ এই যে, স্বপ্নদৃষ্ট প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত হয়; কিন্তু আকাশাদি প্রপঞ্চ ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব অজ্ঞাত না হইলে বাধিত হয় না। অতএব স্বপ্ন-সৃষ্টি বিশেষভাবে মায়িক।'

শঙ্করের গুরুর গুরু গৌড়পাদ কিন্তু জগৎকে স্বপ্ন-সৃষ্টির ন্যায় মিথ্যা বলিয়াছেন;

অবয়ং দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয়ঃ।
অদ্বয়ং দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ন সংশয়ঃ॥
মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে॥*

স্বপ্নে যে দ্বৈত ভাণ হয়, তাহা যে মনঃ-কল্পিত, ইহাতে সন্দেহ নাই। জাগ্রতেও দ্বৈত ভাণ নিশ্চয়ই ঐরূপ। চরাচর যাহা কিছু দ্বৈত, তাহা সমস্তই মনঃ-কল্পিত। মন যদি অমনঃ হয়, তবে আর দ্বৈত থাকিতে পারে না। ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন,—

নহি স্বপ্নে হস্ত্যাদি গ্রাহ্যং গ্রাহকং চক্ষুরাদি বা স্বয়ং বিজ্ঞানব্যতিরেক ব্যক্তি জাগ্রদপি তদ্বৈধর্ম্যাৎ। পরমার্থ সদ্বিজ্ঞান মাত্রাবিশেষাৎ।

সর্ব্বত্র, স্বপ্নে গ্রাহ্য গ্রাহক—বিষয় ইন্দ্রিয়,—এ দ্বৈতের বাস্তবিক সত্তা নাই; কেবল বিজ্ঞান (Ideas) মাত্র থাকে। জাগ্রতেও ঐরূপ। উভয় অবস্থাতেই বিজ্ঞানমাত্রই স্বষ্টিরূপে প্রতীত হয়। এই বিজ্ঞান পরমার্থ সৎ—আত্যন্তিক সত্য।' তদেই জগতে বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত আর কোনরূপ সত্তা নাই। বিজ্ঞানই জগদ্-রূপে প্রতিভাত হইতেছে। গৌড়পাদ এই মর্ম্মে বলিতেছেন,—

জাগ্রচ্চিত্তং দৃশ্যভেদে ন বিদ্যতে ততঃ পৃথক্।
তথা ভদ্দৃশ্যমেবেদং জাগ্রত্তচ্চিত্তমিত্যতো—গৌড়পাদকৃত মাণ্ডুক্যকারিকা, ৪।৩৬।

'জগৎ জাগ্রৎ অবস্থায় চিত্তের অনুভবের বিষয়। তাহার চিত্ত হইতে পৃথক্ সত্তা নাই। এই যে সমস্ত দৃশ্য (বিশ্ব), ইহা জাগ্রত দ্রষ্টার চিত্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে।' যোগবাসিষ্ঠও অনেক স্থলে এইরূপ মতেরই উপদেশ করিয়াছেন;—

যস্য চিত্তময়ী লীলা জগদেচ্ছরাচরম্।
স্বপ্নতুল্যান্তরন্তিন্যো সদা ভাস্করতেজসঃ।
সন্ধা দৃশ্যদৃশোর্দ্রষ্টৃ ব্যতিরিক্তা ন জগতঃ॥—যোগবাসিষ্ঠ, উৎপত্তি, ৯৪।২৯।

* গৌড়পাদকৃত মাণ্ডুক্য উপনিষদের কারিকা। ৪।৩০,৩১।

"যথা স্থিতম্ ইদং বিশ্বম্ নিজভাবক্রমোদিতং।
ন তৎ সত্যং ন চাসত্যম্ রজ্জুসর্পভ্রমো যথা॥
মিথ্যানুভূতিতঃ সত্যং অসত্যং তৎপরীক্ষিতং॥— ঐ ২, ৪০।৪১।

'এই চরাচর জগৎ ব্রহ্মের চিত্তময়ী লীলা (সঙ্কল্প) মাত্র। ইহা যেমন মরীচিকা সৌরকর ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ সমস্ত দৃশ্য-দর্শন, দ্রষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই নিখিল বিশ্ব, দ্রষ্টার ভাবমাত্রে উদিত। ইহা সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে; যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। মিথ্যার যখন অনুভূতি হইতেছে, তখন সত্য, কিন্তু সত্যের পরীক্ষায় অবশ্য অসত্য।'

এই মর্ম্ম প্রকাশানন্দ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে লিখিয়াছেন,—

"প্রতীতিমাত্রমেবৈতদ্ ভাতি বিশ্বং চরাচরম্।
জ্ঞান-জ্ঞেয়-প্রভেদেন যথা স্বাপ্নং প্রতীয়তে।
বিজ্ঞানব্রহ্মমেবৈতৎ তথা জাগ্রচ্চরাচরম্॥
রজ্জুর্যথা ভ্রান্তদৃষ্ট্যা সর্পরূপা প্রকাশতে।
আত্মা তথা মূঢ়বুদ্ধ্যা জগদ্রূপঃ প্রকাশতে॥

'এই যে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব প্রতিভাত হইতেছে—ইহা প্রতীতিমাত্র। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ—জ্ঞান ও জ্ঞেয় ভেদে ভিন্নরূপে প্রতীত হইলেও বিজ্ঞানের অতিরিক্ত নহে, সেইরূপ জাগ্রদ্-দৃষ্ট চরাচর জগৎও বিজ্ঞানের অতিরিক্ত নহে। যেমন রজ্জু দৃষ্টি ভ্রমে সর্প বলিয়া প্রকাশিত হয়, সেইরূপ আত্মাও বুদ্ধি-মোহে জগদ্-রূপে প্রতীত হয়।'

অবশ্য অদ্বৈতবাদীরা জগতের ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করেন। ব্যবহার ভাবে যে জগৎ সত্য, এ কথায় তাঁহাদের আপত্তি নাই। কিন্তু জগৎ যে পরমার্থতঃ সৎ, ইহাতে তাঁহাদের বিশেষ আপত্তি।† "প্রাক্‌ব্রহ্মাত্মতা-প্রতিবোধাদ্ উপপন্নঃ সর্ব্বো লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ",—শঙ্কর। 'জীব ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান পর্য্যন্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার উপপন্ন হইতেছে।' কিন্তু তা বলিয়া জগৎ পরমার্থ নহে। শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, "একরূপেণ যদবস্থিতো যোঽর্থঃ স পরমার্থঃ"। "যে বস্তু সর্ব্বত্র সর্ব্বদা একরূপেই অবস্থিত, তাহাই সত্য, তাহাই পরমার্থ"; অর্থাৎ, যাহার কোন কালে কোন অবস্থায় বাধ হয় না, তাহাই পরমার্থ। ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি পরমার্থ হইতে পারে?

---

* Its essi is percipi.

† ব্যবহার ও পরমার্থের ভেদ জার্ম্মান দর্শনের noumenon ও phenomenonএর প্রভেদের অনেকটা অনুরূপ।

তিনি সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থলে নির্ব্বাধ। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনিই পরমার্থ। "একত্বনেব এবং পরমার্থিকং দর্শয়তি"—শঙ্কর। 'একত্বই পারমার্থিক, নানাত্ব ব্যাবহারিক।' পঞ্চদশী বলিয়াছেন,—

মায়াবিষয়কল্পেষু গতাগম্যেষনেকধা।
নৌদেতি নাস্তমায়াতি সংবিদেষা যথাপ্রভা।

এই স্ব-প্রকাশ সংবিৎ (ব্রহ্ম)-কোন কালে নাশ, ধ্বংস, মৃত্যু, জন্ম, অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—কোনকালে উদিত বা অস্তমিত হন না। অতএব, তিনি একমাত্র পরমার্থ। অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে,—সত্য মিথ্যার লক্ষণ কি? কি চিহ্ন দেখিয়া আমরা চিনিয়া লইব যে, এ পদার্থ সত্য, এ পদার্থ মিথ্যা? তাঁহাদের মতে, যাহার বাধ আছে, সেই মিথ্যা; যাহার বাধ নাই, সেই সত্য।* পথের ধারে একগাছা রজ্জু পড়িয়া আছে। অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে ভ্রমে সেটাকে ভাবিলাম সর্প; এবং ভয়ে চকিত হইয়া পলাইতে উদ্যত হইলাম। এমন সময় এক জন পথিক দীপহস্তে সেই পথে উপস্থিত হইল। সেই দীপালোকে দেখিতে পাইলাম যে, আমি যাহাকে সর্প মনে করিয়াছিলাম, সেটা সর্প নহে—রজ্জু মাত্র। তখন আমি নিরুদ্বেগ হইলাম। এইরূপে আমার সর্প-ভ্রম রজ্জু-জ্ঞান দ্বারা বাধিত হইল। অতএব, এ স্থলে আমার সর্পানুভূতি মিথ্যা বলিতে হইবে।

আর একদিন পথ চলিতে দেখিলাম যে, একটা ভেক ফণাবিস্তার করিয়া ভেককুলের অতিবৃদ্ধি নিবারণ করিতেছে। কৌতূহলী হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। কতক্ষণ দেখিলাম?—সর্পরাজ তন্ময় হইয়া স্বকার্য্য-সাধনে নিরত রহিয়াছেন। অবশেষে তিনি আমার প্রতি কটাক্ষ করিলেন। আমার হাতে লাঠি ছিল। আমি তদ্দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলাম। তিনি গতিক বুঝিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। এ স্থলে আমার সর্প জ্ঞান কোনরূপে বাধিত হইল না। অতএব, ইহাকে সত্য বুঝিতে হইবে।

সত্য মিথ্যার এই সাধারণ পরিচয়। কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ আছে। আমরা বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ, এই তিন কালের সহিত পরিচিত। কোন বস্তু যদি আজ আছে, কিন্তু যদি কাল না থাকে, তবে কি তাহাকে সত্য বলিব? কোন বস্তু এক মাস পূর্ব্বে ছিল না, আজ হইয়াছে, তাহাকেই

* পাশ্চাত্য দার্শনিক হারবার্ট স্পেন্সর তাঁহার First Principles গ্রন্থে সত্য মিথ্যার এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। যাহা persistent (নিত্য) তাহাই সত্য।

বা কি সত্য বলিব? এই আমার দেহ; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহা ছিল না, আবার কয়েক বৎসর পরেও ইহা থাকিবে না; ইহা সত্য, না মিথ্যা? আগ্রার তাজমহল, যাহা আজ আমার নয়নবিনোদন করিতেছে, আকবর বাদশাহের সময় তাহা ছিল না, বোধ হয় এক সহস্র বৎসর পরে কোনও ভবিষ্যৎ নৃপতির নয়নেও তাহা থাকিবে না; ঐ তাজমহলকে কি সত্য বলিব? অদ্বৈতবাদীর মতে যাহা ত্রিকালে নির্ব্বাধ নহে, অর্থাৎ যে পদার্থের বর্ত্তমানে, অতীতে, কিংবা ভবিষ্যতে বাধ আছে, ছিল, বা হইবে, তাহা সত্য নহে, মিথ্যা।

আরও কথা আছে। মানুষের চারিটি অবস্থা আছে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। যাহা আমার জাগ্রৎ অবস্থায় অনুভূত হইতেছে, স্বপ্নে বা সুষুপ্তিতে ত তাহার অনুভূতি হয় না। আবার স্বপ্নে যাহার অনুভব হয়, জাগ্রৎ বা সুষুপ্তিকালে ত তাহা অনুভূত হয় না। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, যে বস্তু জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়, এই চারি অবস্থাতেই নির্ব্বাধ—কোন কালে, কোন অবস্থাতে যাহার বাধ হয় না,—তাহাই সত্য, তাহাই পরমার্থ। এক ব্রহ্মবস্তুতেই সত্যের এই লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে; অতএব, ব্রহ্মই সত্য;—অন্য সমস্ত মিথ্যা।

জগৎ যখন মায়ামাত্র, কাল্পনিক অসত্য, তখন অদ্বৈতমতে সৃষ্টির কথাই উঠিতে পারে না। কারণ, যাহার মাথা নাই, তাহার আবার মাথা ব্যথা হইবে কিরূপে? অতএব, জগতের সৃষ্টি অনেকটা "রাহোঃ শিরঃ"—শিরোহীন রাহুর শিরঃ—এই ধরণের কথা।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মব্যতিরেকেণ কার্য্যজাতস্যাভাবঃ। বিকারজাতস্য বাগ্বিস্ফোরাৎ * * মিথ্যাজ্ঞান-বিজৃম্ভিতনামাত্বম্।—২।১।১৪ সূত্রের ভাষ্য।

'ব্রহ্ম-ভিন্ন আর কিছুই নাই। কার্য্য, বিকার,—অসত্য,—মিথ্যাজ্ঞানের বিজৃম্ভণ।' তথাপি ব্যাবহারিক ভাবে শাস্ত্রে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতির

---

* The fact being that strictly speaking there is with the Vedantists no matter at all in our sense of the word. Creation in our sense can nor exist for the Vedantist The effect is always supposed to be latent in the cause. Hence Brahman is every thing and nothing exists besides Brahman.

—Max Muller's Indian Philosophy.

কথা বলা হইয়াছে। এ ভাবে ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ। সাংখ্যেরা যে স্বাধীন প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলেন, তাহা সঙ্গত নহে।

ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। যাহা জগৎ বলিয়া ভ্রম হইতেছে, তাহাতে ও ব্রহ্মে কেবল নাম রূপের ভেদ। জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন কুণ্ডল, বলয়, হার প্রভৃতি বাহ্য দৃষ্টিতে বিভিন্ন হইলেও স্বর্ণকারের চক্ষে এক সুবর্ণ বই আর কিছুই নহে, সেইরূপ এই বিবিধ-বৈচিত্র্যময় জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্ম-বই আর কিছুই নহে। কেবল নাম রূপের প্রভেদমাত্র। কাহারও নাম হার, কাহারও নাম বলয়; কাহারও নাম পর্ব্বত, কাহারও নাম নদী। হারের রূপ এক প্রকার, বলয়ের রূপ আর এক প্রকার, পর্ব্বতের রূপ এক প্রকার, নদীর রূপ আর এক প্রকার;—কেবল এইমাত্র ভেদ। নাম ও রূপের ভেদ, বস্তুগত কোনও ভেদ নাই। যেমন হারে ও বলয়ে নামের ও রূপের প্রভেদ থাকিলেও উভয়ই বস্তুতঃ সুবর্ণ, সেই রূপ ভৌতিক পদার্থসমূহের মধ্যেও নাম ও রূপের প্রভেদ। কাহারও নাম নদী, কাহারও নাম পর্ব্বত, কাহারও রূপ মনুষ্যোচিত, কাহারও রূপ বৃক্ষোচিত হইলেও সকলেই ব্রহ্ম। কারণ, জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই জন্য বলা হইয়াছে,—

বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্।—ছান্দোগ্য, ৬।১।৪।

'বাক্যের যোজনা, নামের প্রভেদ। মৃত্তিকা ইহাই সত্য।'

অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ।—ছান্দোগ্য, ৬।৩।২।

'তিনি জীবরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপের ভেদসাধন করিলেন।'

তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত।—বৃহদারণ্যক, ১।৪।৭।

'তাহা নাম রূপের দ্বারা বিভিন্ন করিলেন।'

আকাশো হ্যেবৈতেভ্যো নামরূপয়োর্নির্বহিতা।—ছান্দোগ্য, ৮।১৪।১।

'আকাশই (ব্রহ্ম) নাম রূপের নির্ব্বাহক।'

---

* ঈক্ষতের্নাশব্দং—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এ বিষয়ের বিস্তার করিয়াছেন। নত্ত-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ, সর্ব্বশক্তে রীশ্বরাৎ জগজ্জনি-স্থিতি-প্রলয়া নোপপদ্যন্তে ইতি চেন্নৈষ দোষঃ।

† The substance of the world can be nothing but Brahman—It exists through Brahman and would not be at all but for Brahman.

—Max Muller's Indian Philosophy

অতএব দেখা যাইতেছে যে, অদ্বৈত-মতে জীব ও জড় উভয়ই অসত্য। উভয়ের অবিদ্যা-জনিত ব্যাবহারিক (Phenomenal) সত্তা আছে মাত্র—পারমার্থিক (Real) সত্তা নাই। * শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, সূত্রকারের ইহাই অভিপ্রায়, সেই জন্য তিনি পারমার্থিক ভাবে জীব ও জড়ের অসত্তা এবং ব্যাবহারিক ভাবে উভয়ের সত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। "সূত্রকারোঽপি পরমার্থাভিপ্রায়েণ 'তদনন্যত্বম্' ইত্যাহ। ব্যবহারাভিপ্রায়েণ তু 'আরম্ভণাদি-বদ্' ইতি মহাসমুদ্রস্থানীয়তাং ব্রহ্মণঃ কথয়তি।"—২। ১। ১৪ ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য।

আমরা দেখিয়াছি, অদ্বৈত মতে ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মেরও পারমার্থিক সত্তা নাই। তিনিও ব্যাবহারিক (Phenomenal) মাত্র। †

অদ্বৈত বেদান্ত মতে যখন জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, যেই জীব সেই ব্রহ্ম, তখন তাহাতে ভক্তির স্থান নাই। কারণ, ভক্ত ও ভজনীয় স্বতন্ত্র না হইলে ভক্তির উন্মেষ হইবে কিরূপে? সেই জন্য দেখা যায়, অদ্বৈতী নিশ্চলদাস স্বকৃত বিচারসাগর গ্রন্থের প্রারম্ভে শিষ্টপ্রণালী নমস্কারপ্রথা রক্ষা করিতে গিয়া মহা বিভ্রাটে পড়িয়াছেন। তিনি বলেন, যখন আমিই তিনি—'সোঽহং আপে আপ' যখন—

---

* শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন (২। ১। ১৪। সূত্রের ভাষ্যে)—

"এবমবিদ্যাকৃত নামরূপোপাধ্যনুরোধী ঈশ্বরো ভবতি, ব্যোমেব ঘটকরকাদ্যুপাধ্যনুরোধি। স চ স্বাত্মভূতান্ এব ঘটাকাশস্থানীয়ান্ অবিদ্যা-প্রত্যুপস্থাপিত নামরূপ-কৃত-কার্য্য-করণ-সংঘাতানুরোধিনো জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতীষ্টে ব্যবহারবিষয়ে। তদেবম্ অবিদ্যা-কল্পোপাধিনিমিত্তেদাপেক্ষমেব ঈশ্বরস্য ঈশ্বরত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চ; ন পরমার্থতো নিত্যোপাত্ত সর্ব্বোপাধিস্বরূপ আত্মনি ঈশিত্রীশিতব্যসর্ব্বজ্ঞাদিব্যবহার উপপদ্যতে। * * পরমার্থবিষয়াম্ ঈশিত্রীশিতব্যাদিব্যবহারাভাবঃ প্রদর্শ্যতে। ব্যবহারাবস্থায়াং তুক্তঃ শ্রুতাবপি ঈশ্বরব্যবহারঃ এষ সর্ব্বেশ্বর এষঃ ভূতাধিপতি ইত্যাদি।

† The soul and the world both belong to the realm of things which are not real and have little if anything to do with the true Vedanta. It rests chiefly on the tremendous synthesis of subject and object, the identification of cause and effect, of the I and the It

If there is but one Brahman and nothing beside it * how then are we to account for the manifold Thous, the many individuals and the immense variety of the objective world! * * It can therefore be due only to what is called Avidya, Nescience."

—Max Muller's Indian philosophy p 223.

অব্ধি অপার বরুণ যম, লহরী বিষ্ণু মহেশ।
বিধি রবি চন্দ্রা বরুণ যম, শক্তি ধনেশ গণেশ।

'যে সমুদ্রের—ব্রহ্মা বিষ্ণু হর, সূর্য্য চন্দ্র বরুণ যম শক্তি কুবের গণেশ প্রভৃতি লহরীমাত্র, আমি স্বয়ং সেই অপার সমুদ্র'—তখন কাকু করু প্রণাম—কাহাকে প্রণাম করিব? যদি বল, জীব ও ঈশ্বরে ত ব্যাবহারিক ভেদ আছে, সেই ভেদ আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরকে না হয় প্রণাম কর, তাহাও সম্ভবে না; কারণ,—

জা কৃপালু সর্ব্বজ্ঞকো হিয ধারত মুনি ধ্যান।
তাকো হোত উপাধিতে মোসে মিথ্যা জ্ঞান॥

'মুনিরা এক জন কৃপালু সর্ব্বজ্ঞ (ঈশ্বরকে) চিত্তে ধ্যান করেন বটে, কিন্তু তিনি ত উপাধির উপঘাতমাত্র—অলীক পদার্থ, মিথ্যা জ্ঞানের সৃষ্টি তাঁহাকে কিরূপে প্রণাম করা যায়?' সেই সব ভাবিয়া নিশ্চলদাসের আর প্রণাম করা হয় নাই।

কিন্তু ভক্তির অবসর না থাকিলেও অদ্বৈতবাদে উপাসনার নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। তবে আমরা এখন উপাসনা অর্থে যাহা বুঝি, সে উপাসনা নহে। অদ্বৈতবাদীর উপাসনা,—'বিশিষ্ট-চিন্তন-প্রচার'। এই উপাসনা ত্রিবিধ। অঙ্গাববদ্ধ, প্রতীক ও অহংগ্রহ উপাসনা। সাধক যজ্ঞের অঙ্গসমূহে ব্রহ্ম ভাবনা করিতে পারেন। "ইদং উদ্গীথং ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" 'এই উদ্গীথকে (যজ্ঞের অঙ্গবিশেষকে) ব্রহ্ম-ভাবনায় উপাসনা করিবে'—ইহা অঙ্গাববদ্ধ উপাসনার উপদেশ। এইরূপ—"লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত" (ছান্দোগ্য, ২।২।১), "বাচি ষড়্বিধং সামোপাসীত" (ছান্দোগ্য, ২।৮।১) ইত্যাদি বহু উপদেশ উপনিষদে দৃষ্ট হয়। গীতা এইরূপ উপাসনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥

অর্পণ (হাতা) ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, হোতা ব্রহ্ম, কর্ম্ম ব্রহ্ম,—সাধক এইরূপে সমাধি করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন। দ্বিতীয়—প্রতীক উপাসনা। "মনো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত," 'মনকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করিবে', "আদিত্যো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" সূর্য্যকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করিবে'—ইত্যাদি প্রতীক উপাসনার উপদেশ ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭ম অধ্যায়ে বহুশঃ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রতীক উপসনার মর্ম্ম এই, যে ব্রহ্ম নহে, তাহাকে ব্রহ্ম ভাবনা করা।

অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ইহা সঙ্গত নহে। তাঁহাদের মতে, প্রকৃত উপাসনা অহংগ্রহ উপাসনা। আত্মা যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, "সোহং", "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি ভাবসাধনই আত্মগ্রহ উপাসনা। "তত্ত্বমসি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এই উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে।

—আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ।
—ন প্রতীকে ন হি সঃ।
ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ।
আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৩-৬।

সেই জন্য ন্যায়মালায় উক্ত হইয়াছে,—"বাস্তববিরোধাভাবাৎ আত্মনৈবেন ব্রহ্ম গৃহ্যতাম্"। 'যেহেতু আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন, অতএব আত্মাই ব্রহ্ম, এই ভাবনা কর।'

শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

আত্মেত্যেব পরমেশ্বরঃ প্রতিপত্তব্যঃ। যত্তু উক্তম্ ন বিরুদ্ধগুণয়োরভেদাত্মত্বসংভব ইতি। নায়ং দোষঃ। বিরুদ্ধগুণযোগো মিথ্যোপপত্তেঃ।—৪।১।৩ সূত্রের ভাষ্য।

"আত্মাকে পরমেশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিবে। যদি বল, ঈশ্বরে ও জীবে বিরুদ্ধগুণবশতঃ একত্ব সম্ভব নহে, তাহার উত্তর এই যে, বিরুদ্ধ-গুণ-ভাব মিথ্যা (মায়িকমাত্র)।"

এই ভাবনা যখন অভ্যাসের বলে দৃঢ় ও নিশ্চল ভাব ধারণ করে, তখন জীব ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতির ফলে জীবন্মুক্তির অধিকারী হন। কারণ, "তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি"। শ্রুতি বলিতেছেন, 'যে যাহাকে উপাসনা করে, সে তাহাই হয়।' অতএব, ব্রহ্মভাবনারূপ চিন্তার ফলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে ব্রহ্ম অধিগত হইলে তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্তের সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্মের বিনাশ এবং ক্রিয়মান কর্ম্মের অশ্লেষ হয়।* তাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন,—

যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবম্ এবং বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে। তদ্ যথা ঈষিকাতূলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে।

সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে।
উভে উ হৈবৈষ এতে তরতি।

* তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ।
ইতরস্যাপ্যেবম্ অসংশ্লেষঃ পাতে তু।
অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৩-১৫ সূত্র।

'যেমন পদ্মপত্রে জল স্পর্শ করে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীতে পাপ স্পর্শ করে না।'

'যেমন ঈষিকা (নল) তূলা অগ্নিতে দিলে দগ্ধ হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীর সমস্ত কর্ম্ম দগ্ধ হয়।'

'তত্ত্বজ্ঞানী পাপ পুণ্য উভয়কেই উত্তীর্ণ হন।'

কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগের জন্য জীবন্মুক্ত দেহধারণ করিয়া থাকেন, কারণ, প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ ভিন্ন ক্ষয় হয় না। ঐ ভোগান্তে যখন তাঁহার দেহপাত হয়, তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়েন।

তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সংপৎস্যে।

'জীবন্মুক্তের ততদিন বিলম্ব হয়, যতদিন না তাঁহার প্রারব্ধ ক্ষয় হয়; পরেই তিনি ব্রহ্মে সংযুক্ত হন।'

সাধারণ জীবের দেহান্তে উৎক্রান্তি হয়। অর্থাৎ, সে সূক্ষ্ম দেহ অবলম্বন করিয়া লোকান্তরে গমন করে। বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে এই উৎক্রান্তির প্রণালী ও প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণ কর্ম্মী দক্ষিণ মার্গে ধূম্রযানে গমন করে। কর্ম্মানুসারে লোকান্তরে পুণ্য পাপ ভোগ করিয়া তাহাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা উচ্চ সাধক —সগুণ ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারা উত্তর মার্গে দেবযান দিয়া সূর্য্যমণ্ডলে উপনীত হন। পরে সেখান হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে উপনীত হন। তাঁহাদের আর আবর্ত্তন করিতে হয় না—আর মানব-আবর্ত্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

সত্যলোকে অবস্থানকালে তাঁহারা স্বারাজ্য সিদ্ধির অধিকারী হইয়া নানা ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন।

"আপ্নোতি স্বারাজ্যং আপ্নোতি মনসস্পতিং সর্ব্বে দেবা বলিম্ আহরন্তি।"

"সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তে। সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে। একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা ভবতি।"

'তিনি স্বরাট হন, তিনি মনের অধিপতি হন। সমস্ত দেবগণ তাঁহাকে বলি প্রদান করেন।'

'সংকল্পমাত্রেই পিতৃগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন।'

'তাঁহার সমস্ত লোকে কামচার (ইচ্ছাবিহার) হয়।'

'ব্রহ্মলোকে ইচ্ছামাত্রে সমস্ত কামনা সিদ্ধ হইয়া রমণ করেন, এবং স্বেচ্ছাক্রমে কায়ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া এক বা একাধিক রূপে বিরাজ করেন।'

ঐ সত্যলোকে সগুণ ব্রহ্মোপাসক ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, এবং মহা প্রলয়ে যখন ব্রহ্মার দিবার অবসান হয়, তখন ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মে বিলীন হন। ইহার নাম ক্রমমুক্তি।

ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥

'যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ দ্বারা কৃতার্থ হইয়া ব্রহ্মার সহিত কল্পের অবসানে পরম পদে লীন হন।'

কিন্তু যিনি জীবন্মুক্ত—নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক, প্রাণাত্যয় হইলে তাঁহার উৎক্রান্তি হয় না।

ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবনীয়ন্তে।

'তাঁহার (ব্রহ্মজ্ঞানীর) প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না; এখানেই বিলীন হইয়া যায়।' তাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

এষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে।

'ঐ জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিঃ লাভ করিয়া স্ব স্বরূপে অবস্থিত হন।'

শ্রীশঙ্করাচার্য্য এইরূপে সগুণ ও নির্গুণ সাধনার ফলের তারতম্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

'যে তত্ত্বব্রহ্মোপাসনাৎ নহৈব মনসা ঈশ্বরসাযুজ্যং ব্রজন্তি * * জগদুৎপত্তিব্যাপারং বর্জ্জয়িত্বাঽন্যেষাং অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি।

'সাধকগণ সগুণ ব্রহ্ম উপাসনার ফলে মনের সহিত ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করেন; মুক্তদিগের অণিমাদি সমস্ত ঐশ্বর্য্য সিদ্ধ হয়, কেবল জগদ্ব্যাপারে (জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কার্য্যে) অধিকার জন্মে না।'

ঐরূপ সাধকের উল্লিখিত ক্রমে ক্রমমুক্তি হয়।—কিন্তু

বিদুষঃ ঐকান্তিকী কৈবল্যসিদ্ধিঃ। ৩,৩।৩৩ সূত্র।

'ব্রহ্মজ্ঞানীর কিন্তু কৈবল্যসিদ্ধি (বিদেহমুক্তি) হয়।'

অতএব বিদ্যাই একমাত্র পুরুষার্থ।

পুরুষর্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ॥—৩।৪।১ সূত্র।

* তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি হয়—কেবল সৃষ্টি স্থিতি সংহারে স্বাধিকার হয় না।
জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদ্ অসন্নিহিতাচ্চ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭।

অর্থাৎ, অদ্বৈত-মতে নির্গুণ উপাসনা—যদ্দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়—তাহাই শ্রেষ্ঠ।

কারণ, এইরূপ নির্গুণ সাধকের ক্রম-মুক্তি হয় না; জীবন্মুক্তির পর দেহপাত হইলে তিনি একবারে বিদেহমুক্তি লাভ করেন। তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হন।

অবিভাগো লোকবৎ।—ব্র. সূ. ৪।৪।১৬।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ।—ব্র. সূ. ৪।৪।২।

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম (কঠ, ৪।১৫) ইতি চৈবমাদীনি মুক্তস্বরূপনিরূপণপরাণি বাক্যানি অবিভাগমেব দর্শয়ন্তি। নদীসমুদ্রাদিনিদর্শনানি চ।

'যেমন স্বচ্ছ সলিল স্বচ্ছ আধারে নিষিক্ত হইয়া স্বচ্ছই হয়, হে গৌতম! তত্ত্বজ্ঞানী মুনির আত্মাও ঐরূপ হইয়া থাকে। কঠ উপনিষদের এই বাক্য ও অন্যান্য শ্রুতিবাক্য (যাহাতে মুক্ত আত্মার স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে) মুক্ত জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। নদী ও সমুদ্রের দৃষ্টান্ত (নদী সমুদ্রে মিলিত হইলে যেরূপ সমুদ্রের সহিত একীভূত হয়) এই তত্ত্বেরই উপদেশ দিতেছে।'

অন্যত্র শ্রুতি বলিয়াছেন,

ভিদ্যেতে হাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষ অকলোঽমৃতো ভবতি।—প্রশ্ন, ৬।৫।

'মুক্ত জীব ব্রহ্মে মিলিত হইলে তাহার নামরূপ বিলীন হইয়া যায়; তখন সেই (মিলনের আস্পদ) পুরুষ, এইরূপে বর্ণিত হন। সেই জীব অকল (কল—অবয়ব-হীন), অমৃত (মৃত্যুহীন) হন।'

এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিতেছেন,

'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।'

যে ব্রহ্ম জানে, সে ব্রহ্ম হয়।

ইহাই অদ্বৈত-বাদীর মুক্তি।*

* মুক্তস্বরূপং ব্রহ্মাভিন্নম্।—ন্যায়মালা, ৪।৪।৪; নতু তদ দ্বিতীয় মস্তি ততোঽন্যদ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ। বৃহ. ৪।৪।২৩।

'মুক্তের স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।'

'তাঁহা ভিন্ন ব্রহ্ম হইতে দ্বিতীয় কিছুই নাই, যাহাকে আমরা দেখিবে।'

সহযোগী সাহিত্য।

তিব্বতে বাঙ্গালী।

জানুয়ারী মাসের "ডন" নামক দ্বৈমাসিক পত্রে "তিব্বতে বাঙ্গালী" নামক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার সার-সঙ্কলন করিয়া দিলাম।—

বাঙ্গালী জাতি কোমলদেহ,—শান্তস্বভাব, প্রায়ই অনেকের এইরূপ অপবাদ মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী স্বভাবতঃ দুর্ব্বলদেহ, কষ্টসহিষ্ণুতা তাহাদের আদৌ নাই; যে কার্য্যে পুরুষকার, সাহস প্রভৃতি গুণ আবশ্যক, বাঙ্গালী জাতি সেরূপ কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না,—বাঙ্গালীর প্রতি অনেকেই এইরূপ কটাক্ষের আরোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু বঙ্গদেশের সৌভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সুধীগণের কল্যাণে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই বাঙ্গালী জাতির উদ্যোগে ও অধ্যবসায়-প্রভাবেই সিংহলে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ও বহ্নিতে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে,—ভারতবর্ষের দক্ষিণবর্ত্তী উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল জলধি বাঙ্গালীজাতির অধ্যবসায় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পক্ষে যেরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল, উত্তরদিকবর্ত্তী হিমাচলশ্রেণী সেরূপ প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে নাই।

সম্প্রতি যে সকল তিব্বতীয় গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার ও তিব্বতে শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তনে বঙ্গদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীই প্রধানতঃ সাহায্য করিয়াছিলেন। তিব্বতের ইতিহাস ও আখ্যায়িকা গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে তিব্বতীয় লামাগণের মধ্যে যাঁহারা এখন আপনাদিগকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের অধিকাংশই পূর্ব্বে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিব্বতের প্রধান ধর্ম্মগুরু ও সার্ব্বভৌম শাসনকর্ত্তা দালাই লামা পূর্ব্বজন্মে প্রথমতঃ বঙ্গদেশের রাজপুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি পরবর্ত্তী দুই জন্মে উক্ত রাজবংশে ক্রমান্বয়ে জন্ম-পরিগ্রহ করেন। তিনি বদান্যতা ও আত্মত্যাগের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাসিলামা পূর্ব্বজন্মে দুইবার বঙ্গদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। একবার তিনি আচার্য্য অভয়াকর গুপ্ত নামে, আর একবার সুমতিকৃতি নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল কারণবশতঃ বঙ্গদেশ তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ার সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকে। তত্রত্য মানবগণ বঙ্গদেশের যে কোনও নামের পূর্ব্বে 'শ্রীযুক্ত' (মহত্ত্বগুণযুক্ত) অর্থব্যঞ্জক শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পালবংশের রাজত্বকালে, প্রায় তিন শত বর্ষ ব্যাপিয়া, বঙ্গদেশ বিদ্যানুশীলন ও অস্ত্রচর্চ্চায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। একাদশ খৃষ্টাব্দের কোনও তিব্বতীয় ঐতিহাসিকের গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, গৌড়েশ্বর দেবপাল বঙ্গদেশ হইতে সংগৃহীত সেনাবলের সাহায্যে মগধ ও বরেন্দ্রভূমি স্বরাজ্যভুক্ত করেন। উক্ত তিব্বতীয় ইতিহাস ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে কাঙ্কলকে মুদ্রিত হইয়াছিল।

যে সময়ের বাঙ্গালীরা বিদ্যা, শৌর্য্য, বীর্য্য ও মহৎ চরিত্রের জন্য লোকসমাজে বরণীয় হইয়াছিলেন। যে সকল মহৎগুণের জন্য সে কালের বাঙ্গালীরা এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন,

আজ তাঁহাদের বংশধরগণ সে সম্মান হইতে বঞ্চিত। উচ্চশ্রেণীর তিব্বতীয় ও প্রসিদ্ধ লামাগণ জানেন অবশ্যই নহেন যে, বাঙ্গালীরা তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে 'বাবু' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। 'বাবু' শব্দটি মুসলমানদিগের প্রদত্ত। উহা 'আলস্যপরায়ণ ধনবান ব্যক্তি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তিব্বতে জনসাধারণের বিশ্বাস, যে সকল বাঙ্গালী 'বাবু' শব্দ ব্যবহার করে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে মুসলমান।

তিব্বত বা ভোট দেশে বৌদ্ধধর্ম্মবিস্তারের ইতিহাসে আমাদের দেশের কতিপয় পণ্ডিত শ্রেষ্ঠের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের বিবরণ পাঠ করিলে মাতৃভূমির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়; আত্মনবজ্ঞান ও আত্মনির্ভরশীলতা স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। বর্ত্তমান যুগে আমরা দেখিতে পাই, 'কোমল' বঙ্গের এমন বহু প্রমসহিষ্ণু সন্তান আছেন, যাঁহারা জগতের যে কোনও জাতীয় ব্যক্তিবৃন্দের ন্যায় অকুতোভয়ে হিমারণ্যের বিপদসঙ্কুল দুরারোহ অভিক্রম করিতে পশ্চাৎপদ নহেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে দুইটি রাজনন্দিনীর যত্নে বৌদ্ধধর্ম্মের বহ্নিশিখা তিব্বতে প্রথম প্রতিভাসিত হয়। এই উভয় রাজনন্দিনী বৌদ্ধধর্ম্মে পরম অনুরাগিণী ও ভক্তিমতী ছিলেন। এই রাজকুমারীদ্বয়ের মধ্যে এক জন নেপালাধিপতি অংশুবর্ম্মণের কন্যা, অপরা চীনরাজবংশীয়া। এই চীনরাজনন্দিনীর নাম ওয়েনচেং। রাজনন্দিনীদ্বয়ের সহিত তিব্বতরাজ স্রোংচাউগাম্পোর পরিণয় হইলে, তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিব্বতে এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের বীজ উপ্ত হইয়া বটে, কিন্তু রাজকুমারীদ্বয়ের [illegible] ধর্ম্মালোকশিখা চিরপ্রচলিত কুপ্রথার ঘনান্ধকারে দুর্বীভূত করিতে পারিল না। তিব্বতীয়দিগের হৃদয়ে তখনও 'বন্' ধর্ম্মের প্রভাব অপ্রতিহতভাবে বিরাজ করিতেছিল।

উক্ত ঘটনার এক শত বৎসর পরে তিব্বতরাজ খরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের জন্য মগধেশ্বরের দীক্ষাগুরু গৌড়-নিবাসী পণ্ডিত শান্তিরক্ষিতকে আমন্ত্রণ করেন। শান্তিরক্ষিত তখন দেশ-প্রসিদ্ধ নালন্দা মঠের পুরোহিতাচার্য্য ছিলেন। তাঁহারই উপদেশ-অনুসারে তিব্বতাধিপতি নালন্দা মঠের গুরু-পদ্মসম্ভবকেও তিব্বতে লইয়া যান। উভয়ে মিলিয়া প্রথমতঃ মঠাদ্যক লামার-পদের সৃষ্টি করেন। শান্তিরক্ষিত এখনও তিব্বতে আচার্য্য বোধিসত্ত্ব নামে অভিহিত ও পূজিত হইয়া থাকেন। মঠের শান্তিরক্ষিত ও বর্ম্মানুশাসনের শিষ্য প্রভৃতির ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল। পণ্ডিতগুরু পদ্মসম্ভব বৌদ্ধধর্ম্মের তান্ত্রিক অনুশাসনের ব্যাখ্যা ও বিস্তার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর বঙ্গদেশের বহুসংখ্যক পণ্ডিত তিব্বতে আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এইরূপে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল দৃঢ়তর হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে এই সকল জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত, পবিত্র, বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মে সংক্রামক ব্যাধি প্রবেশ করিতে লাগিল। নানাবিধ কুপ্রথা ও ব্যভিচারে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম নিতান্ত কলুষিত হইয়া উঠিল। তখন পবিত্র ধর্ম্মকে পুনরায় সংশোধিত ও প্রবল করিবার অভিপ্রায়ে তিব্বতরাজ ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে খ্যাতনামা মহাপণ্ডিত অতিশা বা দীপঙ্কর জ্ঞানশ্রীকে স্বরাজ্যে আহ্বান করেন। অতিশা ৯৮০ খৃষ্টাব্দে 'বাঙ্গালা'র অন্তর্গত বিক্রমপুর নামক নগরে

গৌড়ীয় রাজবংশে জন্মপরিগ্রহ করেন। বাঙ্গালা বজ্রসভার (বুদ্ধগয়া) পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত। অতিশা ভারতবর্ষে বিদ্যার্জ্জন করিয়া জ্ঞানচর্চ্চার অভিপ্রায়ে ত্রিতিপ্রম বণিকের সমভিব্যাহারে অর্ণবযানে আরোহণপূর্ব্বক সুবর্ণদ্বীপাভিমুখে (সুধর্ম্ম নগর, ইহা পেগুর অন্তর্গত, ইহাকে এক্ষণে থেটন্ বলে) যাত্রা করেন। তথায় কোনও প্রখিতনাম্না পণ্ডিতের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তিনি সিংহলদ্বীপে গমন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, মগধের পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া গ্রহণ করেন। মগধ সে সময়ে সমগ্র বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রধান নগরের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। মগধের তদানীন্তন নৃপতি জ্ঞানপাল অতিশাকে বিক্রমশীলা নামক মঠের প্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টার পদ প্রদান করেন। তিব্বতের অধিপতি স্বরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনঃসংস্কারের অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে লইয়া যাইবার জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তখন অতিশার যশঃসৌরভে সমগ্র ভূখণ্ড আমোদিত হইয়াছিল। তিব্বতীয়-গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায়, মহাজ্ঞানী অতিশাকে লইয়া যাইবার জন্য তিব্বতরাজ বহুবার দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। বহুমূল্য উপঢৌকন, রাশি রাশি সুবর্ণের প্রলোভনে অতিশা মুগ্ধ হন নাই। তিনি স্বদেশের কর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিব্বতে গমন করিতে চাহেন নাই। কিন্তু অবশেষে তিব্বতরাজের ঐকান্তিক প্রার্থনায় ও অনুনয়ে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয়। অতিশা তিব্বতে উপনীত হইলে রাজা প্রজা সকলেই প্রগাঢ় ভক্তি ও গভীর আনন্দের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি অশিক্ষিত-ও-লান্ত তিব্বতীয়দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য মহাযানপন্থা অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের গভীর ও নিগূঢ় অর্থের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন। বহু আয়াস স্বীকার করিয়া অতিশা উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তিব্বতের কলুষিত বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোকে তিব্বতের অন্ধকাররাশি দূরীভূত হয়। অতিশা অতঃপর কদ্দাপা নামক একটি বিশুদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য ব্রুটম্ এই সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টার পদ প্রাপ্ত হন। প্রায় তিন শত বৎসর পরে উক্ত সম্প্রদায়ের নাম পরিবর্ত্তিত হয়। এখন উহা 'জেগুল-পা' বা ধর্ম্মসম্প্রদায় নামে পরিচিত। বর্ত্তমান কালে জেগুল-পাই তিব্বতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়। অতিশা বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'বোধি-পাঠ-প্রদীপ' নামক গ্রন্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতিশা দ্বাদশ বৎসর কাল তিব্বতে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি তত্রত্য যাবতীয় প্রধান প্রধান নগর ও তীর্থে পর্য্যটন এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিবিধ উপদেশ প্রদান করেন। লাসা নগরের সন্নিহিত নেথান নামক স্থানে অতিশা ৭২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। মহারাজ অশোকের ধর্ম্মগুরু উপগুপ্ত ব্যতীত অতিশার ন্যায় কোনও বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক কোনও বৈদেশিক জাতিকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া এরূপ গৌরবসমুজ্জ্বল স্মৃতি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিব্বতায় বৌদ্ধধর্ম্ম এসিয়া মহাদেশের যে যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে, তথায় এই বঙ্গদেশীয় মহাপুরুষের নাম গভীরভক্তিসহকারে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানযুগেও আমাদেরই বঙ্গদেশে হইতে এক জন বাঙ্গালী হিমারণ্য অতিক্রমপূর্ব্বক সার্দ্ধ অষ্ট শত বৎসরের প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মপ্রধান লাসা নগরে প্রবেশ করেন। তাঁহারই চেষ্টায় আজ

সমগ্র সভ্যজগৎ আজ রহস্যময়ী নিষিদ্ধ নগরী লাসার প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়াছে। তাঁহার নাম রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস সি. আই. ই। 'কোমল ও দুর্ব্বলদেহ' অপবাদগ্রস্ত বাঙ্গালী হইয়াও দাস মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আবশ্যক হইলে, বাঙ্গালীও জ্ঞানার্জ্জনের জন্য সর্ব্বপ্রকার বিপদের সম্মুখীন হইতে ভীত নহে।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রশালার আলমপুর নামক গ্রামে কোনও সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস বলেন, বাল্যকাল হইতেই শরচ্চন্দ্র বিপদকে ভালবাসিতেন। এই জন্যই তিনি ভাবী জীবনে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। শরচ্চন্দ্র কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করেন। ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা করিবার প্রবল বাসনা থাকায়, তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের পূর্ত্তশিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন। স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় তিনি শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই দার্জ্জিলিঙ্গে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য গমন করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত মিঃ সি. বি. ক্লার্কের অনুরোধে তিনি তত্রত্য ভুটিয়া বোর্ডিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার তিব্বত-বাসের ইতিহাস 'ডন' পত্রে বারান্তরে বর্ণিত হইবে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। মাঘ। "পূর্ব্ব বঙ্গে মেয়েলী ব্রত" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোমের সঙ্কলিত জাপানী ব্যায়াম-প্রণালী—"জিউজিৎসু" প্রবন্ধে জানিবার ও শিখিবার কথা অনেক আছে। "হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাস" প্রবন্ধটি চিন্তাশীল সামাজিকগণের দ্রষ্টব্য। সেন্সস ১৯০১ পৃঃ যোর লোকগণনার রিপোর্টে নির্ভর করিয়া বলিতেছেন, "ভারতবর্ষে হিন্দুর সংখ্যা দুই কোটীর উপর কমিয়াছে, কিন্তু মুসলমানের সংখ্যা এতদ্ভিন্ন ৮-৯ বাড়িয়াছে।" আমরা এই প্রবন্ধের কিয়দংশ আবশ্যকবোধে উদ্ধৃত করিতেছি।

"সেন্সস্ রিপোর্টে এই হ্রাসের যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতেছি। প্রথম কারণ:—যে যে প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত খুব বেশী, সেই সেই প্রদেশে ১৮৯১—১৯০১ এই দশ বৎসরে দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু খুব বেশী হইয়াছিল; আর যে যে স্থানে হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, তথায় দুর্ভিক্ষ হয় নাই। যেমন, পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গ, পশ্চিম পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, যুক্তপ্রদেশদ্বয়ের মীরাট ও রোহিলখণ্ড ডিবিজনে দুর্ভিক্ষ হয় নাই; কিন্তু মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, রাজপুতানা, মধ্যভারত প্রভৃতিতে খুব দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। প্রথমোক্ত প্রদেশগুলিতে হিন্দু কম, মুসলমান বেশী; শেষোক্ত প্রদেশগুলিতে মুসলমান কম, হিন্দু বেশী। কিন্তু দুর্ভিক্ষই হিন্দুর সংখ্যাহ্রাসের একমাত্র কারণ নহে। ইহার একটি পরোক্ষ প্রমাণ এই যে, যে সকল স্থানে দুর্ভিক্ষ হয় নাই, সেই সকল স্থানেও মুসলমান যত বাড়িয়াছে, হিন্দু তত বাড়ে নাই। দ্বিতীয় কারণ:—অধিকাংশ হিন্দু জাতির (castes) মধ্যে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ। সুতরাং অনেক গর্ভধারণক্ষমা স্ত্রী নিঃসন্তান থাকিয়া যান। তৃতীয় কারণ:—অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকবালিকার বিবাহ। চতুর্থ কারণ:—অনেক হিন্দুর মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্ম

অবলম্বন, বিশেষতঃ শেষোক্ত ধর্ম্ম অবলম্বন। ১৮৯১ হইতে ১৯০১ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে ৬ লক্ষের উপর হিন্দু খৃষ্টান হইয়াছে।"

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "আধুনিক সন্ন্যাসী"র সহিত পরিচয়ে আমরা প্রীত হইতে পারিলাম না। প্রভাত বাবুর গল্পে প্রভাতী ফুলের মত একটু freshness থাকে এ গল্পটিতে তাহা নাই। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দুই দিক" হোমিওপ্যাথিক 'ট্রিবিউলের মত একটি অতি ক্ষুদ্র গল্প। ইহাতেও বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরীর শিরোনামহীন সুদীর্ঘ কবিতা উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সংস্কৃতশিক্ষার" তৃতীয় প্রস্তাবে অনেক কাজের কথার অবতারণা করিয়াছেন। শিক্ষার সহিত যাঁহাদের কিছুমাত্র সংস্রব আছে, এই প্রবন্ধটির আলোচনা তাঁহাদের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ সামসুখার "প্রবন্ধচিন্তামণি" উল্লেখযোগ্য।

ভারতী। মাঘ। প্রবন্ধেই শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত "জুলিয়স সীজর" এবার তৃতীয় অঙ্ক প্রকাশিত হইয়াছে। অনুবাদ পূর্ণাঙ্গ। শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের "কলঙ্কিনী" নামক গল্পটির নামের প্রশংসা করিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষের 'যৌবন-স্বপ্ন' রবির ছায়া। কিন্তু ছন্দের ঝঙ্কার রমণীয়। জনৈক প্রবাসীর সঙ্কলিত 'পুরুষক জাতির বিবরণ' সুপাঠ্য। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বৈশালী" নামক [illegible] "মানসিক কৃষ্ণা" হইতে ডিরোজিওর প্রবন্ধ আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

"বিগত ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা ওভারটুন হলে, মিঃ ই. ডাব্লু স্মাইথ্ সাহেব, হিন্দুকলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক হেনরি ডিরোজিও সম্বন্ধে অনেক নূতনতত্ত্বসংবলিত একটি উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার প্রবন্ধের সারাংশ নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

"১৮০৯ খৃষ্টাব্দে জগতে অনেক বড়লোক জন্মগ্রহণ করেন।—মেণ্ডেল লোহন, ল্যাণ্ডষ্টোন, টেনিসন, ডারউইন, এডগার এ্যালেন পো, ওলিভার ওয়েণ্ডেল হলমস্, ফ্যানি কেম্বেল, লিংকলন প্রভৃতির সঙ্গে উক্ত বৎসর ডিরোজিও-ও ধরাধামে অবতীর্ণ হন। যে গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাহা কলিকাতা লোয়ার সারকুলার রোডের উপর এখনও বিদ্যমান। উহা নবপ্রতিষ্ঠিত সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ভবনালয়ের ঠিক সম্মুখভাগে অবস্থিত।

ডিরোজিওর পিতামহ—মাইকেল ডিরোজিওর নাম, আমরা ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে 'সেণ্ট জনস্ ব্যাপ্টিস্মাল রেজেষ্টারি' বহিতে 'এতদ্দেশীয় (native) খৃষ্টান' বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাই। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের 'বেঙ্গল ডাইরেক্টরী'তে ইনি 'পর্ত্তুগিজবণিক' বলিয়া অভিহিত।

"হেনরি ডিরোজিওর জীবনী ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের 'ওরিয়েণ্টাল ম্যাগাজিনে' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্রিকার এই সংখ্যায় তাঁহার একখানি সুন্দর ছবিও প্রদত্ত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, ওরিয়েণ্টাল ম্যাগাজিন এখন নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে।

"হেনেরি ডিরোজিও 'ড্রামণ্ড একাডেমি' নামক বিদ্যালয়ে পাঠ করেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি কয়েকবার মেডেল প্রাপ্ত হন। হেনেরির পিতা ফ্রান্সিস ডিরোজিও খেসরস্ জেম্‌স্ হুট এণ্ড কোম্পানির দোকানে উচ্চ কর্ম্ম করিতেন। হেনেরি প্রথমতঃ তথায় একটী কর্ম্ম

গ্রহণ করেন, কিন্তু দুই বৎসর পরে সেই কার্য্যভার পূর্ব্বক ভাগলপুর জেলায় কাজরাপুরের নীলকুঠীতে প্রবেশ করেন। এই নীলকুঠির নিম্নবাহিনী মধুমতী নদীর তরঙ্গ এবং চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, নবযুবক ডিরোজিওর কল্পনাকে কাব্যপ্রভায় আবিষ্ট করিয়াছিল। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্তদশবর্ষমাত্র। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি এই সময়ে একখানি কবিতাপুস্তক প্রকাশ করেন। এই কবিতাপুস্তকে তিনি সহসা সাহিত্যক্ষেত্রে কতকটা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়া গেজেটের একটী প্রবন্ধে দৃষ্ট হয়, ডিরোজিওর কবিতাপুস্তক, বিলাতেও তাঁহাকে পরিচিত করিয়াছিল। নব্যশিক্ষিতশুষ্ক যুবকের পক্ষে, এই যশঃ বিশেষ শ্লাঘার কারণ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এই অল্পবয়সেই, ডিরোজিও, ইণ্ডিয়া-গেজেট পত্রের সহকারিসম্পাদক হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাহা পরিত্যাগ করিয়া ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।

"তরুণবয়স্কশিক্ষক, যে প্রণালীতে শিক্ষা দিতেন, তাহা ছাত্রদিগকে জ্ঞানের পথে অপূর্ব্ব-মত্ততা প্রদান করিয়াছিল। তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে লক, রিড, ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি দার্শনিক-গ্রন্থকারগণের বড় বড় পুস্তক, এমন ভাবে পড়িয়া শুনাইতেন যে, তাঁহার স্বীয় আগ্রহাতিশয় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইত। বিষয় যত দুরূহ কঠিন হউক না কেন, তিনি তৎপ্রতি কৌতূহল ও মনোযোগ সঞ্চার করিয়া তুলিতেন। প্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত উইলসন, তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি অনতিক্রান্ত বিংশবর্ষবয়সে ব্যাণ্টের দুর্নীতির প্রতিবাদ করিয়া, যে একখানি পুস্তক রচনা করেন, কলিকাতার তৎকালীন প্রবীণ ইংরেজ অধ্যাপকগণ তাহা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন. ডিরোজিও শুধু কবি নহেন, তিনি এক জন উচ্চদরের দার্শনিক।

"তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে বেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়; মহেশচন্দ্র ঘোষ, রাজা দিগম্বর মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি অনেকের নামই বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা ডিরোজিওর প্রতি স্বরূপ অনুরাগী ছিলেন, একালে অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে সেরূপ সহৃদয়তার দৃষ্টান্ত বিরল। তিনি অল্পদিনমাত্র হিন্দু স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তাঁহার প্রভাব ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে যে ভাবে মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন,—তাহার তুলনা অদ্যত দুর্লভ। তিনি ছাত্রদিগকে নাস্তিক করিয়া তুলিতেছেন—এই অভিযোগের উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যেরূপ অকুণ্ঠিত, তেমনই স্পষ্ট ও প্রবল। কিন্তু তদ্বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল যে, বিরুদ্ধপক্ষগণের চেষ্টাই সফল হইয়াছিল। নাস্তিকতা-শিক্ষাদানের অভিযোগের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,—'এই সকল জঘন্য অভিযোগের উত্তরে আমি স্পষ্টভাবে 'না' বলিতেছি। ঈশ্বরের অস্তিত্বসম্বন্ধে দার্শনিক-পণ্ডিতদের অবিশ্বাসের কারণগুলি আমি ছাত্রদের নিকট বলিয়াছি, ইহা স্বীকার করিতে আমি কিছুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত নহি। আমি এই অবিশ্বাসের হেতুগুলি যেরূপ বুঝাইয়া বলিয়াছি, তাহার সন্দেহ কিরূপে দূর হয়, তাহাও দেখাইতে ত্রুটি করি নাই;—সুতরাং এ কথা বলিতে আমার লজ্জা হওয়ার কোন বিষয় নাই। আমাকে যে, ঘোর অবিশ্বাসী ও নাস্তিক সংজ্ঞা দেওয়া হইবে, তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কারণ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাঁহারাই একটু স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারাই চিরকাল এই ভাবে অভিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আমার এইটি মাত্র বিস্ময়ের প্রধান কারণ, যে সকল বিশ্বাস বা ধারণা আমার মতের সম্পূর্ণ বিপরীত, সেইগুলিই আমার প্রতি আরোপ করা হইয়াছে।'

"ডিরোজিওর পদচ্যুতির পরেও, তাঁহার ছাত্রগণ, তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া সর্ব্বদা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন ও তাঁহার কথা অনুসারে কাজ করিতেন।'

"১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর কলেরারোগে ডিরোজিওর মৃত্যু হয়। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশবর্ষমাত্র ছিল। এই অত্যল্প বয়সে তিনি তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময় জন্মে। ডিরোজিওর ছবি এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। তাঁহার শ্যামবর্ণ সুকুমার বালকের ন্যায় মুখমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে গুচ্ছগুচ্ছ কুঞ্চকুঞ্চিত কেশ দুলিত হইত, চক্ষু দুটি বড় এবং জ্যোতির্ম্ময় ছিল, তিনি কতকটা খর্ব্বাকৃতি ছিলেন, এবং পরিচ্ছদের পারিপাট্যসম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার রচিত কবিতাগুলির মধ্যে 'জাম্বিরার কবির' শীর্ষক কাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেক ইংরেজ সমালোচক তাঁহাকে 'প্রাচ্যদেশের বাইরণ' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ডিরোজিওর প্রতিভায় বাইরণের তেজস্বিতা ও হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রতিবিম্বিত হইত। সেকালের নবীন কবিগণ, বাইরণ, মুর ও স্কটের কবিতার অনুকরণ করিতেন; ডিরোজিও-ও সেই আকর্ষণ এড়াইতে পারেন নাই। কিন্তু হৃদয়ের গভীর উদ্বেল ভাব ও সৌন্দর্য্যের প্রতি সূক্ষ্মদৃষ্টি, তাঁহার নিজস্ব; অনেক স্থলেই তাঁহার নিজের একটা মৌলিক সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। তাহা, কালে কি অপূর্ব্বসঙ্গীত-লহরীর সৃষ্টি না করিতে পারিত!

"তাঁহার কবিতা, মাইকেল স্থলে-স্থলে অনুকরণ করিয়া গুরুভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, একটি স্থান উঠাইলে তাহা প্রতিপন্ন হইবে।"

'Gone to that narrow cell
Whose gloom no lamp hath broken nor shall break.
Whose secrets never spirits came to tell—
Oh-! that then day might dawn for then they would awake'

ডিরোজিওর এই কবিতাটি অবশ্য মনে রাখিয়া মাইকেল লিখিয়াছেন,—

'আসিছে রজনী, নাহি যার কেহ পাশে
তারা-রূপ মণি,
চিররুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত কবে
ঊষা, তপনের দূতী অরুণরঞ্জনী।'

উদ্ধৃত অংশে "দুলিত" প্রভৃতি আজগুবি ভাষার নমুনাগুলি অবশ্য পাঠকের উপরি লাভ।

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরীর "মুক্তি" নামক ক্ষুদ্র কবিতাটির শেষ চরণ শেষ করিয়া যথার্থই মুক্তির আনন্দ অনুভব করিলাম।

"আর নাই! কেন নাই? আছে, আছে, আছে,
বিস্তৃত হয়েছে হের এই বিশ্বমাঝে"

এই দুই চরণের মিল দেখিয়া রবিবাবুর 'যা পদ্য যা মিলে যাও লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠিবে।

আরতি। পঞ্চমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মাঘ। আমরা 'আরতির' পুনরাবির্ভাবে আনন্দলাভ করিলাম। "বাণী আরাধনা" নামক সুদীর্ঘ কবিতাটিতে কবিতা অপেক্ষা বক্তৃতার মাত্রা অধিক—কিন্তু এই বক্তৃতায় উদ্দীপনা আছে। শ্রীযুক্ত ব্রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর "কালিদাস ও রঘুবংশ" নামক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। "শ্রী" স্বাক্ষরিত "খুকী" নামক ক্ষুদ্র গল্পটি অতি সুন্দর। শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের 'খেদা' নামক প্রবন্ধে অনেক কৌতুকাবহ তথ্য আছে। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদারের "ময়মনসিংহে সন্ন্যাসীবিদ্রোহ" নামক উপাদেয় ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি আমরা সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি। আজ কাল মফঃস্বল হইতে যে সকল মাসিক পত্র প্রকাশিত হয় তাহাতে প্রাদেশিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ প্রায় দেখিতে পাই না। কিন্তু আমাদের মনে হয় প্রাদেশিক ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, জনশ্রুতি প্রভৃতির অনুশীলনই প্রাদেশিক পত্রগুলির মুখ্য কর্ত্তব্য। আরতি কর্ত্তব্য-পথের পথিক হইয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষের 'নূপুর' নামক ক্ষুদ্র সনেটটি অতি সুন্দর।

কোমল চরণদুটি' জড়ায়ে যতনে
দুখানি অলক্ত-আভা-বিম্বিত নূপুর;
বসন্ত সঙ্গীত যেন বাঁধিয়া চরণে
নিমেষে নিনেষে ঐ বাজে সুমধুর।
কি সৌভাগ্য নূপুরের সার্থক জীবন—
মগ্ন হয়ে আছে সুধা-প্রসূনের রসে!
শতদল দল ঘিরে ভ্রমর যেমন
তাই বুঝি শতবার গুঞ্জরে হরষে।
অথবা কি, হে কল্যাণি, নারীরূপ লয়ে
আপনি পরেছ পদে মায়ার বন্ধন,
তুমি স্বেচ্ছাকৃত বন্দী মানব-আলয়ে
গৃহ-কারাগার তুমি করেছ নন্দন।
নূপুর দুখানি বুঝি তাই শত ছলে
তোমারি-মহিমা নারি, গায় কুতূহলে।

নবনূর। মাঘ। নবনূর জন্মেই উজ্জ্বল হইতেছে। পুরাতন মাসিকে অবসাদের অবনতির চিহ্ন দেখিয়া নিরাশার সঞ্চার হয়। নূতনের নবোৎসাহে জরা স্পর্শ করিতে পারে না। নবনূরের এই উদ্যম হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতিবর্দ্ধনের সহায় হউক এই আমাদের আন্তরিক কামনা। জাতিবিদ্বেষে ভারতবর্ষে দগ্ধ হইয়াছে সে অনলে আর ইন্ধন দিবার আবশ্যক নাই। বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান একথা বিস্মৃত নহেন। "ঐসলামিক যৎকিঞ্চিৎ" উল্লেখযোগ্য কিন্তু লেখকের ধীরতার অভাব শোচনীয়। শ্রীযুক্ত মহাম্মদ-মহৎসম্বলিত চৌধুরী সাহেবসপ্ত পরিবারের ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন, মহারাজ বল্লভসেনের জীবনচরিত ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। "মেথরাণীর আবেদন" ভদ্রসমাজের যোগ্য নহে।

কিরিঙ্গি বণিক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অসাধারণ আত্মত্যাগ।

The institution of chivalry, one which has so much elevated human nature, that love of glory instead of mere country, that spirit purified from the contamination of surrounding barbarism appeared upon the banks of the *Tagus*, with all the splendour which had characterised its origin in France and England. The Portuguese Monarchs strove to preserve it, and to extend its power by the establishment of various orders formed upon the old models, and whose spirit was the same,—that is to say,—a union of heroism, gallantry, and devotion,—*Portuguese Discoveries by Rev. Alex. J. D. D'Orsey, B. D.*

অসাধারণ আত্মত্যাগই অধিকাংশ মানব-সমাজের অভ্যুদয়ের মূল কারণ বলিয়া ইতিহাসে সুপরিচিত। সম্ভোগ মানব-সমাজকে স্বার্থপর করিয়া সমগ্র দেশের অভ্যুদয়ের পথ সংকীর্ণ করিয়া রাখে। স্বার্থচিন্তা প্রবল হইয়া, কখন কখন প্রধান পুরুষগণকে স্বদেশদ্রোহে লিপ্ত করিয়া, অধঃপতনের সূত্রপাত করে। পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার উদাহরণের অভাব নাই। পর্ত্তুগীল যখন মুসলমান-শাসন উৎখাত করিয়া স্বাধীনতা-লাভের আয়োজন করিয়াছিল, সে সময় আধুনিক ইউরোপের নবজীবন-লাভের প্রথম প্রভাত। তখনও নব্যযুগের অজ্ঞানতার অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই। তথাপি আশার তরুণ কিরণ ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। স্বদেশ অপেক্ষা স্বকীর্ত্তি যেন সমধিক প্রবলপ্রতাপে মানব-সমাজে কর্ত্তব্যনিষ্ঠার নূতন শিক্ষা প্রচারিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যেখানে অত্যাচার, সেখানেই জন-সমাজ তাহার বিরুদ্ধে সশস্ত্রে দণ্ডায়মান;—প্রতীকার-কল্পনায় জীবনবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত;—প্রয়োজন হইলে, দলে দলে পতঙ্গের ন্যায় অনলশিখায় আত্মোৎসর্গ করিতে লালায়িত! এই শিক্ষা এক দিকে অকুতোভয়তায়, অন্য দিকে অকৃত্রিম গৌরবলালসায়, ইউরোপীয় জনসমাজকে অসাধারণ আত্মত্যাগ-স্বীকার করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিল। রাজকুমার হেন্‌রী এই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া, শিক্ষা ও সাধুদৃষ্টান্তে শৈশব হইতেই সাহসী, অধ্যবসায়শীল ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বীরপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

সেকালের ধর্ম্মোন্মাদ তাঁহাকেও উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মুসলমান-বিদ্বেষ তাঁহার তরুণহৃদয়ে জিগীষার জন্মদান করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারের জন্য উত্তেজনা উপস্থিত করিয়াছিল। সেকালের লোকচরিত্রের নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিয়া, লোকসমাজের কার্য্যাকার্য্যের বিচার করিতে হইলে, সেকালের এই সকল বিমিশ্র চিত্তবৃত্তির কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। যে কেহ ধর্ম্ম-রাজ্য-সংস্থাপন-কাননায় আত্মোৎসর্গে অগ্রসর, সে কেবল সন্ন্যাসী হইয়া, এক গণ্ডে চপেটাঘাত সহ্য করিয়া, অন্য গণ্ড ফিরাইয়া দিয়া, খৃষ্টধর্ম্মের প্রেমের শাসনের মর্য্যাদা-রক্ষা করিতে সম্মত হইত না; বরং স্বয়ং অগ্রবর্ত্তী হইয়া, অপরের গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়া, ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিতেও ইতস্ততঃ করিত না। যে কেহ অনন্ত বিষয়-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, সন্ন্যাসীর ন্যায় কঠোর তপস্যায় খৃষ্টান-সমাজের সেবার ভার গ্রহণ করিত, সে কেবল ভিক্ষালব্ধ তিলতণ্ডুলে সেবাব্রত উদ্‌যাপিত করিত না; বরং সময় সুযোগ প্রাপ্ত হইলে, বাহুবলে পরস্বাপহরণেও কুণ্ঠিত হইত না।

সেকালের ইউরোপে যেরূপ ধর্ম্ম-নীতি খৃষ্টান-সমাজকে উত্তরোত্তর পরাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা এসিয়ার শান্ত শীতল খৃষ্টধর্ম্ম হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল। অদ্যাপি সে পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। রাজকুমার হেন্‌রীর আবির্ভাবসময়ে তাহা সমধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

হেন্‌রী যখন ধাত্রীক্রোড়ে শৈশবক্রীড়ার অবসরশূন্য, হেন্‌রীর জন্মভূমি তখন মুসলমান-বিজয়ের এক নূতন পথে দণ্ডায়মান। মুসলমান পর্ত্তুগাল হইতে তাড়িত হইয়া, আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমে সমুদ্রোপকূলে রাজ্যভোগ করিত। অশান্ত পর্ত্তুগাল সেখানে উপনীত হইয়া, মুসলমান-রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল। এই কার্য্য ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া, খৃষ্টান ইউরোপ জয়ধ্বনি করিয়া, পর্ত্তুগালকে উত্তেজিত করিয়া দিল। ইংলণ্ডের ধনুর্দ্ধরগণ ইংলণ্ডাধিপতির জামাতার এই সমরবিজয়ের সহচর হইবার জন্য সগর্ব্বে আস্ফালন করিয়া উঠিল। আয়োজনের ত্রুটি হইল না, জীবনবিসর্জ্জনের অবধি রহিল না; অসাধারণ আত্মত্যাগের পুণ্যকীর্ত্তিতে খৃষ্টান-সমাজের ধর্ম্মোন্মাদ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল;—তথাপি মুসলমানশক্তি পিপীলিকার ন্যায় পদবিদলিত হইল না। অলেন্ত কিউটা-দুর্গে আশ্রয় লাভ করিয়া, মুসলমান অসিহস্তে আত্মরক্ষার জন্য বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইল; তাহার সম্মুখে

সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় শত্রুসেনাতরঙ্গ প্রবলগর্জ্জনে পুনঃপুনঃ আস্ফালন করিয়া আস্ফোট করিতে লাগিল; তথাপি মুসলমানবীরবৃন্দ বিচলিত হইল না। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দীর্ঘকাল এইরূপ শক্তিপরীক্ষায় পর্ত্তুগালের দিগ্বিজয়-লালসা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। রাজকুমার হেন্‌রী অষ্টাদশবর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতেই সেনানায়ক হইয়া, মুসলমান-বিজয়ের জন্য আফ্রিকার উপকূলে প্রেরিত হইলেন।

হেন্‌রী বিজয়লাভ করিলেন। যে মুসলমান-দুর্গ অভেদ্য বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছিল, তাহা অবরুদ্ধ হইল। হেন্‌রী দুর্গজয় করিয়া, মুসলমানের শেষ আশ্রয়স্থল অধিকার করিবার জন্য স্বয়ং সর্ব্বাগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন। হেন্‌রীর স্বধর্ম্মানুরক্ত চরিতার্থ্যায়ক এই দুর্গজয়কাহিনী বর্ণন করিবার সময়, হেন্‌রীর অসাধারণ আত্মত্যাগের কথা পুনঃপুনঃ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সেদিন মুসলমান-সেনা প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের প্রবল প্রতাপে খৃষ্টান-সেনা পুনঃপুনঃ দুর্গমূল হইতে তাড়িত হইয়াছিল। কেবল এক জন খৃষ্টান-সেনানায়ক দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান থাকিয়া, অকুতোভয়তার প্রতিমূর্ত্তিরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। সেই খৃষ্টান-সেনানায়ক স্বয়ং রাজকুমার হেন্‌রী! দুর্গজয় সুসম্পন্ন হইলে, এই অলৌকিক বীরত্ব-কাহিনী যখন ইউরোপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তখন পোপ, জর্ম্মন-সম্রাট, স্পেন্ ও ইংলণ্ডের অধীশ্বর, সকলেই রাজকুমার হেন্‌রীকে সেনাপতি করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। পর্ত্তুগালের অধীশ্বরের পঞ্চম পুত্রের পক্ষে সিংহাসনে আরোহণ করিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, সেনাপতি হইয়া, অতুল ঐশ্বর্য্য ও অলৌকিক বীরকীর্ত্তি সম্ভোগ করিবার সম্ভাবনা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। হেন্‌রী স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, অসাধারণ আত্মত্যাগে ইউরোপকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। তিনি চিরকুমারব্রত গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন!

রাজকুমার হেন্‌রীর এই অলৌকিক আত্মত্যাগ ইউরোপের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইয়া রহিয়াছে। ইহা অসাধারণ সন্ন্যাস-কাহিনী। পর্ত্তুগালের অভ্যুদয়-কামনাই তাহার মূলমন্ত্র। কিরূপে স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে, কিরূপে স্বদেশের পদমর্য্যাদা বিশ্বব্যাপ্ত হইবে, কিরূপে স্বদেশের ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব স্ফীত হইয়া উঠিবে, তাহার উপায়-উদ্ভাবন করিবার জন্য ও সেই উপায় অবলম্বন করিয়া স্বদেশের অভ্যুদয়সাধন করিবার জন্যই হেন্‌রী সন্ন্যাস গ্রহণ

করিয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ উদাহরণ অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমের মুসলমান-রাজ্য দক্ষিণাংশের নানা স্থান হইতে ধনাহরণ করিত। হেন্‌রী সেই সকল দেশে গমনাগমনের জলপথ আবিষ্কৃত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার বাল্যশিক্ষা তাঁহাকে গণিতবিজ্ঞানের অনুরক্ত করিয়া, এই কার্য্য-সাধন করিবার উপযুক্ত সামর্থ্য দান করিয়াছিল। তিনি রাজকোষ হইতে যে-বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন, তাহা এই কার্য্যে উৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। হেন্‌রীর ধর্ম্মানুরাগই তাঁহার সকল কার্য্যের প্রধান প্রবর্ত্তক বলিয়া সুপরিচিত। এ ক্ষেত্রেও তাহার পরিচয় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে।

খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে ইউরোপের "ড্রুইড্"-পুরোহিতগণ জনসাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্য নানারূপ অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করিতেন। অশিক্ষিত জনসাধারণ পুরোহিতবর্গের অলীক কাহিনীতে কোনরূপ অনাস্থা প্রকাশ করিত না। "সেণ্ট ভিনসেণ্ট" নামক পর্ত্তুগালের একটি অন্তরীপ পুরোহিতগণের পবিত্র সাধনক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত ছিল। তথায় তাঁহাদিগের মন্দিরে প্রতি রজনীতে দেবতাদিগের সমাগম হইবার কথা জনসাধারণ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিত,—সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিত। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পরেও, এই পুণ্যক্ষেত্র লোকসমাজের নিকট অলৌকিক শক্তিলাভের সাধনক্ষেত্র বলিয়াই সুপরিচিত ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, রাজকুমার হেন্‌রী এই পুরাতন পুণ্যক্ষেত্রেই আশ্রম সংস্থাপিত করিলেন;—কি উদ্দেশ্যে হেন্‌রী এই স্থান মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

আটলাণ্টিক মহাসাগরের অনন্ত নীলাম্বুকল্লোল আশ্রমনিবাসী তরুণ সন্ন্যাসীর কর্ণপুটে নিয়ত ধ্বনিত হইয়া, তাঁহাকে নিরন্তর মহাসাগরের

"In days long past there had stood upon the sister head-land of St. Vincent, at about a league's distance, a circular Druidical temple, where, as Strabo tells us, the old Iberians believed that the gods assembled at night, and from the ancient name of Sacrum Promontorium hence given to the entire promontory by the Romans, Cape Sagres received its modern appelation. As may be imagined, the motive for the Prince's choice could not have been an ordinary one.—*Major's Prince Henry the Navigator*, p 2.

রহস্যভেদ করিবার জন্য উত্তেজিত করিত। হেনরী আফ্রিকার পশ্চিমোপকূলের সন্ধানলাভার্থ জলযাননির্ম্মাণে ব্যাপৃত হইয়া, অপরিজ্ঞাত সমুদ্রপথে পোতচালনা করিবার উপযোগী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-বিস্তারের আয়োজন করিলেন। তাঁহার আশ্রম নৌবিদ্যালোচনার প্রধান পাঠশালায় পরিণত হইল। ইউরোপের নানা স্থান হইতে প্রবীণ নাবিকগণ সে পাঠশালায় উপনীত হইয়া, বিবিধ অভিনব জ্ঞানলাভে সুশিক্ষিত হইতে লাগিল। হেনরী ধর্ম্মবীর; হেনরী সন্ন্যাসী; হেনরী সমগ্র ইউরোপে সুপরিচিত স্বদেশ-প্রেমিক। তাঁহার নিকট অভিনব জ্ঞানশিক্ষা করিতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন খৃষ্টান-নাবিকগণের ইতস্ততঃ রহিল না। পর্ত্তুগালের জনসাধারণ এত দিনের পর সুদূর সমুদ্রপারের অজ্ঞাত রাজ্যের ধনাহরণ করিয়া সমৃদ্ধিলাভ করিবে; চিরশত্রু মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া মুসলমানাধিকৃত বহুদেশে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচার করিতে পারিবে;—এই অভ্যুদয়ের আশার আলোকে পর্ত্তুগালের রাজা প্রজা সমভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। * হেনরী তাঁহাদের নায়ক হইয়া আবিষ্কার-ব্রত গ্রহণ করিলেন।

পর্ত্তুগাল ভিন্ন অন্য কোন ইউরোপীয় রাজ্যের পক্ষে এই সকল সুযোগ তখন পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং ক্ষুদ্র হইয়াও, পর্ত্তুগাল এই দুষ্কর কার্য্যের পথপ্রদর্শক বলিয়া পরিচিত হইবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল। অদম্য উৎসাহ, অপরাজিত অধ্যবসায় ও অসাধারণ আত্মত্যাগ ভিন্ন হেনরীর অন্য সম্বল অধিক ছিল না। যে-সকল জলযান প্রচলিত ছিল, তাহা ক্ষুদ্রকায়; তাহা কেবল ক্ষেপণী-বলে পরিচালিত হইত; যে সকল নাবিক এতদর্থে বলিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিত, তাহারা কেবল উপকূলপথে পোতচালনায় সিদ্ধহস্ত। সুদূর সমুদ্রপথে অবিজ্ঞাত নূতন দেশে পোতচালনা করিতে হইলে, দীর্ঘকালের জন্য অন্নজল সঞ্চিত করা আবশ্যক। সেকালের ক্ষুদ্র-পোতে তাহার স্থান হইত না। পোতের আয়তন বর্দ্ধিত করিলে, ক্ষেপণীবলে তাহাকে চালিত করা কঠিন হইয়া উঠিত। এই সকল বিঘ্ন বাধা হেনরীর

* "The war-like character of the population, the long range of coast bordered by the unknown Atlantic, and the desire to avenge the thraldom under which their native land had groaned, inspired the Portuguese with a desire to carry the war into the enemy's country, and to subdue the territory of the infidel to the Faith of the Cross."—*Portuguese Discoveries by Rev. Alex. J. D. D'Orsey, B. D. p. 7-8.*

নিকট এক সময়ে অনতিক্রমণীয় বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার অধ্যবসায় অবসন্ন হয় নাই। তিনি বায়ুবলে প্রোতচালনা-কৌশলের শিক্ষাদান করিয়া, অর্ণবযানের আয়তন-বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুদূর সমুদ্রপথে পোতচালনা করিতে হইলে সর্ব্বদা উপকূলভূমির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দিঙ্‌নির্ণয় করিবার উপায় থাকে না। কখন কখন অনন্ত মহাসমুদ্রে পতিত হইয়া দিগ্‌ভ্রান্ত হইতে হয়। হেনরী এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য যন্ত্রনির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। একালের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর হইলেও, সে কালের নাবিকগণের পক্ষে তাহাই একমাত্র সহায় বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সকল আয়োজন সুসম্পন্ন করিতে কত সময়, কত অর্থ, কত শ্রম ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু হেনরী তাহাতে বিস্মিত হইলেন না। তাঁহাকে এই কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য দীর্ঘকাল কত আয়োজন করিতে হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিবার জন্য ঐতিহাসিক আর ডব্লিউ হণ্টার লিখিয়া গিয়াছেন, হেনরীর জীবনের অধিকাংশ ভাগই এই কার্য্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহাকে মান-মন্দির নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল; নৌ-বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়া, গণিতবিজ্ঞানের শিক্ষাদানে সুদক্ষ নাবিকগণকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইয়াছিল। অসহিষ্ণু জনসাধারণ এত দীর্ঘকাল ধৈর্য্য ধরিয়া সিদ্ধিলাভের জন্য অপেক্ষা করিতে পারে না। তাহারা বীজ-রোপণ করিবামাত্র ফলভোগের জন্য লালায়িত হইয়া থাকে। তাহারা কিছুদিন পরে হেনরীর ধনবানসমূহের বিদ্রূপ, দুর্দ্দশার ও ব্যর্থবিজয়চেষ্টার সমাচার প্রাপ্ত হইয়া, হেনরীর বিপুল উদ্যমকে উন্মত্ততা ও অবিমৃষ্যকারিতা

On that barren spur of rocks and shifting sands and stunted juniper, with the roar of the Ocean for ever in his ears, and the wide Atlantic before him inviting discovery from sunrise to sunset, he spent his remaining forty-two years, a man of one high aim, without wife or child. Amid its solitude he built the first observatory in Portugal, established a naval arsenal, and founded a school for navigation, marine mathematics and chart-making. Thither he invited the most skilful pilots and scientific sailors of Christendom, from Bruges near the North Sea to Genoa and Venice on the Mediterranean. Thence, too, he sent forth at brief intervals exploring expeditions into the unknown South—expeditions often unfruitful, sometimes calamitous, even denounced as folly and waste.—*Sir W. Hunter's History of British India, Vol. I. p. 62–63.*

বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী সমুদ্রপথের ঝঞ্ঝাতাড়নার ন্যায় জনসমাজের এই সকল তীব্রতাড়না অকাতরে সহ্য করিয়া, সাধনপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

মধ্যযুগে আফ্রিকার পশ্চিমোপকূলের অত্যল্প অংশই ইউরোপের নিকট সুপরিচিত ছিল। হেনরী যখন সেই উপকূলভাগ অন্বেষণ করিবার আশায় পোত-প্রেরণের আয়োজন করেন, তখন জিব্রাল্টারের দক্ষিণে অধিক দূর পোত-চালনার সম্ভাবনা আছে, তাহা নাবিকদিগের সুপরিচিত ছিল না। তাহারা জানিত,—জিব্রাল্টারের দক্ষিণে ঘিগি পর্য্যন্ত নিরাপদে গমনাগমন করা যায়। তাহার দক্ষিণে বোজাডর অন্তরীপ। সেই সীমাই শেষ সীমা। তাহা অতিক্রম করিয়া জলপথে ভারতবর্ষে উপনীত হইবার আশায় এক দল জেনোয়া-নিবাসী সাহসী নাবিক ১২৯১ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা আর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। তাহাদের সাহস বাতুলতা-নামে পরিচিত হইয়াছিল; কাব্যে ইতিহাসে সেরূপ সাহস কেবল অবিমৃষ্যকারিতা বলিয়াই কীর্ত্তিত হইত। হেনরী সেই পথেই ভারতবর্ষে পোত-প্রেরণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। প্রচলিত জনশ্রুতি যে নিতান্ত অলীক, তাহা সপ্রমাণ করিতে না পারিলে, কেহই সে পথে ভারত-যাত্রায় সক্ষম হইত না। হেনরী সর্ব্বাগ্রে সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হেনরীর সুশিক্ষিত নাবিকবর্গ বোজাডর অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া বলে উপনীত হইল। ইউরোপের চিরসঞ্চিত ভ্রান্তসংস্কার দূর হইয়া গেল। বিষুব-রেখার নিকটবর্ত্তী হইলে যে ভস্ম হইবার আশঙ্কা নাই, সে কথাও জনসমাজে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। হেনরীর বাসনা সিদ্ধ হইল। ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিলেই যে ভারতযাত্রার জলপথ আবিষ্কৃত হইবে, তাহাতে সংশয় রহিল না। কেবল এই কার্য্য সাধন করিতে যত আবশ্যক, তত সময় হেনরীর নশ্বরদেহ ধরাধামে রহিল না। তাঁহার তিরোভাবে সমগ্র ইউরোপ ও তাঁহার প্রিয়তম জন্মভূমি হাহাকার করিয়া উঠিল। পুণ্যাশ্রমের সাগরসৈকতের তর্জ্জদ্বারে হেনরীর অলৌকিক আত্মত্যাগের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এক অভ্রংলিহ জয়স্তম্ভ অদ্যাপি মহাসাগরকল্লোলে প্রতিনিয়ত স্তূয়মান হইয়া সন্ন্যাসীর সম্মানরক্ষা করিতেছে।

* রাজকুমার হেনরীর তিরোভাবকাল-নির্ণয়ে এখনও নানা তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। জয়স্তম্ভের প্রমাণ-অনুসারে ১৪৬০ খৃষ্টাব্দই তাঁহার তিরোভাব-কাল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উত্তরাশা অন্তরীপ।

So strangely were right and wrong compounded by these pioneers of so called Christianity that the fifth part of the proceeds of the sale of human beings was granted to the Grand Master of the Order of Christ.—*Portuguese Discovery in Fifteenth Century.*

রাজকুমার হেন্‌রীর সমসাময়িক গোমেজ-ইয়ানেজ-ডি-অজুরারা এক জন সুনিপুণ ইতিহাস-লেখক বলিয়া সুপরিচিত। তিনি হেন্‌রীর গুণমুগ্ধ অনুরক্ত স্বদেশভক্ত খৃষ্টান লেখক। তাঁহার গ্রন্থে এই যুগের বিবিধ রহস্য সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে।

খৃষ্ট-ধর্ম্মাচার্য্য পোপ চতুর্থ ইউজিন এই সকল অভিনব আবিষ্কারবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া, হেন্‌রীকে আফ্রিকার ও আফ্রিকার পূর্ব্বাঞ্চলের সমগ্র রাজ্যে অধিকার দান করিয়াছিলেন। মুসলমান সম্রাট আপন সেনাপতি বা অমাত্যবর্গের উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে পৃথিবীর যে কোন অংশ দান করিতেন। সে দেশ স্বাধীন বা অনাবিষ্কৃত হইলেও দানের ব্যাঘাত হইত না। সম্রাটের দান প্রাপ্ত হইয়া সেনাপতি বা অমাত্যবর্গ সেই সকল নূতন রাজ্য জয় করিবার চেষ্টা করিতেন। জয় করিতে না পারিলেও তদ্দেশের অধিপতি বলিয়া আপনার উপাধিসংখ্যা বর্দ্ধিত করিবার ত্রুটি হইত না। ভারতবর্ষ বিজিত হইবার পূর্ব্বেই কুতবুদ্দীন ভারতসম্রাট-উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন; বঙ্গদেশে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই বক্তিয়ার খিলিজি "সনন্দ" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি কোন কোন ইংরাজ সেনাপতি স্বাধীন কান্দাহার রাজ্যের অধিপতি বলিয়া উপাধি লাভ করিয়া থাকেন। সেকালেও পর্ত্তুগালের রাজকুমার হেন্‌রী সমগ্র প্রাচ্যরাজ্যের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে পর্ত্তুগালের অধিবাসিবর্গের ধনলিপ্সা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা যে কোন উপায়ে ধনোপার্জ্জনের জন্য খৃষ্ট-ধর্ম্মের উদারনীতি অতল সাগর-জলে নিক্ষেপ করিয়া, দেশ-লুণ্ঠনে বহির্গত হইয়াছিল।

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের সন্ধানলাভ করিবামাত্র পর্ত্তুগালের ধর্ম্মোন্মত্ত নাবিকদলের অর্থোন্মাদ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা বিশেষ কোন পণ্যদ্রব্যের সন্ধান না পাইয়া, সে দেশের কৃষ্ণকায় বর্ব্বরগণকে ধৃত করিয়া স্বদেশে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিতে ও তদ্দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতে শিক্ষা

করিয়াছিল। এইরূপে ইতিহাসবিখ্যাত "দাস-ব্যবসায়ে"র সূত্রপাত হয়। এই ব্যবসায়ের লাভাংশের পঞ্চম ভাগ রাজকুমার হেন্‌রীকে প্রদান করিতে হইত। তাঁহার সমসাময়িক ইতিহাস লেখক ইহার উল্লেখ করিবার সময়ে হেন্‌রীর পক্ষসমর্থনের জন্য লিখিয়া গিয়াছেন, ক্রীতদাসগণ খৃষ্ট-ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনীত হইয়া পরিত্রাণের সুসমাচার প্রাপ্ত হইত।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পুরাকাল হইতে দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। তাহারা ধর্ম্মের আবরণে তাহাকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিত না। খৃষ্টান ইউরোপ "দাস-ব্যবসায়ে" প্রবৃত্ত হইবার সময়ে ধর্ম্মের ভাণের সৃষ্টি করিয়া অর্থোপার্জ্জনে লিপ্ত হইয়াছিল। ইহার ফল অল্পদিনেই ফলিতে আরম্ভ করিল। পর্ত্তুগালের অধিবাসিবর্গ ক্রীতদাসের হস্তে সমস্ত কৃষিক্ষেত্র সমর্পণ করিয়া দিগ্বিজয়ে ও অর্থান্বেষণে ভুবনভ্রমণে বহির্গত হইল। ধর্ম্মোন্মাদের সহিত ধনোন্মাদ মিলিত হইল; ধনাহরণের ছলকৌশলকেও ধর্ম্মানুমোদিত করিতে বাধ্য হইয়া খৃষ্টধর্ম্ম তাহার সমুচ্চ সোপান হইতে অধঃপতিত হইতে লাগিল। ধনের সঙ্গে সম্ভোগ-লালসা বিবর্দ্ধিত হইয়া, জনসমাজের চিত্ত বিকার উৎপাদিত করিয়া দিল। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যাহারা আত্মত্যাগে ভুবনবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা দেখিতে না দেখিতে সম্ভোগের ক্রীতদাস হইয়া জলে স্থলে রুদ্রমূর্ত্তিতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। হেন্‌রীর নশ্বর দেহ সমাধি-নিহিত হইল; তিনি যে উদ্দাম দিগ্বিজয়লালসা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা পর্ত্তুগালের অধিবাসিগণকে উত্তরোত্তর অধিক উন্মত্ত করিয়া তুলিতে লাগিল।

এই সময়ে হেন্‌রীর সুশিক্ষিত নাবিকগণ সমগ্র ইউরোপে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বনামখ্যাত কলম্বস্ পর্ত্তুগালে উপনীত হইয়া, হেন্‌রীর জনৈক প্রধান নাবিকের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, গোপনে পর্ত্তুগালের নৌ-বিদ্যালয়ের মানচিত্রাদির সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন। আটলাণ্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগে অনন্ত জলরাশি বর্ত্তমান থাকিয়া, ইউরোপের জনসমাজের নিকট অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিয়া পরিচিত ছিল। দক্ষিণভাগে পোতচালনা করিয়া রাজকুমার হেন্‌রী ইউরোপের কুসংস্কার দূর করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কলম্বস্ পশ্চিম দিকে সমুদ্রযাত্রা করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল, পশ্চিম সমুদ্রপারেই ভারতবর্ষ। পশ্চিম সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিলে নিশ্চয় স্থলভাগ প্রাপ্ত

হওয়া বাইবে,—এই বিশ্বাস তৎকালের ইউরোপীয় জনসাধারণের নিকট বাতুলতা বলিয়াই প্রতিভাত হইত। কলম্বসের সুযোগ্য পুত্র ফর্দ্দিনন্দ লিখিয়া গিয়াছেন,—পর্ত্তুগালে অবস্থান করিবার সময়েই তাঁহার পিতার মনে এই বিশ্বাস প্রথমে উদিত হইয়াছিল। মার্কোপোলো স্থলপথে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া চীনদেশে আসিয়া সমুদ্রতীরে উপনীত হইয়াছিলেন। পর্ত্তুগাল আসিয়া ইউরোপের স্থলভাগের শেষ হইয়া সমুদ্রের আরম্ভ দেখিয়া কলম্বস্ ভাবিয়াছিলেন,—পর্ত্তুগাল হইতে পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া সমুদ্র পার হইতে পারিলেই এসিয়াখণ্ডে উপনীত হইবেন।

কলম্বস্ এই বিপদ-সংকুল সমুদ্রযাত্রার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া, পর্ত্তুগালের অধীশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। দ্বিতীয় জন্ নামক নরপতি তখন পর্ত্তুগালের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন। তাঁহার অমাত্যবর্গ নিরতিশয় দীর্ঘসূত্রী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা কলম্বসের সমুদ্রযাত্রার সংকল্প শ্রবণগত হইয়া তাহা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ বাতুলতা বলিয়া, প্রত্যাখ্যান করিলেন। নরপতি স্বয়ং কোনরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন না। তিনি তখন আফ্রিকা অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইবার সম্ভাবনায় আশান্বিত হইয়া, পশ্চিম সমুদ্রে পোত-প্রেরণের প্রয়োজন স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিয়া সময় নষ্ট করিতে লাগিলেন। পশ্চিম সমুদ্রপথে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া আদৌ সম্ভব কি না, গোপনে গোপনে তাহারও পরীক্ষাকার্য্য আরব্ধ হইল। সে পরীক্ষা সফল হইল না। নাবিকগণ ঝঞ্ঝাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কলম্বস্ তখন পর্ত্তুগাল পরিত্যাগ করিয়া স্পেন্-রাজ্যে গমন করিলেন। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বস্ স্পেনরাজ্যের প্রতিনিধি হইয়া আমেরিকা-আবিষ্কার সুসম্পন্ন করিলেন। তাহা তখন ভারতবর্ষ নামেই পরিচিত হইল, অদ্যাপি তাহা পশ্চিম ভারত বলিয়া কখন কখন কথিত হইয়া থাকে। এই আবিষ্কার-বার্ত্তা পর্ত্তুগালের জনসমাজকে বিচলিত করিয়া তুলিল। আফ্রিকা অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইবার সহজ পথ শীঘ্র আবিষ্কৃত না হইলে, ভারতবাণিজ্য যে স্পেনরাজ্যের করতলগত হইবে, এই চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিল।

"It was in Portugal that the Admiral began to surmise that if the Portuguese sailed so far south, one might also sail westwards and find land in that direction.

আফ্রিকার কোন অজ্ঞাত প্রদেশে একটি খৃষ্টান জনপদ বর্ত্তমান থাকিবার প্রবল জনশ্রুতি সমগ্র ইউরোপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে জনপদের খৃষ্টভক্ত নরপতির নাম "প্রেষ্টার জন"। ইহার অধিক আর কোন কথা জানিবার উপায় ছিল না। রাজকুমার হেন্‌রী এই খৃষ্টান জনপদের সন্ধানলাভের জন্য লালায়িত ছিলেন। সন্ধানলাভের পূর্ব্বেই রাজকুমার হেন্‌রীর আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু তাঁহার সে সাধু সংকল্প পর্ত্তুগাল-রাজ-পরিত্যাগ করিলেন না। দ্বিতীয় জন সিংহাসনারূঢ় হইবার পর হইতেই হেন্‌রীর এই শুভ সংকল্পের সহায় হইয়াছিলেন। হেন্‌রীর স্বর্গারোহণের পর, জল স্থল উভয় পথেই সন্ধান-চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইল।

১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বারথোলেমু ডায়া নামক নাবিকবর দক্ষিণ সমুদ্রপথে প্রেরিত হইলেন। মিশরপথে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার জন্য কোভিল্‌হাম ও পয়বা নামক স্থলপর্য্যটকদ্বয় বহির্গত হইলেন। ডায়া যখন জলপথে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময়ে এই দুই স্থলপর্য্যটক ভূমধ্যসাগর উত্তীর্ণ হইয়া লোহিতসাগরতীরের সুবিখ্যাত এডেন্ বন্দরে উপনীত হইলেন। কোভিল্‌হাম তথা হইতে একখানি আরবীয় অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন; তাঁহার সহচর লোহিত-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া আবিসিনিয় রাজ্যে গমন করিলেন।

কোভিল্‌হাম ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলের বিবিধ বন্দর পরিদর্শন করিয়া, তথা হইতে আফ্রিকার পূর্ব্বদক্ষিণ "সোফালা" বন্দরে উপনীত হইয়াছিলেন। সেকালে সোফালা হইতে মদাগাস্কর দ্বীপ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে যাতায়াতের সমুদ্রপথ সুপরিচিত ছিল। এই পথে ভারতবাণিজ্য আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলের বিবিধ জনপদে পরিচালিত হইত। কোভিল্‌হাম্ বুঝিলেন,—আফ্রিকার দক্ষিণসীমা অতিক্রম করিয়া "সোফালা" বন্দরে উপনীত হইবার জলপথ আবিষ্কৃত হইলেই, পর্ত্তুগালের পক্ষে ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কারের চেষ্টা সফল হইবে। তিনি এই সুসমাচার বহন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে মিশরে উপনীত হইয়া সহচরের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। কোভিল্‌হামের স্বদেশযাত্রা স্থগিত হইল; তিনি সমস্ত সমাচার লিপিবদ্ধ করিয়া, স্বদেশে প্রেরণ করিলেন; এবং আবিসিনীয় রাজ্যে গমন করিবার জন্য পুনরায় পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কোভিল্‌হামই ভারতবাণিজ্যের অভিনব জলপথের প্রকৃত আবিষ্কার-কর্ত্তা। কিন্তু তিনি আবিসিনীয় রাজ্যে

বিবাহ করিয়া, তদ্দেশেই জীবনক্ষয় করিয়া, ইতিহাসে অপরিচিত হইয়া রহিয়াছেন।

কোভিল্‌হামের ভ্রমণবৃত্তান্ত পর্ত্তুগালে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই নাবিকবর ডায়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি ক্রমাগত অকূলোদ্ভবে দক্ষিণাভিমুখে পোতচালনা করিতে করিতে আফ্রিকার দক্ষিণসীমা-সংলগ্ন সমুদ্রপথে প্রবল ঝটিকায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অর্ণবপোত সে ঝটিকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, বহুদূরে নীত হইয়াছিল। ঝটিকা-শেষে নাবিকবর সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন,—তাঁহার অর্ণবপোত আফ্রিকার দক্ষিণসীমা অতিক্রম করিয়া আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলের ভারতসাগরে উপনীত হইয়াছে। তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। কিন্তু সে আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারিল না। নাবিকগণ অশান্ত হইয়া উঠিল। অজ্ঞাত সমুদ্রপথে বহুদূরে আসিয়া ঝটিকাতাড়নায় তাহাদের জীবনের আশা তিরোহিত হইয়াছিল। তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অগত্যা ভারতবর্ষে উপনীত হইবার গৌরবলাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া নাবিকবর ডায়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি ঝটিকাতাড়িত হইয়া, আফ্রিকার দক্ষিণসীমার "ঝটিকাতরীপ" নামকরণ করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগালের নরপতি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, ভারত-বাণিজ্যের আবিষ্কৃত হইবার আশার সন্ধানলাভ করিয়া, তাহাকেই "উত্তমাশা অন্তরীপ" বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন।

কোভিল্‌হামের ভ্রমণবৃত্তান্ত পর্ত্তুগালে উপনীত হইবামাত্র জনসাধারণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। ভারতবর্ষের গমনাগমনের অভিনব জলপথ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি রহিল না। কোভিল্‌হাম যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহাই ভারতযাত্রার পথ-প্রদর্শক হইল। তিনি লিখিয়াছিলেন, তিনি পেদেলের উপকূল পর্য্যন্ত যে সকল অর্ণবপোত প্রেরিত হইয়া থাকে, তাহারা অধ্যবসায়ের সহিত দক্ষিণে অগ্রসর হইলেই আফ্রিকার দক্ষিণসীমা অতিক্রম করিয়া, ভারতসাগরে উপনীত হইবে। তথায় "সোফালা" বন্দরের সন্ধান করিয়া লইতে পারিলেই, ভারতবর্ষে উপনীত হইতে বিলম্ব ঘটিবে না। এই সুসমাচারের পর্ত্তুগাল ভারতযাত্রার যথাযোগ্য আয়োজন করিবার জন্য উৎসাহিত হইল। রাজকুমার হেন্‌রীর অসাধারণ আত্মত্যাগ সফল হইল;—পর্ত্তুগালের অকূলো-

ভর নাবিকস্বর্গের দীর্ঘ অধ্যবসায় জয়যুক্ত হইল;—ইউরোপের নব-জীবন-লাভের এই প্রথম প্রভাতে, এসিয়ার ভাগ্যবিপর্য্যয় সংঘটিত হইবার সূত্রপাত হইল। "উত্তমাশা অন্তরীপ" ইউরোপের ও এসিয়ার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছে; তাহার কথা এখন বিদ্যালয়ের বালকবৃন্দেরও কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে!

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ।

এখনই আমাদিগের হস্ত ও পদের অঙ্গুলি সকল যেরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিলে, পরিণাম ভাবিয়া কিছু ব্যাকুল হইবার কারণ উপস্থিত হয়। একবার কল্পনা করুন যে, আমাদিগের পদের অঙ্গুলি নাই; কেবল প্রদতল দ্বারা পদের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে! তাহা হইলে কিরূপ বোধ হয়? আমার মনে ত একটা আতঙ্কের সঞ্চার হয়। মনে হয়, যেন প্রত্যেক পদক্ষেপেই পড়িয়া যাইতেছি; অন্ততঃ পিচ্ছিল স্থানে যে কিরূপে চলিব, তাহা সম্পাদকমহাশয়ের সহিত পরামর্শ না করিয়া, আমি কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছি না! কিন্তু এই অঙ্গুলিহীন কাল্পনিক অবস্থাই বোধ হয় আমাদিগের যথার্থ পরিণাম; আর নানা কারণে সেই দিকেই আমাদিগের চরণ অগ্রসর হইতেছে, ইহা বিলক্ষণ বুঝা যায়।

আমাদিগের অব্যবহিত নিম্নতন জীবগণের হস্ত ও পদের অঙ্গুলির সহিত আমাদের কর-চরণের অঙ্গুলির তুলনা করুন। সেই অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের হনুমদ্বৃন্দের পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠগুলি অন্যান্য অঙ্গুলি হইতে একটু ব্যবধানে স্থিত, এবং পদের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম কোণ থাকে যথা ∠। অর্থাৎ, আমাদের হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ যেমন তর্জ্জনীর সহিত সূক্ষ্ম কোণে ও একটু ব্যবধানে অবস্থিত, তাহাদিগের পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অবস্থানও সেইরূপ। কিন্তু আমাদিগের পদাঙ্গুষ্ঠের পরিবর্ত্তন দেখুন। উহা পদের তর্জ্জনীর দিকে অনেকটা সরিয়া আসিয়াছে।—এখন আর ব্যবধান নাই বলিলেই হয়। তর্জ্জনীর সহিত ঐ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের আর সূক্ষ্ম কোণ নাই, এখন প্রায় সমান্তরাল-

ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। বানরাদি জীবের ন্যায় পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আমরা আর পার্শ্বের দিকে বেশী ব্যবহার করিতে পারি না, কিংবা উহা দ্বারা জোর করিয়া কোনও দ্রব্য ধরিতে পারি না। উহার সঞ্চালিত হইবার শক্তি ও অন্য বস্তু ধরিবার বলের অনেক হ্রাস হইয়াছে। আমরা নির্ভয়ে সম্পূর্ণভাবে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারি। সুতরাং পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বানরগণের ন্যায় ফাঁক করিয়া দিয়া ভূমিতে জোর করিয়া দাঁড়াইবার ও সেই ভাবে দেহের ভার-কেন্দ্র ঠিক রাখিবার আবশ্যক হয় না।

বিড়ালাদি জীবগণ উঠিয়া দাঁড়ায় না। আমাদিগের ন্যায় তাহাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অস্থি নাই। কেবল তাহার স্থলবর্ত্তী নখমাত্র আছে। অন্য নখের সহিত তাহার সংস্রব নাই। তাহা ভারবহনও করে না; কেবল অস্ত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। তাহারা পরে, বানরাদি পশু; যাহারা কখন কখন দাঁড়ায়, কিন্তু ভাল করিয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইতে পারে না। তাহাদিগের দেহ-ভার বহন করিবার জন্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অন্যান্য অঙ্গুলি হইতে একটু ব্যবধানে ও পদের সহিত সরলভাবে অর্থাৎ সূক্ষ্ম কোণে থাকা আবশ্যক। কারণ, তাহা হইলে তাহাদের ভার বহিবার জন্য আশ্রয়ের স্থানের বিস্তৃতি হয়; তাহাতে ভার-কেন্দ্র ঐ আশ্রয়ের বাহিরে যায় না। গণিতজ্ঞ জানেন যে, এরূপ না হইলে, ঐ সকল জীব পড়িয়া যাইত, দাঁড়াইতে পারিত না।

সর্ব্বশেষে মানুষ; নির্ভয়ে উঠিয়া দাঁড়ায়। তাহার পদের পেশী ও শিরাতে শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে। তাহার বাহু, স্কন্ধ ও মস্তকের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং তাহার আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বিস্তার করিয়া দাঁড়াইবার আবশ্যক হয় না। সেই জন্য মানবের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অন্যান্য অঙ্গুলির নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তবেই দেখা গেল যে, জীবের প্রয়োজনবশতঃ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অন্যান্য অঙ্গুলির নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সূক্ষ্ম কোণে সরিয়া গিয়াছিল; পরে ঘুরিয়া আসিয়া সমান্তরালভাবে তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। উহার বলক্ষয়ও ঘটিয়াছে। কারণ, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা আমাদিগের আর কিছুই ধরিবার আবশ্যক না হওয়ায় উহা ক্রমে দুর্ব্বল হইয়াছে। কিন্তু কেবল বলক্ষয় নহে, উহার অঙ্গক্ষয়ও ঘটিয়াছে। আমাদিগের পদের অথবা হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলিগুলির প্রত্যেকের তিন তিনটি অংশ আছে। অর্থাৎ, যে ভাগ অঙ্গুলিনামে খ্যাত, তাহার প্রত্যেকটিতে তিনটি সন্ধি (গাঁইট) ও তিনটি ভাগ বা অংশ আছে। কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুলির তাহা নহে; উহার দুইটি সন্ধি (গাঁইট)

ও দুইটি ভাগ বা অংশ আছে। সুতরাং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একটিকে হারাইয়াছেন। পদতল এখন পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কুব্জ অথবা 'খাল' হইয়াছে। আর পদপৃষ্ঠে অঙ্গুলির মূলের সহিত সংলগ্ন যে সকল অস্থি রহিয়াছে, যাহাদিগকে গূঢ়াঙ্গুলি বলা যাইতে পারে, (Metatarsus) তাহা প্রায় পূর্ব্ববৎ থাকিলেও, প্রকৃত অঙ্গুলি ভাগের খণ্ডাস্থি সকল মধ্যস্থলে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। শেষে তাহার কি অবস্থা হইবে, তাহা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দশা দেখিলে সহজেই অনুমিত হইতে পারে। অঙ্কিত চিত্রে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ১ ও ২ এই দুই খণ্ড; অন্যান্য অঙ্গুলির ১।২।৩ প্রত্যেকের এই তিনটি খণ্ড। গূঢ়াঙ্গুলির সহিত গণনা করিলে দেখা যায়, অন্যান্য অঙ্গুলির ৪।৪ ভাগ বা অংশ, কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অংশ তিনটি মাত্র।

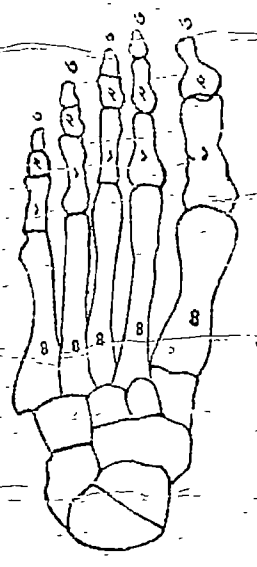

বাম পদ।

সুতরাং বৃদ্ধ একটি হারাইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃদ্ধের যেমন একটি অঙ্গ গিয়াছে, তেমনই আবার স্থূলতায় তিনি অত্যন্ত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন! হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির তুলনায় অথবা হস্তপদের অন্যান্য অঙ্গুলির তুলনায় পদাঙ্গুষ্ঠ অত্যন্ত স্থূল হইয়াছে। আর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিও একটি অংশ খোয়াইয়াছেন, কিন্তু তিনি অতিরিক্ত স্ফীত না হইলেও, অপর বৃদ্ধের সমব্যবসায়ী বলিয়া, এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই চিত্রের আর এক ভাগ দেখুন। সকল খণ্ডাস্থিরই (Phlanges) আগা ও গোড়া মোটা ও মাঝখানটা সরু হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাগ্রভাগের খণ্ডাস্থিগুলি অর্থাৎ (৩) চিহ্নিত খণ্ড সকল অতীব ক্ষুদ্র হইয়াছে, এবং মধ্যভাগ এত সরু হইয়াছে যে, এখনই খসিয়া পড়িবার আশঙ্কা হইতেছে। গূঢ়াঙ্গুলিই কিছু দীর্ঘ ও সুস্থকায়। তাহাও বড় জোর করিয়া বলা যায় না। যাহা হউক, তাহাই যেন ধরিয়া লওয়া গেল। কিন্তু যেগুলি অঙ্গুলি নামে খ্যাত, সেগুলির প্রত্যেক খণ্ডাস্থি ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ; এবং হস্তের অঙ্গুলির খণ্ডাস্থির সহিত তুলনায় দেখা যায়, পদের তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা

অঙ্গুলির খণ্ডাস্থি নিতান্তই ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। অথচ এত বড় দেহের ভারটা পদযুগলকেই বহন করিতে হয়। ব্যাপারটা গুরুতর নয় কি? তাহার পর পদের যিনি কনিষ্ঠ অঙ্গুলি, একবার তাঁহার অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে, অশ্রুসংবরণ করা যায় না। তিনি এত ক্ষুদ্র যে, তাঁহার তিনটি খণ্ডাস্থি এক রকম তাঁহাকে জবাব দিয়াছে, বলিলেও চলে। তাহারা ক্ষুদ্রতম ও ক্ষীণতম। কনিষ্ঠের নড়িবার চড়িবার কিছুমাত্র শক্তি নাই। তিনি এখন কেবল না থাকার মত কোনও রূপে দেহধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার পেশীগুলি প্রায় কোনও কাজই করে না। সকল অঙ্গুলিরই পেশীগুলি মৃত-কল্প। সুতরাং অঙ্গুলিগুলির পরিণাম ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। অস্থিগুলি ক্ষুদ্র হইতেছে; তাহাদিগের মধ্যভাগ ক্ষীণ হইতে হইতে প্রায় ধসিয়া পড়িবার উপক্রম ঘটিয়াছে। পেশীগুলি আর তেমন কাজ করে না। বৃদ্ধ যিনি, তিনি ত একাংশ হারাইয়াছেন; কনিষ্ঠ মুমূর্ষুর অপেক্ষাও সঙ্কটাপন্ন। এখন প্রশ্ন এই, আমরা কি অঙ্গুলি হীন-পদতল-বিশিষ্ট জীব হইতে চলিলাম? তাহা হইলে শ্রীচরণকমল যে বড় কদাকার হইয়া উঠিবে! মুখের অপেক্ষা নারীর পদাঙ্গুলির পরিবর্ত্তন আরও বিস্ময়াবহ। এই দুর্দ্দিনে একমাত্র আশার স্থল পদের তর্জ্জনী। তিনি এখনও আর সকলের অপেক্ষা অবিকৃত আছেন। ইনি আরও বহু দিন টিকিয়া থাকিতে পারিবেন, এমন ভরসাও করা যায়। তর্জ্জনীর অদৃষ্ট যদি এইরূপ প্রসন্ন থাকে, তাহা হইলে হয় ত একবারে অঙ্গুলিহীন না হইতেও পারি। অন্ততঃ তর্জ্জনীটি থাকিতে পারে। সেই ভবিষ্যতের চরণ দেখিতে কতকটা এইরূপ হইতে পারে। * কিন্তু ইতোমধ্যেই পদশক্র ট্রাম, বাইসিকল, মোটর প্রভৃতি যেরূপ সাংঘাতিক দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, নিশ্চয়ই পায়ের কপাল ভাঙ্গিয়াছে! তর্জ্জনীও যদি অন্যান্য অঙ্গুলির গতি অবলম্বন করে, তাহাতেও বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

ভবিষ্যতের বাম পদ।

* ডাক্তার ওয়েডারকোম আর একটু আশা দিয়াছেন। তিনি বিবেচনা করেন যে, তর্জ্জনীর সহিত বৃদ্ধাটিও বা থাকিতে পারে। "It might therefore be predicted of the human foot that it may end by possessing only two two-jointed toes, the great toe and its neighbour."—*Weidershiem's structure of man.* Translated by *Bernard* p. 90.

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নিতান্ত অনুন্নত জীবগণের পদের ব্যবহার প্রধানতঃ ভ্রমণকালে দেহ-বহন। কিন্তু বানরাদির পদ, ভ্রমণ ও বস্তুগ্রহণ এই উভয় কার্য্যই সম্পাদন করে; আবার, মানুষের পা বস্তুগ্রহণ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভ্রমণ কার্য্যেই ব্যবহৃত হইতেছে। সুতরাং প্রয়োজনভেদে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠও নানা-অবস্থাপন্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ বিড়ালাদি জীবের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অস্থি নাই, কেবল স্বল্পাগ্রবক্র নখমাত্র আছে, বানরাদির বৃদ্ধাঙ্গুলির অস্থি হইয়াছে, কিন্তু তাহা তর্জ্জনীর সহিত সূক্ষ্ম কোণে অবস্থিত। মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুলি উহার সহিত সমান্তরালভাবে স্থিত। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের সহিত পেশী সকলও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মানুষের পা প্রধানতঃ ভ্রমণ কার্য্যেই ব্যবহৃত হওয়ায়, পায়ের নলী-সংযুক্ত পেশী সকল দৃঢ় হইয়াছে। কিন্তু পায়ের অঙ্গুলি বস্তু-গ্রহণ কার্য্য পরিত্যাগ করায়, অঙ্গুলি-সংযুক্ত পেশী সকল ক্ষীণ অথবা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; কোনটি বা অঙ্গুলির সংযোগ ত্যাগ করিয়াছে। * যে সকল পেশী বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহারা ক্ষীণও হইয়াছে; এবং যে সকল পেশী অঙ্গুলির সংযোগ ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ক্রমে ঊর্দ্ধগামী হওয়ায়, অঙ্গুলির সঞ্চালন কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়াছে। সুতরাং ইহা সহজেই বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, কালক্রমে অঙ্গুলিও অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। দুর্ব্বল, ক্ষীণ, ভগ্ন ও লুপ্ত হওয়া কেবল কালসাপেক্ষ, এইমাত্র।

তাহার পর, হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের আর এক অবস্থা কখনও-কখনও দেখিতে পাওয়া যায়। উহার খণ্ডাস্থি যেন দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রস্তুত হয়। ঐ দুই খণ্ড অস্থি যেন একত্র জুড়িয়া দিলে একটি গোটা অঙ্গুষ্ঠ হয়। ইহাতে উভয় বৃদ্ধেরই বলহানি ঘটে, এবং বর্ত্তমান অবস্থা লোপ পাইবার

* A further consequence of the transformation of the hind limb into a supporting and ambulatory organ is that some of the flexor muscles which originally ran down without interruption to the sole of the foot have become interrupted at the prominentia calcanei by the dorsal flexion entailed * * * The short flexor has shifted its point of origin further and further down, till at last, on the acquisition of the upright gait, it has reached the calcareal tuberosity. * * * At present it shows in many ways, e, g, in the variaton of its terminal tendors and the frequent absence of that to the fifth toe, evidences of a retrogressive tendency.

Structure of Man. p. 110. III.

সাহায্য করে। ইহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উন্নতির পরিজ্ঞাপক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কখনও কখনও বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্বে পৃথক আর একটি অঙ্গুলি হয়। ইহা হাতেরই হইয়া থাকে। তজ্জন্যও বৃদ্ধের বলক্ষয় ও অবনতির সূত্রপাত হয়।

পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির দুর্দ্দশার কথা বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। ইহার অস্থি, পেশী, সকলই ইহাকে অধোগতির দিকে লইয়া যাইতেছে। এই পরিবর্ত্তন আমাদিগের সমক্ষে ঘটিতেছে; অথচ ইহা আমরা লক্ষ্য করিতেছি না। এই অঙ্গুলি কখনও কখনও নিকটবর্ত্তী অঙ্গুলির সহিত মাংস ও চর্ম্ম দ্বারা জড়িত হয়। তাহাতে উহার ক্ষীণ অস্তিত্ব ক্ষীণতর হয়। উহার কার্য্য ও চেষ্টা আরও পরায়ত্ত হইয়া পড়ে। পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠও কখনও কখনও তর্জ্জনীর সহিত চর্ম্ম দ্বারা সংযুক্ত হইয়া যায়। তাহাতে বৃদ্ধেরও স্বাধীন কার্য্য ও চেষ্টার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ইহাকেও একটি অবনতিসূচক ঘটনা বলিতে হইবে। সুতরাং নানা কারণে এ কথা একরূপ নিশ্চিত হইতেছে যে, অঙ্গুলি সকলের অন্য কারণে উন্নতিবিধান না হইলে, ইহাদিগের লোপ অবশ্যম্ভাবী। ডাক্তার ওয়েডারকোম্ব ও অধ্যাপক টমসন প্রভৃতি জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এখনও একবারে আশাশূন্য হন নাই। ইহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যখন আমাদিগের পদ আর বানরাদির পদের ন্যায় বস্তুগ্রহণ কার্য্য না করাতেই প্রধানতঃ এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তখন বস্তু-গ্রহণ কার্য্যে আবার পায়ের অঙ্গুলি সকলকে নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেই, ক্রমে উন্নতির আশা করা যাইতে পারে। জাপানী স্ত্রীলোকগণ এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। জাপানীগণ সকল বিষয়েই জগৎকে স্তম্ভিত করিতেছেন। অঙ্গুলিগণের পুনর্জ্জীবনপ্রাপ্তিও কি তাঁহাদিগের দ্বারাই সম্পন্ন হইবে? জাপানী নারী শেলাই করিবার সময় পদের অঙ্গুলি সুতা টানা কার্য্যে বিলক্ষণ ব্যবহার করিতে পারেন; পায়ের অঙ্গুলি দ্বারা বেশ চিমটি কাটিতে পারেন। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়ৎপরিমাণে সঞ্চালন করিতে ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু জোর ধরিতে পারেন। এইরূপে ক্রমে পদাঙ্গুলির

* The use made by the Japanese of the great toe as a thumb is very remarkable. It can be independently moved and strogly pressed against the second toe that even small objects can be firmly held between them. A woman when sewing may hold the stuff with her

অবহার-বৃদ্ধির সহিত এই দুর্দ্দশারও অবসান হইতে পারে। অধুনা ব্যবসার-ভেদে মনুষ্যের পদাঙ্গুলির প্রয়োজন বাড়িতেছে, এবং ক্রমে বাড়িবে, বোধ হইতেছে। এই কঠিন জীবন-সংগ্রামের যুগে শুধু হাতে বোধ করি আর কুলাইবে না। সুতরাং পাঠকগণ, বিশেষতঃ অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত-চরণা পদারবিন্দ-গৌরবময়ী পাঠিকাদিগের বিশেষ উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই! আমি কেবল ভয় দেখাইতে আসি নাই, কিয়ৎপরিমাণে আশাও দিতে পারি। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদের অধিক দোষ। কারণ, পদাঙ্গুলির অ-ব্যবহার তাঁহাদিগের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহাদিগের প্রকৃতি স্থিতিশীল; সুতরাং পুরুষের অপেক্ষা তাঁহাদিগের অঙ্গুলি সকল খর্ব্ব ও ক্ষীণ। পুরুষের অঙ্গুলি বড় ও সবল, তাঁহাদিগের ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল। যদি সত্যই কখনও অঙ্গুলিগুলির উচ্ছেদ ঘটে, তবে তাঁহারাই সে জন্য দায়ী।

শ্রীশশধর রায়।

স্মৃতি।

১

সমস্ত দিন খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গম্ভীর, নিস্তব্ধ। আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া 'সিভিল' সাহেবের গম্ভীর মুখশ্রীর সহিত আকাশের গাম্ভীর্য্যের তুলনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে খাস্‌কামরা হইতে আমার ডাক পড়িল।

অনেক চেষ্টায় চল্লিশ টাকা মাহিনার চাকরীটি জুটাইয়াছিলাম। সে চেষ্টার বর্ণনা করিতে গেলে, কাহারও ধৈর্য্য থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না। এত কষ্টে যে চাকরীরত্ন লাভ করিয়াছি, নবীনমেঘে বিদ্যুদ্বিকাশবৎ সিভিল সাহেবের মেঘাচ্ছন্ন বদনে দন্তপংক্তির বিকাশ দেখিলে, মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই 'সাত রাজার ধন এক মাণিক'কেও বিসর্জ্জন দিবার স্পৃহা প্রবল হইয়া

toes. * * * and can pinch effectively with them. Balz. The bodily characteristics of the Japanese quoted by wendustein.

* Structure of Man, p. 89

উঠিত। তথাপি পোষ্যবর্গের কথা স্মরণ করিয়া, বহুকষ্টে আত্মসংযম করিতাম।

আমি দরিদ্রের সন্তান। পিতা ধনীর পুত্র হইয়াও ভাগ্যদোষে আজ নিঃস্ব। আমার বিদ্যালয়ের বেতনের জন্য, আমার একখানি পাঠ্যপুস্তকের জন্য বাবা যখন শ্যামবাজারে দ্বারে দ্বারে ফিরিতেন, তখন তাঁহার সেই ক্লিষ্ট মুখশ্রী দেখিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, যদি বাঁচিয়া থাকি, পরিবারের এ দুঃখ দূর করিব। সেই প্রতিজ্ঞা চল্লিশ টাকার চাকরীটিতে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু 'অদৃষ্ট' বলিয়া একটা কথা আছে। স্মৃতি ক্যাম্বেল হইতে বাহির হইয়াই বিনা কষ্টে পঞ্চাশ মুদ্রার চাকরীটি লাভ করিয়াছিল। এই দুর্লভ চাকরী ও তদুপরি অতিদুর্লভ সিভিল সাহেবের অনুগ্রহ, উভয়ই তাহার 'অদৃষ্টে' ছিল বলিতে হইবে। আমিও প্রায়ই যাহা লাভ করিতাম, তাহাও আমার 'অদৃষ্ট'। অতএব অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিয়া পোর্টম্যাণ্টো হইতে আর্য্যমিশনের গীতাখানি বাহির করিয়া মনকে নির্ব্বিকার করিবার চেষ্টা করিতাম। তাহার ফলে, মনের বিকার উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিত। আজ তাহা বিষম-বিকারে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে, এমন সময় খাস্ কামরার আহ্বান আমার নিকট উপস্থিত হইল।

দেখিলাম, সাহেবের গলায় গলাবন্ধ বেষ্টিত হইয়াছে, এবং পদতলে ফোমেণ্ট হইতেছে। এ দৃশ্য আমার চক্ষে নিতান্ত নূতন নহে। যদি এই দোরস্তর বর্ষার সময়ও অসুখ না হয়, তবে বিধাতার অসুখ সৃষ্টিটাই মিথ্যা হইয়া যায়। অতএব বর্ষা ও সিভিল সাহেবের পীড়া ও এ অধীনের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ, এ সমস্তই পঠিত পুস্তকের চিরপরিচিত পংক্তির মত পূর্ব্ব হইতেই আমার বিদিত ছিল। সুতরাং ব্যাপার বুঝিতে অধিক বিলম্ব ঘটিল না।

আমার প্রভু নাকের উপর হইতে চশমাখানি একটু ঊর্দ্ধে তুলিয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, স্বরে ও দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ কোমলতা-প্রকাশের জন্য অনর্থক চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—"ডাক্তার! এই পত্র পড়িয়া দেখ। কেস্ বড় কঠিন। মিস্ সেনকে লইয়া শীঘ্র যাও, বিলম্ব করিও না; আমার শরীর যে নিতান্ত অসুস্থ, এ কথাও জানাইও। এরূপ অসুস্থ শরীরে বাহিরের ঠাণ্ডা লাগিলে নিউমোনিয়া হইতে পারে, এ জন্য আজ আমি যাইতে পারিলাম না।"

স্মৃতির সঙ্গে 'কলে' যাইবার সুযোগ পরিত্যাগ ডাক্তার সাহেবের পক্ষে এই প্রথম! তাই আমার মনে হইল, আজিকার অসুস্থতার মূলে কিঞ্চিৎ সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে। যাহা হউক, কালবিলম্ব না করিয়া স্মৃতির সন্ধানে চলিলাম।

হাঁসপাতালের অতি নিকটেই স্মৃতির আবাস। স্মৃতির এক জন দাসী ছিল, কিন্তু শনিবারের সন্ধ্যায় কখনই তাহার উদ্দেশ পাওয়া যাইত না। দুই একবার ঘণ্টা বাজাইয়াও যখন কোনও উত্তর পাইলাম না, তখন আর অধিক বিলম্ব করা সঙ্গত মনে না করিয়া, আমি পর্দা ঠেলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম।

স্মৃতি নতজানু হইয়া কার্পেটের উপর বসিয়া ছিল। হাত দু'খানি অঞ্জলিবদ্ধ, দৃষ্টি ঊর্দ্ধে, চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। আমার উপস্থিতি সে বুঝিতেও পারিল না।

লোকের সঙ্গে লোকের সর্ব্বদাই দেখাশুনা ও আলাপ হয়, তথাপি কেহ কাহারও পরিচয় পায় না। এতদিন আমি স্মৃতিকে কেবল এক জন ধাত্রী বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু আজ তাহার নূতন পরিচয় পাইলাম।

২

বর্ষা ও ডাক্তার সাহেবের অসুখ বাড়িয়াই চলিল; আমাকে ও স্মৃতিকে তিন রাত্রি রোগীর কক্ষে রাত্রিজাগরণ করিতে হইল।

তিন দিনের পর আকাশ মেঘমুক্ত হইল। সূর্য্যের প্রসন্ন মুখচ্ছবি প্রকাশ পাইল। সূর্য্যের দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল, একটা দীর্ঘ সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে যেন সহসা জাগিয়া উঠিলাম। এই তিন দিনে জগতে যেন কতই পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, যেন এই তিন রাত্রির মধ্যে আমার নীরস জীবনের পরিবর্ত্তে নূতন জন্ম লাভ করিয়াছি; পুরাতন জীবনের সহিত আর কোনও মতেই তাহার মিল হইতেছে না।

ডায়েরী খুলিবামাত্র একখানি অর্দ্ধলিখিত পত্রে আমার দৃষ্টি পতিত হইল। তিন দিন পূর্ব্বে পত্রখানি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষ করিতে পারি নাই। পাঁচ মাস পূর্ব্বে আমি তিন দিনের ছুটীতে বাড়ী গিয়া বিবাহ করিয়া আসিয়াছিলাম। পত্রখানি আমার নববিবাহিতা পত্নীর প্রতি প্রথম সম্ভাষণ। ডায়েরী হইতে বাহির করিয়া পত্রখানি একবার পড়িয়া দেখিলাম, তাহার পর দেশলাই জ্বালিয়া তাহার অগ্নিকৃত্য সম্পন্ন করিলাম।

মন নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। মনের অস্থিরাবস্থায় পাদচারণটা নিতান্ত স্বাভাবিক। আমি ছাতে উঠিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

নানারূপ তত্ত্বকথার মীমাংসা করিতে করিতে ক্রমশঃ তন্ময় হইয়া পড়িলাম। সহসা আমার দৃষ্টি নিম্নাভিমুখী হইয়া পদযুগলকে যেন আকর্ষণ করিয়া বাগানের দিকে লইয়া গেল।

৩

স্মৃতি ঝাউগাছের তলায় দাড়াইয়া ছিল। তিন রাত্রি জাগরণের পরও এমন নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে যে তাহার শয়নকক্ষ ত্যাগ করিয়া ঝাউগাছের তলায় আসিয়া দাড়াইবার ইচ্ছা হইয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ হইল।

স্মৃতিরও সেইরূপ আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু বোধ হইল, তাহার মনে বিস্ময় অপেক্ষা আনন্দের মাত্রাটাই অধিক।

ডাক্তার সাহেব সময়ে অসময়ে স্মৃতির সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করিতেন, স্মৃতিকে তখন বড়ই অল্পভাষিণী বলিয়া বোধ হইত। আমি পূর্ব্বে কখনও তাহার সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করি নাই, দূর হইতে উভয়ের সম্ভাষণ দেখিয়া পাশ কাটাইয়া সরিয়া যাইতাম। কিন্তু এই তিন দিনে বুঝিয়াছিলাম, স্মৃতি উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই অনর্গল বকিয়া যাইতে পারে।

স্মৃতি বলিল, "আমার বাবার সমাধির উপর ঠিক্ এইরকম একটি ঝাউগাছ আছে। এই ঝাউগাছটি দেখিলেই আমার সেই গাছটির কথা মনে পড়ে। আমার এখানে আসিতে বড় ভাল লাগে। বাড়ীতে আমি যখনই অবসর পাইতাম, তখনই বাবার সমাধির কাছে সেই ঝাউগাছের নীচে বসিয়া থাকিতাম।"

আমি ঝাউগাছটির দিকে চাহিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। কি জানি কেন, বাবার সেই বিদায়কালের অশ্রুনিরুদ্ধ দৃষ্টি সহসা মনে পড়িয়া গেল।

স্মৃতি বলিতে লাগিল, "বাবার সমাধির পাশেই আমার মার সমাধি। মার সমাধির পাশে একটি যুঁই গাছ আছে, গ্রীষ্মকালে রাশি রাশি সাদা যুঁই সাদা পাথরের উপর পড়িয়া থাকে। মায়ের কথা আমার ভাল মনে পড়ে না; তিনি যখন স্বর্গে যান, তখন আমি খুব ছোট ছিলাম। তার একখানি 'ক্রস্' ছিল, সেই ক্রস্খানি তাঁর বড়ই প্রিয় ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর বাবা

সেখানি সর্ব্বদা কাছে রাখিতেন। বাবা মৃত্যুকালে সেখানি আমাকে দিয়া গিয়াছেন। সেই ক্রস্ আর বাবার ছোট ফটোখানি, বাবা ও মার স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ সর্ব্বদা আমার কাছে কাছে থাকে।"

এই বলিয়া স্মৃতি তাহার লকেটটি খুলিয়া আমার হাতে দিল। লকেটের সঙ্গে একখানি ক্ষুদ্র হাতীর দাঁতের ক্রস্ ছিল। লকেটটি খুলিয়া দেখিলাম, তাহার ভিতর ছোট একখানি ফটো। সেইটি তাহার পিতার প্রতিকৃতি।

স্মৃতি তখন অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। স্মৃতির অজ্ঞাতসারে তাহার চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। সে অশ্রুর সঙ্গে কি মুক্তার তুলনা হইতে পারে? আমার মনে হইল, পৃথিবীর সমগ্র ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা এই অশ্রুবিন্দু দুইটির মূল্য অধিক।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই তিন দিনের পরিশ্রমের পর বাগানে না আসিয়া তোমার একটু বিশ্রাম করা উচিত ছিল।"

তিন দিনের মধ্যে শিষ্টাচার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এবং আত্মীয়তার মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছিল।

স্মৃতি চোখের জল মুছিয়া হাসিয়া বলিল, "বিশ্রামের কথা বল্‌ছেন? আপনি ব্যবস্থা দিতেছেন, কিন্তু নিজে তাহা পালন করিতেছেন না কেন?"

আমি উত্তর দিবার উপক্রম করিতেই স্মৃতি আবার বলিল, "আমার বাবা দিনরাত যেরূপ পরিশ্রম করিতেন, সে কথা মনে করিলে এ সামান্য পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলিয়াই মনে হয় না। কি আশ্চর্য্য! এত পরিশ্রমের পরেও তাঁহাকে কখনও ক্লান্ত কি বিরক্ত হইতে দেখি নাই, তাঁহার মুখ সর্ব্বদাই প্রসন্ন ও হাস্যময় থাকিত। ধর্ম্মে তাঁহার কি শ্রদ্ধা—যীশুর প্রতি তাঁহার কি প্রবল প্রেমই ছিল!" বলিতে বলিতে স্মৃতির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

"ওঃ! সে চিঠির কথা আপনাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি।—বাবার কথা মনে হইলে আর আমার কিছুই মনে থাকে না।—আমার ধর্ম্মপিতাকে ডাক্তার সাহেবের অসঙ্গত ব্যবহারের কথা জানাইয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলাম, তাহার উত্তরে তিনি আমাকে এখানকার কাজ ছাড়িয়া দিতে লিখিয়াছেন।"

"চিঠি পড়িয়া তুমি কি স্থির করিলে?"

"এখনও আমি কিছু স্থির করিতে পারি নাই, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব, মনে করিয়াছিলাম। আপনি কি বলেন?"

"আমি—" বলিয়া আমি কয়েক মিনিট নীরব হইয়া রহিলাম। এই কয়েক মুহূর্ত্তে আমার মস্তিকে প্রবলবেগে এক সঙ্গে এত চিন্তার উদয় হইতে লাগিল যে, আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, এই রকম করিয়াই মানুষ পাগল হইয়া যায়। সহসা উন্মত্তের মত স্মৃতির হাত ধরিয়া বলিলাম, "স্মৃতি, স্মৃতি, বল, আমি যদি তোমাকে জীবন-সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী করিতে চাই, তাহাতে কি তুমি সম্মতি দিবে না?"

৪

আমার নিয়ম ছিল, বাবাকে নিয়ম মত দুই দিন অন্তর পত্র লিখিতাম। শত কাজের ভিড়েও এ নিয়ম চিরদিন পালন করিয়া আসিয়াছি। যখন মনে হইত, বাবা কত ব্যাকুলতার সহিত সেই কয়েকটি কালীর অক্ষর দেখিবার জন্য পিয়নের পথ চাহিয়া আছেন, তখন অসময়ের মধ্যেই সময় পাইতাম। কিন্তু এবার আমার দুই সপ্তাহ বাবাকে পত্র লেখা হইল না।

এই দুই সপ্তাহ যে আমার কি ভাবে কাটিয়াছিল, আমি স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলেও, তাহা স্মরণ করিতে পারি না।

সিভিল সাহেব তিন সপ্তাহের ছুটী লইয়া গিয়াছেন, আমার উপরেই সমস্ত কাজের ভার ছিল। স্মৃতি সর্ব্বদা আমাকে সাবধান করিয়া না দিলে রোগীদের অবস্থা যে কি হইত, বলিতে পারি না।

যাহা হউক, সুখের মধ্যে এই, কাজকর্ম্মের বিশেষ কোন গোলযোগ হয় নাই। কিন্তু ডেস্কের ভিতর বাবার দুখানি চিঠি আসিয়া পড়িয়া আছে, সে দুখানি খুলিয়া পড়াও হয় নাই।

অনুতপ্তচিত্তে চিঠি খুলিলাম। এমন সময়ে হাস্যময়ী স্মৃতি আসিয়া আমার চেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া বলিল, "চিঠিখানি কার?"

"আমার বাবার চিঠি।"

দেখিলাম, স্মৃতির প্রফুল্লবদনে একটু অন্ধকার ছায়া পড়িল। সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তুমি খৃষ্টান হইলে তোমার বাবার মনে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হইবে।" স্মৃতি লৌকিক হাস্যে তাহার আন্তরিক বিষাদ ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছিল, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমি কেন খৃষ্টান হইব? তুমিই ত হিন্দু হইতেছ!"

স্মৃতি ভাবিতে ভাবিতে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হিন্দু হ'লে তো আর যীশুকে ভালবাসিতে পারিব না, সে কেমন ক'রে হ'বে?"

"কেন, হিন্দু হ'লে কি যীশুকে ভালবাসা যায় না? আমি তো যীশুকে কত ভালবাসি।"

"সত্য তুমি যীশুকে ভালবাস?" বলিতে বলিতে স্মৃতির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

৫

পরদিন প্রত্যূষেই স্মৃতি বলিল, "কাল ভাবিতে ভাবিতে আমার সারারাত্রি ঘুম হয় নাই।"

আমি বলিলাম, "এত ভাবনা কিসের?"

"আচ্ছা, আমাকে বিবাহ করিতে তোমার বাবা কি মত দিবেন? যদি তিনি মত না দেন, তুমি কেমন করিয়া তাঁর মনে কষ্ট দিয়া বিবাহ করিবে?"

এ কথাটা যে আমিও না ভাবিয়াছি, এমন নয়; কিন্তু ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই।

স্মৃতি ডেস্কের ধারে আসিয়া বাবার চিঠিখানি উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। বলিল, "কি সুন্দর হাতের লেখা। আমার তাঁকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। আমি তাঁকে খুব ভালবাসিব, খুব ভক্তি করিব, তিনি আমাকে যেমন ভাবে প্রাণিতে বলিবেন, সেই রকমই থাকিব। তবুও কি তিনি আমাকে ভালবাসিবেন না?"

আমি অন্যমনস্কভাবে স্মৃতির কথাগুলি শুনিতেছিলাম, এমন সময় স্মৃতি বলিয়া উঠিল, "তিনি যে লিখেছেন, 'বধূমাতাকে আনিতে হইবে', বধূমাতা কে?"

আমি কাপুরুষ, এ পর্য্যন্ত বিবাহের কথা স্মৃতিকে বলিতে সাহস করি নাই, কিন্তু এখন আর না বলিলে চলে না।

আমি বলিলাম, "বধূমাতা কে, শুনিতে চাও স্মৃতি? তাহার সঙ্গে আমার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু সে বিবাহ নামমাত্র, আমি তাহাকে স্ত্রী বলিয়া মনে করি না।"

"সে কি?" বলিয়া স্মৃতি চমকিয়া উঠিল, তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। অতিকষ্টে বলিল, "এতদিন এ কথা কেন আমাকে বল নাই?"

আমি বলিলাম, "একবার ভ্রম করিলে আর কি তাহার সংশোধন নাই? এই সামান্য ভ্রমের জন্য কি আমার জীবনের সুখ বিসর্জ্জন দিব?"

স্মৃতি মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ কি খেলার ঘর যে, একবার ভাঙ্গিয়া আবার গড়িবে?"

এই কথা বলিয়া স্মৃতি মৃদুপাদক্ষেপে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তাহার প্রতি পদক্ষেপ যেন আমার বুকে গাঁইতি বাজিতে লাগিল। আমি অনেকক্ষণ নিশ্বাস ফেলিতে পারিলাম না।

৬

সেদিন সমস্ত দিন স্মৃতির সাক্ষাৎ পাইলাম না। স্মৃতির দাসীর নিকট শুনিলাম, তাহার মাথার যন্ত্রণা বড়ই বাড়িয়াছে, সে জন্য সে শয্যা হইতে উঠিতে পারে নাই। স্মৃতির মাঝে মাঝে মাথার অসুখ হইত।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইলাম। দীর্ঘ রাত্রি। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, ঘড়ি বুঝি খারাপ হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বদিনের মত অতি প্রত্যুষেই স্মৃতির দেখা পাইলাম। কিন্তু একদিনে তাহার আকৃতিতে কি পরিবর্ত্তনই হইয়াছে!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্মৃতি, মাথার যন্ত্রণা কি একটু কমিয়াছে?"

স্মৃতি আমার মুখের দিকে চাহিল না। নতনেত্রে আমার পদতলে জানু পাতিয়া বসিল, অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলিল, "আপনি আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি আজ আপনার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি, বলুন, আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন।"

আমি পাষাণ, তবু চোখের জলে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। স্মৃতির হাত ধরিয়া তুলিতে সাহস হইল না। গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলাম, "ওঠ স্মৃতি, ওঠ, তোমাকে দিব না, এমন আমার কি আছে?"

"তবে আমার কাছে এই অঙ্গীকার করুন যে, আপনি আপনার স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া সংসারী হইবেন। আর—" বলিয়া—স্মৃতি কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তাহার পর কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া বলিল, "কাল আমি কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। আমার একখানি ফটো ও একগোছা চুল আপনার কাছে আছে, ফিরাইয়া দিন। বলুন, আপনি আমার উপর রাগ করেন নাই?"

আমরা এতই অন্যমনস্ক ছিলাম যে, সিঁড়ির উপরে জুতার শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পাই নাই; এখন সশরীরে সিভিল সাহেবকে গৃহমধ্যে উপস্থিত দেখিয়া

চমকিত হইলাম। সাহেব ক্রোধকুটিলনেত্রে আমাদের উভয়ের দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গহাস্যের সহিত বলিলেন, "এ ব্যবহার অতি উত্তম!"

* * *

ইহার ফলে এই হইল যে, আমার বেতন চল্লিশটি মুদ্রার স্থলে রূপান্তরিত ও সঙ্কুচিত হইয়া বিংশতি মুদ্রায় পরিণত হইল। সে আজ দশ বৎসরের কথা।

এখন বহু কষ্টে বেতন কিছু বাড়িয়াছে, সেই সঙ্গে পরিবারও বাড়িয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীরূপিণী স্ত্রীর গুণে এই সামান্য আয়েও সংসারের বিশেষ কষ্ট নাই। এখন আমার তিনটি সন্তান। স্মৃতির সহিত আর দেখা হয় নাই। শুনিয়াছি, সে এখন চিরকুমারী, সন্ন্যাসিনী। অনেক সময় আমি একটি কথা মনে করি, "সব যায়, স্মৃতি কখনও যায় না।"

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী।

বেদান্ত দর্শন।

বিশিষ্টাদ্বৈত মত।

বিশিষ্টাদ্বৈত মত অনেক বিষয়ে অদ্বৈত মতের বিরোধী। আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈত মতে ব্রহ্মের স্বরূপ,—নির্ব্বিকল্প, নির্গুণ, সমস্ত-বিশেষ-রহিত। শ্রীরামানুজাচার্য্য এই মতকে পূর্ব্ব-পক্ষ রূপে নিরাস করিয়া আপন মত এইরূপে প্রচার করিয়াছেন যে,—শ্রুতি স্মৃতি, সর্ব্বত্র, যিনি সমস্ত-দোষ-রহিত ও সমস্ত কল্যাণ গুণের আকর, সেই সগুণ ব্রহ্মেরই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

যতঃ সর্ব্বত্র শ্রুতিস্মৃতিষু পরং ব্রহ্মোভয়লিঙ্গং উভয়লক্ষণমভিধীয়তে; নিরস্ত-নিখিল-দোষত্ব-কল্যাণ-গুণাকরত্ব-লক্ষণোপেতমিত্যর্থঃ।—শ্রীভাষ্য; ৩।২।১১।

রামানুজ এই ভাবে পূর্ব্ব-পক্ষ উপস্থিত করিয়াছেন,—

নন্বু চ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদিভি নির্ব্বিশেষপ্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্মাবগম্যতে, অস্তস্ত সর্ব্বজ্ঞত্বসত্যকামত্বাদিবং নেতি নেতীত্যাদিভিঃ প্রতিসিধ্যমানত্বেন মিথ্যাভূতমিত্যবগন্তব্যং, তৎ কথং কল্যাণ গুণাকরত্বনিরস্তনিখিলদোষত্বরূপোভয়লিঙ্গং ব্রহ্মণ ইতি উচ্যতে।—শ্রীভাষ্য, ৩।২।১৬-১৭।

কেহ কেহ বলেন যে, "ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত" ইত্যাদি বাক্যে নির্ব্বিশেষ স্ব-প্রকাশ ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে। আর শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে "নেতি নেতি" এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং ইহার দ্বারা, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব, সত্য-সংকল্পত্ব, জগৎ-কারণত্ব, অন্তর্য্যামিত্ব, সত্য-কামত্ব—ইত্যাদি সগুণ ভাবের নিষেধ করিয়াছেন, তখন যে ভাব অবাস্তব, ইহাই বুঝিতে হইবে;—তবে আর তিনি কল্যাণ গুণের আকর, এবং সমস্ত-দোষ-রহিত, তাঁহার এই উভয়-লিঙ্গত্ব কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে?

এই পূর্ব্ব-পক্ষের নিরাস করিয়া রামানুজাচার্য্য স্ব-মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যে, শ্রুতি স্মৃতি-সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে উভয়-লিঙ্গ রূপে (তিনি সমস্ত-দোষ-বর্জ্জিত এবং কল্যাণ গুণের আকর এই উভয় লক্ষণে) লক্ষিত করিয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শঙ্করের মতে নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য—সগুণ নহেন, এবং রামানুজের মতে সগুণ ব্রহ্মই সত্য—নির্গুণ নহেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতীরা বলেন যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে প্রমাণাভাব; সবিশেষ ব্রহ্মই প্রামাণিক। ব্রহ্ম সর্ব্বদাই মায়া-বিশিষ্ট।

মায়িনন্তু মহেশ্বরম্—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্।

এই মায়া অর্থে অদ্বৈত-বাদীর অনির্ব্বচনীয় অনাদি ভাব-রূপ অজ্ঞান নহে, কিন্তু বিচিত্রার্থ সৃষ্টিকর্ত্রী গুণাত্মিকা প্রকৃতি।

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ।

রামানুজের মায়ায়, ব্রহ্ম "নিখিল-হেয়-প্রত্যনীক" ও "কল্যাণ-গুণগণাকর।" তবে যে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহাতে প্রাকৃত হেয়-গুণের লেশমাত্র নাই।*

বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ।
কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ॥
ইত্যাদিভি র্নিখিল-হেয় প্রত্যনীকতয়া কল্যাণগুণগণাকরত্বঞ্চ অবগম্যতে। * *
সর্ব্বদোষো ন সম্ভাবে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ।
সগুণো নির্গুণো বিষ্ণুর্জ্ঞানগম্যো হ্যসৌ মতঃ॥

---

* কিঞ্চ সর্ব্বপ্রমাণস্য সবিশেষবিষয়তয়া নির্ব্বিশেষবস্তুনি ন কিমপি প্রমাণং সম্ভবতি, নির্ব্বিকল্পকপ্রত্যক্ষেঽপি সবিশেষমেব প্রতীয়তে।—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে রামানুজদর্শন।

অত্রেঽপি মায়াশ্রয়বলমেব ব্রহ্ম, অতশ্চ সর্ব্বজ্ঞ-বিশিষ্টমেব ইতি সিদ্ধম্। * * তস্মাৎ সর্ব্বথা সবিশেষমেব ইতি সিদ্ধম্।—বেদান্ততত্ত্বসার।

† নির্গুণবাদাশ্চ প্রাকৃতহেয়গুণনিষেধবিষয়তয়া ব্যবস্থিতাঃ।—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ।

ন হি কল্যাণ-নির্হে সর্বৈর্মুনিগণৈরপি।
বক্তুং শক্যা বিযুক্তস্য সত্ত্বাদ্যৈরখিলৈর্গুণৈঃ।

"এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা", "পরাঽস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে", "তত্ত্বং নারায়ণঃ পরম্" ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিভির্নারায়ণস্যৈব পরতত্ত্বং দিব্যকল্যাণগুণযোগেন সগুণত্বং প্রাকৃত-হেয়গুণরহিতত্বেন নির্গুণত্বমিতি বিষয়ভেদ-বর্ণনেনৈকস্যৈবাবগমাদ্ ব্রহ্মদ্বৈবিধ্যং দুর্বচনমিতি দিক্॥

—বেদান্ততত্ত্বসার।

"কল্যাণ-গুণ-যুক্ত বাসুদেবই পর-ব্রহ্ম", "মুক্তিদাতা সনাতন বিষ্ণুই পর-ব্রহ্ম";—ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভগবান্ হেয় গুণের বিপরীত ও কল্যাণ গুণের আধার—ইহাই জানা যায়। এবং নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতি ও স্মৃতিবচন দ্বারা নারায়ণই পরতত্ত্ব, তিনিই দিব্য-কল্যাণগুণ-সংযোগে সগুণ ও প্রাকৃত হেয়গুণ-বিয়োগে নির্গুণ: অর্থাৎ,—সেই একই ব্রহ্ম-বস্তু সগুণ ও নির্গুণ, ইহাই সূচিত হইতেছে। কিন্তু ব্রহ্ম দ্বিবিধ—ইহা বলা সঙ্গত নহে। এ বিষয়ে শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্য, যথা,—"বিষ্ণুই সগুণ ও-নির্গুণ, তিনি জ্ঞানগম্য।" "তিনি সত্ত্বাদি-অখিল-গুণ-বিযুক্ত। তাঁহার সমস্ত গুণের বর্ণনা মুনিগণও করিতে পারেন না।" "এই পরমাত্মা পাপ-স্পর্শ-হীন।" "ইহার বিবিধ পরা শক্তি শ্রুত হয়।" "নারায়ণই পরতত্ত্ব"—ইত্যাদি।

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ব্রহ্মই জগতের কর্ত্তা ও উপাদান।

---

* With Ramanuja also, Brahman is the highest reality, omnipotent, omniscient; but this Brahman is at the same time full of compassion or love. According to Ramanuja Brahman is not Nirguna—without quality. Such qualities as intelligence, power and mercy are ascribed to him; while with Shankara, even intelligence was not a quality of Brahman, but Brahman was pure thought and pure being. Besides these qualities Brahman is supposed to possess as constituent elements, the material world and the individual souls, and to act as the inward ruler (Antaryamin) of them. Hence neither the world nor the individual souls will ever cease to exist. All that Ramanuja admits is that they pass through different stages as Abyakta and Byakta. * Brahman is to be looked on and worshipped as a personal God, the creator and ruler of a real world. Thus, Isvara, the Lord, is not to be taken as a phenomenal God and the difference between Brahman and Isvara vanishes, as much as the difference between a qualified and an unqualified Brahman.

[Max Muller's Indian Philosophy. pp. 215, 217-218]

Ramanuja's Brahman is always one and the same, and, according to him, the knowledge of Brahman is likewise but one; but his Brahman is in consequence hardly more than an exalted Isvara. He is able to perform the work of creation without any help from Maya or Avidya.—Ibid. p 261.

বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ
ভুবনানামুপাদানং কর্ত্তা জীবনিয়ামকঃ।

'কল্যাণগুণান্বিত বাসুদেবই পর-ব্রহ্ম। তিনি ভুবন সকলের উপাদান, কর্ত্তা ও অন্তর্য্যামি-রূপে জীবের নিয়ামক।'

অর্থাৎ, ঈশ্বরই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। তাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি, তাঁহাতেই জগতের স্থিতি, এবং তাঁহাতেই জগতের লয়।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।

অর্থাৎ, 'যাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি লয় নিষ্পন্ন হয়, তাঁহাকে জানিতে হইবে, তিনিই ব্রহ্ম।' ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ। সেই জন্য সূত্রকার বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,—

জন্মাদ্যস্য যতঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২।

—'যাঁহা হইতে জগতের জন্মাদি সিদ্ধ হয়, তিনিই ব্রহ্ম।'

যতো যস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরাৎ নিখিলহেয়প্রত্যনীকস্বরূপাৎ সত্যসঙ্কল্পাদানবধিকাতিশয়াসংখ্যেয় কল্যাণগুণাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ পুংসঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াঃ এবমস্য ইতি সূত্রার্থঃ।—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ।

ঐ সূত্রের অর্থ এই,—'যে সর্ব্বেশ্বর, সকল হেয় গুণের বিপরীত, সত্য-সংকল্পাদি-নিরবধিশয় অসংখ্য কল্যাণ গুণের আকর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হয়, (তিনিই পর-ব্রহ্ম)'।

অদ্বৈত-বাদীরা ইহাকে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বলিয়াছেন, এবং "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম", ইহাই তাঁহাদের মতে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণের প্রভেদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ইহাই ব্রহ্মের প্রকৃত লক্ষণ।

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ঈশ্বর, জীব ও জড়,—এই তিন পদার্থ।

দ্রব্যং দ্বেধা বিভক্তং জড়মজড়মিতি স্বক্ত তত্র জীবনভেদাৎ।

দ্রব্য দ্বিবিধ—জড় ও অজড়। অজড় বা চিতের—জীব ও ঈশ্বর—এই দুই বিভাগ।

অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে, ব্রহ্ম একমাত্র পরমার্থ, এবং জীব ও জগৎপ্রপঞ্চ রজ্জুসর্পের ন্যায় অবিদ্যার পরিকল্পনা মাত্র; ইহা বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর অনুমোদিত নহে।

এবো হি তস্য সিদ্ধান্তঃ চিদচিদ্ ঈশ্বরভেদেন ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ামক-ভেদেন ত্রিবস্থিতাত্মকঃ পদার্থ ইতি। তদুক্তম্,—

ঈশ্বর শ্চিদচিচ্চেতি পদার্থত্রিতয়ং হরিঃ।

ঈশ্বরশ্চিত ইত্যুক্তো ভাবৌ দৃশ্যমচিৎ পুনরিতি।—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শন।

'রামানুজাচার্য্যের সিদ্ধান্ত এইরূপ। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর,—পদার্থ এই তিনটি। চিৎ=ভোক্তা, অচিৎ=ভোগ্য ও ঈশ্বর=নিয়ামক; ইহার সমর্থন জন্য তিনি নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।—'ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ—পদার্থ এই তিনটি; হরি বলেন ঈশ্বর, জীব চিৎ ও দৃশ্য (জড়) অচিৎ।'

এ সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ এইরূপ বলিতেছেন,—

উদ্গীত মেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম তস্মিন্ ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।

'এই যে পর-ব্রহ্ম, ইনি অক্ষর—ইহাতে তিনটি সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, এইরূপ উদ্গীত হইয়াছে।'

এই তিনটি কি কি? ভোক্তা (জীব), ভোগ্য (জড়) ও প্রেরিতা (ঈশ্বর)। কারণ, অন্যত্র শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন,—

ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা।

সর্ব্বং প্রাপ্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।—

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

ভোক্তা জীবঃ ভোগ্যং ইতরৎ সর্ব্বং প্রেরিতা অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর এতৎ ত্রিবিধং প্রোক্তং ব্রহ্মেতি।

অর্থাৎ, 'পুরুষ, প্রকৃতি ও পরমেশ্বর, ব্রহ্মের এই তিন ভাব।'

কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র পদার্থ হইলেও, বিশিষ্টাদ্বৈত মতে, তাহারা সম্পূর্ণ ঈশ্বরাধীন। কারণ, ঈশ্বরই ভোক্তা ও ভোগ্য—পুরুষ ও প্রকৃতি—উভয়তেই অন্তর্য্যামি-রূপে অবস্থিত আছেন।

পরমেশ্বরস্যৈব ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ কৃৎস্নয়োরন্তর্য্যামিরূপেণাবস্থানম্।—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে।

'পরমেশ্বরই ভোক্তা ও ভোগ্য উভয়েই অন্তর্য্যামি-রূপে অবস্থান করিতেছেন।' অর্থাৎ, তিনি জীব ও জড়—উভয়েরই অন্তর্য্যামী।

সেই জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা এই উভয়কে তাঁহার শরীর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

---

* Chit and Achit, what perceives and what does not perceive—soul and matter, form, as it were, the body of Brahman, are in fact modes (Prakara) of Brahman.—Max Muller's Indian Philosophy.

তদেবঞ্চ কার্য্যাবস্থস্য চ কারণাবস্থস্য চ চিদচিদ্বস্তুনঃ সকলস্য স্থূলস্য সূক্ষ্মস্য চ ব্রহ্মশরীরত্বম্।—২।১।১৫ সূত্রের শ্রীভাষ্য।

'কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থাপন্ন চিৎ ও অচিৎ—স্থূল ও সূক্ষ্ম, সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর।'

এ কথার সমর্থনের জন্য শ্রীরামানুজ নিম্নলিখিত শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ * * যস্য পৃথিবী শরীরং * * যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ * * যস্য বিজ্ঞানং শরীরং য আত্মনি তিষ্ঠন্ যস্যাত্মা শরীরম্ ইত্যাদি।—অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণ।

'জগৎ সর্ব্বং শরীরং তে', 'যদ্যদ্ যৎ কিঞ্চিৎ কাষ্ঠং' 'তৎ সর্ব্বং বৈ হরেস্তনুঃ' 'তানি সর্ব্বাণি তদ্বপুঃ'; 'সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ'।

'যিনি (অন্তর্য্যামি-রূপে) পৃথিবীতে রহিয়াছেন, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি বিজ্ঞানে রহিয়াছেন, বিজ্ঞান যাহার শরীর; যিনি আত্মাতে রহিয়াছেন, আত্মা যাহার শরীর।'

'সমস্ত জগৎ তোমার শরীর', 'যে অম্বু (কারণার্ণব) বিষ্ণুর শরীর'। 'সে সমস্তই শ্রীহরির তনু', 'সে সমস্তই তাঁহার বপু'। 'তিনি অনুধ্যান করিয়া নিজের শরীর হইতে (প্রজা) সৃষ্টি করিলেন'।

তাহাই যদি হইল,—যদি পুরুষ, প্রকৃতি ও পরমেশ্বর, এই তিন পদার্থ স্বীকার্য্য হইল, তবে যে শ্রুতি—

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। একমেবাদ্বিতীয়ম্। আত্মা বা ইদমেকাগ্র আসীৎ।

"এখানে নানা (বহুত্ব) নাই", "ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়", "অগ্রে এই পরমাত্মাই ছিলেন" ইত্যাদি উপদেশ দিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য কি? ঐ সকল ব্রহ্মৈক্য-প্রতিপাদক শ্রুতি-বাক্যের কি গতি হইবে? তদুত্তরে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই নানাত্ব-নিষেধের উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, এই জড় ও জীব মিথ্যাকল্পনামাত্র; কিন্তু এই শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ ভগবানেরই প্রকার বা বিধা (aspect) মাত্র।

একমেব ব্রহ্ম নানাভূতচিদচিৎপ্রকারং নানাত্বেনাবস্থিতম্।—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ।

'একই ব্রহ্মের নানাভূত চিৎ অচিৎ প্রকারভেদ। তিনি নানারূপে অবস্থিত।'

একস্যৈব ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারভূতং সর্ব্বং চেতনাত্মকং বস্তু।—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ।

'চিৎ ও জড়, এক ব্রহ্ম-পদার্থেরই শরীর, অতএব তাঁহারই প্রকারমাত্র।'

শ্রুতি যে ব্রহ্মকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায়

একপ নহে যে, ব্রহ্ম ভিন্ন আর অন্য বস্তু নাই। সেই শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, প্রলয়ে প্রকৃতি পুরুষ-নাম-রূপের ভেদ-রহিত হইয়া অনির্দ্দেশ্য ভাবে যখন ব্রহ্মে বিলীন থাকে, সেই অব্যাকৃত অবস্থায় তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্।

তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ। নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে।

'প্রলয়ে জগৎ অব্যাকৃত অবস্থায় থাকে; পরে (সৃষ্টিতে) তাহা নাম-রূপের দ্বারা ব্যাকৃত (ব্যক্ত) হয়।'

বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা বলেন,—

বস্তুতস্তুবিশিষ্টস্যৈব অদ্বিতীয়ত্বং শ্রুত্যভিপ্রায়ঃ।

এবং তাঁহারা এই কথার সমর্থনের জন্য এই-সকল শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধৃত করেন,

একো নারায়ণো দেবঃ পূর্ব্বসৃষ্টিং স্বমায়য়া।
সংহৃত্য কালকলয়া কল্পান্তে ইদমীশ্বরঃ॥
এক এবাদ্বিতীয়োঽভূদাত্মাধারোঽখিলাশ্রয়ঃ।
* * * *
ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং।
ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্॥
অক্ষরং তমসি লীয়তে। তমঃ পরে দেবে একীভবতি।
ব্রহ্মাদিষু প্রলীনেষু নষ্টে লোকে চরাচরে।
আভূতসংপ্লবে প্রাপ্তে প্রলীনে প্রকৃতৌ মহান্॥
একস্তিষ্ঠতি সর্ব্বাত্মা স তু নারায়ণঃ প্রভুঃ॥

'নারায়ণ দেব এক ও অদ্বিতীয়। তিনি মায়াবলে পূর্ব্ব-সৃষ্ট জগৎ কালকলার দ্বারা কল্পান্তে সংহার করিয়া এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর-রূপে বিরাজিত থাকেন। সমস্ত আত্মা তাঁহাতে নিহিত থাকে, এবং সমস্ত জগৎ তাঁহাতে বিলীন থাকে।'

'আমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, আমাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে, আমাতেই সমস্ত বিলীন হয়; অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আমিই।'

'অক্ষর প্রকৃতিতে লীন হয়, প্রকৃতি পরমেশ্বরে একীভূত হয়।'

'যখন ব্রহ্মাদি লয় প্রাপ্ত হন, যখন চরাচর বিনষ্ট হইয়া যায়, যখন ভূত-সকলের প্রলয় উপস্থিত হয়, যখন মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়, তখন সর্ব্বাত্মা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর বিরাজিত থাকেন, তিনিই নারায়ণ প্রভু।'

—এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা "একমেবাদ্বিতীয়ম্" শ্রুতির এইরূপ অর্থ করেন,—

তদানীং সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্টস্য ব্রহ্মণঃ বিদ্ধত্বাদ্ বিশিষ্টস্যৈব অদ্বিতীয়ত্বং সিদ্ধম্। ন চ তদানীমপি বিভাগ উপপদ্যতে, যতস্তৎ ক্ষেত্রজ্ঞবত্ত তদানীং পরিত্যক্তনামরূপং ব্রহ্মশরীর-তয়াপি পৃথগ্ব্যপদেশানর্হমতিসূক্ষ্মম্।—বেদান্ততত্ত্বসার।

প্রলয়ে সূক্ষ্মভাবাপন্ন জীব ও জড় ব্রহ্মে বিলীন থাকে। তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। সেই জন্য তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলা হয়। যদিও জগৎ অনাদি, কিন্তু প্রলয়ে জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়া যায়। কারণ, তখন ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) নাম-রূপ-পরিত্যাগ করিয়া অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, ব্রহ্মের শরীর হইলেও তাহার পৃথক্ উপলব্ধি হয় না।

এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা ব্রহ্মের দুই অবস্থা,—কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থা—স্বীকার করেন। যখন প্রলয়ে জীব ও জড়াত্মক জগৎ ব্রহ্মে প্রলীন হইয়া যায়, যখন সেই সূক্ষ্ম দশাতে তাহাদের নাম-রূপের বিভাগ তিরোহিত হয়, তখন ব্রহ্মের কারণাবস্থা। আবার যখন সৃষ্টিতে চিৎ ও জড় নাম-রূপের বিভাগে বিভক্ত হইয়া ব্যক্ত স্থূল অবস্থা ধারণ করে, তখন ব্রহ্মের কার্য্যাবস্থা। সে-অবস্থায় অচিৎ (দৃশ্য জড় জগৎ), ভোগ্য (বিষয়), ভোগোপকরণ (ইন্দ্রিয়) ও ভোগায়তন (দেহ)—এই ত্রিবিধ আকার ধারণ করে।

নামরূপ-বিভাগার্হং সূক্ষ্মদশাবৎ-প্রকৃতিপুরুষশরীরং ব্রহ্মকারণাবস্থং জগতস্তদাপত্তিরেব প্রলয়ঃ নামরূপবিভাগে-বিভক্তস্থূল-চিদচিদ্-বস্তু-শরীরং ব্রহ্ম কার্য্যাবস্থং ব্রহ্মণস্তথাবিধ-স্থূলভাবস্তু সৃষ্টিরিত্যভিধীয়তে।—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে রামানুজদর্শন।

কারণাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের নাম-রূপের ভেদ-রহিত সূক্ষ্ম-দশাপন্ন প্রকৃতি ও পুরুষ শরীর; জগতের ব্রহ্মে লীন হওয়ার নামই প্রলয়। আর কার্য্যাবস্থায় ব্রহ্মের নাম-রূপের ভেদে ভিন্ন, স্থূল-দশা-প্রাপ্ত চিৎ ও অচিৎ (জীব ও জড়) শরীর; ব্রহ্মের সেইরূপ স্থূলভাবকেই সৃষ্টি বলে।

পরব্রহ্ম হি কারণাবস্থং কার্য্যাবস্থং সূক্ষ্মস্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া সর্ব্বদা সর্ব্বাত্মভূতম্।—১।২।১ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য।

পর ব্রহ্মের দুই অবস্থা,—কারণাবস্থা ও কার্য্যাবস্থা। কারণাবস্থায় সূক্ষ্ম-ভাবাপন্ন প্রকৃতি পুরুষ তাঁহার শরীর। অতএব, তিনি সর্ব্বদাই সকলের আত্মা রূপে অবস্থিত।

অতএব,—

আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ।

'আদিতে আত্মা ভিন্ন আর কিছু ছিল না'—ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য, এই ভাবে বুঝিতে হইবে যে, প্রলয়ে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে লীন ছিল—একীভূত ছিল; ইহা দ্বারা স্বরূপ-নিবৃত্তি বুঝাইতেছে না। জগৎ স্থূল-রূপ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম-রূপে ব্রহ্মে অবস্থিত ছিল—ইহাই বুঝাইতেছে। অতএব, সূক্ষ্ম চিৎ ও জড় বিশিষ্ট ব্রহ্মই জগতের কারণ।

তবে যে জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা হয় (তদনন্যত্বম্ আরম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৫) এবং ব্রহ্মকে জানিলে সমস্ত বিজ্ঞাত হইল, এইরূপ বলা হয়, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, জগৎ যখন ব্রহ্মেরই শক্তি, তাঁহারই প্রকার বা বিধা, তখন তাঁহাকে জানিলে কি আর অজ্ঞাত থাকিতে পারে?

কার্য্যমপি নক্তং ব্রহ্মৈব ইতি কারণভূতব্রহ্মাত্মজ্ঞানাদেব সর্ব্বজ্ঞানং ভবতীতি এক বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানস্য উপপন্নতরত্বাৎ।—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে রামানুজদর্শন।

'সমস্ত কার্য্যই ব্রহ্ম, তাহাদিগের কারণভূত ব্রহ্মের জ্ঞান হইলেই কার্য্যেরও জ্ঞান হয়।—শ্রুতি যে এক বস্তু জানিলেই সকলই জ্ঞাত হইবে—এইরূপ বলিয়াছেন, তাহাও এই ভাবে সঙ্গত হইতেছে।'

---

১ নন্থ 'আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ'. ইতি প্রাক্-সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাৎ কথং সূক্ষ্মচিদ্অচিদ্-বিশিষ্টস্য নারায়ণস্য কারণত্বম্। উচ্যতে।—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি' ইতি পরিত্যক্তস্থূলাকারাণাং সূক্ষ্মাকারাপত্ত্যা ব্রহ্মণি বৃত্তিঃ প্রতিপাদ্যতে, নতু স্বরূপনিবৃত্তিঃ। 'অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি' ইতি তমঃশব্দবাচ্যায়াঃ প্রকৃতেঃ পরব্রহ্মণ্যেকীভাবশ্রবণাৎ। পৃথগ্গ্রহণরহিতত্বেন বৃত্তেরেকীভাবঃ।

'"আত্মাই এ জগৎ আত্মাই ছিল. এই শ্রুতির দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে এক আত্মাই ছিলেন, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে কিরূপে সূক্ষ্ম চিদ্অচিৎ-বিশিষ্ট নারায়ণের কারণত্ব উপপন্ন হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—"যাঁহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, যাঁহাতে স্থিতি, এবং যাঁহার দ্বারা প্রলয় সিদ্ধ হয়, তিনিই ব্রহ্ম"—এই শ্রুতি-বাক্যে জগৎ স্থূল অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম অবস্থায় ব্রহ্মে বিলীন থাকে, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, জগতের অত্যন্ত নিবৃত্তি প্রতিপাদিত হইতেছে না। "তমঃ পরমেশ্বরে একীভূত হয়,"—এই বাক্যে তমঃশব্দবাচ্য প্রকৃতি পরমেশ্বরে বিলীন হইয়া একীভূত হয়, ইহাই কথিত হইয়াছে। একীভাব অর্থে—সেই অবস্থা, যে অবস্থায় বস্তুর পৃথক্-রূপে নাম গ্রহণ করা যায় না।'

অতএবং তত্ত্বং চিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া তৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব সর্ব্বদা সর্ব্বশব্দাভিধেয়ঃ। তৎ কদাচিৎ স্বস্মাৎ স্বশরীরতয়াঽপি পৃথগ্ ব্যপদেশানর্হং সূক্ষ্মদশাপন্নং চিদচিদ্বস্তুশরীরং তৎ কারণাবস্থং ব্রহ্ম। কদাচিদ্ চ বিভক্তনামরূপ ব্যবহারার্হং স্থূলদশাপন্নং চিদচিদ্বস্তুশরীরং, তৎ কার্য্যাবস্থমিতি কারণাৎ পরস্মাৎ ব্রহ্মণঃ কার্য্যরূপং জগদনন্যৎ।—২,১।১৫ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য।

অতঃ সর্ব্বশব্দং ব্রহ্ম চিদচিদ্ বস্তু শরীরমিতি সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কারণং তদেব ব্রহ্ম স্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরং অপৃথগ্ধার্যং কার্য্যমিতি জগদ্ব্রহ্মণোঃ সামানাধিকরণ্যোপপত্তিঃ।—২,১।২৩ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য।

এ বিষয়ের তত্ত্ব এইরূপ। ব্রহ্মই সর্ব্বশব্দ। "সর্ব্ব" শব্দের বাচ্য; কারণ, চিৎ ও জড় তাঁহার শরীররূপে তাঁহারই প্রকার। তাঁহার কখনও কারণাবস্থা, কখনও কার্য্যাবস্থা। কারণাবস্থায় সূক্ষ্ম-দশাপন্ন, নাম-রূপের স্বাতন্ত্র্যরহিত জীব ও জড় তাঁহার শরীর, এবং কার্য্যাবস্থায় স্থূল-দশাপন্ন নাম-রূপের ভেদে ভিন্ন জীব ও জড় তাঁহার শরীর। কারণ, পরব্রহ্ম হইতে তৎকার্য্য জগৎ অভিন্ন।'

'অতএব সকল অবস্থাতেই জীব ও জড় ব্রহ্মের শরীর। কারণ-ব্রহ্মের সূক্ষ্ম জীব ও জড় শরীর, কার্য্য-ব্রহ্মের (যাঁহার নাম জগৎ) স্থূল জীব ও জড় শরীর। এই ভাবে জগৎ ও ব্রহ্মের অভিন্নতা উপপন্ন হইতেছে।

শাস্ত্রে অনেক স্থলে জগৎকে অসৎ বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, জগৎ বিজ্ঞানমাত্র—নাস্তিক আস্তা। জগৎকে অসৎ বলার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, জগৎ যখন পরিণামী ও বিকারশীল, যখন একরূপে অবস্থান করে না, তখন নির্ব্বিকার ব্রহ্মের তুলনায় ইহা অবস্তু বই আর কি?

'বিকারজননীমজ্ঞাম্ নিত্যং সততবিক্রিয়াদি ত্যাদিভিরঙ্গৈঃ সবিকারত্বেন সততপরিণামিত্বেন চৈকরূপাভ্যামব্রহ্মসমানসত্তাকত্বম্। অতএবমনৃতাদিপদৈরপচর্য্যতে বেদান্ততত্ত্বসার।

'জগৎকে যে মিথ্যা বলা হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি যখন বিকারী জড় বস্তু, প্রকৃতি যখন নিয়তই পরিণামী, যখন প্রকৃতি একরূপে অবস্থান করিতেই পারে না (ব্রহ্ম যেরূপ অবস্থান করেন),—তখন তাহার ব্রহ্মের সমান সত্তা কিরূপে হইবে?'

জগৎ যে ভ্রম নহে—মায়ার বিজৃম্ভণ, বিজ্ঞানমাত্র নহে, এ কথা প্রতিপাদিত করিবার জন্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা অনেক যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন।

অতো বিজ্ঞানমাত্রমেব তত্ত্বম্ ন বাহ্যার্থোঽস্তি ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে নাভাব উপলব্ধেরিতি। —ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২৭।

জ্ঞানব্যতিরিক্তস্য অভাবো ব্যক্তুং ন শক্যতে-কুতঃ উপলব্ধেঃ জ্ঞাতুরাত্মনোঽর্থবিশেষব্যবহার-যোগ্যতাংপাদনরূপেণ জ্ঞানস্যোপলব্ধেঃ * * জ্ঞানবৈচিত্র্যমন্তরেণার্থবৈচিত্র্যকৃতমেব * * যৎ পরৈঃ স্বপ্নজ্ঞানদৃষ্টান্তেন জাগরিতজ্ঞানানামপি—নিরালম্বনত্বমুক্তং তত্রাহ * * বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২৮।

স্বপ্নজ্ঞানবৈধর্ম্যাজ্জাগরিতজ্ঞানানাম্ অর্থশূন্যত্বং ন যুজ্যতে বস্তুতঃ—* * ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২৯।

ন কেবলস্যার্থশূন্যস্য জ্ঞানস্য ভাবঃ সম্ভবতি, কুতঃ কচিদপ্যনুপলব্ধেঃ।

'যদি কেহ বলেন, বাহ্যার্থ (External world) নাই—বিজ্ঞান-মাত্রই আছে, তাহার উত্তরে আমরা বলি,—"নাভাবঃ"—এই ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, যখন জগতের উপলব্ধি হইতেছে—তখন বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত পদার্থের সত্তা নাই, এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ, বিষয়কে জ্ঞাতার ব্যবহার-যোগ্য করিয়াই জ্ঞানের উপলব্ধি হয়। বিষয় না থাকিলে এরূপ হয় কিরূপে? * * আর বিষয় বিচিত্র বলিয়াই জ্ঞানও বিচিত্র হয়। বিপক্ষ-বাদীরা যে বলেন যে, যখন স্বপ্ন-জ্ঞান নিরালম্বন—তখন জাগরিত-জ্ঞানও আলম্বন-শূন্য, তাহার উত্তর—"বৈধর্ম্যাচ্চ"-সূত্র (২।২।২৮)। স্বপ্ন-জ্ঞান ও জাগরিত-জ্ঞান এক-ধর্ম্মাক্রান্ত নহে। অতএব, স্বপ্ন-জ্ঞানের দৃষ্টান্তে জাগরিত-জ্ঞানকেও অর্থশূন্য (নিরালম্বন) বলা সঙ্গত নহে। * * কেবল অর্থশূন্য জ্ঞানের "ভাব" সম্ভব নহে। কারণ, কোথাও না কোথাও তাহার বাধ হইবেই।'

অদ্বৈত বাদীর মতে, জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা এ মতের অনুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন, জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু। * *

জীবপরয়োরপি স্বরূপৈক্যং দেহাত্মনোরিব ন সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ—দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্ অন্যোঽভিচাকশীতি।

---

* ভাবে উপলব্ধেঃ।—ব্রহ্মসূত্র; ২।১।১৬। অসদিতি চেৎ ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৭; তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৫; ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে শ্রীরামানুজাচার্য্য তাঁহার মত আরও বিশদ করিয়াছেন।

** The souls as individuals possess reality The human spirit is distinct from the Divine spirit.—Max Muller's Indian Philosophy.

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে * * যস্তং প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা ইত্যাদ্যাঃ। "ভেদব্যপদেশাৎ, উভয়েঽপি ভেদেনৈনমধীয়তে, ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ, অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" ইত্যাদিষু সূত্রেষু চ "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানম্ অন্তরো যময়তি" "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনাঽন্বারূঢ়ঃ ইত্যাদিভিরুভয়োরন্যাত্মপ্রত্যনীকাকারেণ স্বরূপনির্ণয়াৎ।—১।১।১ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য।

অর্থাৎ, দেহ ও আত্মার যেরূপ স্বরূপতঃ ঐক্য সম্ভবে না, জীব ও ব্রহ্মেরও সেইরূপ। কারণ, নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতি, স্মৃতি ও সূত্রসমূহ জীব ও ব্রহ্মের যেরূপ স্বরূপনির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, উভয়ে পরস্পরের বিপরীত। শ্রুতি স্মৃতি যথা,—সহযোগী সখ্যশালী দুইটি পক্ষী এক বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছে। তন্মধ্যে এক জন স্বাদু ভক্ষ্য আহার করে—অপর আহার না করিয়া কেবল দৃষ্টি করে। লোকে, সুকৃতের "ঋত"-পানকারী দুই জন পরম পরার্দ্ধ স্থানে গুহাপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তিনি সর্ব্বাত্মা জনগণের শাস্তা অন্তর্য্যামী। ভেদব্যপদেশহেতু উভয়েই উপদেশ দিতেছেন। ভেদব্যপদেশ হেতু ভিন্ন। ভেদনির্দ্দেশহেতু অধিক ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র। "যিনি আত্মায় থাকিয়া আত্মার অন্তরে—যাঁহাকে আত্মা জ্ঞাত নহে—আত্মা যাঁহার শরীর—যিনি আত্মার অন্তর্য্যামী।" "প্রাজ্ঞ আত্মা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত, প্রাজ্ঞ আত্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত" ইত্যাদি। বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা জীব ব্রহ্মের ভেদ-সমর্থন জন্য নিম্নোক্ত শাস্ত্র সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। "পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং" "আত্মাধারোঽখিলাশ্রয়ঃ"—'বিশ্বের পতি, আত্মার ঈশ্বর, আত্মার আধার, অখিলের আশ্রয়।'

অন্যত্র রামানুজাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন,—

আধ্যাত্মিকাদিতঃপ্রযোজ্যাৎ প্রত্যগাত্মনোঽবিদম্ অর্থান্তরভূতং ব্রহ্ম কৃতঃ—ভেদনির্দ্দেশাৎ প্রত্যগাত্মনো হি ভেদেন নির্দ্দিশ্যতে—পরব্রহ্ম * য আত্মনি তিষ্ঠন্ * * য আত্মানম্ অন্তরো—

---

* জীব ও ব্রহ্ম পৃথক বস্তু—এই মতের সমর্থন জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা নিম্নোক্ত সূত্রের উপরও নির্ভর করেন।

ইতরব্যপদেশাদ্ হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ।—২।১।২৩ ব্রহ্মসূত্র।

প্রকাশাদিবত্ত্ব নৈবং পরঃ।—২।৩।৪৬ সূত্র।

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন।—১।৩।৪২ সূত্র।

গত্যর্থাভ্যশব্দেভ্যশ্চ।—১।৩।৩১ সূত্র।

'যস্যাত্মা শরীরং যস্যাত্মানমন্তরো যময়তি স ত্বাত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ' 'পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি' 'ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ' 'প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ' * * 'যোঽব্যক্তমন্তরে সঞ্চরন্ যময়ত্যব্যক্তং শরীরং যমক্ষরং ন বেদ, যোঽক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্ যময়ত্যক্ষরং শরীরং যমমৃতং ন বেদ এষ সর্বভূতান্তরাত্মাঽপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণ' ইত্যাদিভিঃ।*

অর্থাৎ, ব্রহ্ম জীব হইতে স্বতন্ত্র। জীব আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক দুঃখসমূহের অধীন। সে ও ব্রহ্ম কিরূপে এক বস্তু হইতে পারে? সেই জন্য শ্রুতিতে পর-ব্রহ্মের জীব হইতে ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'যিনি আত্মায় থাকিয়া আত্মার অন্তর, যিনি আত্মাকে অন্তরে যমন করেন, সেই অন্তর্যামী অমৃত তোমার আত্মা, জীব ও নিয়ামক (ঈশ্বর) পৃথক মনন করিয়া; তিনিই কারণ ও করণাধিপতির (জীবের) অধিপতি; দুইটি অজ, ঈশ ও অনীশ, প্রাজ্ঞ ও অজ্ঞ। তিনি প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞ (প্রকৃতি ও পুরুষের) অধিপতি—গুণের প্রভু। যিনি প্রকৃতির অন্তরে সঞ্চরণ করেন, প্রকৃতি যাহার শরীর, প্রকৃতি যাঁহাকে জানে না; যিনি অক্ষরের (জীবের) অন্তরে সঞ্চরণ করেন, অক্ষর যাঁহার শরীর, অক্ষর যাহাকে জানে না, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা পাপস্পর্শশূন্য একমাত্র দিব্য দেব (অদ্বিতীয় ঈশ্বর) নারায়ণ।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা আরও বলেন যে, ব্রহ্ম যখন অখণ্ড বস্তু, তখন জীব ব্রহ্ম-খণ্ড হইতে পারে না। 'ন চ ব্রহ্মখণ্ডো জীবঃ'—(বেদান্ত-তত্ত্বসার)। তবে যে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে—

'অংশো নানাব্যপদেশাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪২।

ইহার এই অর্থ যে, জীব ব্রহ্মের বিভূতি। যেমন প্রভাকে অগ্নির অংশ বলা যায়, যেমন দেহকে দেহীর অংশ বলা যায়, জীব সেই ভাবে ব্রহ্মের অংশ।

* এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বেদান্ত-তত্ত্বসার-কর্ত্তা লিখিয়াছেন,—'নৈবং পর ইতি মুখ্যভূতো জীবস্তদ্ব্যতিভূতো ন পরঃ; যথৈব হি প্রভায়াঃ প্রভাবান্ অন্যথাসত্তত্তা প্রভাস্থানীয়-ত্বাংশাৎ জীবাদ্ অংশী পরোপাধ্যবচ্ছিন্নভূতঃ। "নৈব পরঃ" ইহা দ্বারা বলা হইল যে, জীব যেরূপ, পরমেশ্বর সেরূপ নহেন। যেমন প্রভা ও প্রভাবানের প্রভেদ। প্রভাস্থানীয় জীব অংশ, এবং পরমাত্মা অংশী, সুতরাং ভিন্ন তত্ত্ব।

* প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ (২।৩।৪৫) সূত্রের ভাষ্যে রামানুজ এইরূপ লিখিয়াছেন,—প্রকাশাদিবৎ জীবঃ পরমাত্মনোঽংশঃ। যথায়াদিত্যাদ্যং ভাক্তো ভারূপঃ প্রকাশাংশো ভবতি * রূপা বা দেহিনো দেবমনুষ্যাদের্দেহোঽংশশব্দশব্দবৎ। * * এবং জীবপ্রকারাদিশেষ্য-নিবেশনয়ো রংশাংশিত্বং স্বভাবভেদশ্চোপপদ্যতে।

শ্রুতি স্থানে স্থানে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে; যেমন, সোঽহং, তত্ত্বমসি, ইত্যাদি। এ সকল বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, জীব ব্রহ্ম-ব্যাপ্য, ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্মাত্মক।

অতশ্চ জীবব্যাপিত্বেনাভেদো ব্যপদিশ্যতে।—বেদান্ত-তত্ত্বসার।

সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ-কার রামানুজ-দর্শনের পরিচয়স্থলে এ প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

তথাহি তৎপদং নিরস্তসমস্তদোষাসংখ্যেয়কল্যাণগুণাস্পদং জগদুদয়বিভবলয়-লীলং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েত্যাদিষু তস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ সমানাধিকরণ্যং; ত্বংপদং বা চিদ্বিশিষ্টং জীবশরীরং ব্রহ্মাচষ্টে প্রকারদ্বয়বিশিষ্টৈকবস্তুপরত্বাৎ সমানাধিকরণ্যম্।

অর্থাৎ, তত্ত্বমসি—এই বাক্যে, তৎ পদে, যিনি সমস্ত দোষহীন অসংখ্য অনন্ত কল্যাণ গুণের আধার, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাঁহার লীলা-বিলাস, সেই ব্রহ্মকে বুঝায়। কারণ, তৎ ঐক্ষত—এখানে তৎ-পদে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। তত্ত্বমসি স্থলেও তৎ পদে সেই একই বস্তুকে বুঝায়। ত্বং পদ দ্বারা যিনি চিৎ-বিশিষ্ট, জীব যাঁহার শরীর, সেই ব্রহ্মকেই বুঝায়। একই বস্তু, অথচ তাঁহার প্রকারের ভেদ আছে,—সমানাধিকরণ দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়া থাকে।

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে অবশ্য জীব নিত্য-বস্তু।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ।

জীব-জন্মেও না, মরেও না।

এই শ্রুতির বলে তাঁহারা বলেন, জীবের জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। এ সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী-দিগের সহিত তাহাদের এক মত। কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা যে জীবকে বিভু (সর্ব্ব-ব্যাপী) বলেন, ইঁহারা সে সম্বন্ধে ভিন্নমত। তাঁহারা বলেন, জীব অণু; এবং প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত শ্রুতি উদ্ধৃত করেন,—

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ।

'সেই অণু আত্মাকে চিত্তের দ্বারা জানিতে হয়।'

বালাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য চ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ইতি।

আরাগ্রমাত্রঃ পুরুষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্য ইতি চ।

* তত্ত্বমসি অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদিষু তচ্ছব্দব্রহ্মশব্দবৎ 'ত্বম্' অয়ম্ আত্মা শব্দোঽপি জীবশরীরকব্রহ্মবাচকত্বেন একার্থাভিধায়িত্বাৎ।

'কেশের অগ্রভাগকে শত খণ্ড করিয়া প্রত্যেক খণ্ডকে যদি আবার শত ভাগ করা যায়, তবে তাহাই জীবের পরিমাণ। সেই জীবকে জানিলে অমর হওয়া যায়।'

'জীব আরাগ্রমাত্র—অণুপরিমাণ, ইহাকে চিত্তের দ্বারা জানিতে হইবে।'

জীব যখন অণু, তখন এক জীব কখনও বহু শরীরে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না। অতএব জীব বহু, প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন।

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে, ঈশ্বরকে লাভ করাই জীবের পরম-পুরুষার্থ। জীব যদি পুরুষোত্তমকে লাভ করিতে পারে, তবে তাহার পরম-সিদ্ধি লাভ হয়। সে সিদ্ধি পুনরাবৃত্তি-রহিত ভগবৎ-পদ-লাভ।

স্বভক্তং বাসুদেবোঽপি সংপ্রাপ্যানন্দমক্ষয়ম্।
পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বীয়ং ধাম প্রযচ্ছতি।

'বাসুদেব স্বভক্তকে অক্ষয় আনন্দ প্রদান করিয়া পুনরাবৃত্তি-রহিত নিজ ধাম প্রদান করেন।'

তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় কি? ইহার উত্তরে শ্রীরামানুজাচার্য্য বেদার্থ-সংগ্রহে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

সোঽয়ং পরব্রহ্মভূতঃ পুরুষোত্তমো নিরতিশয়পুণ্যসঞ্চয়ক্ষীণাশেষজন্মোপচিতপাপরাশেঃ পরমপুরুষচরণারবিন্দশরণাগতিজনিতভদাভিমুখ্যস্য সদাচার্য্যোপদেশোপবৃংহিতশাস্ত্রাধিগতত্বযাথাত্ম্যাববোধপূর্ব্বকাহরহরুপচীয়মানশরদমতপঃশৌচক্ষমার্জ্জবভয়াভয়স্থানবিবেকদয়াঽহিংসাদ্যাত্মগুণোপেতস্য বর্ণাশ্রমোচিতপরমপুরুষারাধনরূপনিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মোপবৃংহণপ্রকর্ষপরিনিষ্ঠিতস্য পরিহারবিধ্বস্তপরমপুরুষচরণারবিন্দযুগলস্যন্তাত্মাত্মীয়স্য তদ্ভক্তিকাষ্ঠাপ্রাপ্তিহেতুবরতন্তুতি-স্মৃতি-নমস্কৃতি-বন্দন-যজন-কীর্ত্তন-গুণশ্রবণ-বচন-প্রণামাদিপ্রীতপরমকারুণিক-পুরুষোত্তমপ্রসাদ-বিধ্বস্তসমস্তধ্বান্তজ্ঞানস্য যাজনানবরত-নিরতিশয়প্রিয়বিশদতম প্রত্যক্ষতাপন্নানুধ্যানরূপ-ভক্ত্যেকলভ্যঃ। তদুক্তং পরমগুরুভির্ভগবদ্যামুনাচার্য্যপাদৈঃ—উত্তমপরিকর্ম্মিতস্বান্তৈঃ কান্তিকাত্যন্তিকভক্তিযোগলভ্য ইতি।

'সেই পরব্রহ্ম-রূপী পুরুষোত্তম, নিম্নোক্তরূপ সাধকের পক্ষে অন্য প্রয়োজন-রহিত, বিরাম-রহিত, অতিশয়-রহিত, প্রিয়, সুবিশদ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ, অনুধ্যান-রূপ যে ভক্তি, তদ্দ্বারাই লভ্য (তাঁহাকে লাভের অন্য উপায় নাই)। কিরূপ সাধক? যাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ-রাশি (ইহজন্মে) অশেষ পুণ্য-সঞ্চয়ের দ্বারা ক্ষয়িত হইয়াছে; যিনি পরম পুরুষের চরণারবিন্দে শরণাগতিবশতঃ তাঁহার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন; সর্ব্বদা আচার্য্যের উপদেশে বিশদীকৃত

* উত্তমপরিকর্ম্মিতস্বান্তস্য = জ্ঞানকর্ম্মযোগসংস্কৃতান্তঃকরণস্য।

শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ববোধের ফলে শম, দম, তপঃ, শৌচ, ভয়, অভয়, বিবেক, দয়া, অহিংসাদি সদ্‌গুণ যাঁহার নিত্য উপচিত হইতেছে; যিনি বর্ণাশ্রমের উপযোগী পরম-পুরুষের আরাধনা করিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের উপসংহার এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের পরিহারে নিযুক্ত হইয়াছেন; যিনি পুরুষোত্তমের চরণ-কমলে আপনাকে ও আপনার সর্ব্বস্বকে ন্যস্ত করিয়াছেন; ভগবদ্-ভক্তি-প্রণোদিত অবারিত স্তব, শরণ, নমস্কার, বন্দন, যজন, কীর্ত্তন, গুণ-শ্রবণ, বচন, ধ্যান, অর্চ্চন, প্রণামাদি দ্বারা প্রীত পরমকারুণিক পরমেশ্বরের প্রসাদে যাঁহার হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার বিধ্বস্ত হইয়াছে,—এইরূপ সাধক হওয়া চাই।' এই মর্ম্মে ভগবান্ রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন—যে সাধকের অন্তঃকরণ, জ্ঞান-কর্ম্ম উভয়-বিধ যোগ দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছে, তিনিই ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক ভক্তিযোগ দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করেন।

বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা—

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥

'যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই জানেন, তিনি অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার দ্বারা অমরত্ব লাভ করেন'—এই শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে, অবিদ্যা (কর্ম্ম) ও বিদ্যা (ভক্তিরূপাপন্ন ধ্যান)—এই উভয়ের সমুচ্চয়ই মুক্তির সাধন। তাঁহারা বলেন,—

উপাসনা-কর্ম্মসমুচ্চিতেন বিজ্ঞানেন দৃষ্টে দর্শনে নষ্টে ভগবদ্‌ভক্তস্য তমিষ্টস্য ভক্তবৎসলঃ পরমকারুণিকঃ পুরুষোত্তমঃ স্বয়মাত্মানুভবানুগুণনিরবধিকানন্তরূপং পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বপদং প্রযচ্ছতি।

'উপাসনা-রূপ কর্ম্ম-সহকৃত যে বিজ্ঞান, তদ্দ্বারা যে ভগবদ্-ভক্তের দৃষ্টি-দর্শন বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাকেই ভক্ত-বৎসল, পরম-কারুণিক পুরুষোত্তম, অনন্ত-কালস্থায়ী, পুনরাবৃত্তি-রহিত স্বপদ প্রদান করেন।' তখন সেই ভক্ত ভগবান্‌কে স্বরূপ অনুভব করেন।

এই জ্ঞান বাক্য-জন্য আপাত-জ্ঞান নহে। ইহা ধ্যান-উপাসনাদি-শব্দ-বাচ্য বেদন বা সাক্ষাৎকার। এই কথার সমর্থনের জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা নিম্নলিখিত শ্রুতি উদ্ধৃত করেন:—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।

'এই আত্মা, শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা প্রাপ্য নহেন; ইনি যাহাকে বরণ করেন, তাহারই লভ্য,—তাহাকেই আত্মা আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন।' অর্থাৎ, রামানুজের ভাষায়—

যোঽয়ং মুমুক্ষুর্বেদান্তবিহিতবেদনরূপধ্যানাদিবিশিষ্টঃ যদা তস্য তস্মিন্নেবানুধ্যানে নিরবধিকাতিশয়া প্রীতির্জায়তে তদৈব তেন লভ্যতে পরঃ পুরুষ ইতি।

'যখন বেদান্ত-বিহিত বিজ্ঞান-রূপ ধ্যানাদির অনুষ্ঠাতা মুমুক্ষুর সেই অনুধ্যানে সুমহতী নিরতিশয় প্রীতির অনুভব হয়, তখনই তিনি সেই পরম পুরুষকে লাভ করেন।'

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে এই পরম-পুরুষ পরম-কারুণিক ও ভক্ত-বৎসল। তিনি লীলাবশে অর্চ্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম ও অন্তর্য্যামী, এই পঞ্চ রূপে অবস্থান করিতেছেন। অর্চ্চা=প্রতিমাদি; বিভব=রামাদি অবতার; ব্যূহ=বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ,—এই চতুর্ব্যূহ; সূক্ষ্ম=সম্পূর্ণ ষড়্‌গুণ * পরব্রহ্ম; এবং অন্তর্য্যামী=সকল জীবের নিয়ামক। সাধক অর্চ্চাদি-নিম্নতর স্তর অতিক্রম করিয়া অন্তর্য্যামি-উপাসনার অধিকারী হয়।

অর্চ্চোপাসনয়াক্ষিপ্তে কর্ম্মণ্যেঽধি ততো ভবেৎ।
বিভবোপাসনে পশ্চাদ্ব্যূহোপাস্তৌ ততঃ পরম্॥
সূক্ষ্মে তদনু শক্তঃ স্যাদন্তর্য্যামিণমীক্ষিতুমিতি॥—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ।

সাধক, 'অর্চ্চার উপাসনার দ্বারা পাপক্ষয় হইলে বিভবের উপাসনার অধিকারী হয়; তদনন্তর ব্যূহ উপাসনার অধিকারী হয়; তাহার পর সূক্ষ্ম উপাসনায় নিরত হয়; শেষ উপাসনা—অন্তর্য্যামীর।'

অদ্বৈত-বাদীরা যেরূপ সগুণ ও নির্গুণ—উপাসনার এইরূপ দ্বৈবিধ্য ও ফলের তারতম্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর তাহা অনুমোদিত নহে। সেই জন্য রামানুজাচার্য্য প্রথম সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

পরবিদ্যাসু সর্ব্বাসু সগুণমেব ব্রহ্ম উপাস্যম্। ফলঞ্চ একরূপমেব।

অর্থাৎ, সর্ব্বত্র পরাবিদ্যায় সগুণ ব্রহ্মই উপাসনার বিষয়, এবং উপাসনার

---

* ষড়্‌গুণম্—গুণাঃ সংহতপাপ্মত্বাদয়ঃ। সোঽপহতপাপ্মা বিরজো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্প ইতি শ্রুতেঃ।

'ষড়্‌গুণ কি কি? পাপহীনতা, রজোঃশূন্যতা, অমরত্ব, বিশোকত্ব, অক্ষুধিত্ব ও সত্যকাম-

ফল একরূপই কথিত হইয়াছে।' এবং তিনি প্রমাণস্বরূপ প্রাচীন ভাষ্য-কার বোধায়ন ও বাক্য-কার উডুলোমির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর অনুমোদিত মুক্তির স্বরূপ কি? মুক্ত পুরুষ কখন ব্রহ্মের স্বরূপৈক্য লাভ করেন না। তিনি ব্রহ্মের স্বভাব প্রাপ্ত হন বটে, ব্রহ্মোচিত গুণ (সত্যসংকল্প, সর্ব্বজ্ঞত্ব) লাভ করেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন না।

এবং গুণাঃ সমানাঃ স্যুর্মুক্তানামীশ্বরস্য চ।
সর্ব্বকর্তৃত্বমেবৈকং তেভ্যো দেবে বিশিষ্যতে॥

'মুক্ত-পুরুষদিগের ঈশ্বরের সহিত সমান গুণ হয়; কিন্তু বিশেষ এই যে, একমাত্র ঈশ্বরেই সর্ব্বকর্তৃত্ব সম্ভবে।'

নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নিবর্ত্তিতাবিদ্যস্য শরীর স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ অবিদ্যাশ্রিতত্বযোগ্যয়া তদনন্যত্বাসম্ভবাৎ।—শ্রীভাষ্য।

'এইরূপ সাধন-অনুষ্ঠান দ্বারা অবিদ্যা বাধিত হইলেও, পরমেশ্বরের সহিত সাধকের স্বরূপৈক্য সম্ভবে না; অবিদ্যার আধারের পক্ষে একতা হওয়ার সম্ভাবনা কি?'

তাঁহারা বলেন, শাস্ত্রে যে মুক্তের আত্ম-ভাব বা ব্রহ্ম-ভাব-প্রাপ্তির কথা আছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্ম বা আত্মার স্বভাব-প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। মুক্তের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞাপক যে সকল শ্রুতি আছে, তদ্দ্বারা তিনি স্বরাট্, অনন্তাধিপতি, সংকল্প-সিদ্ধ হয়েন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। * কিন্তু জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ব্যাপারে তাঁহার অধিকার জন্মে না। বেদান্তের "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্" সূত্রে (৪।৪।১৭) এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ। স বা এষ বিবোন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে। স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন সম্পন্নো মহীয়তে।

'পশ্য (মুক্তপুরুষ) সকল বিষয় দর্শন করেন, সকল বিষয় প্রাপ্ত হন, তিনি ব্রহ্মলোকে দিব্য চক্ষু দ্বারা এ সমস্ত কামনার বস্তু দর্শন করিয়া রমণ করেন। যদি তিনি পিতৃগণের কামনা করেন, সংকল্পমাত্রই পিতৃগণ উপস্থিত হন, সমস্ত দেবগণ তাঁহার জন্য বলি উপহার দেন।'

* সংকল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ॥—ব্রহ্মসূত্র।—৪।৪।৮।

ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর মুক্তি ; অদ্বৈত-বাদীর কথিত মুক্তি হইতে ইহা বিভিন্ন। কারণ, সে মতে মুক্তের ব্রহ্মের সহিত একত্ব হয়।

পরব্যোম পরমং সাম্যং—৩।৩।২৮ সূত্রের শঙ্করভাষ্য।

'ব্রহ্মের সহিত পরম সাম্যই (মুমুক্ষুর) লক্ষ্য।'

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সহযোগী সাহিত্য।

তিব্বতে বাঙ্গালী।

বিগত ১৮৮১ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর এফ্, ক্রফ্ট শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র দাস সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—'১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর স্যার জর্জ্জ্ কাম্বেল সাহেবের আদেশ অনুসারে বাবু শরচ্চন্দ্র দাস দার্জ্জিলিঙ্গের তিব্বতীয় বোর্ডিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। দাস মহাশয় তৎকালে প্রেসিডেন্সী কলেজের পূর্ব্ববিভাগের এক জন ছাত্র ছিলেন। প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করিয়া শরচ্চন্দ্র তিব্বতীয়-ভাষা-শিক্ষায় প্রভূত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী বৎসরে তিনি—সাধীন সিকিমরাজ্যের অন্তর্গত মঠ-পরিদর্শনে গমন করেন। এই সময়ে তত্রত্য রাজা, রাজমন্ত্রী ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ সিকিম-বাসীদিগের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। গত ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে পেমাইয়াংসি নামক মঠের উগায়েন-পারাৎস্থ নামক জনৈক লামা সন্ন্যাসী উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকপদে নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত মঠের সন্ন্যাসীরা সিকিম উপঢৌকন সহ তাঁহাকে তাসিলুনপো ও বাসা নগরীতে প্রেরণ করেন। বাস মহাশয় তিব্বতে গমন করিবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। এই সুযোগে

* The Souls of the departed, if only their life has been pure and holy, are able to approach this Brahman, sitting on his throne, and to enjoy their existence in a heavenly paradise.—Max Muller's Indian Philosophy, page 251.

While the very idea of an approach of the souls of the departed to the throne of Brahman, or of their souls being merged in Brahman was incompatible with the fundamental tenet that the two were and always remain, one and the same, never separated except by Nescience. The idea of an approach of the soul to Brahman, nay, even of the individual soul being a separate part of Brahman, to be again joined to Brahman after death, runs counter to the conception of Brahman, as explained by Shamkara, however prominent it may be in the Upanishads and in the system of Ramanuja.—Ibid. page 252.

যদি তিনিও নিষিদ্ধ নগরী লাসায় গমন করিতে পারেন, কর্তৃপক্ষ তাহার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। লামা উগায়েন-গিয়াৎস্থ লাসা নগরীতে উপস্থিত হইয়া বাবু শরচ্চন্দ্র দাসের পক্ষে অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও ফল হইল না। লামা উগায়েন গিয়াৎস্থ অগ্রোদ্যম হইয়া তাসি লামার দীক্ষাগুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাসিলুনপোতে গমন করিলেন। দীক্ষাগুরুর উপদেশ অনুসারে তাসিলামা দাস মহাশয়কে তথায় লইয়া যাইবার জন্য উগায়েন-গিয়াৎস্থর হাতে একখানি আত্মপরিচয়লিপি প্রেরণ করিলেন। বাবু শরচ্চন্দ্র দাস তাসিলুনপো নগরের প্রধান মঠের এক জন ছাত্ররূপে পরিগৃহীত হইলেন। তিনি যে পথে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাহার অনুমতিপত্রও প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যতীত তাসিলামা এরূপ আদেশ প্রচার করিলেন যে, যে কোনও ঘোঙ্পন (বিভাগীয় শাসনকর্ত্তা) বা তিব্বতবাসীকে উক্ত পত্র প্রদর্শিত হইবে, তিনিই এই ভারতীয় পণ্ডিতের সাহায্য করিবেন; এবং তাঁহার মালপত্রাদি যে সকল জিনিসপত্র থাকিবে সমস্ত নিরাপদে পৌঁছিয়া দিবেন।

এই আত্মপরিচয়লিপি প্রাপ্ত হইয়াই দাস মহাশয় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে লামা উগায়েন-গিয়াৎস্থর মালপত্রাদির একটি Photographic camera যন্ত্র ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও উপহার দ্রব্যাদি লইয়া তাসিলুনপো অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজধানীতে তিন মাস অবস্থানের পর দাস মহাশয় সদলবলে বুদ্ধগয়ের দেবভাগে দার্জ্জিলিঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাসিলুনপোর প্রধান সচিব যথাযোগ্য সম্মানসহকারে তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বৎসরে পরচন্দ্রকে পুনরায় তাসিলুনপোতে গমন করিবার জন্য মন্ত্রী মহাশয় নিমন্ত্রণও করিয়াছিলেন, কিন্তু বিগত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সিকিমরাজ্যে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই।

তাসিলুনপোর যাত্রাকালে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের সহিত লামা উগায়েন-গিয়াৎস্থ, এক জন পথপ্রদর্শক ও দুই জন কুলি অনুগমন করিয়াছিল। তাঁহার সহিত একটা থিওডোলাইট বা কোণ-পরিমাপক যন্ত্র, একটি Prismatic compass, দুইটি hypsometers, একটি থার্ম্মোমেটার, একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও সাতশত দেড় শত টাকা ছিল।

নানাবিধ ঘটনায় এখন দেখা যাইতেছে যে, দাস মহাশয়ের তিব্বত গমনের মধ্যে কোনও রাজনীতিক উদ্দেশ্যের বীজ নিহিত ছিল। কিন্তু তিনি নিজে বলিয়াছেন, তুষারাবৃত হিমালয় গিরিশ্রেণীর অপরপার্শ্বস্থিত এই অজ্ঞাত নিষিদ্ধ নগরীর মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় রাজনীতিক অভিসন্ধি বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে আদৌ উদিত হয় নাই। নিষিদ্ধ নগরীতে প্রবেশ করিবার আনন্দ, বিপদকে আলিঙ্গন করিবার আহ্লাদ ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা আমার মনে তখন স্থান পায় নাই। ঈশ্বরের অবতার লামাদিগকে দেখিবার জন্য এই পবিত্র নগরীর অভিমুখে যখন আমি যাত্রা করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলাম, তখন কোনরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অর্থলাভের আশা, বা উচ্চ রাজপদলাভের প্রলোভন আমার মনে স্থান পায় নাই।

দার্জ্জিলিঙ্গের তিব্বতীয় বোর্ডিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে কার্য্য করিবার সময়

(১৮৭৪ হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) আমি তিনবার সিকিমরাজ্যে গমন করিয়াছি—প্রথম। যখন চিরতুষারাচ্ছন্ন ধূসর বিরাট ও দিগন্তপ্রসারিত গিরিশ্রেণীর ভীমকান্ত রূপ, বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্য ও কল্পনাতীত উচ্চতা অবলোকন করিতাম, তখন আমার হৃদয় একটা মহান ভাবে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িত। এই অনন্ত হিমারণ্যের অজ্ঞাত অপরিচিত পর্ব্বতগুহার অভ্যন্তরে যে সকল ঋষিকল্প পণ্ডিতগণ অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের পুণ্যাশ্রমে গমনের জন্য, অধুনা লুপ্ত উনবিংশ বৌদ্ধ-মঠের অভ্যন্তরে সযত্নরক্ষিত প্রাচীন ভারতের অমূল্য সাহিত্য-রত্নের আবিষ্কারের জন্য, আমার প্রাণের মধ্যে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত। * * * যখনই আমি তুষারমণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ও কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশৃঙ্গের দিকে চাহিয়া তিব্বতের নীল গগনপ্রান্ত অবলোকন করিতাম, তখনই এই সকল দেব-কল্প লামা ও তাঁহাদিগের পবিত্র ধর্ম্মমন্দিরসমূহ দর্শন করিবার জন্য আমার হৃদয় অধীর হইয়া উঠিত।

'তিব্বতীয় বোর্ডিং বিদ্যালয়ে অবস্থিতিকালে লামাদিগের সম্বন্ধে আমি কতিপয় পুস্তক পাঠ করিয়াছিলাম। সেই সকল গ্রন্থে একাদশ খৃষ্টাব্দের মহাত্মা অতিশা ও মিলারপার কথাই গল্পচ্ছলে বিবৃত হইয়াছিল। অতিশার চেষ্টা কিরূপে ফলবতী হইয়াছিল, এবং মিলারপা কিরূপ লোকাতীত বিভূতির ক্রিয়া দ্বারা স্বকার্য্যসাধন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিতে করিতে তিব্বতে যাত্রা করিবার জন্য আমি অধীর হইয়া থাকিতাম।

'সিকিমের ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিপাঠে ও তত্রত্য অধিবাসীদিগের সহিত কথোপকথনে তিব্বতীয় ভাষায় আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, তাহাতে আমার বিশ্বাস ছিল যে, তিব্বতে গমন করিলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। আমি শুনিয়াছিলাম, বৌদ্ধেরা দ্বিপ্রহরীয় ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে ভালবাসে, তিব্বতীয়গণ তাঁহাদিগের অনুরক্ত। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমি তাসিসুদনপো ও লামা নগবীর কতিপয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর নিকট আমার তিব্বতগমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। আমার সহকারী শিক্ষক বাবুবাহাদুর লামা উগায়েন-গিয়াৎসু উক্ত পত্রাদি সহ তিব্বতীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট গমন করেন।

'ইতিমধ্যে আমি দার্জ্জিলিঙ্গের ডেপুটী কমিশনরের নিকট আমার তিব্বত-গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম। বৃটিশ রাজ্যের বহির্ভাগে যাইতে হইলে তাঁহার অনুমতি আবশ্যক। মেজর গ্রাব্বাট লিউইন মহোদয় আমার আবেদনের উত্তরে বলিলেন যে, তিব্বত-রাজ কোনও ভ্রাতাকেও সিকিম-সীমান্তের বহির্ভাগে গমনের আদেশ দিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। তিনি আরও বলিলেন যে, তিব্বতীয়গণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হিতৈষী নহে; সেখানে ইংরাজদিগের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইতে পারে; সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে মহারাণীর কোনও প্রজাকে বৈদেশিক রাজ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি দেওয়া ষ্টেট-সেক্রেটারী ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। অর্দ্ধপ্রত্যেক অনুমতিলাভে বঞ্চিত হইলাও আমি ভগ্নোদ্যম হইলাম না। আমি লামা উগায়েন-গিয়াৎসুর প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে ছায়াচিত্র (Photography) শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে আমি একটি ক্যামেরা ক্রয় করিলাম। অবসর-কালে আমি ফটো তোলা শিক্ষা করিতে লাগিলাম। তিন মাস পরে লামা দৌত্যকার্য্যে সাফল্য

[illegible] করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন আমি তাঁর নিকট [illegible] ডিরেক্টর মিঃ [illegible] মহোদয়কে দেখাইবার সেই অনুমতিপত্রখানি [illegible] মহোদয় [illegible] প্রদান করিবার জন্য বন্ধুটি বাহাদুরকে অনুরোধ করিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে [illegible] বাহাদুরের সহিত কার্সিয়ঙ্গ দরবারে তিব্বতীয় ভাষার প্রধান [illegible] কার্য্য করিবার জন্য [illegible] করিলাম। সিকিমরাজের সহিত লামাদিগের 'নেওয়ার' সংক্রান্ত বিবাদ [illegible] জন্যই দরবার বসিয়াছিল।

হুকার মহাশয় নবেম্বর মাসে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভারতীয় মার্চে আফিসে [illegible] সংক্রান্ত মানচিত্র অঙ্কনের কার্য্যে নিযুক্ত হন। পর বৎসর মে মাসে তিনি তিব্বত যাত্রা করেন। সিকিমরাজ্যের জলপি নামক স্থান হইতে যাত্রা করিয়া [illegible] সহকারে নেপাল রাজ্যের [illegible] উপনীত হন। উক্ত নগর তাঁহার নদীর [illegible] এই স্থান হইতে তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গশ্রেণীর পশ্চিমপার্শ্ব দিয়া পর্ব্ব অতিক্রম করিয়া গিয়ানদর নামক গ্রামের সন্নিহিত লাসি গোম্ফা নামক মঠে উপনীত হন। তথা হইতে নেপাল ও তিব্বতের সীমান্তবর্ত্তী দুরারোহ ছত্রগম চাংলা নামক গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া জেম্ নগরে সদলবলে উপস্থিত হন। এই গিরিবর্ত্ম অতিক্রমকালে তাঁহাকে বিশেষ দুঃসহ ক্লেশ ও অনশনের যন্ত্রণা [illegible] করিতে হইয়াছিল, তাহা তাঁহার লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে উদ্ধৃত হইল।

"২৭শে জুন ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ। এখন আমরা [illegible] তুষারস্রোতের শেষ প্রান্তে পৌঁছিলাম। আমাদিগের বাম ও দক্ষিণে দুই সারি অনন্তবিস্তৃত হিমারণ্য। এই তুষার স্রোতের মধ্য দিয়া আমরা ক্রমশঃ অতিকষ্টে উপরে উঠিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর দেখিলাম, তুষারগিরিশ্রেণী উত্তর হইতে উত্তরপশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। উপত্যকা-ভূমি Corniche তুষারস্তূপে সমাবৃত। এ সকল তুষারস্তূপ অন্যূন পঞ্চাশ [illegible] উচ্চ। আমার মনে হইল, এই স্তূপসমূহ যেন সমুদ্রের তরঙ্গ। তুষারস্রোতের [illegible] অতিক্রম করিবার পর আমি [illegible] বসিয়া পড়িলাম। বায়ুমণ্ডলের লঘুতা-বশতঃ আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস বল অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। আমরা ১৯০০০ ফুট উচ্চে উঠিয়াছিলাম। এই সুদীর্ঘ তুষারস্রোত পথ অতিবাহনে প্রায় [illegible] সেই [illegible] আসিল। চক্ষে সবুজ চসমা পরিয়াছিলাম, তথাপি সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত তুষারবক্ষের [illegible] আমার নেত্রপীড়া উপস্থিত হইল। এরূপ শোচনীয় অবস্থায় আমি আর কখনও পড়ি নাই। নানা উপায়ে শিরাঃশূলের অবস্থা আমার অপেক্ষাও শোচনীয় হইয়াছিল। লামা দুইজন, সুতরাং পথশ্রমে তিনি একান্ত কাতর হইয়া বসিয়া পড়িলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা [illegible] শোচনীয় অবস্থায় তুষারস্তূপের উপর পড়িয়া রহিলাম। অবশেষে [illegible] আমাদিগের পথ প্রদর্শক ফুরচঙ্গকে বলিলেন, সে যদি আমাকে কিছু দূর কোলে করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে তিনি তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দিবেন। পুরস্কারের লোভে ফুরচঙ্গ আমাকে স্কন্ধে করিয়া [illegible] লইয়া গেল। [illegible] নামাইয়া দিয়া

পথপ্রদর্শক তাহার মোট লইয়া আসিল। আবার আমরা হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। তখন অপরাহ্ণ হইটা বাজিয়াছিল, কিন্তু যে পর্ব্বতে আমরা বিশ্রাম করিব ভাবিয়াছিলাম, তাহা বহু দূরে অবস্থিত। তাহার তখন আট ক্রোশ যাইতে বাকি ছিল না, কিন্তু বিশ্রাম করিবার উপযোগী স্থান ত এখানে নাই! এক বিন্দু জল যে পান করিব, তাহারও কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না। যেরূপ বেগে তখন তুষারপাত হইতেছিল ও বাতাস বহিতেছিল, তাহাতে অনাবৃত শিলাদ্রি-উপর রাত্রিবাস করাও নিরাপদ নহে। আবার আমরা অতিকষ্টে পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু এক মাইল পথ অতিবাহন করিবার পূর্ব্বেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। তখনও তুষারে প্রতিফলিত অল্প অল্প আলোক ছিল বলিয়া আমরা কোনরূপে পথ দেখিতে পাইতেছিলাম। সাতটার সময় আমরা একটা প্রকাণ্ড শিলার নিকট উপস্থিত হইলাম। উহা শিলাখণ্ড কঠিন বরফের উপর অবস্থিত ছিল। পথপ্রদর্শক বলিল, রাত্রির মধ্যে উহা পড়িবে না। কারণ, এখন বরফ গলিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমাদিগকে যাত্রা করিতে হইবে। তুষারোপরি উহার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পূর্ব্বপূর্ব্ব দিবস আমি কিছুই আহার করি নাই, কিন্তু তথাপি আমি ক্ষুধা বোধ করিলাম না। আমি তখন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম।

২৮শে জুন। অতি প্রত্যূষে আমরা পুনরায় তুষারবেষ্টনের মধ্য দিয়া যাত্রা করিলাম। কিন্তু কেবল তুষার। বৃক্ষ-তৃণ তখনও বহু নিম্নে থাকুক, তখন যদি কেবল একখানিও প্রস্তর দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলেও মনটা কতক নিশ্চিন্ত হইত। কেবল তুষার দেখিয়া আমাদের নয়ন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু হায়! একখানিও প্রস্তর আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। শ্বাসের কষ্ট ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কয়েক পা অগ্রসর হইয়াই আমরা শ্রান্তদেহে তুষারতলে বসিয়া পড়িতে লাগিলাম। আবার উঠিয়া চলিতে লাগিলাম। আবার রৌদ্রদীপ্ত তুষারের উপর বসিয়া পড়িলাম। এইরূপে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলাম। উগায়েন গিরাৎসু প্রফুল্লচিত্তে পথ চলিতে লাগিল। কিন্তু আমার প্রফুল্লতা কোথায়? আমার জানুদ্বয় স্পন্দরহিত হইয়া আসিল; পা আর চলে না। এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় অতিকষ্টে আমি চাখাংলা গিরিসঙ্কটের ত্রিশত হাত নিম্নে উপনীত হইলাম। আমার অবস্থা দেখিয়া কুরচঙ্গের অনুকম্পার উদয় হইল। সে তুষাররাশির উপর তাহার বোঝা ফেলিয়া দিয়া দৃঢ়হস্তে যষ্টি ধারণপূর্ব্বক আমার পৃষ্ঠ তুলিয়া লইল। আমি তাহাকে আমার স্কন্ধে জড়াইয়া ধরিলাম। তার পর নিমীলিতনেত্রে নিষ্পন্দভাবে আমি তাহার পৃষ্ঠে বসিয়া রহিলাম। চাখাংলা গিরিসঙ্কট হইতে ক্ষুদ্র নদীর পৌঁছিতে আমি ইচ্ছু চাহিলাম। এখানে নয় ইঞ্চি পরিমাণ তুষার জমিয়াছিল। কুরচঙ্গের পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আমি চলিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু তখনও আমার ভয়ানক কষ্ট বোধ হইতেছিল। কুরচঙ্গ তাহার মোট আনিবার জন্য আবার পূর্ব্বস্থলে ফিরিয়া গেল। তখনও তুষারপাত হইতেছিল। আমরা ভাবিলাম, বেচারীর মোট বোধ হয় এতক্ষণ তুষারে ডুবিয়া গিয়াছে। মধ্যাহ্ন-রবির প্রখর তেজে ও প্রদীপ্ত তুষারের আলোকে আমাদিগের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল। ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। পশ্চিমদিক্‌বর্ত্তিনী গিরিমালার

অন্তরালে সূর্য্য অস্ত গেল। তখন আমরা ভয়াবহ দুর্গম ক্রমোচ্চ গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিতেছিলাম। অবশেষে আমরা যে স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিব স্থির করিয়াছিলাম, সেই পর্ব্বতের বিপরীত ভাগে উপনীত হইলাম। অতিকষ্টে আমরা উপরে উঠিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে আমাদের পদস্খলন হইতেছিল, আর অমনি আমরা গড়াইয়া নীচে পড়িতেছিলাম। কখনও কখনও কুরি (নেপালী ছোরা বিশেষ) দ্বারা বরফ কাটিয়া পথ করিতেছিল, এবং এক হস্তে আমাকে দৃঢ়রূপে ধারণপূর্ব্বক উপরে উঠিতেছিল। ক্রমশঃ তুষারপটল অধিক হইতে লাগিল। তখন আমাদের মনে ভয় হইল, এইবার বুঝি তুষারসমাধি লাভ করিতে হয়। যাহা হউক, অতঃপর ছয়টার সময় আমরা নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বতগুহার সমীপে উপনীত হইলাম। গত রাত্রিকালে আমরা যেরূপ স্থলে বিশ্রাম করিয়াছিলাম, তদপেক্ষা এ স্থানটী অধিকতর নিরাপদ ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পথপ্রদর্শক তখন আমাদিগকে বলিল, সর্ব্বাপেক্ষা বিঘ্নসঙ্কুল ও দুর্গম পথ এখন আমরা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। অবশিষ্ট পথ অপেক্ষাকৃত সুগম। এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় আমি ভগ্নমনোরথে চাখালাং গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়াছিলাম। এরূপ ভীষণ, দুর্গম ও বিঘ্নসঙ্কুল গিরিবর্ত্ম আর নাই। প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যু যেন বিকট বদন ব্যাদানপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। সে রাত্রিতে নত আমরা কম্বল বিছাইয়া শয়ন করিলাম। শীতে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ নিষ্পন্দপ্রায় হইয়াছিল। গহ্বরের মধ্যে তুষার, বাহিরে তুষার, আবার গহ্বরের ছিদ্রপথে তুষার গলিয়া গলিয়া বৃষ্টিধারার মত আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গে পতিত হইতেছিল।

আমাদের প্রতিভা।

সে গেছে;—সে তারি সাথে নিয়ে গেছে সব সুখ,
রেখে গেছে ব্যথা শুধু জা'লাতে এ ভাঙ্গা বুক।
আশা সে নিয়ত গেছে, রেখে গেছে হাহাকার
শূন্য করি' গেছে বুক,—সে ত পুরিবে না আর।
শুষ্ক মরুভূমি মাঝে সেই ফুটায়েছে ফুল,
বহায়েছে স্রোতস্বতী,—শুনায়েছে কুল কুল;
তারি সাথে গেছে চলি' সে মায়া নন্দন তার,
শুধু শূন্য মরুভূমি—দীপ্ত বালু চারিধার।
কি নিয়ে কাটিবে দিন?—জ্বালা শুধু বুকে ভরা,
লক্ষ্যহীন দীর্ঘ পথ—শূন্য এ নিষ্ঠুর ধরা।
কি আশে ভরিবে আর—হৃদয়ে বাঁধিবে বল?
কি নিয়ে থাকিবে আর—মুছিবে নয়নজল?
মর তারে, মুছ আঁখি, বাঁধ বল হৃদি মাঝে—
আছে সে হৃদয় মাঝে—তা'রে স্মরি' চল কাজে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। ফাল্গুন। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুর লিখিত—"অক্ষয়কুমার দত্ত" নামক প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এবারকার 'প্রবাসী'তে আর কোনও উল্লেখযোগ্য সুখপাঠ্য প্রবন্ধ দেখিতেছি না। স্বর্গীয় মধুসূদন বসুর সহিত দত্তজার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। আজকাল, বোধ করি, আমাদের 'স্বদেশী-সমাজে' এরূপ বন্ধুত্ব বিরল। এখন আমরা কস্যাকুমারীর সহিত হিমালয়ের বন্ধুত্ব-প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত উৎসুক। সুতরাং আমাদের ভারতব্যাপী হৃদয়ে ব্যক্তিগত তুচ্ছ বন্ধুত্বের অবকাশ নাই। বন্ধুজের সহিত দত্তজার পত্র-ব্যবহার হইল। অক্ষয়কুমারের লিখিত কতিপয় পত্রের কিয়দংশ আলোচ্য প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে উভয় বন্ধুর আন্তরিক নিকটতা যেন মুদ্রিত হইয়া আছে। একখানি পত্রে অক্ষয়কুমার লিখিতেছেন—"মধ্যে মধ্যে আপনাকে স্মরণ হইয়া অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। অনেক দিন আর আপনার সহিত সদালাপ করিতে পাই নাই। আপনার তপস্যার কুশল, পরীবর দুখল, আশ্রমের কুশল, ব্যবসায়ের কুশল লিখিয়া বাধিত করিবেন। আপনার 'ছোট খাট' স্বপনমঞ্জরী কেমন আছে? আপনার চতুষ্পাঠীর শিষ্য-গুলি কেমন শিখিতেছে? গত দুই বৎসরে পরিমা তো পাঠ করিয়াছেন? তাহা আপনার মনোগত হইয়াছে কি না? আপনার মনঃপূত হইয়াছে কি না? এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় জানিবার জন্য ব্যগ্র রহিলাম।" আর একখানি পত্রে অক্ষয়কুমার লিখিয়াছিলেন—"আপনকার প্রণয়রসাভিষিক্ত সানুরাগ পি প্রাপ্ত হইয়া আপ্যায়িত হইলাম এবং তন্মধ্যে আপনকার প্রেমরস ভাব মূর্তিমান দেখিয়া ইই হইলাম।" আর একখানি পত্র এই,—"আপনার লিখিত ২৯ অগ্রহায়ণের অনুগ্রহ-পত্র পাইয়া বিশেষরূপে উপকৃত হইলাম। আপনি তাহার প্রত্যেক পংক্তিতে যে অনুপম নির্ব্বচনীয় বন্ধুবাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উপমা দিবার স্থল নাই। অতএব ভূমণ্ডলে এতাদৃশ বন্ধু এক জন থাকিলেও সকল সন্তাপ শীতল হইয়া যায়। অক্ষয়কুমারের ন্যায় আধুনিক সাহিত্যসমাজের আদর্শ লেখক বলিতেছেন,—"অক্ষয়কুমার বঙ্গের বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যসেবিগণের নেতৃশ্রেণীভুক্ত হইয়াও অহঙ্কারী ছিলেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহার যে বিনয়ভাব, তাহা তাঁহার পত্রসমূহের মধ্যে স্থানে স্থানে অতি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। ১৮৫৪ সালের ১৪ই ফাল্গুনে লিখিত পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন,—'আপনার সুরসময় প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। এবারকার সাহিত্যসম্মিলন সমাজের বক্তৃতা আপনার মনঃপূত হইয়াছে ইহা আমার প্রীতির বিষয়। আমার কোন রচনার সাধারণের সন্তোষ প্রকাশ না করেন, তাবৎ তাহা বিশুদ্ধ বলিয়া কোন মতেই প্রত্যয় জন্মেনা। * * * আপনিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানং।' * * * এই বিনম্রতা অনেক গ্রন্থকারের আত্মম্ভরিতা ভাবের সহিত তুলনা করিলে কেমন সুমধুর বোধ হয়। অন্যত্র লেখক বলিতেছেন,—'অক্ষয়কুমারের পত্রাবলীর নানা স্থলে তাঁহার রসিকতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। * * * কোন বিষয়ের জন্য ছয়টি টাকা দানের অনুরোধ করায় একজন

এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন ;—আপনাকে মহাবাণীর ছয়খানি অমূল্য মুখচন্দ্রমা প্রতিভা করিতে হইবেক। স্বপ্রণীত উপাসক-সম্প্রদায় নামক গ্রন্থ সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার লিখিয়াছেন ;—আপনি উপাসক-সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকা ভাগ সমগ্র পাঠ করিয়া উঠিয়াছে শুনিয়া চমকিত হইলাম। ভাগ্যে তাহার মধ্যে দু একটি Quis আছে, তাহা না হইলে আপনার কি উপায় হইত তাহা বলিতে পারি না। এইরূপ প্রবন্ধে মাসিকপত্রের গৌরব বৃদ্ধি হয় তাহা না বলিলেও চলে। বহু দিনের পর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "একজনের কথা" নামক গল্পটি বড় আগ্রহে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষ করিয়া নিরাশ হইয়াছি। প্রভাত বাবু গাউন চাকিতে পারে নাই। স্বদেশী গল্পের বিলাতী 'কোট' কা পুরু ধৌত করা যায় না। স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রঞ্জিত চিত্র খানি সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর" নামক প্রবন্ধে লেখকের নিজস্ব কি নাই। তাহার কিয়দংশ মহর্ষির স্বরচিত জীবনচরিত হইতে উদ্ধৃত, এবং মহর্ষির লিখিত দুইখানি "সঞ্জীবনী" হইতে না বলিয়া সঙ্কলিত।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। একাদশ ভাগ—দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা। শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ বেদান্তবিদ্যাসাগরের "গোতমের প্রতিভা" নামক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধটি অনুশীলনযোগ্য। বেদান্তবিদ্যাসাগর মহাশয় যে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার ন্যায় গালাগালি বিদ্যাতে বিশারদ, তাহার "প্রতিভায়" তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। জয়পুর-প্রবাসী শ্রীযুক্ত সেবানন্দ ভট্টাচার্য্যের "বিদ্যাধর" নামক প্রবন্ধটি মন্দ হয় নাই। "বিদ্যাধর এক জন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। অধর রাজ্যের বর্ত্তমান রাজধানী জয়পুর নগরের পত্তন তাঁহারই।" পত্রিকা হইতে "আয়ুধ-রাজবংশের" "ন্যায়া" ও "নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা"র 'মুড়া' বাদ দিয়া পরিষদ আমাদের উপহাস করিয়াছেন। ছেলেরা বলে 'আলা খেলে রাজা হয়', পরিষদের দপ্তরীই কি রাজা হইয়াছে? মুড়া খাইলে কি হয়,—'মুড়া'টি কাহার পাতে পড়িল? পরিষদের সম্পাদক আত্মসাৎ করেন নাই ত? তাঁহার মাথায় কাল চুলের একান্ত অভাব। যাক, শ্রীযুক্ত মোহনচরণ ভট্টাচার্য্য এ গ্রাম্য কবিতার বনফুলগুলি এক সাজিতে চয়ন করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

"মাসী গিসী বনকাপাসী বনের ভিতর টিয়ে। মাসী গেছে বৃন্দাবনে দেখে আসি গিয়ে।
কিসের মাসী, কিসের গিসী, কিসের বৃন্দাবন। জনম ভরে জেনো বাছা মা বড় ধন॥"

এই ঘুমপাড়ানিয়া গানটির পাঠান্তর আছে। আমাদের প্রিয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের মুখে আছে,—"মরা গাছে ফুল ফুটেছে মা বড় ধন।" "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" বলিলেও উদাত্ত সামগান। কিন্তু বলিতে কি, এই ঘুমপাড়ানিয়া গানে "মা বড় ধন" তাহা অপেক্ষাও বেশী জোরে আমাদের হৃদয়তন্ত্রী ঝঙ্কৃত করে। শ্রীযুক্ত অনেশচন্দ্র প্রমুখ "পয়ার ছন্দের উৎপত্তি" হইতে বাজে কথা বাদ দিলে পরিষৎপত্রিকা অনেকটা ভার কমিত। লেখকের উপমা কালিদাসের অপেক্ষাও বিচিত্র। তদ্যথা,—"এই সময়ে কেন্দুবিল্বের অরকবি শ্রীজয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দ কাব্যে 'পয়ার' ছন্দের ডিম্ব হইতে পক্ষী (?) শাবকের উৎপত্তির ন্যায়, অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।" উপমা রোগ সংক্রামক, অতএব আমরাও উপমা দিয়া বলি, পয়ারের উৎপত্তি সম্বন্ধে লেখকের সিদ্ধান্ত কি, তাহাও অখণ্ডিতের ন্যায় আমাদের অগোচর হইয়াই রহিল।